

तमसो मा ज्योतिर्गमय

SANTINIKETAN  
VISWA BHARATI  
LIBRARY

७२.२८१

अ

71487







# শ্রীশ্রীযুগাচার্য-জীবন-চরিত

সম্মেন্তা—

আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজীর  
জীবন-চরিত



স্বামী বেদানন্দ  
ভারত সেবাশ্রম সমাজ

মূল্য  
সাধারণ—১০ টাকা  
বীথান—৫ টাকা

প্রকাশক—  
স্বামী অন্নানন্দ  
ভারত সেବାশ্রম সঙ্ঘ  
২১১, রাসবিহারী এভিনিউ  
বালিগঞ্জ, কলিকাতা—১২

[ শ্রীশ্রীপ্রণবমঠ কর্তৃক সর্বস্ব সংরক্ষিত ]

মুদ্রাকর—শ্রীতেজেন্দ্রনাথ সরকার  
ক্লাসিক প্রেস  
২১, পটুয়াচৌলী লেন, কলিকাতা ।

## প্রকাশকের নিবেদন

ভারত সেবাপ্রম সজ্জের প্রতিষ্ঠাতা ধর্ম-সংস্থাপক, জাতি-সংগঠক ও সমাজ-সংস্কারক অলৌকিক তপঃশক্তি-ঘন-বিগ্রহ আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজীর দিব্য জীবন-সীলার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। তাঁর স্থূল জীবন-সীলার উপর যবনিকাপাত ঘটিয়াছে মাত্র নয়টা বৎসর। ইতোমধ্যেই তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী বর্ণে বর্ণে প্রত্যক্ষ হইতেছে। দেশের বিশেষ ভাবে হিন্দু জাতির জীবনে আসন্ন মহাবিপর্ধ্য প্রত্যক্ষ করিয়া অতিমাত্র বিচলিত আচার্য্যদেব আহ্নার নিজায় উদাসীন হইয়া দিব্যরাত্র অতদ্রুতাবে মহাহুদিনের পাথের সংগ্রহের জন্য অবিরাম প্রেরণা দান করিতেছিলেন। তজ্জন্ত তিনি যে অব্যর্থ ও অদ্বিতীয় কর্ম-পরিকল্পনা নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন, সেই কর্ম-যোজনা লইয়া স্বয়ং সহস্র সহস্র কর্মী সহ অবিভ্রাম কর্ম-তরঙ্গে ভাসিয়াছিলেন। হুর্ভাগ্যের বিষয় যথা সময়ে তাঁর বাণী ও কর্ম নির্দেশ জাতি গ্রহণ করিতে পারে নাই; মহাহুদিনের আবশ্যক পাথের সংগ্রহে অসমর্থ জাতি আজ মহাবিপর্ধ্যয়ে মুহমান।

বিশ্বনিয়ন্তা ভগবানের অবশ্রুতাবী বিধানই যুগের মহান আচার্য্যের জীবন ও কর্মসীলার মধ্যদিয়া জাতি ও জগতের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়াছে। যতদিন জাতি ভগবদ্ বিহিত যুগাচার্য্য-প্রদর্শিত পন্থা গ্রহণ না করিবে, ততদিন বিপদের উপর মহাবিপদ, বিপর্ধ্যের উপর মহাবিপর্ধ্য, ধ্বংসের উপর মহাধ্বংস ক্রমাগত বর্জিত বেগে আপতিত হইতে থাকিবে। যত দ্রুত দেশ ও জাতির দুর্দুর্ভাগ্য অবসান ও স্বয়তির উদ্ধোধন ঘটে, ততই মঙ্গল।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସ୍କରଣେ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ପରିବର୍ଦ୍ଧନ କରା সম୍ଭବ হয় নাই । জাতি-সংগঠক মহান্ আচার্য্য যে বিরাট্ କର୍ମଚକ୍ର প্রবର୍ତ୍ତନ କରିয়া গিয়াছেন, দেশ ও জাতির জীবনে ক্রমাগত বিরাটতর দুର୍ଦ୍ଦୋগের আবির্ভাবে সেই କର୍ମଚକ୍ରের বেগ ଢ୍ରুତতର ও ব্যାପକତର হইয়া উঠিয়াছে ; ফলে তদীয় সজ্জের আত্মনিবেদিত କର୍ମীগণ অনবসর হইয়া পড়িয়াছেন । সজ্জনেতা আচার্য্যদেব কথা খুব কমই বলিয়াছেন, অবিরাম অবিশ্রাম, অতদ্রুতভাবে কাজই କରିয়াছেন ও করাইয়াছেন । তাঁহার উত্তর সাধক সন্তানগণের জীবনেও তদ্রূপ কাজের নিদারুণ চাপে কথা বলিবার অবসর নিতান্ত কম ।

পୁস্তকের ছাপা ব্যয় ও কাগজের মূল্য পୂର୍ବাপেক্ষା পাঁচ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି পাইয়াছে । সে হিসাবে পୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣ অপେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସ୍କରଣের ଜନ୍ତ୍ର ব্যয় তদ୍ରূପ ଅধিক পড়িয়াছে । কিন্তু জন-সাধারণের କ୍ରେୟ-ଶକ୍ତିର ମିଳିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାখିয়া ଗ୍ରନ୍ଥের ମୂଲ୍ୟ ବିଶେଷ ବୃଦ୍ଧି କରା ହইল ନା ।

ଚେଷ୍ଟାସତ୍ତ୍বেও ମୁଦ୍ରଣের ଭୂଲ କ୍ରୁটি ରହିয়া গিয়াছে ; ଏକତ୍ର পাঠକ পাঠିକାଗଣের ନିକଟ ମାର୍ଜ୍ଜନା ଭିକ୍ଷା କରି । ইতি—

ପ୍ରକାଶକତ୍ର

## ৩ ভূমিকা

বিশ্বপ্রবাহ-শ্রোতে নটরাজ মহাকালের নৃত্যরঙ্গে যখন নব নব পর্যায়ের সূচনা হয়, সেই যুগ-সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হন—এক এক যুগ-মানব, তাঁকে ভগবান বল, অবতার বল, আচার্য্য বল, নেতা বল, গুরু বল, পরিজ্ঞাতা বল, মহামানব বল—যে নামে যার খুসী। সেই দেব-মানবের দেহ-মনের মধ্য দিয়ে সমগ্র অনাগত যুগের ব্যথা-বেদনা, অভাব-অভিযোগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংশয়-সমস্যার সমাধান ও পরিপূরণের উপায়ের ইঙ্গিত আসে—তার সাধনা-তপস্যা, চিন্তা-ভাবনা, আলাপ-আলোচনা, আদর্শের প্রেরণা ও কর্ম-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। এমনতর মহামানব আসেন একবার নয়, দুইবার নয় বহুবার, অসংখ্য বার। তাই ভাগবতে ঋষি স্বীকার করিয়াছেন—

“অবতারা হ্যসংখ্যেনাঃ”

অনাগত যুগের শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে যে মহামানবের প্রবর্তিত আদর্শ ও অবদান-পরম্পরা ধীরে ধীরে ক্রম-বিকসিত হয়ে মানবের সাধনা-সংস্কৃতির ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর, পূর্ণতর করে তুলে শক্তি, শান্তি ও মুক্তির পথ দেখাবে;—সেই বিরাট পুরুষকে জনসাধারণের ক্ষুদ্রবুদ্ধি স্বভাবতঃ ধরিতে ও বুঝিতে পারে না, স্তব্ধাং বিশ্বাসও করিতে পারে না। শুধু তাই নয়, অন্তরে বাহিরে সেই মহামানবের বিরুদ্ধে একটা বিজ্রোহ, ঝন্ড, সংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়া বসে। তাই ~~ঐক্য~~ ~~বয়ং~~ বলিয়াছেন—

“অবজানন্তি মাং যুতা মানুষীং তন্মুমাশ্রিতম্”

কিন্তু কালের আবর্তনে যুগ-মানবের জগৎ-কল্যাণমূলক ভাব যতই বিকসিত হইয়া আনন্দ, কল্যাণ, শান্তি, সৌরভ বিতরণ করিতে থাকে, ততই মানবগণ তাঁর সম্বন্ধে সচেতন ও জিজ্ঞাসু হইয়া উঠে। তাঁর ভাবের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, কর্মের প্রবাহে ভাসিয়া মহাভাবে মাতোয়ারা আত্মহারা হয়। তখন তাঁর প্রত্যেকটী কথাবার্তা, আকার ইন্দ্রিত, বিধি-ব্যবস্থা ও কর্মপ্রচেষ্টায় বিশ্বকল্যাণমূলক ভাব ও উদ্দেশ্য অনুধাবন করিয়া অবাক হয়। আর সেই ভাবের একটুখানি স্পর্শলাভের জগৎ কত আক্ষেপ, আকুতি, অশ্রুজল ঢালিতে থাকে :—

“হরি নাম দিয়ে যে মাতায়ে গেল—

সে কোথায় র’লো

\* \* \* \*

তাঁরে কোরে দিলি অপমান

তাই চলে গেলো।

এখন যে ভাই জলে পরাণ

কী করি বলো !”

সঙ্ঘবনেতা আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী—তাঁর সম্বন্ধে পাত্রভেদে বার যে ধারণাই থাকুক না কেন, তিনি যে এমনিতর একজন যুগ-মানব,—তাঁর দিব্যজীবনের আদর্শ, সাধনা ও কর্মেষণার মধ্য দিয়ে যে আসন্ন ভবিষ্য যুগের অসংখ্য সমস্যার মূল সমাধান আসিয়াছে ;— তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এক যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষার ফল বৃকে কোরে এসেছিলেন ; ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন—আর এক যুগের মূর্ত সমাধান রূপে ; তথাগত, বুদ্ধদেব,

আচার্য্য শঙ্কর, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য—এঁরাও ছিলেন এক একটা যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনার,—সংশয়-সমস্যার সমাধানের মূর্ত্তবিগ্রহ।

আবার যুগান্তর ;—তথাগত বুদ্ধের অহিংসা-সাধনার যুগ চলে গেছে ; আচার্য্য শঙ্করের বেদান্তভিত্তিতে বর্ণাশ্রমাপ্রতিষ্ঠিত আৰ্য্য হিন্দু সমাজের পুনর্গঠনের যুগ অতীত হয়েছে ; মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের “তৃণাদপি সুনীচেন” এবং “মেরেছিস কলসীর কাণা তা’ বলে কি প্রেম দিব না” রূপ হরিনামের বস্ত্রার শ্রোত মন্দীভূত হয়েছে। বর্ত্তমান ও আসন্ন যুগের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ; এ যুগের অভাব-অভিযোগ, ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আকুতি-আবেদন, সংশয়-সমস্যা সম্পূর্ণ পৃথক।

এ যুগে দৈবী সভ্যতা-সংস্কৃতির সহিত আনুসারী সভ্যতা-সংস্কৃতির সংগ্রাম ; আৰ্য্য আধ্যাত্মিক আদর্শ-সাধনার বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক ও নাস্তিক জড় আদর্শ-সাধনার দুরন্ত অভিযান ; জড় সভ্যতা-সংস্কৃতির উপাসকরূপে পৃথিবীর সকল স্বাধীন, শক্তিশালী জাতি আধ্যাত্মিক আদর্শ ও সাধনার সাধক ও বাহক—ভারতীয় আৰ্য্য হিন্দুজাতির অস্তিত্বের ধ্বংস-সাধনে বড়যন্ত্র-পরায়ণ ও সজ্জবদ্ধ।

ব্যক্তিগতবাদ, ভোগবাদ, সমানাদিকারবাদ এর বিজয় নিশান উড়াইয়া মানব ভগবানকে অস্বীকার করিতেছে, ধর্মকে অবজ্ঞায় ঠেলিয়া ফেলিতেছে, ভক্তি-প্রীতি-বিনয়-সরলতা-কৃতজ্ঞতা-সহানুভূতি-সংযম-সতীত্ব বিসর্জন দিয়া নরনারী অবাধ স্বেচ্ছাচারে অঙ্গ ঢালিয়া দিরাছে ; ব্যক্তিগত স্বার্থ-সুখ-সন্তোষই যাবতীয় কর্মের নিয়ামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জীবনই বাস্তব, ইহকালই জলন্ত সত্য, ভগবান-পরকাল-স্মৃতি-নরক দুর্বল মনের কল্পনা ; সুতরাং “হেসে নাও ছ’দিন



বৈতন্য, কি জ্ঞানি কার কখন সন্ধ্যা হয়”; ভোগ-সুখ-আনন্দ—হলে বলে কৌশলে যতটা পার করিয়া লও;—ইহাই বর্তমান যুগের জঘন্য আত্মঘাতী মনোবৃত্তি। এই ভাব ও আদর্শের প্রভাবে ব্যাটি ও সমষ্টি জীবনে সংঘর্ষের দাবানল জলিয়া উঠিয়াছে। ফলে পারিবারিক জীবনে স্নেহ-ভক্তি-প্রেম-অঙ্কা-প্রীতি প্রভৃতির বন্ধন এবং পরস্পর দায়িত্ব ও কর্তব্য-বোধ অন্তহিত হইয়াছে ও হইতেছে। সামাজিক জীবনে সহায়ত্ব, সহযোগিতা ও ঐক্য বিলুপ্ত হইতেছে।

আজ তাই দেখি—সর্বত্র শক্তিমান, ধনবান ও কুট বুজিমানের জয় জয়কার; পক্ষান্তরে—দুর্বল, অসহায়, দরিদ্র, সরল ব্যক্তি ও জাতির সর্বনাশ—শাসন-শোষণ ও পীড়নে। পৃথিবীময় আজ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ বিগ্রহের কালিয়া জলিয়াছে; সে প্রলয়-বহ্নিমুখে মানবজাতি পতঙ্গের মত ভস্মীভূত হইতে বসিয়াছে। ঐহিক ভোগ-সর্বস্ব, আত্ম-কেন্দ্রিক সভ্যতা-সংস্কৃতির ইহাই শোচনীয় ভয়াবহ পরিণাম।

আত্মরিক সভ্যতা-সংস্কৃতির এই আত্মনাশা প্রবাহ ভারতের দেশ ও জাতিকে ভাসাইয়া ডুবাইয়া ইংরেজ আধিপত্যের ছিদ্র বাহিয়া আধ্যাত্মিক আদর্শ-সাধনার দুর্ভেদ্য দুর্গ—ভারতীয় আৰ্য্য হিন্দু-সমাজেও প্রবেশ করিয়াছে। অথচ আৰ্য্য হিন্দুসমাজ আজ বিচ্ছিন্ন, বিপর্য্যস্ত, দুর্বল, আত্মরক্ষায় অক্ষম। জড় সভ্যতার এই প্রচণ্ড বেগ সে কিরূপে প্রতিহত করিবে? শুধু যে আৰ্য্য সভ্যতা-সংস্কৃতি আজ বিপন্ন—তা’ নয়; আৰ্য্য সভ্যতা-সংস্কৃতির একমাত্র উত্তরাধিকারী—আৰ্য্য হিন্দুর সামাজিক ও জাতীয় জীবনের অস্তিত্বও আজ বিপন্ন। আৰ্য্যহিন্দুজাতি বাঁচিলে—আধ্যাত্মিক আদর্শ ও সাধনা বাঁচিবে; আৰ্য্য হিন্দু মরিলে আধ্যাত্মিক সভ্যতা-সংস্কৃতি নিশ্চিহ্ন হইয়া বাইবে।

এই অভিনব ভয়াবহ যুগের আশার বার্তা, সাধনার ইঙ্গিত ও কর্মপরিকল্পনা বহন কোরে এসেছিলেন—সম্মানেতা আচার্য—শ্রীমৎ স্বামী প্রবানন্দজী। তপস্শ্রাব্য বেদীতে বখন তাঁর দেহমনে আনন্দের প্রাবন বহাইয়া নির্ঝঞ্জে জ্যোতিঃ বলকিয়া উঠেছিল আসন্ন যুগের আশার বাণী তাঁর কণ্ঠে ঝঙ্কত হলো—“এ যুগ মহাজাগরণের যুগ, এ যুগ মহাসমস্রয়ের যুগ, এ যুগ মহামিলনের যুগ, এ যুগ মহামুক্তির যুগ।” আর এই সংক্ষিপ্ত যুগবাণীর জলন্ত ভাষা ছিল—অলৌকিক তপঃশক্তিশালী যুগাচার্যের অনিরুদ্ধচরিত্র, অতুলনীয় জীবন।

আচার্য ইঙ্গিত করিলেন—মানবজাতিকে আসন্ন ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিতে হইলে আধ্যাত্মিক আদর্শ—ত্যাগ—সংযম—সত্য—ব্রহ্মচর্যের প্রতিষ্ঠা চাই—ব্যাপ্তি ও সমষ্টি জীবনে। ভারতীয় আধ্যাত্মিক এই আদর্শের বাণী ও সাধনা মানবজাতিকে শিখাইতে পারে। সুতরাং আধ্যাত্মিক হিন্দুজাতিকে সম্ভবতঃ, শক্তিমান, জীবন-সংগ্রামে উৎসাহী ও নির্ভীক, স্বধর্ম-নিষ্ঠ করিয়া তুলিতে হইবে। তাই তিনি নির্দেশ করিলেন “হিন্দুর কল্যাণে, ভারতের কল্যাণ—মানবজাতির কল্যাণ; হিন্দুর মুক্তিতে ভারতের মুক্তি,—সমগ্র মানবজাতির মুক্তি।” সম্মানেতা আচার্যের জীবন একটি মহাসমুদ্রবিশেষ। ইহার কুল-কিনারা ও গভীরতা নির্ধারণ করা অসম্ভব। তবে তিনি যে আদর্শ, বাণী ও কর্মপরিকল্পনা প্রচার করিয়াছেন, স্বয়ং তাহা নিজের ও পারিপার্শ্বিকের জীবনে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন।

স্বীয় জীবন, চরিত্র ও আদর্শের হাঁচে একদল তরুণ ত্যাগী সন্ন্যাসী গঠন পূর্বক “ভারত সেবাস্রম সঙ্ঘ” রচনা করিয়াছেন। এই সঙ্ঘ-বহুর মধ্যেই আচার্য তাঁর মহাতপঃশক্তি, আধ্যাত্মিক আদর্শ, আধ্যাত্মিক

হিন্দু-সমাজকে অথও, শক্তিশালী, আত্মরক্ষণক্ষম করিয়া গড়িবার শক্তি, প্রেরণা, আদর্শ ও পরিকল্পনা সঞ্চিত রাখিয়া গিয়াছেন।

তাঁর বাল্য ও কৈশোর জীবনে বুদ্ধের কঠোর ত্যাগ ও বৈরাগ্য, শঙ্করের ব্রহ্মচর্য ও ব্রহ্মজ্ঞান জলন্তরূপে দেখিয়াছি ; জাতি গঠনক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বীৰ্যবস্তুর প্রেরণা, স্মৃতীক্স দূরদৃষ্টি এবং সর্বসামঞ্জস্য ও সমাধান-মূলক নীতি-নৈপুণ্য লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইয়াছি। সম্ভবশক্তি গঠন ক্ষেত্রে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীচৈতন্যের গ্রাম অনমনীয় মর্যাদা-বোধ ও আচণ্ডাল সর্বতোবিসারী—প্রেমের বস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ উভয়ের সমন্বয়—এই আচার্যের জীবনে দেখিয়া অন্তর মন্থন নাথ মুখোপাধ্যায় আচার্যের শোকসভায় উল্লেখ করিয়াছিলেন—“শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ নাই ; কিন্তু ছিলেন—আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী। তাঁর তিরোধানে হিন্দুধর্ম ও জাতির স্বর্ণচূড়া খসিয়া পড়িল।”

সম্বনেতা আচার্যের জীবনী লিখিতে বসিয়া মনে হয়—“প্রাণ্ডলভ্যে কলে লোভাতুষ্ণাহরিব বামনঃ”বৎ “হুনের পুতুল হইয়া যেন মহাসমুদ্রের পরিমাণ” করিতে বাইতেছি। সেকথা ভাবিতে গেলে লেখনী স্তব্ধ হয়, বাকশক্তি মুক হয়, মননশক্তি দিশাহারা হয় ; কিন্তু তথাপি তিনি আসিয়াছিলেন—আমাদেরই জন্ত, একান্ত দরদী, মরমী, ব্যথার ব্যথী, —পিতামাতা, বন্ধু, সখা রূপে ময়লামালিন্য ধুইয়া মুছিয়া স্বীয় অভয় কোলে তুলিয়া নিতে। আমরা তাঁহার স্নেহের প্রাশ্রয় পাইয়া অশ্রদ্ধা ও অবাধ্যতা করিতে থাকিলে তিনি কদাচ উত্তেজিত হইয়া বলিতেন—স্নেহাঙ্ক পিতামাতা যেমন পুত্রকন্যাকে প্রাশ্রয় দিয়া তাদের সর্বনাশ করে ; আমিও তেমনি অতিরিক্ত স্নেহের বশে তোদেরকে ক্ষমা করে, প্রাশ্রয় দিয়ে তোদের ক্ষতি করছি।

ওরে! সিংহ আজ সাধ করে মেবের দলে মেঘ সেজে কেন  
আছে, তা' জোরা কি বুঝি?

যিনি “অবান্ননসোগোচর” ভূমাপুরুষ, তিনি যে জীবোদ্ধারের  
প্রেরণায় আমাদের মত মানুষের ধর্ম স্বীকার করে, প্রেম-সম্বন্ধে আবদ্ধ  
হয়ে আমাদের মধ্যে ছিলেন; আমাদের ক্ষুদ্র-হৃদয়-মুকুরে তাঁর যেটুকু  
প্রতিবিম্ব প্রতিকলিত হয়েছে;—তাহাই তো আমাদের পাথের;  
সেইটুকু স্মরণ—মনন—আলোচন-আশ্বাদন ছাড়া আমাদের আর  
তাঁকে বোঝার উপায় কি?

তাই অক্ষম হইলেও তাঁর অলৌকিক ভাগবত জীবন ও চরিত্র  
আলোচনা করিব; অসম্পূর্ণ হইলেও যেটুকু জানি, বুঝি ও অনুধাবন  
করিতে পারি—তাহাই করিতে হইবে। তাঁর অহৈতুকী  
আশীর্বাদ ও অলৌকিকী শক্তিই একমাত্র ভরসা।

তাঁর জীবিত কালে কেহ কেহ জীবনী লেখার কথা উত্থাপন করিলে  
তিনি ধমক দিয়া বলিতেন—“জীবন্ত জীবন সামনে থাকতে আবার  
জীবনী কি? আমি কি পাহাড়ে পর্বতে বনে জঙ্গলে থাকি?  
আমাকে দেশে কে না জানে, না চেনে?” সত্যই তিনি  
জন্মাবধি গ্রামে, সমাজে, সহরে বাস করিয়া আসিয়াছেন। আধ্যাত্মিক  
সাধন-ভজন-তপস্তার অজুহাতে তিনি কদাচ পাহাড়ে পর্বতে  
নির্জন অরণ্যে জীবন বাপন করেন নাই। লোকচক্ষুর সম্মুখে তাঁর  
সাধন-জীবন; লক্ষ লক্ষ লোকের সমক্ষে সহস্র সহস্র কর্মী লইয়া  
অবিরাম অবিশ্রান কর্মতরঙ্গে তাঁর জগদ্ধিতায় কর্মজীবন! কোনো  
প্রকার রহস্যের কুহেলিকা ও ভাবুকতার আবছায়া সেখানে নাই।  
তিনি তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যগণকেও নির্দেশ দিতেন—“যখন  
বাকে যেখানে রাখা হইবে, সেইখানকেই হিমালয়ের

স্বহাগস্বর মনে করিবে; সঙ্কল্পিত মনই সাধকের নির্জন্ম  
 শুভা;” তাঁর বক্তৃকঠোর নির্দেশ—“সঙ্কল্পে যে স্বদৃঢ়, প্রতিজ্ঞার  
 অবিচলিত সিদ্ধি তার করতলগত; সঙ্কল্প হতে বিচলিত হওয়ার  
 পূর্বে যেম প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।” তাঁর অলৌকিক জীবন,  
 অটুট ব্রহ্মচর্য, কঠোর তপস্যা, অপ্রতিহত সাধনা, দুর্দম কৰ্মপ্রবাহ,  
 অসামান্য সজ্জ-গঠন-কৌশল;—সমস্ত কিছুর মূলে এই সরল রহস্য।

**বুদ্ধদেবের**—প্রধুমিত বৈরাগ্য লইয়া বিবাহ ও সাময়িক  
 সাংসারিক জীবন; প্রজ্জ্বলিত বৈরাগ্য লইয়া নির্বাণের আশায় সংসার  
 ত্যাগ; সুদীর্ঘ স্বকঠোর তপস্চর্যার পর “মার” কে পরাজিত করিয়া  
 বোধিলাভ; তৎপরে পঞ্চশিষ্যকে লইয়া ধর্মচক্র প্রবর্তন ও সজ্জ-গঠন  
 এবং ধর্মপ্রচার;—এ সবই আমাদের নিকট বেশ আভাবিক মনে  
 হয়—মানবজীবনে আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিকাশের ক্রমোচ্চ স্তর  
 সমূহ।

**আচার্য্যশঙ্করের** জীবনও অলৌকিক হইলেও আমাদের নিকট  
 অস্বাভাবিক মনে হয় না। তিনবৎসর বয়সে গুরুগৃহে গমন,  
 ব্রহ্মচর্যাভ্যাস, শাস্ত্রাভ্যাস এবং পঞ্চবর্ষ বয়সে সমাবর্তন; আট বৎসর  
 বয়সে মাতার অহুমতিক্রমে সম্মানগ্রহণপূর্বক গুরু মহাযোগী গোবিন্দ  
 পাদের নিকট যোগসাধনা; তৎপরে বৈদিক ধর্মপ্রচারের উদ্যোগ ও  
 ভাষ্যাদির রচনা, সম্মানসী সজ্জ সংগঠন ও মঠ সংস্থাপন; এ সবের মধ্যেও  
 একটা ক্রমিক বিকাশের ধারা আছে।

মহাপ্রভু **শ্রীচৈতন্যদেবের** জীবনের ক্রমিক বিকাশগুলিও  
 স্বকোঁথ্য নয়। তাঁর অধ্যয়ন, বিবাহ, সংসারধর্মপালন; তৎপরে  
 ভগবদ্ভাব ও ভক্তির উদয়, নাম-সংকীর্ণনের উদ্ভাদনা; প্রথমা পত্নীর  
 পরলোক গমনে দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ, তৎপরে বৈরাগ্য ও সম্মান,

শিষ্য সংগ্রহ পূর্বক লুপ্ত হিন্দুতীর্থসমূহের সমুদার ও ধর্মপ্রচারে নিয়োগ, তৎপরে অধিকাংশ সময় ভগবৎ প্রেমে উন্নত ও ভাব-বিস্মল অবস্থা ; কদাচ ভগবদ্ভাবে ঐশ্বর্য-বিস্তার ও শক্তি-সঞ্চার ;—অলৌকিক হইলেও ইহা অসমঞ্জস নয় ।

কিন্তু সজ্জনেতা আচার্য্যের জীবনে বহু দ্বন্দ্বের সমন্বয় দেখিয়া বিচার-বুদ্ধি বিমূঢ়, দিশাহারা হয় । এই অলৌকিক আচার্য্য জন্মাবধি দিক্‌লাভ ও সজ্জ গঠনের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে বাস ; গ্রাম্য সমাজে নঙ্গিগণের সহিত বিছালয়ে অধ্যয়ন, ব্যায়ামক্রীড়া, গৃহকর্ম, গ্রাম-হিতকর ও জন-হিতকর কর্মাদিতে নেতৃত্ব, বালক ও যুবকগণের হিত-চিন্তা ও জীবন গঠনের উপদেশ দান ; গ্রাম্য সমাজের মনোমালিন্য, বিবাদ-বিসম্বাদে মধ্যস্থতা, কদাচ কঠোর হস্তে দুর্বৃত্ত-দমন করিয়াছেন ; অথচ ইহারই মধ্যে তাঁর কঠোর তপশ্চর্যা ও অটুট ব্রহ্মচর্যা ;—স্বল্পভাষী, স্বল্পাহারী, জিতনিদ্র, আত্মসমাহিত, শান্ত, স্নিগ্ধ, সর্বপ্রিয়কারী, প্রিয়বদ, অথচ মহাতেজস্বী মহাশক্তিশালী এই অদ্ভুত সাধকের অবিচালিত সঙ্কল্পে অভীষ্ট মহামুক্তি লাভের পথে দ্রুত অথচ সূদৃঢ় পদে অভিযান ;—এই অদ্ভুত সমন্বয় যথার্থই দুর্কোধ্য ; এমনটী বুদ্ধ-শব্দর-চৈতন্যের দ্বায় মহান্ আচার্য্যগণের জীবনেও দেখা যায় নাই । বিচার ও তুলনা করিলে মনে হয়—একমাত্র শ্রীশ্রীকৃষ্ণের মহাজীবনের সহিতই এই আচার্য্যের জীবনের সাদৃশ্য ।

দিক্‌লাভের পর ভগবৎ-শক্তির প্রেরণায় যখন সজ্জগঠন ও জাতি গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে আচার্য্যদেব কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, তখনও সর্বদাই তিনি একভাবে চলিয়াছেন । দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত সঙ্কল্পিত কর্মের চিন্তা ও অহুষ্ঠান । এই শত শত সন্ন্যাসীকে ধর্মপ্রচারাদি-কার্যে নিয়োগপূর্বক আদেশ নির্দেশ দিতেছেন ; সেই সঙ্গেই শত শত

কৃষাণ-মজুরকে খাটাইতেছেন, পর মুহূর্তে পাকশালায় প্রবেশপূর্বক খুটীনাটী নির্দেশ (কত লোকের জন্ত কি কি কত পরিমাণ পাক করিতে হইবে) দিতেছেন; পরমুহূর্তে রাজমিস্ত্রিকে গৃহ নির্মাণের নির্দেশ দিতে দিতে কাজ দেখাইয়া দিতেছেন; তৎপরেই হয়তো গ্রাম্য দলানলি, পারিবারিক কলহ, সাম্প্রদায়িক বিবাদ লইয়া সমাগত লোকজনের সহিত বিচারে বসিয়া তাহাদের সমস্তার সমাধান পূর্বক শাস্তি বিধান করিতেছেন; তৎপরেই সিংহাসনে বসিয়া ধর্মার্থী জিজ্ঞাসু নর-নারীগণকে উপদেশ দান, সাধন প্রদান ও শক্তি সঞ্চার করিতেছেন; পর মুহূর্তে ভগবদ্ভাবে আরতির সিংহাসনে বসিয়া সহস্র সহস্র ভক্ত, শিষ্য ও অনুরক্ত নরনারীর আকৃতি ভরা পূজা গ্রহণ পূর্বক শিরঃস্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ দান ও শক্তি সঞ্চার করিতেছেন; তৎপরেই স্নান ও আহাৰান্তে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া শত শত সন্ন্যাসী, কন্মী, কৃষাণ, মাঝি, মিস্ত্রীকে সম্মুখে বসাইয়া সমস্তে মাতৃস্নেহে আহাৰ করাইতেছেন,—প্রতিদিন, দু'বেলা;—এইরূপে উচ্চতম আধ্যাত্মিক ভাব হইতে তুচ্ছতম গৃহীর সাংসারিক কর্তব্যগুলি অবিভ্রান্ত সমান তালে চলিয়াছে,—কোনো ছেদ নাই, ব্যতিক্রম নাই;—ইহা অতি সূক্ষ্ম বিচারশীল বুদ্ধিতেও সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব কি?

এই কারণেই এই অলৌকিক আচার্য্যের সম্বন্ধে অসংখ্য লোকের অসংখ্য ধারণা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভূমিকায় তাঁর মহাভাব ও কার্যাবলী লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির এক্রূপ পরস্পর-বিরোধী ধারণা হওয়া অসম্ভব নয়। কেহ বলেন—তিনি ব্রহ্মচর্য্যের ও আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিমূর্তি, কেহ বলেন—তিনি ভগবদ-শক্তিসম্পন্ন অবতার, কেহ বলেন—তিনি মহাকৰ্মযোগী, কেহ বলেন—তিনি শক্তিশালী নেতা, কাহারও মতে তিনি অসাধারণ সংগঠন-প্রতিভাশালী ব্যক্তি

(Organiser)। অবশ্য কাহারও ধারণা মিথ্যা নয়। আচার্য্যের অলৌকিক জীবনে এই সর্ববিধ ভাব ও শক্তির বিকাশ ও সমন্বয় ছিল।

পূর্বেই বলিয়াছি একমাত্র শ্রীশ্রীকৃষ্ণের সহিত আচার্য্যের এই সর্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ বিরাট ব্যক্তিত্বের সাদৃশ্য দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের সেই (১) অত্যাচারী দুষ্টির দমনে আজীবন প্রচেষ্টা, (২) ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যম ও ব্যবস্থা, (৩) ধার্মিক ও ভক্তগণের রক্ষা বিধান; —জাতি সংগঠক যুগাচার্য্যের জীবনে এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই লক্ষ্য করি—তাঁহার প্রবর্তিত (১) হিন্দু মিলন-মন্দির স্থাপন ও রক্ষাদল গঠন (২) তীর্থ সংস্কার এবং (৩) সন্ন্যাসী সঙ্ঘ সংগঠন কার্য্য-পদ্ধতির মধ্যে। পার্থ-সারথি শ্রীকৃষ্ণের “ক্লেব্যং মান্ম গমঃ” এই বজ্রবাণীর প্রতিধ্বনি আচার্য্যের “মহাপাপ কি? দুর্বলতা, ভীকৃত্য, কাপুরুষতা”—এই ভৈরব নিনাদের মধ্যে। মহাকর্ষ্যবোগী শ্রীকৃষ্ণের “নিয়তং কুরু কৰ্ম্ম ত্বং” এই নির্দেশ আচার্য্যের “আমার সন্তানগণের পরিশ্রমই বিশ্রাম, বিশ্রামই পরিশ্রম; দেহ যেদিন মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেবে বিশ্রাম সেইদিন, তৎপূর্বে নয়; দিনটা যদি আরও খানিকটা লম্বা হতো তবে আরও খানিক কাজ করার সুবিধা হতো; ঘণ্টা মিনিট হিসাব করে যেখানে কাজ করা হয় না, সে জীবন কি একটা জীবন?” এই নির্দেশের মধ্যেই পরিস্ফুট হইয়াছে।

যুদ্ধ-বিমুখ অজ্ঞানকে শ্রীকৃষ্ণ যেমন বলিয়াছিলেন “মঠেইবতে নিহতাঃ পূৰ্বমেব। নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসংচিন্”। আমি সবাইকে মারিয়া রাখিয়াছি তুমি নিমিত্ত মাত্র হইয়া যুদ্ধ করিবে। সন্তোষে আচার্য্যও তেমনি সংশয়পন্ন, কর্ম্মবিমুখ আমাদিগকে বলিতেন “আমি তোদের কাউকে চাই না; আমার উপর যে আদেশ নির্দেশ আছে,



আমি তা কাঠের পুতুলের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে করে যাব।  
আমি যে পথ দেখাচ্ছি সেই পথে চলো, দেখবে দেশজাতি  
ছদ্দিন পরে তোমাদের পেছনে চলবে”।

মধ্য যুগের নৈরক্ষ্যবাদ ও অদৃষ্টবাদ জাতির মনের উপর এমনই  
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর  
অর্ধাংশব্যাপী ধার্মিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনেও সে মোহ  
কাটে নাই। এখনও জাতি ধর্ম ও কর্মের মধ্যে ব্যক্তিগত, আধ্যাত্মিক  
সাধনা-অহুষ্ঠানের সহিত সামাজিক ও জাতীয় কর্তব্য ও দায়িত্বের নিত্য  
বিরোধ ও পার্থক্য ধারণা করিয়া হৃর্ভেদ্য সীমারেখা রচনা করিয়া  
রাখিয়াছে। ধর্মের মানির মূল এখানে ৯ ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার নামে  
এই নৈরক্ষ্যবাদকে মনোরম করিয়া তুলিয়া আত্মপ্রবঞ্চনা করিবার জন্ত—  
ধর্মের বাহু—আড়ম্বর—ভেক্‌ভাক্‌, ফোঁটাতিলক, মালাঝোলা প্রভৃতি  
জাতির হৃদয়-মনকে ধর্মের কাল্পনিক রূপ-মোহে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।  
ফলে ধর্মের সার বস্তু—ভ্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, ত্রিপুরা দমন,  
ইন্দ্রিয় সংযম—তাহা জাতি একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছে। ইহার  
ফলে আজ যুক্তিকা, ধাতু, বা প্রস্তর নির্মিত দেব-প্রতিমাকে ছাপাম শব্দে  
ভোগ নিবেদন করা হয়, কিন্তু জীবন্ত শরীর বিগ্রহধারী, সমাজের  
দীন, দরিদ্র, অশিক্ষিত, অস্পৃশ্য নরনারীর ক্ষুধার্ত্তমুখে এক মুষ্টি  
অন্ন দেবার, নগ্নদেহে বস্ত্রখণ্ড দিবার, তথাকথিত স্থপিত  
অস্পৃশ্যকে সদয় ব্যবহার ও মৌখিক মহানুভূতি দেখাইবার  
প্রবৃত্তি ও হৃদয়টুকু পরিলক্ষিত হয় কৈ? জাতি আজ একান্ত  
ভোগপরায়ণ ও আত্মকেন্দ্রিক হইয়া পড়িয়াছে।

ফলে স্বাভাবিক ভাবে জাতি ধর্মমানির নিম্নতর স্তরে পৌঁছিয়াছে।  
অবাধ ইন্দ্রিয়-স্বথ-সন্তোষ এবং খেচ্ছা-বিহার বর্ত্তমান যুগের নরনারীর

সর্বোচ্চ কাৰ্য্য ও করণীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; বাহা কিছু এই পথের সহায়ক তাহাই সভা, মার্জিত, সূক্ষ্ম, সঙ্গত, শালীন, শ্রায়বিধান ; পক্ষান্তরে বাহা কিছু উহার বিরোধী ও নিয়মতান্ত্রিক, তাহাই মনুষ্যত্ব-নাশক, বন্ধন, অশ্রায়, অবিচার, ভণ্ডামী ;—এই মনোবৃত্তির ফলে ধর্ম ও ভগবান উড়িয়া গিয়াছেন ; শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিনয়, স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, সহানুভূতি, কৃতজ্ঞতা ক্রমে ক্রমে সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবন হইতে মুছিয়া যাইতেছে ।

সজ্ঞানেতা আচার্য্য ধর্ম-মানির এই বিভিন্ন স্তরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁর ধর্মপ্রচার ও ধর্মসংস্থাপন কার্য্যাবলী প্রবর্তন করিয়াছেন ;—জীবনী-প্রসঙ্গে আমরা তা লক্ষ্য করিব ।

জাতিগঠনের ক্ষেত্রে আচার্য্য সম্পূর্ণ অভিনব পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন । ভৌগলিক বা রাজনৈতিক জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার জগৎ যে আন্দোলন বিগত অর্ধশতাব্দী ধরিয়া চলিয়াছে, উহার প্রয়োজনীয়তা তিনি অস্বীকার করেন নাই । কিন্তু সেই রাষ্ট্র-আন্দোলনের ভিত্তিতে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না । ভারতীয় জাতীয়তার লক্ষ্য, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও সাধনার প্রতি অথও মনোযোগ ও শক্তি প্রয়োগ না করিলে জাতিগঠন আকাশ-কুসুম ;—এই অভ্রান্ত নির্দেশ জাতির সম্মুখে ধরিয়া জাতিগঠনের যথার্থ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন ।

আর্য্য আদর্শ, সাধনা, সংস্কৃতির সুনির্দিষ্ট পথে চলিয়া যে ধর্ম-সংস্থাপন ও সমাজ-সংগঠন—তাহাই ভারতীয় জাতীয়তার যথার্থ স্বরূপ ; ইহা সুস্পষ্ট নির্দেশ করিয়া তদনুসারে তিনি স্বীয় জাতিগঠনে কর্মপদ্ধতি প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন, জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তাহা লক্ষ্য করিব ।

সমাজ-সংস্কারক আচার্যের অভ্রান্ত বাণী—“সমাজ জীবন্ত সহস্র শীর্ষা বিরাট পুরুষ। তাকে কাঠ, মাটির স্থায় ইচ্ছানুসারে ভাজিয়া চুরিয়া সকপোল-কল্লিত ছাঁচে কেহ গড়িতে পারে না ; সেই চেষ্টায় সমাজের অঙ্গে আঘাত করা ও বিপ্লব সৃষ্টি করা হয় মাত্র। দরদী সেবকরূপে আদর্শ জীবন লইয়া যিনি সমাজের সেবা করিতে প্রস্তুত, তিনি সমাজের প্রকৃত নেতা নিয়ন্তা হইতে পারেন।”

স্বীয় স্বীয় কল্পনার ছাঁচে সমাজকে নবরূপ দান করিতে গিয়া রাজা রামমোহন রায় ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন হিন্দু ব্রাহ্ম-সমাজ সৃষ্টি করিয়া বসিলেন, স্বামী দয়ানন্দ আর্য্য-সমাজ রচনা করিলেন, শ্রীচৈতন্য-যুগে বৈষ্ণব নেতাগণ স্মার্ত্ত সমাজ হইতে পৃথক করিয়া বৈষ্ণব সমাজ গড়িয়াছিলেন। তাহাতে বৃহত্তর মূল সমাজের শক্তিবৃদ্ধি বা কল্যাণ লাভ হইল না, বরং মূল সমাজ হইতে প্রতিভাশালী সম্ভানগুলি বিচ্ছিন্ন ও বহির্গত হইয়া যাওয়ায় হিন্দু-সমাজ অধিকতর দুর্ব্বল, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে বলিতে হইবে **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ** প্রবর্ত্তিত আন্দোলন পৃথক কোন সমাজ বা গোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়া মূল সমাজকে ক্ষুণ্ণ করে নাই।

অবশ্য ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণব সমাজ ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রাবন হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে—সত্য ; কিন্তু তথাপি মূল সমাজ যে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে—তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পক্ষান্তরে মূল সমাজের সহিত বিচ্ছিন্ন থাকায় এই সকল সমাজও তাহাদের

জীবন-প্রবাহকে স্বতন্ত্ররূপে বজায় রাখিতে না পারিয়া বাহিরের ঋনিক জঞ্জাল ও কুসংস্কার লইয়া মূল সমাজের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

সজ্জনেতা আচার্য্যদেব সমাজ সংস্কারের মূলে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

**সমাজে অভিভাবক-শক্তি বা নেতৃত্ব শক্তির অভাব।** কোনো গ্রামে বা সহরে বা শ্রেণীর মধ্যে এমন এক বা ততোধিক ব্যক্তি নাই, যার বা যাহাদের আদেশ, উপদেশ বা বিধি-বিধান সমাজ মাথা পাতিয়া নেয়। ফলে সমাজের আবালবৃদ্ধ আজ স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচার, কেহ কারো মর্যাদা দান করিতে বা নির্দেশ মানিতে বাধ্য নয়।

সংস্কার বা সংশোধনের জন্ত সমাজে কোনো অভিনব বিধি-বিধান প্রবর্তন বা পুরাতন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিতে হইলে তাহা করিবে কে? কিরূপে?

আগে চাই সমাজের বিলুপ্ত নেতৃত্বশক্তির পুনরুদ্ধার ও পুনঃ প্রতিষ্ঠা; তৎপরে সমাজে আদর্শ ও বিধিব্যবস্থার প্রবর্তনের কথা উঠিতে পারে।”

সজ্জনেতা আচার্য্য তাই সমাজে নেতৃত্বশক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে “মিলন-মন্দির” কর্মপদ্ধতি প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। সর্বশ্রেণীর প্রবীণ ব্যক্তিগণকে লইয়া যে সমিতিগুলি গ্রামে গ্রামে গঠিত হইতেছে, সেই গুলিই তত্ত্ব স্বানীয় সমাজে অভিভাবক স্থানীয়। সমাজের অভিভাবক-স্থানীয় এই মিলন-মন্দির সমিতিগুলির মধ্য দিয়া সমাজ-সংস্কার-মূলক নব নব বিধি-বিধানগুলি স্বাভাবিকভাবে সুসম্পূর্ণে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

সমাজ একটা জীবন্তদেহ; মানব-শরীরের স্থায় ইচ্ছাও গ্রহণ, পরিপাক, পরিবর্জন ও আত্মরক্ষণের ক্ষমতা আছে। নানা কারণে

ভারতীয় হিন্দুসমাজের এই আত্মরক্ষার সামর্থ্য ক্ষীণতম হইয়া পড়িয়াছে। আত্মরক্ষার সঙ্কল্প ও উপায় দুইটা হারাইয়া হিন্দু-সমাজ আজ অসহায়। সজ্বনেতা আচার্য্য “রক্ষিদল গঠন” আন্দোলনের মধ্যদিয়া সমাজে এই আত্মরক্ষার প্রেরণা ও সঙ্কল্প সঞ্চার ও উপায়বিধান দান করিয়া গিয়াছেন।

ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের উত্থানীতেই হউক বা অপরাধ-প্রবণতা ও ধর্মান্ধতার বশেই হউক—মুসলমান ও খৃষ্টানগণের হস্তে হিন্দু-জন-সাধারণ যে লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হইতেছে এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও সঙ্ঘর্ষ যে ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে; ইহার প্রতিকারকল্পে বহু নেতা ও মনীষী বহু জল্পনা, কল্পনা ও উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। পুনা প্যাক্ট, লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট প্রভৃতি এবং সখ্যাল্ল সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার অজুহাতে অতিরিক্ত অগ্রায় দাবী ও অধিকার স্বীকার করিয়া নিয়া মুসলমান-তুষ্টির যুগকাষ্ঠে হিন্দুর ধান্মিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও অধিকার বলিদান দিয়া বহু নেতা বহু কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার ব্যাধি আরোগ্য হওয়া দূরে থাকুক, দিনের পর দিন উহা মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইতেছে। অবশ্য অনেকেই এখন “আশায় ছলনে ভুলি কি ফল ফলিহু হায়, তাই ভাবি মনে” বলিয়া অল্পতাপ করিতে করিতে নিজের কোঠায় ফিরিয়া আসিতেছেন।

সজ্বনেতা আচার্য্যদেবের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত—“মিলন, সখ্য, সহযোগিতা হয়—সমানে সমানে, সবলে সবলে; সবলে দুর্ব্বলে কদাচ নয়। মুসলমান সজ্ববদ্ধ, সুগঠিত; খৃষ্টান—সুরক্ষিত; হিন্দুই অগঠিত দুর্ব্বল, আত্মরক্ষায় অক্ষম। হিন্দু যেদিন মুসলমান-খৃষ্টানের জায় সজ্ববদ্ধ, শক্তিমান ও সুরক্ষিত হয়ে দাঁড়াবে, মিলন হবে—সেই দিন, তৎপূর্ব্বে নয়, নয়!”

সুতরাং স্বীয় ধার্মিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের ক্রুটি ও গলদ দূরীকরণ ও শক্তি সঞ্চয়ের প্রতি মনোযোগী না হইয়া শুধু সবল প্রতিপক্ষের প্রতি দোষারোপ, নিন্দা ও গালিবর্ষণ,— ক্লীবতা ও কাপুরুষতার পরিচয়। শক্তিশালী হিন্দু-সংহতি গঠনই এই সমস্তার একমাত্র সমাধান ;—ইহাই সজ্জনেতার অদ্বিতীয় অশ্রান্ত নির্দেশ ।

এজ্ঞ তিনি মিলন-মন্দিরের জালদিয়ে সমগ্র হিন্দুস্থান ছেয়ে ফেলে ত্রিংশ কোটি হিন্দু-নরনারীকে গেঁথে নিয়ে এক অথও হিন্দু-সংহতি গঠনের সূচনা করিয়া গিয়াছেন ;—যে সংহতির অন্তর্গত এক ব্যক্তির গায়ে আঘাত লাগিলে সেই আঘাত কোটি কোটি হিন্দুর প্রাণে সমান ভাবে ব্যথা-বেদনা জাগাইয়া সকলকে এক ষোগে প্রতীকার প্রতিবিধানার্থ উত্তোঙ্গী করিয়া তুলিবে।”

তিনি আশ্বাস দিয়া গিয়াছেন—“হিন্দুর বিজ্ঞাবুদ্ধি, অর্থ-সামর্থ্য আছে ; নাই সজ্জবদ্ধতা। একমাত্র সজ্জশক্তির অভাবেই হিন্দুর যাবতীয় দুর্দশা। এই সজ্জশক্তি রচনা করিয়া দিতে পারিলে হিন্দু পুনরায় স্বীয় বিক্রমে ও গৌরবে উঠিয়া দাঁড়াইবে।

হিন্দুর ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের যাবতীয় লাহুনা, অত্যাচার, কদাচার, কুসংস্কার, ক্লীবতা, দুর্বলতার প্রতীকার নির্ভর করিতেছে— এই সজ্জশক্তি সংগঠনের উপর ( building up of systematic and powerful Hindu organisation )।

বিগত শতাব্দ কাল ধরিয়া ভারতে জাতি গঠনের বাণী ও নির্দেশ মনোবিগণের নিকট হইতে পাইয়া আসিতেছি। কাজ অপেক্ষা কথাই আড়ম্বর অধিক লক্ষ্য করিতেছি। সজ্জনেতা আচার্য্য কথা নিতান্ত

কম কহিয়াছেন ; যেটুকু না কহিলে কাজ চলে না, সেইটুকুই মাত্র কহিয়াছেন, তিনি যুগের আচার্য্যরূপে আসিয়াছিলেন ; তাই যুগের বাহা কিছু আদর্শ, কর্তব্য, দায়িত্ব, সাধনা,—সবই আপনি আচরণ করিয়া অপর সকলকে আচরণ করাইয়া, শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি কাজ করিতে আসিয়াছিলেন, কাজ চাহিয়াছিলেন,—কাজ করিয়াই চলিয়া গিয়াছেন ; সময়-ক্ষেত্রে যুদ্ধরত সেনাপতির ত্রায় তিনি চলিয়া গিয়াছেন।

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের ত্রায় স্বকৌশলে অনন্ত প্রেমের বলে ক্ষুদ্র বৃহৎ—তুচ্ছ-মহৎ বাবতীয় শক্তিগুলিকে একত্র সম্মিলিত ও যুক্ত করিয়া বিরাট মহাশক্তিপ্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; একমাত্র কপর্দক ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া স্বাধীন ভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহ পূর্বক বিরাট জাতিগঠন আন্দোলন প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁর সর্বতো বিসারী প্রেমে সকল শ্রেণী, সকল সম্প্রদায় মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছিল ; তাঁর চরণে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, ধনী-দরিদ্র, মূর্থ-বিদ্বান্, হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান—সব ভ্রাতৃত্বাবে একত্র হইয়া তাঁর ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবে ভেদাভেদ ভুলিয়া তাঁর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রের সেতু-বন্ধনে ক্ষুদ্র কাষ্ঠবিড়ালীর ধূলিমুষ্টির ত্রায় কারও ক্ষুদ্রতম শক্তি ও সহায়তাটুকুও তিনি উপেক্ষা করেন নাই ; উপযুক্ত বা অতিরিক্ত মৰ্য্যাদা দিয়াছেন।

অনন্ত ক্ষমা, অসীম সহিষ্ণুতা, অগাধ প্রেম, অটুট বৈধ্য, সর্বব্যাপী দৃষ্টি লইয়া আচার্য্যদেব বাবতীয় পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাব ও শক্তিগুলিকে সংহত করিয়া রাখিয়াছিলেন ; শত্রু মিত্র তাঁহার নিকট সমান দাবী রাখিয়া চলিতে কুণ্ঠিত হইত না। তাঁর চৌম্বক ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে প্রত্যেকে দৃঢ় ধারণা করিত যে তিনিই আচার্য্যের প্রিয়তম ব্যক্তি। এই

অদ্ভুত আকর্ষণের বলে আচার্য্যের প্রয়োজনে প্রাণ দানও তাহার নিকট কিছুমাত্র কঠিন ছিল না। আচার্য্যদেবের একটি সম্মেহ বাণী বা এক টুকরা প্রসন্ন হাসির বৈদ্যুতিক শক্তিতে শ্রান্ত অবসন্ন কশ্মিগণকে নব বীৰ্য্যে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিত।

আচার্য্যদেবের স্থূল দেহের অবসান হইয়াছে—সত্য; কিন্তু তিনি আশ্বাস দিয়া গিয়াছেন—“আমি তো বাকী রাখিনি; তিল তিল করে আমাকে সবার মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছি।” সত্যই তিনি স্বীয় আদর্শ, ব্যক্তিত্ব ও শক্তিকে তাঁর পদাঙ্কানুসারী সন্তানগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁর অমোঘ সঙ্কল্প, অলৌকিক তপঃশক্তি ও অক্ষয় আশীর্বাদ সজ্জের মধ্যে সঞ্চিত ও সুরক্ষিত থাকিয়া বিভ্রান্ত জাতিকে সত্য পথে পরিচালিত করিবে।

সজ্জনতা যুগাচার্য্যের অলৌকিক জীবন ও চরিত্র এবং লীলা-পরম্পরা আমরা ধ্যান-মনন-আচরণ করিব। তাঁর শক্তি ও আশীর্বাদ যেমন তাঁর জীবৎ-কালে অভিভাবক রূপে আমাদের নিয়ত রক্ষা বিধান করিয়াছে, আজ তাঁর স্থূল দেহের অবসানেও তাহা রক্ষা-কবচ রূপে জাতিকে সর্বদা নিরাপদ রাখিবে। তাঁর কৃপা ও আশীর্বাদে তাঁর লীলার মর্ম্মকথা আমাদের হৃদয়ে ক্ষুরিত হইয়া তাঁরই সঙ্কলিত কর্ম্ম সংসাধনে আমাদের প্রেরিত করুক।

ওঁ তৎ সৎসং।



# শ্রী শ্রীযুগাচার্য্য জীবন-চরিত

১ হইতে ৮২ পৃঃ

জন্মস্থান ও পিতৃ-মাতৃ পরিচয়—আবির্ভাব—বালক বিনোদ—তপস্বী  
ব্রহ্মচারী বিনোদ—সমাধি ও সিদ্ধি—আচার্য্যভাবে উন্মেষ ও ক্রম-  
বিকাশ—আচার্য্যভাবে বিকাশ ও সজ্জ গঠনের সূত্রপাত—।

ধর্ম্মচক্র ও কর্ম্মচক্রের প্রেরণা ও জনসেবার আদর্শ বিস্তার

২০ হইতে ১১৩ পৃঃ

জন-সেবার কার্য্যারম্ভ—কলিকাতার নেতৃবৃন্দের সহিত পরিচয় ও  
প্রচার—অবিরত কর্ম্মরত অথচ শাস্ত্র-সমাহিত—অহিংস অসহযোগ  
আন্দোলন ও সজ্জ-সন্তানগণের আগমন—খুলনা ছুভিক্ষ সেবাকার্য্য—  
সেবক ও কর্ম্মিগণের মধ্যে ব্রহ্মচারীর প্রেরণা—চিহ্নিত সন্তানগণের  
সহিত ব্রহ্মচারীর সংযোগ ও স্বীয় আচার্য্যত্বের ইঙ্গিত—আশাশুনি  
সেবাপ্রম ও পল্লী-সংগঠন—জগদ্ধিতায় সর্ব্বত্যাগী তরুণদল—বাজিতপুর  
সেবাপ্রমে ব্রহ্মচারীর সিদ্ধপীঠ—ম্বাঘী পূর্ণিমা মহোৎসব ও ব্রহ্মচর্য্য  
সংস্কার দান—কলিকাতায় কার্য্যালয় স্থাপন।

সন্ন্যাসী গঠন ও সজ্জ গঠন

১১৪ হইতে ১৩৪ পৃঃ

ব্রহ্মচারীর বাণী—ব্রহ্মচারীর শিক্ষাদান পদ্ধতি—ত্যাগী কর্ম্মীর জন্ম

ব্রহ্মচারীর ব্যাকুলতা—সজ্জের সর্বপ্রকার কর্মীর স্থান—সজ্জের নামকরণ ও ব্রহ্মচারীর ‘আচার্য’ পদবী গ্রহণ—আত্মগঠনের সাধনায় শুদ্ধতা ও বিশ্ব বিপদ—নবীন ব্রহ্মচারীদের বেদান্তবাদ—ব্রহ্মচারী মহারাজের সন্ন্যাস গ্রহণ—সজ্জের ত্যাগী সন্তানগণের সন্ন্যাস।

## জনসেবাকে ধর্ম-সেবা ও সমাজ-সেবার রূপদান

১৩৫ হইতে ১৫৪ পৃঃ

সেবার ব্যাপকরূপ—সজ্জের কর্ম বিস্তার—গয়া সেবাশ্রম—চারণ দল বা Procession party—অর্থ সংগ্রহের উপায় ও চারণদলের উদ্দেশ্য—উড়িষ্যায় কর্ম-বিস্তার ও পুরী সেবাশ্রম—মাদারিপুর ঘৃণিবাত্যা ও পাবনা দাঙ্গা—নানা স্থানে সেবার্থ্য—সজ্জ-সেবক সম্মিলনী—যুক্তপ্রদেশে কর্ম-বিস্তার ও কাশীতীর্থ সেবাশ্রম।

## আচার্য বরণ ও সজ্জের অধ্যাত্ম সাধনার সূত্রপাত

১৫৫ হইতে ১৬৭ পৃঃ

উপযুক্ত পাত্র এবং অমুকুল পারিপার্শ্বিক গঠন—আশ্রিত সন্তানগণের শিক্ষাবিধানে আচার্যের প্রযত্ন—আচার্যের কঠোর দায়িত্ব—সজ্জ-সন্তানগণের হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার—জগদগুরুরূপে আত্মপ্রকাশ—গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা—গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ পুনঃ প্রতিষ্ঠার কৌশল।

## আচার্য্যদেবের মূল শিক্ষা-সাধনা

১৬৮ হইতে ১৭৯ পৃঃ

ব্রহ্মচর্য্যম্—ব্যাদি উগ্রতপশ্চা—সজ্জ-বাণী।

## নৈতিক আদর্শের আন্দোলন ও ব্রহ্মচর্য্য সাধন প্রদান

১৮০ হইতে ১৯৭ পৃঃ

গার্হস্থ্য-জীবনের আদর্শ প্রচার ও শক্তি-সাধনা প্রদান

১৯৮ হইতে ২১৭ পৃঃ

[ ১০ ]

## সঙ্ঘ-কর্মচক্রের শৃঙ্খলা-বিধান ও সঙ্ঘের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা

২১৮ হইতে ২৩৩ পৃ:

## সঙ্ঘনেতা আচার্য্যের প্রচারাভিযান

২৩৪ হইতে ২৬৫ পৃ:

রাঁচি—মুন্সের—জামালপুর—হাজারিবাগ—পুরুলিয়া—বর্দ্ধমান—  
ভাগলপুর—যশোহর—পূর্ণিয়া—কলিকাতা।

## জাতীয় জীবনে গুরু-শক্তির সঞ্চার ও গুরু-পূজার প্রতিষ্ঠা

২৬৬ হইতে ২৯১ পৃ:

আচার্য্যই বেদমূর্তি—ভারতীয় জাতির জন্ম গুরুগৃহে—ভারতীয়  
জাতির আমূল সংস্কার ও সংগঠন—গুরু-পূজা প্রচলন—গুরু পূজার  
প্রচার-ব্যবস্থা—গুরু পূজার সমালোচনা—ব্যাপক গুরু পূজার আদর্শ—  
গুরু পূজার অহুষ্ঠান—আত্মসমর্পণ যোগ—আত্ম-সমর্পণ-যোগের সাধনা।

## জাতীয় জীবনে শক্তির সাধনা প্রবর্তন

২৯২ হইতে ৩২১ পৃ:

শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব—মহাশক্তি শ্রীশ্রীদুর্গার পূজাযোজন—সকল—  
কাশীধামে প্রচার কার্য—দেবীর বোধন ও সঙ্ঘ-সন্তানগণের সমস্তার  
সমাধান—চন্দ্রদান ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা—শক্তি-সাধনা প্রদান ও গুরু-পূজা  
—চামুণ্ডার পূজা—গুরুপূজা আরতি—দেবীর আরতি ও অঞ্জলি নিবেদন  
—আচার্য্যদেবের মাতৃভাব—বিভিন্ন স্থানে ৬দুর্গোৎসব—আচার্য্যদেবের  
মহাপ্রকাশ—হিন্দু সম্মেলন—দেবী প্রতিমা হিন্দু-জাতি-মাতৃকার-

প্রতীক—হিন্দুধর্ম মহাশক্তির সাধনা—দেবীপূজার রহস্য—দেবী  
প্রতিমায় জাতি গঠনের ইঙ্গিত—দেবী পূজায় চাই কি ?—শুধু ফুলে  
পূজা নেবো না এবার—বিজয়া সম্মেলন—শ্রীশ্রীপ্রণব মঠে ৬ছগোৎসব  
ও মহাপ্রকাশ ।

## আচার্যের কায়কল্প

৩২২ হইতে ৩৩৫ পৃ:

## হিন্দু জাতি গঠন

৩৩৬ হইতে ৩৪৯ পৃ:

## হিন্দু সমাজ সমন্বয় আন্দোলন

৩৫০ হইতে ৩৭৮

আচার্যের প্রচারাভিযান—বিহার ও যুক্ত-প্রদেশে প্রচারাভিযান  
—বাজিতপুর হইতে খুলনা নৌপথে—আশাশুনি হইতে নৌপথে  
কলিকাতা—খুলনা-যশোহরের গ্রামে নৌপথে—খুলনা হইতে  
নৌপথে শ্রীরামকাঠী—নানাস্থানে প্রচারাভিযান—হিন্দু-সম্মেলনের  
প্রবর্তন—বঙ্গীয় হিন্দু-মহাসম্মেলন—সুন্দরবনে অনুষ্ঠিত হিন্দু-সম্মেলন  
—পর্কোৎসবগুলিকে হিন্দু-সম্মেলনের রূপ দান—সজ্জসস্তানগণের হৃদয়ে  
প্রেরণা সঞ্চার ।

## হিন্দু মিলন-মন্দির-কর্মপদ্ধতি প্রবর্তন

৩৭৯ হইতে ৪৮৯ পৃ:

পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে প্রথম প্রচারাভিযান ।

## হিন্দু-সমাজ-সমন্বয় আন্দোলনের প্রভাব বিস্তার

৩৯০ হইতে ৪০৫ পৃ:

গয়ালী পাণ্ডার দমন—অন্নপূর্ণা মন্দিরের অত্যাচার দমন—মোহন্ত ও

মঠধারীদের প্রতি সতর্কতার বাণী—হিন্দু-সংগঠন কার্যে হিন্দু-নেতৃবর্গকে আহ্বান—বিক্রমপুর হিন্দু-সম্মেলনে আচার্য্যদেব ।

## আত্মরক্ষার সঙ্কল্প সঞ্চার ও রক্ষীদল আন্দোলন

৪০৬ হইতে ৪২৭ পৃঃ

নেতৃ-সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ—পূর্ববঙ্গে দ্বিতীয় অভিযান—বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-সম্মেলনে আচার্য্যদেবের বাণী—কলিকাতায় হিন্দু-সম্মেলন—বিহার হিন্দু-সম্মেলন—যুক্তপ্রদেশে হিন্দু-সম্মেলন—কলিকাতায় হিন্দু-সম্মেলন—পার্কত্য হিন্দু সম্মেলনে বাণীপ্রচার ।

## শ্রীশ্রীপ্রণবমঠ প্রতিষ্ঠা ও জগদগুরুরূপে অর্ঘ্য গ্রহণ

৪২৮ হইতে ৪৬৪ পৃঃ

মঠ প্রতিষ্ঠা উৎসব—ভারতে মঠ-মন্দিরের সার্থকতা—মঠের আর্থিক ভিত্তি—মঠের সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য—মঠের গৃহাদি নির্মাণ ও সিদ্ধাসন স্থাপন—বিশ্বকর্মা আচার্য্যদেব—আচার্য্যের শরীরে সঙ্কট-জনক ব্যাধি—আচার্য্যদেবের দেহধারণের সঙ্কল্প শিথিল—দেহধারণের সঙ্কল্পের পুনর্জাগরণ—সর্বসাধারণের মধ্যে মহাপ্রকাশ—আচার্য্যবরণ ও অর্ঘ্যপ্রদান—রাজবেশ ও অষ্টসিদ্ধাসন, মহাভিষেক, অন্নকূট ভোগ, অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, বরাভয় দান, দোল-লীলা, ত্রিশূল-উৎসব ।

## বিশ্বরূপে পর্য্যবসানের আভাস

৪৬৫ হইতে ৪৭০ পৃঃ

## বিশ্বরূপে পর্য্যবসান

৪৭১ পৃঃ





ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা  
আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ

# শ্রীশ্রীযুগাচার্য-জীবন-চরিত

## “জন্মস্থান ও পিতৃ-মাতৃ-পরিচয়

“সোণার বাঙলা আমি তোমায় ভালোবাসি !

চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস

আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী ।”

শতাব্দী পূর্বের সেই সোণার বাঙ্গলা আর নাই। হুভিক্ষ, প্রাবন মহামারী প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক ও আর্থিক শাসন-শোষণ-পীড়ন, সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষ আজ বঙ্গ-রাণীর সে স্বর্গীয় সুষমা হরণ করিয়া লইয়াছে। “অবারিত মাঠ গগন-ললাট” আজিও বঙ্গজননীর পদধূলি চুষন করিতেছে, কিন্তু সেই “ছায়া-স্থনিবিড় শান্তির নীড়”—বাঙ্গলার পল্লীর মাধুর্য আর নাই।

কিন্তু পূর্ব বঙ্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এখনো বঙ্গ-জননীর পূর্ব রূপ কিয়ৎ পরিমাণে বজায় রাখিয়াছে। বাঙ্গলা মায়ের “অনিল-বিকম্পিত শ্রামল অঞ্চল,” উদার আকাশ, মধুর বাতাস, দোয়েল-শ্রামা-পিক-চন্দনার সঙ্গীত-মূর্ছনা-মুখরিত কানন-কান্তার, দিগন্ত-বিসারী শস্তশ্রামল প্রান্তর, পয়স্বিনী স্রোতস্বিনী এখনো সোণার বাঙ্গলার বিলীয়মান অপরূপ রূপরাশি ধরিয়া রাখিয়াছে।



পূর্ব বঙ্গের ফরিদপুর জেলায় মানারিপুর মহকুমার অন্তর্গত **বাজিতপুর** একটি পল্লী—যুব সমৃদ্ধিশালী না হইলেও সুপরিচিত, স্বরহং না হইলেও বিশিষ্ট। ময়মনসিংহের মহারাজা ৮মূখ্যকান্ত এই গ্রামনিবাসী মজুমদার বংশেরই সন্তান। এই মজুমদার বংশের ঐশ্বর্য্য ও গৌরবে গ্রামখানি একদা সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। বর্ত্তমানে উক্ত মজুমদার বংশের ঐশ্বর্য্য ও গৌরবের দীপ্তি অনেকখানি হ্রাস হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু গ্রামটী অপর এক যুগান্তরকারী মহাপুরুষের জন্ম, সাধনা ও সিদ্ধির পীঠস্থান এবং জাতির অগ্রতম শক্তিকেন্দ্ররূপে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে।

কুমার নদের দক্ষিণ তীরে অর্দ্ধ কোশব্যাপী শস্ত-শ্যামল প্রান্তর অতিক্রম করিলেই এই গ্রাম। কুমার নদ হইতে একটি খাল উঠিয়া এই গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গ্রামখানিকে প্রধানতঃ দুইটী প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এই খালের কয়েকটী শাখা প্রশাখা গ্রামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পৃথক পৃথক কয়েকটী পাড়ার সৃষ্টি করিয়াছে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নমঃশূদ্র, কুণ্ড, জেলে, মুসলমান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের লোক লইয়া এক একটী পাড়ার উদ্ভব। গ্রামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, একটি সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয় এবং একটি বাজার উল্লেখযোগ্য। পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চলের ত্রায় এই গ্রামটিও বর্ষার প্লাবনে ভাসিয়া যায়। খালবিল, মাঠঘাট ছাপাইয়া কোন কোন বৎসরে বাড়ীর উঠানে জল উঠে। গৃহগুলি তখন সমুদ্রে ভাসমান পোত-শ্রেণীর ত্রায় প্রতীয়মান হয়। সাধারণ প্লাবনেও মাঠ ডুবিয়া গেলে বাড়ীগুলি পৃথক পৃথক ছীপের ত্রায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। বর্ত্তমানে ইউনিয়ন বোর্ডের চেষ্টায় রাস্তা ও সেতু নিশ্চিত হওয়ায় গ্রামের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পরস্পর যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে।

বানের জলে বিদ্যোত হওয়ায় এই অঞ্চলটী বেশ স্বাস্থ্যকর, জমিও উর্বর। গ্রামটীর চারিদিকে যেমন উন্মুক্ত প্রান্তর; অভ্যন্তর ভাগ তেমন ঘন বৃক্ষলতাগুলে সমাচ্ছন্ন। পূর্বোক্ত খালটী গ্রামের প্রান্ত বহিয়া মাঠ ছাড়াইয়া যেখানে সমকোণ প্রায় বক্রগতিতে গ্রামের মধ্যভাগে প্রবেশ করিয়াছে সেই স্থানে খালের পশ্চিম তীরে **৩বিষ্ণুচরণ দাস বা বিষ্ণু ভূইয়ার** বাসগৃহ ছিল, এখনো আছে। বিষ্ণু ভূইয়া কায়স্থ, অর্থ ও প্রতিপত্তিশালী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ; পূর্বোক্ত মজুমদার বংশের জমিদারী সেরেস্তায় তিনি কর্মচারী ছিলেন; তেজারতি এবং কারবারও ছিল। ভূইয়া বংশ তেজস্বী, শক্তিশালী ও দৃঢ়কায়। ভূইয়া নিজে যেমন শক্তিমান ও তেজস্বী ছিলেন, তাঁর পুত্রগণও তেমন শক্তিশালী ও তেজস্বী ছিলেন। এ বিষয়ে গ্রামের কোনো পরিবারই ভূইয়া পরিবারের সহিত তুলনীয় ছিল না।

বিষ্ণু ভূইয়া ভয়ঙ্কর “বাশ্ভারী” লোক ছিলেন। তাঁর শক্তিশালী, সমুন্নত, বিপুল দেহের সহিত এই তেজস্বিতাপূর্ণ গাভীর্ঘ্য বেশ খাপ খাইয়া গিয়াছিল। তাঁহার শরীর যেরূপ দৃঢ় ছিল, মনটা তদপেক্ষা দৃঢ়তর, সঙ্কল্প ছিল—কঠোরতর। জীবনে তিনি বহু বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, বহুকাল মৃত্যুকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাকে চলিতে হইয়াছিল; কিন্তু কদাপি তিনি স্বীয় সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হন নাই। আরক্ কৰ্ম সমাপ্ত বা সফল না করিয়া তিনি কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হন নাই। লোকে তাঁহার দুর্জয় আত্মবিশ্বাসকে অহঙ্কার বলিয়া ভুল করিত; সঙ্কলিত কৰ্ম সম্পাদনে অবিচলিত অধ্যবসায়কে দান্তিকতা ও একগুয়েমী ভাবিত;—এই সাধারণ ভ্রান্তির বশে এই অসাধারণ লোকটীর দৃঢ় দেহ ও তেজস্বী মনের পশ্চাতে যে মহৎ সহায়ভূতিপূর্ণ হৃদয় ছিল,—তাঁর সন্ধান তারা জানিত না।

## শ্রীশ্রীযুগাচার্য-জীবন-চরিত

মহারাজা ৩২শ্রীযুগাচার্যের ভ্রাতা ৩২রাজকুমার মজুমদার মহাশয় ক্ষুদ্র হইলেও প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন ; কোন কারণে এই মজুমদার পরিবার ও ভূঁইয়া পরিবারের মধ্যে মামলার সৃষ্টি হয় এবং উহা একাদিক্রমে অন্যান্য বিশ বৎসর চলিয়াছিল ; অবশ্য ৩২বিষ্ণু ভূঁইয়াই বিজয়ী হইয়াছিলেন ; প্রতিপক্ষের যাবতীয় যড়যন্ত্র বার্থ হইয়া যায় । এই মোকদ্দমায় উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয় বটে ; কিন্তু মজুমদার পরিবার তুলনায় দরিদ্র হইয়া পড়েন । ভূঁইয়ার ক্রমাগত জয়লাভে এতদঞ্চলের হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে প্রবাদ প্রচারিত হইয়াছিল যে ৩২বিষ্ণু ভূঁইয়া মা কালীর বর পাইয়াছে । এই জয়লাভের ফলে ৩২বিষ্ণু ভূঁইয়ার প্রভাব ও প্রতিপত্তি চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল । ফরিদপুর জেলার প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব ভূতপূর্ব কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ৩২অধিকাচরণ মজুমদার মহাশয় পূর্বোক্ত মামলায় ভূঁইয়ার পক্ষ সমর্থন করিতেন । মামলার বহু দূরূহ সমস্যা সম্বন্ধে ভূঁইয়া স্বয়ং তাঁহাকে সমাধান নির্দেশ করিতেন ; মজুমদার মহাশয়ও তাহা সানন্দে স্বীকার করিতেন ; ৩২বিষ্ণু ভূঁইয়ার পুণ্ড্রিগত বিজ্ঞা অধিক না থাকিলেও বীশক্তি অসাধারণ ছিল ।

বিশ্বয়ের বিষয় এই যে আদালতে বিবদমান এই দুই পরিবারের মধ্যে সামাজিক ও পারিবারিক সদ্ভাব ও স্নেহ-প্ৰীতির আদান প্রদানে বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিত না । পূর্বাপর সমানভাবে মেলামেশা ও আদানপ্রদান চলিত । এমন কি মামলা-বাপদেশে ফরিদপুর সহরে গিয়াও ৩২রাজকুমার মজুমদার মহাশয় প্রায়ই ৩২বিষ্ণু ভূঁইয়াকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইতেন ; অধ্ৰুপতাকীরও অনধিক কালের ব্যবধানে বাঙ্গালী হিন্দুর নিকট ইহা অসম্ভব ও আশ্চর্যজনক মনে হয় ।

৩২বিষ্ণু ভূঁইয়ার আত্মবিশ্বাস যেমন সূদৃঢ় ও অটল ছিল, তাঁর ভগবদ্বিশ্বাস ও ভক্তি তেমনি গভীর ও অকৃত্রিম ছিল ; কিন্তু কঠোর পৌরুষ ও

গাস্তীর্ঘ্যের আবরণে তাহা আবৃত থাকিত। বৈষয়িক ও সাংসারিক কর্মে নিরন্তর ব্যতিব্যস্ত ভূঁইয়ার ভগবদ্ভক্তি ও বিশ্বাস কল্পধারার তায় হৃদয়ের অন্তরালেই প্রবাহিত হইত। যখন মামলা মোকদ্দমা ও বিপদাপদে অতিমাত্র বিব্রত হইয়া পড়েন, সেই সময়ে তিনি কুলদেবতা নীলরুদ্র শিবের আরাধনায় দীর্ঘকাল রাত্রির অধিকাংশ সময় যাপন করিতেন; অশ্রুজলে আত্মনিবেদন করিয়া দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংসকারী ত্রিপুরারি মহাদেবের শ্রীচরণে অত্যাচারিতের উদ্ধার ও অত্যাচারি-অবিচারের প্রতীকার কামনা করিতেন। তদীয় কুলদেবতা “নীলরুদ্র” জাগ্রত বলিয়া অত্যাচারি প্রসিদ্ধ। জাগ্রত দেবতা ভক্তের করুণ আবেদনে প্রসন্ন হইয়া যথার্থই বর প্রদান করিয়াছিলেন। দেবাদিদেব মহাদেবের অক্ষয় আশীর্বাদ মুক্তি-পরিগ্রহ পূর্বক তাহার পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন।

আচাধ্যদেবের নিকট শুনিয়াছি—মৃত্যুর দু’তিন বৎসর পূর্বে হইতে ভূঁইয়া বৈষয়িক কর্ম হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া ভগবদারাধনা এবং রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতাদি পাঠে ও শ্রবণে দিনাতিপাত করিতেন। জীবনের এই শেষ কয়েকটি বৎসর তিনি সাংসারিক বা বৈষয়িক কোনো প্রসঙ্গ শুনিতেও চাহিতেন না। তাঁর আজীবন বন্ধু ৬কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী মহাশয় পূর্বাভাসবশে হঠাৎ কোনো সাংসারিক কথা উত্থাপন করিলেও তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা বন্ধ করিয়া দিতেন। তিনি যেন পরলোকের আস্থান সুস্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং সেই আস্থানের উত্তর প্রদানের উপযুক্ততা লাভের জন্য দ্রুত আপনাকে প্রস্তুত করিয়া নিতেছিলেন।

তেজস্বী কর্মযোগীর তায় তিনি প্রভুত্ব সহকারে সাংসারিক কর্মক্ষেত্রে বীরবিক্রমে বিচরণ করিয়া গিয়াছেন; আবার ঠিক তেমনি তেজস্বিতা ও দীর্ঘ্যবতার সহিত সংসারাসক্তিকে দূরে পরিহার করিয়া নিলিপ্ত মনে দেহ

পরিত্যাগ পূর্বক স্থায়ী কর্মসম্বন্ধিত পুণ্যধামে প্রয়াণ করিয়াছিলেন। তাঁর সমগ্র জীবনে আগন্তু তেজস্বিতা, বীৰ্য্যবত্তা, নিভীকতা, দৃঢ়-সঙ্কল্পতা, আত্মবিশ্বাস, অগ্ন্যয়ের বিকল্পে অভিমান পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ যুগাচার্যের জনক হওয়ার উপযুক্ত মহত্ত্ব ৩৬বিধ ভূঁইয়ার জীবনে ও চরিত্রে প্রচুর পরিমাণে ছিল।

তদীয়া সহধর্মিণীকে আমরা বহু বৎসর যাবৎ দেখিবার ও জানিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। তাঁহার গায় সরল, স্নেহ-প্রবণ এবং অত্মপর-ভেদ-বোধহীন নারী গ্রাম্য সমাজে নিতান্ত দুর্লভ।

## আবির্ভাব

স্বামী বিবেকানন্দ ভবিষ্যৎ মহাযুগের মহাভাবের বিকাশের ইঙ্গিত দিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—“এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।” অর্থাৎ ভারতবর্ষ হইতে যে মহা-ঐশীশক্তির প্রেরণা ও আধ্যাত্মিক মহাভাবধারা প্রবাহিত হইবে, তাহাই অনতি-ভবিষ্যতে জগতে যুগান্তর আনয়ন করিবে। কিন্তু যদি বলি—এবার কেন্দ্র বঙ্গদেশ—তাহা হইলেও বোধ হয় অতুল্য হইবে না। কারণ—বুটিশ শাসনের প্রারম্ভ হইতে যে নবযুগ প্রবর্তিত হইয়াছে, সে যুগে ধর্ম ও সমাজক্ষেত্রে ( রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিষয় আমার আলোচ্য নয় ) যতগুলি যুগপ্রবর্তনকারী মহাপুরুষ—৩রাজা রামমোহন রায় হইতে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত—আবির্ভূত হইয়াছেন, তার মধ্যে প্রায় সকলেই বঙ্গ-সন্তান; নবযুগে আবাস্থানী ধর্মপ্রবর্তক একমাত্র ৩স্বামী দয়ানন্দ—আধ্যাসমাজের প্রতিষ্ঠাতা।

পূর্ববর্তী যাবতীয় মহাপুরুষের আদর্শ ও ভাবধারাকে আত্মসাৎ করিয়া, বৃহত্তর ও মহত্তর ভাব ও কর্মপ্রবাহ কইয়া সমগ্র ভারতে জাতি

গঠনের আদেশ, ইচ্ছিত ও প্রেরণা লইয়া এই বাঙ্গালা দেশেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন—আর এক মহাপুরুষ—যাঁর অলৌকিক শক্তি ও প্রেরণা সমগ্র দেশ, জাতি ও সমাজের স্তরে স্তরে এক অভিনব ভাবস্পন্দন ও জীবন-প্রবাহ সঞ্চার করিয়া দিয়াছে ও দিতেছে।

পূর্বোক্ত বাজিতপুর নামক ক্ষুদ্র পল্লীই সেই মহাভাব ও মহাশক্তির লীলা তরঙ্গের কেন্দ্রস্থল। ইং ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী ( সন ১৩০২।১৬ই মাঘ ) বুধবার মাঘীপূর্ণিমা তিথি জগতের—বিশেষভাবে ভারতীয় আৰ্য্য হিন্দুজাতির ইতিহাসে কত বড় যুগান্তরকারী স্মরণীয় দিবস—তাহা ভবিষ্য ঐতিহাসিক ও মনীষিগণের গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে। উক্ত মহাতিথি অলৌকিক ভগবৎশক্তি-বিগ্রহ যুগাচার্য্য প্রণবানন্দজীর মহাবির্ভাবের শুভ দিবস।

যখন চতুর্দিকে বিপদের জালে পরিবেষ্টিত হইয়া অনন্তোপায় ৮বিষু ভুইয়া বিপন্মুক্তির জন্ত ইষ্টদেবতা মহাদেবের শ্রীপাদপদ্মে একাগ্রচিত্তে আত্মনিবেদন করিতেছিলেন, সেই সময়ে একদিন তন্ময় অবস্থায় আরাধ্য দেবতার আশ্বাস লাভ করিলেন—“পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া আমি তোমার প্রার্থনা পূরণ করিব।” তদীয়া সহধর্মিণীরও এই সময়ে অলৌকিক দর্শন ঘটে—রাত্রিযোগে তিনি দর্শন করিলেন—উজ্জলকিরীটধারী শুভ্র-জ্যোতির্মণ্ডিত মহাদেব পুত্ররূপে তাঁহার কোলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন।

মাঘ মাস, নিশ্চল সূর্য্যকরোজ্জল বরগী, শ্যামল শস্ত্ররাজিপূর্ণ দিগন্ত-বিস্তীর্ণ প্রাস্তরে নয়নরঞ্জন সবুজের সমারোহ; স্পর্শস্বাবহ মৃদুমন সমীরণ, চতুর্দিকে মুহুমূহ কোকিলের কুহুতান;—এই সময়ে পূর্ববঙ্গের পল্লী অঞ্চল বড়ই মনোরম, আনন্দদায়ক। এমনি সুখময় দিনে পুণ্য মাঘীপূর্ণিমা তিথিতে গোধূলিলয়ে সূর্য্যাস্তের প্রাঙমুহূর্ত্তে বিষ্ণু ভুইয়ার গৃহে আনন্দের জয়ধ্বনি। পূর্ণিমা তিথিতে গ্রাম ভরিয়া ভক্তগণের প্রেমান্বিত কণ্ঠে হরিনাম

গান। সেই আনন্দের শ্রোত দ্বিগুণিত করিয়া মানব-হৃদয় আলোকিত করিতে আবির্ভূত হইলেন মানবের সৌভাগ্য-গগনের পূর্ণচন্দ্র—এক অলৌকিক দেবশিশু।

অলৌকিক দর্শন ও আশ্বাস-বাণীতে আশ্বস্ত জনক-জননী প্রাণে আভাস জাগিল—আজ শিশুরূপে স্বয়ং কৈলাসপতি দেবাদিদেব মহাদেব,—‘অবাস্তবসোগোচর’ শ্রীভগবান্ সৃষ্ণ রক্ত-মাংসের শরীর ধারণ করিয়া তাঁহাদের মর্ত্যগৃহ আলোকিত করিয়াছেন;—ইহা বিচার পূর্বক না বঝিলেও তাঁহাদের হৃদয়ের অনাস্বাদিত-পূর্ব আনন্দের অমুভূতিই যেন এই নীরব বার্তা বহন করিয়া আনিল। জনক জননী, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী, গ্রামবাসী সকলে যেন নবশিশুর জন্ম-সংবাদে আনন্দে ভাসিল, অজানা পুলকে উল্লসিত হইল। যিনি স্বয়ং আনন্দ-ঘন-বিগ্রহ, তাঁর সান্নিধ্যে আনন্দ তো হইবেই। “রসোবৈবঃ রসোহ্যেবাং লঙ্কানন্দী ভবতি।” ঋষি তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়া বলিয়াছেন—“তিনি রসস্বরূপ; সেই রসস্বরূপকে পাইলে মানুষ আনন্দময় হইয়া যায়।”

কংস কারাগারে বহুদেব-দেবকীর বক্ষ আলোকিত করিয়া যেদিন ভগবান্ ত্রীকৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেদিন তাহাদের হস্তপদের শৃঙ্খল, কারাগারের লৌহদ্বার সহসা উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিল, সিপাহী শাস্ত্রী নাগানিজায় অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল। এই দেবশিশুর শুভাবিভাবের দিবস হইতেই ৬বিষ্ণু ভূঁইয়ার জীবনের সুখসম্পদময় নবীন অধ্যায়; বিপদের জাল সহজে ছিন্ন করিয়া তিনি মেঘ-নিম্নুক্ত গগনের ত্রায় বিরাজিত হইলেন। পারিবারিক সাংসারিক জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এরূপ আকস্মিক অভ্যুদয় লাভে নবজাত দেবশিশুর প্রতি জনকজননী আত্মীয় স্বজনের স্নেহ ও আকর্ষণ স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। পিতা আদর করিয়া নাম রাখিলেন

“জয়নাথ”। কারণ শিশুর শুভাবির্ভাবেই তিনি সর্বত্র বিজয়ী হইতে ছিলেন। বৃদ্ধবारे জন্ম বলিয়া কেহ কেহ তাঁকে ‘বুধ’ বলিয়া ডাকিত। যে নামে কিন্তু সর্বত্র এই শিশু পরবর্তী কালে পরিচিত ও অভিহিত হইয়াছিলেন—সে ছিল “বিনোদ”।

## বালক বিনোদ

এই অলৌকিক দেবশিশুকে ভূমিষ্ঠ হইতে দেখিয়াছে, কোলে কাঁথে করিয়াছে, একত্র খেলাধুলা করিয়াছে, এক সঙ্গে পড়াশুনা করিয়াছে, এমনতর পুরুষ ও স্ত্রী এখনো বহু বহু বর্তমান আছেন। তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়, জ্যেষ্ঠা ভগিনীদ্বয় এখনো বর্তমান। সকলের মুখে এই অলৌকিক দেবশিশুর অসাধারণত্ব সম্বন্ধে অনেক কথাই শোনা যায়। ভূঁইয়াবংশের কুলপুরোহিত শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ভাগবতরত্ন আচার্য্যদেবের প্রসঙ্গে স্মৃতিসভায় বলিয়াছেন—“তাঁর ‘বিনোদ’ নামটি সত্যই সার্থক ছিল; তাঁর আকৃতি-অবয়ব, রীতি-প্রকৃতি, আলাপ-ব্যবহার, সত্যই নয়ন-রঞ্জন, চিত্ত-বিনোদন ছিল। তাঁর সান্নিধ্যে আসিলেই, যে কোনো ব্যক্তির হৃদয় স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে ভাসিত। মুহু মধুর স্বল্পভাষী, বিনয় নম্র ব্যবহার, শাস্তশিষ্ট, স্বচ্ছন্দ চালচলন, অনাসক্তভাব—সত্যই সকলকে মুগ্ধ করিত, আকর্ষণ করিত, আনন্দে প্রাণিত করিত। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা—সর্ব ঋতুতে দুঃখকেননিভ শুভ্র একখণ্ড বহির্কীস ও একখণ্ড উত্তরীয় পরিচ্ছদরূপে তাঁর আঙ্গুল-চরণ কলেবর আবৃত করিয়া থাকিত; যেন তাঁরই অন্তরের নিঃশল, পবিত্র, অনবচ্ছাদিত শুচিতা শুভ্রোজ্জ্বল জ্যোতিঃতে স্থূলভাবে তাঁহাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। অনতিদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশদামের মধ্যবর্তী মুহু-হাস্যরঞ্জিত ভাবগন্তীর মুখখানি অর্দ্ধ-বিকসিত কমলদলের ন্যায়



আবালবৃদ্ধ নরনারীর হৃদয়কে আকর্ষণ করিত। ‘বিনোদ’ বথার্থই সকলের দেহ-মন-আত্মার বিনোদকারী ছিল।”

গিতা বিষয়কর্মে সর্বদা ব্যস্ত ; মাতার সম্ভ্রহ তত্ত্বাবধান ও সতর্ক অভিভাবকতার মধ্যে শিশু সিতপঙ্কের শশিকলার গায় বদ্ধিত হইতে লাগিল। শিশু—শাস্ত, স্থির, অচঞ্চল, নয়নমনোমুগ্ধকর ; আকৃষ্ট হইয়া সকলেই শিশুকে কোলে নিতে, আদর করিতে চাহিত। শিশু কিন্তু স্বাভাবিক সংস্কারবশে যখন তখন যার তার কোলে যাইতে চাহিত না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনভীষ্ট ব্যক্তি কোলে করিলে শিশু অশান্ত হইয়া অস্থিরতা প্রকাশ করিয়া নীরব প্রতিবাদ জানাইত।

গৃহে একটা দাসী ছিল ; যৌবনে দাসীটির চরিত্র ভাল ছিল না ; প্রৌঢ় বয়সে দাসীবৃত্তি গ্রহণপূর্বক ভুঁইয়া গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল। দাসীটি শিশুকে কোলে নিবার জগ্ন সর্বদাই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিত। কিন্তু শিশু দাসীকে দেখিলেই দূরে সরিয়া যাইত। পুত্রস্নেহাতুরা জননীও সর্বদা শিশুকে তত্ত্বাবধান করিতেন যাহাতে দাসী শিশুর সঙ্গে হস্তক্ষেপ না করে। একদা অসতর্ক মুহূর্ত্তে দাসীটি ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিশুকে কোলে নেয়। অনতিবিলম্বে শিশুর সর্বাঙ্গে ‘চাকা’ ‘চাকা’ ফুলিয়া উঠে। জননী জানিতে পারিয়া দাসীকে তিরস্কার পূর্বক পুনরায় কদাচ শিশুকে স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়া দেন। এইরূপ আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে বোঝা যায় যে জননী শিশুর জন্মের পূর্বে যে অলৌকিক দর্শন ও অভূত লাভ করেন, শিশুর জন্মের পরেও তাহা স্মরণ করিয়া চলিতেন। পুত্রের প্রতি স্নেহ-মনতার বশে উচ্চতর জ্ঞান, দান্য, উপলব্ধি না হইলেও, শিশুর অসাধারণ এবং দেবতার আশীর্বাদের কথা তাঁহার স্মৃতিতে জাগরুক ছিল। শিশুর কোনো ব্যারামের সময়ে একবার মাতা

অন্যোপায় হইয়া দৈব কৃপায় শিশুর জন্মের বিষয় স্মরণ করিয়া আরোগ্য কামনা পূর্বক স্থানীয় জাগ্রতা দেবী বুড়াঠাকুরাণীর (৩বনদুর্গাদেবীর) প্রীপাদপদ্মে শিশুকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন ; শিশুও সত্যই সস্তর আরোগ্যলাভ করিয়াছিল। উত্তর কালে পরিণত বয়সে আচার্য্যাদেবের কোনো ব্যাধি হইলে তদীয়া মাতা ও ভগিনী ৩বুড়াঠাকুরাণীর পূজা দিয়া তাঁহার সন্তানকে আরোগ্য করিয়া তুলিবার জন্ত প্রার্থনা করিতেন। জননীকে বলিতে শুনিয়াছি—“যার সন্তান তাঁকে দিয়াছি ; তিনিই আরোগ্য করিয়া দিবেন।”

শিশুটির প্রতি সকলেই এমনি অহৈতুক আকর্ষণ অনুভব করিত যে উহার সঙ্গক্ষে জল্পনা-কল্পনা-আলোচনা সকলের মুখে মুখে চলিত ; ফলে এই দেব-শিশুটির সঙ্গক্ষে কৌতূহলের অন্ত ছিল না। স্বেযোগ পাইলে লোকে তাহাকে দেখিতে আসিত এবং কারণ না বুঝিলেও আকর্ষণ অনুভব করিত। এই কৌতূহল ও আলোচনা কেবলমাত্র বাজিতপুর-বাসীর মধ্যেই যে সীমাবদ্ধ ছিল, তা’ নয় ; পাগুবন্দী পল্লীসমূহেও দীর্ঘে দীর্ঘে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

দেবশিশুর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য যাহা পরবর্ত্তীকালে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত ও পরিবদ্ধিত হইয়াছিল, তাহা এই অতি শৈশবেও পরিলক্ষিত হইত। শিশুটা সর্বদা শান্ত, স্থির, আদৌ চঞ্চলতা-বঞ্চিত ; সর্ব বিষয়ে অনাসক্ত,—এমন কি আহাৰাদিতেও ; হরিনামে অত্যন্ত প্রীতি, নাম-সংকীৰ্ত্তন শ্রবণে বড়ই উল্লাস। এই সময়ে একদা তুলসীবৃক্ষের উপর বালস্বভাববশে ‘গুণ’ নিক্ষেপ করিলে সেই বৃক্ষের মধ্যে দেবীর আবির্ভাব দর্শনে বালক অভিভূত হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন ; তুলসী বৃক্ষ সম্বন্ধে তদবধি তিনি বিশেষ মৰ্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে নির্দেশ দিতেন। লেখকের স্মরণ আছে—ইং ১৯২৪

খৃষ্টাব্দে একদিন মান্দারিপুৰ সেবাস্রমে আচাৰ্য্যদেব বসিয়া আছেন, তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া লেখক কথাবার্তা বলিতেছে; লেখকের বহিৰ্ব্বাসের এক প্রান্ত অসাবধানতাবশতঃ একটি তুলসীবৃক্ষের উপর পড়িয়াছে; এমন সময়ে হঠাৎ আচাৰ্য্যদেব কঠোর কণ্ঠে লেখককে ধমক দিলেন “মরে দাড়াও! তুলসীগাছ জাগ্রত দেবতা; পাঁচ মিনিট তাঁর দিকে তাকালেই কথা বলে; তোমার বহিৰ্ব্বাস উহার গায়ে পড়ায় বৃক্ষটী যন্ত্রণা বোধ করুছে।”

এই ঘটনার আচাৰ্য্যের প্রত্যক্ষ অভূত্ব লেখকের হৃদয়েও কিছু স্থায়ীভাব মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিল; কারণ তদবধি আজ পর্য্যন্ত তুলসীবৃক্ষ সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা ও মৰ্য্যাদাবোধ সমভাবে জাগ্রত রহিয়াছে। অথচ কোনো ব্যক্তিকে তুলসীবৃক্ষের অমৰ্য্যাদা করিতে দেখিলেও লেখক হৃদয়ে অব্যক্ত যন্ত্রণা অভূত্ব করিয়া থাকে।

আহারাদি বিষয়ে বালক অনাসক্ত। মংস মাংসাদিতে তাঁহার রুচি ছিল না; অথচ গৃহের সকলেই মংস, মাংস, ডিম প্রভৃতির অতিরিক্ত পক্ষপাতী। একবার সকলের নিৰ্ব্বজ্ঞাতিশয্যে মাংস ভক্ষণ করিয়া বালক গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়ে; তদবধি তাঁহাকে মাংসাদি ভোজনের জগৎ কেহ পীড়াপীড়ি করিত না। একদিন গৃহ-সংলগ্ন পুকুরে একটি স্তব্ধ মংস ধরা পড়ে। সকলে জিদ্ ধরিল বালককে মাছ খাওয়াইতেই হইবে। বালক পুনঃ পুনঃ আপত্তি করা সত্ত্বেও যখন তাহারা ছাড়িল না তখন অগত্যা বালক মাছ খাইতে রাজী হইল। ফলে ভেদ ও বমি হইতে থাকিল। অতঃপর আর কেহ কদাচ তাঁহাকে মাছ খাওয়াইতে চাহে নাই।

শৈশবাবধি বালকের আনন্দ, উন্মত্ততা, আনন্ডাবে তন্ময়, কোনো দিকে তেমন দৃষ্টি বা খেয়াল নাই। কোনো চিন্তাশীল

ব্যক্তি লক্ষ্য করিলেই বুঝিত—বালক দেহে থাকিয়াও দেহে বিগতমান নাই—“দেহস্থোহপি ন দেহন্তঃ”—অভ্যাসবশে শারীরিক ক্রিয়াদি চলিতেছে ; কিন্তু অন্তরে ফল্গু-ধারার গ্রায় কী যেন এক মহান ভাবের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে । তাঁহার প্রাণমন যেন দেহাতীত হইয়া এক অভিনব অজ্ঞাত রাজ্যে প্রবেশ পূর্বক কোন্ হারামণির সন্ধানে, কোন্ অমৃতের আশ্বাদনে নিবিষ্ট রহিয়াছে । এই অতি শৈশবের কথা উল্লেখ করিয়া একদা আচার্য্যদেব লেখককে বলিয়াছিলেন—“চারি পাঁচ ঘণ্টা জপধ্যান একাসনে গ্যাংটা কালে পাঁচ বছর বয়সে কর্তাম ।” শুনিয়া লেখক স্বীয় বৈরাগ্য ও সাধনভজনের অকিঞ্চিংকরতা উপলব্ধি করিয়া অবাক হইয়া বাইত ; ভাবিত—আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশাধিকার চাহিলে কত বেশী বৈরাগ্য, ব্যাকুলতা, উত্তম ও অধ্যবসায় আবশ্যক ।

শিশু বালকে পরিণত হইল ; অন্তরের ভাব আরও ফুটিয়া উঠিতে লাগিল ; উন্মনা ও ওদাসীত্বের ভাব বাড়িয়া চলিল । অনাবশ্যক কথা, অনাবশ্যক চলাফেরা, অনাবশ্যক মেলামেশা—বালকের স্বভাব-বিরুদ্ধ । বালক সর্বদা সর্বাবস্থাতেই স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আপন মহিমায় বিরাজমান । বালকের শারীরিক অচাপল্য এবং মানসিক গাভীর্ঘ্য অটল ; কিন্তু সে গাভীর্ঘ্যের মধ্যে পারুষ্যের লেশমাত্র ছিল না ; গাভীর্ঘ্য ও মাধুর্য্যের পরিপূর্ণ সমন্বয় । শুধু বাল্যকালে নয় ; উত্তরকালে যখন আচার্য্য, গুরু, নেতা, সমাজ-সংগঠকরূপে সহস্র সহস্র কর্ম্মী এবং লক্ষ লক্ষ নরনারীকে লইয়া দুর্বার কর্ম্মতরঙ্গে ভাসিয়াছেন, তখনও এই গাভীর্ঘ্য ও মাধুর্য্যের অটুট সমন্বয়ে তাঁহার অপূর্ণ ব্যক্তিত্ব-প্রভাব চৌদ্দক আকর্ষণে সকলকে সমানভাবে আকর্ষণ করিত ।

পাঠশালার অধ্যয়ন শেষ হইলে বালক গ্রামের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইল ; কিন্তু পড়াশুনার দিকে বালকের মনোযোগ

কোথায় ? যন্তবৎ স্কুলে নির্দিষ্ট স্থানটিতে বসিত ; অনাবশ্যক একটি ক্ৰথাও মুখে নাই। বই খোলা পড়িয়া রহিয়াছে, শিক্ষক মহাশয় পড়াইতেছেন ; কিন্তু বালকের মন বাহ্য জগৎ ছাড়িয়া কোথায় বিহার করিতেছে কে জানে ? দৃষ্টি স্থির উদাস। কোনো কোনোদিন এমনো হইত যে বিদ্যালয়ের ছুটি হইয়া গেল, শিক্ষক ও ছাত্রগণ চলিয়া গেল ; কিন্তু বালক বিনোদের হৃৎ নাই, একইভাবে বসিয়া রহিয়াছে। যখন বাহ্য বোধ ফিরিয়া আসিল, তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া আপন মনে বাড়ী চলিল।

বালকের এই অসাধারণ অপূৰ্ণ হাবভাব, চালচলন, হৈয্য ও গান্ধীৰ্য্য শিক্ষক ও ছাত্রগণের হৃদয়ে এমনি সম্মের সৃষ্টি করিত যে কোনোদিন কেহ তাঁহাকে কৌতূহলের বশেও কোনো প্রশ্ন করিয়া বিরক্তি উৎপাদন বা তাঁহার ভাবের ব্যাঘাত করিতে সাহসী হয় নাই। শিক্ষকগণের স্নেহ-প্ৰীতি বিনোদের প্রতি ছিল অপরিণীম ; ছাত্রগণের প্ৰেম-প্ৰীতি-শ্রদ্ধাও তাঁহার প্রতি অত্যধিক ছিল। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, ছাত্র সকলের মুখেই তাঁর প্রশংসা ও গুণের আলোচনা। তাঁর শিক্ষক, অভিভাবক ও স্বগ্রামবাসী সহপাঠী বহু বহু এখনো জীবিত আছেন, সকলেই একবাক্যে এই কথা স্বীকার করিয়া থাকেন। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-কালীন সচরিত্ৰতার (good conduct) পুরস্কারটী তাঁরই একচেটীয়া ছিল।

বালক বিনোদের এই অদ্ভুত ভাব ছাত্রগণের হৃদয় মনে অত্যন্ত বিস্ময় ও কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়াছিল। পার্শ্ববর্তী বহুগ্রাম হইতে বহুছাত্র ঐ স্কুলে পড়িতে আসিত। তাহাদের মুখে মুখে এই দেব-বালকের কথা, তাঁর অপূৰ্ণ চাৰিত্ৰ্য-মহিমা রূপকথার কাহিনীর মত গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িতেছিল—“বিষ্ণু ভুইয়া এক ছেলে হয়েছে

শিবের বরে। এমন স্বন্দর ছেলে দেখা যায় না। কি তার চেহারা, কী তার স্বভাব। কী মধুর কথাবার্তা, কী তাঁর চাল চলন; সবই আশ্চর্যজনক। বোধ হয় কোনো দেবতাই স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে এসেছে।”

এইরূপ কাহিনী নানা রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া শাখা প্রশাখায় গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। পার্শ্ববর্তী ও দূরবর্তী গ্রাম-সমূহের নরনারী কোনো কিছু উপলক্ষ্যে বাজিতপূরে আসিলে বিনোদকে একটি বার না দেখিয়া যাইত না। অনেকে শুধু এই অদ্ভুত বালকটাকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষায় দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া বাজিতপূরে আসিত। অগাধ গ্রামের বালক ও যুবকগণ ঝাঁহারা ভিন্ন স্থলে অধ্যয়ন করিত তাহারাও সন্মোগ স্তবিধামত শনিবার ও রবিবারে এবং অগাধ বারেও দিনে এবং রাত্রিতেও তাঁর নিকট ষাতাঘাত করিত।

বালক বিনোদ স্বীয় স্বাভাব্য ও উন্নতা-ভাবে বিরাজমান থাকিত বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সে যে সংসারের সমস্ত কিছুর সহিত সঙ্গচ্ছ্যত হইয়াছিল;—এরূপ মনে করিবার কোনো কারণ নাই। সর্বনিয়ন্তার বিশেষ বিধানে যে মহান্ ভাগবত উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত তিনি জগতে নর-শরীরে অবতীর্ণ, সেই উদ্দেশ্য বিষয়ে বাল্যবয়সেও বিনোদের চিন্তা সদাজাগ্রত ছিল। বালক গৃহকর্মও কখনো কখনো কিছু কিছু করিত; খেলার নাঠেও কখনো কখনো যাইত; কদাচ খেলায় যোগদানও করিত; কিন্তু সর্বত্র তাঁর অনাসক্ত ভাব। বোঝা যাইত সব কিছুর সহিত যে বালক যোগ রাখিতেছে, তাহা সেই বিষয়ে তার প্রীতি বা আকর্ষণের জন্ত নয়, একটি গুঢ় উদ্দেশ্য তার আছে; সব কিছুর সহিত বাহ্যতঃ যোগ রক্ষা করিতেছে—সেই গুঢ় উদ্দেশ্যটি সাধন করিয়া নিবার জন্ত।

পরবর্তী জীবনে আমরা দেখিব তিনি আসিয়াছিলেন—**জীবন-গঠনের ও জাতিগঠনের প্রেরণা ও উপাদান লইয়া**। অতি শৈশব হইতেই সে উদ্দেশ্য বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন, এক মুহূর্তের তরেও তাহা বিস্মৃত হন নাই। তাই শৈশবে বা ছাত্রজীবনে উন্নয়ন ও অনাসক্ত ভাবে চলিয়াও তিনি পারিপার্শ্বিক জনমণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ ভাবে বালক ও যুবকগণের মধ্যে **জীবন-গঠনের প্রেরণা ও উপাদান** বিতরণ করিতে সর্বদাই সতর্ক ও উদ্যত ছিলেন।

এজ্ঞ কোনো কিছুর মধ্যে না থাকিয়াও সর্ব বস্তুর সহিত তাঁর যোগ ছিল। এবং সবকিছুর সহিত যুক্ত হইয়াও তিনি কোনো কিছুর প্রতি আসক্ত বা জড়িত ছিলেন না। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে শত শত বালক ও যুবক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট ছিল; সকলেই তাঁর তুষ্ট ও তৃপ্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিত। বালক বিনোদ সকলকে জীবন-গঠনের পথে উপদেশ ও উৎসাহ দিতেন। যে সময়ে বরিশালে **অশ্বিনীকুমার দত্ত, ভজগদীশ মুখোপাধ্যায়, কালীশ পণ্ডিতকে** কেন্দ্র করিয়া একটা পবিত্র নৈতিক ও ধার্মিক আবহাওয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল; ঠিক সেই সময়ে ফরিদপুর জেলায় বালক বিনোদকে কেন্দ্র করিয়া বালক ও যুবক-সমাজে পবিত্রতা, সংঘম-ব্রহ্মচর্যের আবহাওয়া বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল। পূর্ববঙ্গের সে এক স্বর্ণযুগ। সে যুগে ধর্মনীতি, দেশসেবা, স্বদেশপ্রেম সকল বিভাগে পূর্ববঙ্গের তরুণ-প্রতিভা দিগ্বিজয়ী শক্তির বিকাশ প্রকাশ প্রদর্শন করিয়াছিল।

বালক হইলেও বিনোদের ব্যক্তিত্ব-প্রভাব এমন ভাবে আত্ম-প্রকাশ করিতেছিল যে তাঁর সন্নিধানে আসিলে আবালবৃদ্ধ সকলের মনে যেন সাময়িক ভাবে আত্মশ্রুতি আত্মবোধ জাগিয়া উঠিত, যেকোনো তাঁর নিকটে আসিলে সাময়িক ভাবে স্থির গম্ভীর সংঘত হইয়া বাইত ;

বাজে কথাবার্তা খামিয়া যাইত ; স্বভাবগত চাপল্য পরিত্যাগ করিয়া শান্তভাবে ধারণ করিত। উত্তরকালে যখন তিনি আচার্য্যরূপে বিরাজিত ছিলেন ; প্রত্যহ সহস্র সহস্র দর্শনার্থী ও উপদেশপ্রার্থী তাঁর চরণসমীপে উপস্থিত হইত ; তখন বহু ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি যে তাহারা বহু জিজ্ঞাসা, বহু অনুসন্ধিসা নিয়া বহু সংশয়ের সমাধানের আকাঙ্ক্ষা নিয়া তাঁহার নিকট গিয়াছেন; কিন্তু সম্মুখে উপস্থিত হওয়া মাত্রই সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছেন; তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যাহা বলিয়াছেন, মস্ত-মুগ্ধবৎ। তাহাই শুনিয়া চলিয়া আসিয়াছেন এবং তদ্বারাই তাহাদের আবশ্যক সমাধান মিলিয়াছে ও তাহারা শান্তিলাভ করিয়াছেন। অনেকে নির্ঝাঁক হইয়া শুধু তাঁর চরণদ্বয়ের উপর মস্তক স্থাপন করিয়া কেহ সরবে কেহ বা নীরবে অশ্রুজলে ভাসিয়াছেন এবং আকৃতি সহকারে প্রাণের বেদনা নিবেদন করিয়াছেন। তাঁর আসন ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া এই দৃশ্য-বৈচিত্র্য ও ভাব-বৈচিত্র্য দেখিয়া বিস্ময়ে বিমূঢ় হইতাম।

বালক বিনোদের শরীর হুঠ, পুঠ, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘাকৃতি ছিল; বয়সের তুলনায় তাঁহার শরীরের বৃদ্ধি অধিক ছিল। তাঁহার দেহের বিশালতা, স্বভাবের মৃদুতা, চরিত্রের শুচিতা, ব্যবহারের মাধুর্য, আলাপের শিষ্টতা, বুদ্ধির নির্মলতা, মানসিক স্বৈর্য্য ও অটল গাভীর্ঘ্য এবং অটুট ধৈর্য্য স্বাভাবিক নিয়মে তাঁহাকে নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। যদিও বালক বিনোদ খেলাধুলার মধ্যে বিশেষ যাইত না, তথাপি সে বিষয়েও তাঁর নেতৃত্ব ও পরামর্শ বালক ও যুবকগণের অপরিহার্য্য ছিল। “টাগ অব্ ওয়ার”—দড়াটানাটানি খেলার সময়ে বিনোদকে স্বদলে পাইবার জ্ঞাত উভয় পক্ষই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিত। বিনোদ যে পক্ষ গ্রহণ করিত, সে পক্ষের জয় অবধারিত ছিল।



বালক বিনোদ কটিদেশে দড়াটা বাঁধিয়া খুঁটি হইয়া দাঁড়াইলে বিরুদ্ধ পক্ষ সংখ্যা ও শক্তিতে যতই বেশী হোক নী কেন, বিন্দুমাত্র টলাইতে পারিত না।

খেলার মাঠে দুই পক্ষের মধ্যে বিতর্ক উপস্থিত হইলে বিনোদকেই মধ্যস্থ হইতে হইত; বিনোদ মধ্যস্থ হইয়া যে মীমাংসা করিয়া দিত, উভয়পক্ষই সানন্দে তাহা মানিয়া লইত। কদাচ কোনো কারণে খেলার মাঠে বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে সংবাদ প্রাপ্তিমাাত্র বিনোদ যখন তাঁহার বিশাল দেহ লইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে গিয়া অটল পূর্বতের গায় দণ্ডায়মান হইত, অমনি যুধ্যমান পক্ষদ্বয় শান্ত হইয়া যাইত। যেখানে যখনি এমনিতির কোনো ব্যাপারে তাঁহার উপস্থিতি ও উপদেশ অত্যাবশ্যক বিবেচিত হইত তখন কদাচ বিনোদ উদাসীনতা বা উপেক্ষা অবলম্বন করিত না। চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই এই ছিল যে সর্বদা স্থায়ী স্বাভাব্য এবং পারিপার্শ্বিকের প্রতি অনাসক্তির ভাব লইয়া চলিলেও প্রয়োজনীয় কোনো বিষয়েই তিনি অংশ গ্রহণে বা সহায়তা দানে উদাসীন থাকিতেন না। এই অভূত সামঞ্জস্য জীবনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোনো ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের জীবনেও দেখা গিয়াছে কিনা জানা যায় না।

বালক সিদ্ধার্থ (বুদ্ধদেব) বালাকালে এমনি আনুমনা, উন্ননা ছিলেন; সাংসারিক কোনো কিছুর মধ্যে থাকিতে চাহিতেন না বা পারিতেন না। বালক বিনোদ সিদ্ধার্থের গায় আত্মসমাহিত; অথচ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের গায় শৈশবাবধি প্রয়োজন হইলে সর্বত্র সকল বিষয়ে শক্তি ও সহায়তা প্রদানে সমুদ্বৃত, যাবতীয় অত্যায়ে অবিচারের প্রতিরোধে উদ্যোগী। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বৈরাগ্য ও অনাসক্তি যেমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক সমস্যাগুলির প্রতি দৃষ্টি এবং

তৎসমাধানে চিন্তা ও চেষ্টাও তার মধ্যে লক্ষিত হইতেছিল;—ইহা আমরা ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইব।

## তপস্বী ব্রহ্মচারী বিনোদ

বালক বিনোদের মধ্যে ধীরে ধীরে তপস্বী ব্রহ্মচারী বিনোদ অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। বালক আহার, নিদ্রা, বেশভূষায় কঠোরতা অবলম্বন করিতে লাগিল। শুধু হুন্ ভাত বা আলুসিদ্ধ ভাত বা জল দেওয়া ভাত বালকের আহাৰ্য্য হইয়া দাঁড়াইল; একখানি সাদা ধুতি ও একখানি চাদর সৰ্ব্ব ঋতুতে তার পরিচ্ছদ ছিল; নিদ্রা স্বল্প মাত্রায় পর্যাবসিত হইল। বালকের এরূপ অবস্থা দেখিয়া তদীয় পিতা তদীয়া জননীকে বালকের প্রতি অযত্নের দ্বেষ অনেক সময়ে অমুযোগ করিতেন। পিতামাতা কুলপুরোহিত—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়কে অমুদোধ করিতেন—বিনোদকে বলিয়া কহিয়া কিঞ্চিৎ স্নাত বা দুধ গ্রহণে রাজী করাইতে। পুরোহিত মহাশয়ও বিনোদকে তাঁহার পিতামাতার মনোদুঃখ জ্ঞাপন করিয়া স্নাত-দুধাদি গ্রহণে অমুরোধ করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে বালক বিনোদ একদিন পুরোহিত মহাশয়কে বলিয়াছিলেন—“দেখুন ঠাকুরমশায়! ভগবান আমাকে যে শক্তি দিয়াছেন, আমি যদি বেশী করে বা ভাল করে খাই দাই, তাহলে সেই শক্তি নষ্ট হয়ে যেতে পারে; সেই শক্তিকে রক্ষা করতে পারলেই যথেষ্ট। কড়াইতে দুধ জাল দিলে যেমন তা' উথলে উঠে পড়ে যেতে চায়, তেমনি ভাল ভাল পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে শরীরে উত্তেজনা সৃষ্টি করলে আমার শক্তি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। এই শক্তি অটুটভাবে ধারণ করায় আমার যে কী অনন্ত আনন্দ, তা, আপনারা

কল্পনাও করতে পারেন না; আমার এত শক্তি ও আনন্দ, মনে হয় যেন দালানটাকে লাথি মেরে ভেঙ্গে গুড়ো করে দিতে পারি।” এই কথার পরে উক্ত পুরোহিত মহাশয় আর কখনো বালক বিনোদকে উক্ত বিষয়ে কোনো উপদেশ দিতে যান নাই।

। বালক বিনোদের সাধনা ছিল—সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য। বিনোদ স্বয়ং অবিকলিত ও অটুটভাবে উহার অনুষ্ঠান করিত; এবং পরিচিত ও সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক বালক ও যুবককে উপদেশ, নির্দেশ ও উৎসাহ দান করিত। বীৰ্য্য-ধারণ ও ইন্দ্রিয়-সংযমই যে শারীরিক, মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক—সর্ববিধ শক্তির ভিত্তি, প্রতিভা, মহত্ব ও কর্ম-সাফল্যের উপাদান;—ইহাই আবাল্য তাঁর সিদ্ধান্ত; বাল্যাবধি এই সিদ্ধান্ত মতে নিজে চলিয়া সকলকে চালাইবার, স্বয়ং আচরণ করিয়া অন্তকে আচরণ করাইবার প্রেরণা দান তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পরবর্ত্তী জীবনে যিনি আচার্য্যরূপে স্বীয় আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তি, ভাব ও যোগৈশ্বর্য্য বিস্তার পূর্ব্বক লক্ষ লক্ষ নরনারীকে জীবন গঠনের পাথেয় যোগাইয়াছেন এবং পথ-নির্দেশ দিয়াছেন;—সেই সম্বন্ধেই যুগাচার্য্য বাল্য-জীবনেও “আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে” শিখাইয়াছেন। তিনি ভগবদ্গিষ্টি আচার্য্য। আচার্য্য রূপেই জন্মিয়াছিলেন। সাধনাবলে সিদ্ধিলাভ করিয়া আচার্য্য পদটি গ্রহণ করিতে হয় নাই। আচার্য্যত্ব ও নেতৃত্ব তাঁর স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত্ত, আজন্ম-বিকসিত বস্তু ছিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার জীবন ও কর্ম্মলীলার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা উহার পরিচয় পাইব।

বালক বিনোদের বয়স ১৩।১৪ বৎসরে পড়িলে ব্রহ্মচারী বিনোদ আত্মপ্রকাশ করিলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে যখন ব্রহ্মচারীর বয়স ষোড়শ বর্ষ তখন শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য তদানীন্তন বাজিতপুর হাইস্কুলের

প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি এই দেব-বালককে কঠোর তপস্বী,—ব্রহ্ম-চর্যের প্রতিমূর্তিরূপে দেখিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হন এবং তাঁহার সাধন-জীবন ও ব্যবহারিক জীবনের সহিত নানানুত্রে জড়িত হন। গোথ হয় তৎকালে আর কোনো ব্যক্তিই ব্রহ্মচারীর এতদূর অন্তরঙ্গ স্নেহ, সখা ও অভিভাবক স্থানীয় ছিলেন না। অধ্যাপক মহাশয়ের স্ব-লিখিত বিবরণের কিয়দংশ অবিকল নিয়ে তুলিয়া দিলাম। ইহাতে ১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারীর ক্রমবর্ধমান তপস্বী, ব্রহ্মচর্য-সাধনা ও আধ্যাত্মিক বিকাশের আভাষ পাওয়া যাইবে :—

“১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে হেড মাষ্টার হয়ে আসি—আমি এই বাজিতপুরের স্কুলে। মাথা নত করে, অনেকটা জায়গা জুড়ে বসে থাকতো বিনোদ পেছনের বেঞ্চিতে। মনে হতো—চলতে চলতে যেন স্কুলে একটু বসে যেতে এসেছে। একখানা খাতা, পেনসিল একটা, দু’ একখানা বই দেখা যেতো কখনো কখনো তার হাতে,—নিজের মহিমায় যেন বসে আছে,—ডাকুলে সাড়া দিতো নিদ্রোথিতের মত। কিসের ধ্যানে যেন ডুবে থাকতো তার মন।”

“ব্যবধান অনেক খানি। আমি গ্রাম্য স্কুলের হেড মাষ্টার, আর সে আমার ছাত্র; ঘনিষ্ঠ আলাপ পরিচয় হওয়াই বিচিত্র। কিন্তু তাহার চেহারা ছিল—এমনি অসামান্য যে এই অদ্ভুত-দর্শন বালকের সম্বন্ধে কৌতূহলাক্রান্ত না হয়ে উপায় ছিল না কোনো আগন্তকের। দেখলাম—ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, গ্রামবাসী—সবাই পঞ্চমুখ তার প্রশংসায়। ছেলেটা কে—জিজ্ঞাসা করতেই মাষ্টার মশারোবা সম্বন্ধে বল্লেন—এমন ছেলে আর হয় না, যেমন ধীর, স্থির, যেমন নম্র মধুর, তেমননি বলিষ্ঠ ও কর্মক্ষম! লেখাপড়ায় তেমন মন নাই; কেমন একটা উদাস ভাবে ডুবে থাকে।”

“ক্রমে যথেষ্ট পরিচয় হলো। পায়ে জুতা নাই, কোপীন আঁটা ; শুভ্রোজ্জল মোটা কাপড় ও মোটা চাদরে আবৃত বিশাল দেহ, মুহূ হাস্য-বিকশিত দাঁতগুলি ঝক্ ঝক্ করছে। শ্যাম বর্ণ, উজ্জল, বিশাল বক্ষ, প্রশস্ত ললাট ঈষদুন্নত, অল্প কেশ ; স্নিগ্ধোজ্জল দৃষ্টি, মুহূ মধুর হাসি, উন্নত নাসা ;—যেন শুভ্র তুষারাবৃত একটি প্রস্তর নিশ্চিত শিব ; দেখলেই নয়ন জুড়ায়—সুন্দর নয়নাভিরাম মূর্তি।…… নিত্য দু’ হাজার মুগুর ভাজা ও ডন-বৈঠক, শক্ত বিছানায় শয়ন, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, জপ ধ্যান প্রভৃতি শুনে নিলুম।……সন্ধ্যা চ কেটে গেল ; বিনোদ আসা যাওয়া করতে লাগলো।”

“শিবরাত্রি এলো ; ঠিক হলো—উপবাস করা হবে, রাত্রি জাগরণও করা হবে। ফুল-বিল্পত্রাদি সব সংগ্রহ করলেন—শ্রীমান বিনোদ। সন্ধ্যা হতেই আমরা ত্রিমূর্তি—আগি, বিনোদ ও রমণী (জর্নৈক শিক্ষক)। পূজা সারা হলো। মধ্য রাত্রে এসে জুটলেন—পণ্ডিত বাণীকান্ত বাচস্পতি। সারারাত্রি স্তবপাঠ, গান ও কীর্তন করে কেটে গেল ;—কারো সন্নিঃ নেই। আমাদের এই মাতামাতির সাঙ্গী স্বরূপ—একাসনে স্থির ভাবে বসে রইলেন—বিনোদ। বালকের স্বৈর্য্য ও ধ্যানপরায়ণতা দেখে বিস্মিত হলাম। বয়স তখন তার ১৬।১৭ হবে ; আমার বয়স ২৩ বৎসর। প্রবীণতায় এক এক সময়ে মনে হতো বিনোদই জ্যেষ্ঠ। এ ছেলের ভিতর এত যে খবর লুকানো ছিল—তা’ আমার জানা ছিল না।……”

“এই সময়ে বিনোদের মনে নানাপ্রকার আন্দোলন শুরু হয়েছে ; আগে থেকে ছোট্ট একটি দল গড়ে উঠেছে তাকে কেন্দ্র করে। সে স্বয়ং যা’ করতো, তার দলের ছেলেরা অধিকাংশই তাই করতো। বিনোদ ছেলেদের নৈতিক দুরবস্থার জন্য প্রায়ই দুঃখ করতো। তখন

ছেলেদের বিপদ ছিল প্রধানতঃ দু' রকমের—একটা নৈতিক, আর একটা রাজনৈতিক। একদল ছেলে ছোট কাল থেকে তামাক, বিড়ি, সিগারেট খেতে শিখতো, বাবুগিরি শিখতো, নাটক নভেল পড়তো, আর অসংযমের মধ্য দিয়ে নৈতিক অধঃপতনের চরম প্রাপ্তি গিয়ে উপনীত হতো। বীৰ্য্যহীনতার ফলে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তো; বালস্বভাব কমনীয়তা ও সরলতা হারিয়ে ফেলতো। দুঃখে বিনোদের বুক ফেটে যেতো। বলতো—মাষ্টার মশায়! আপনারা জানেন না, আমি জানি—ব্রহ্মচর্য্য-হীন, সরলতা-হীন, আশা-উদ্বমহীন—যত ছেলের দল। উচ্ছন্ন যাবে দেশ-জাতি, যদি এ বন্ধ না হয়। ব্রহ্মচর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্য-হারা হয়ে বালক যুবক সব অধঃপাতে যাচ্ছে! শক্তিহীন যারা, তাদের দ্বারা কি দেশ, জাতি, সমাজের কিছু হতে পারে? “স্বদেশী” “স্বদেশী” করে কি হবে। যারা কাজ করবে তারা মনুষ্যত্ব-হীন হয়ে যাচ্ছে—কেউ দেখবার নেই।

“এ দেশের ছাত্র কি ছিল, কি হয়েছে! ছাত্রাবস্থার নামই ছিল—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম; আর এখনকার বিদ্যার্থীরা ব্রহ্মচর্য্যহীন, ভোগবিলাস-পরায়ণ;—এ পড়াশুনায় কিছু হবে না,—হচ্ছে না। ছেলেদের ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করতে শেখাতে হবে। কষ্টসহিষ্ণু করতে হবে। স্বাবলম্বী করতে হবে,—ভারতীয় প্রাচীন আদর্শে ফিরিয়ে নিতে হবে। বলতে বলতে বিনোদ ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস মোচন করতো; পরক্ষণে ফিরে আসতো—একটা গভীর সঙ্কল্পের ছাপ, কঠোর প্রতিজ্ঞার আভা নিয়ে।”

“অতীত দিয়ে আরও একটা গোপন বেদনা ছিল তার বৃকে—যার আভাস মাত্র সে আমাকে দিত। কিন্তু প্রাণ খুলে বলতে সাহসী হতো না। সমৃদ্ধি-সম্পন্ন যুবকগণকে রক্ষা করাও কঠিন সমস্যা হয়ে উঠেছিল তার কাছে। যাদেরই একটু সমৃদ্ধি ফুটতো, তাদের

ঠিকপথে চালাবার লোক না থাকায় প্রায়ই তারা বিপথে যেতো। ভণ্ড সাধুর পাল্লায় পড়ে নিজেকে হারিয়ে বসতো। তাদের প্রতিভার ও সম্ভাবের বিকাশের ক্ষেত্র এবং পরিচালক নেতার অভাব বিনোদ বিশেষভাবে অনুভব করতো। নিজে যে সে ভার নিতে পারে—এমন অবস্থা তার তখনো ফোটেনি। কিন্তু সমবেদনায় তার বুক ফেটে যেতো—পছা খুঁজে বেড়াতো তাদের রক্ষার। কিন্তু কদাচ নৈরাশু তার দেখিনি! উপায়—কিছু হতেই হবে—এই ছিল তার দৃঢ় বিশ্বাস।”

—প্রণব. মাঘ, ১৩৪৭ সাল

ইং ১৯১০।১১ সাল, যখন ব্রহ্মচারীর বয়স ১৪।১৫ বৎসর. তখন হইতেই তার ব্রহ্মচর্য-সাধনা, কঠোর তপস্যা প্রবলভাবে চলিতেছিল। অটুটভাবে বীর্ঘ্যরক্ষা, আহারে সংযম ও কঠোরতা এবং নিয়মিত ব্যায়াম চর্চা দ্বারা শরীর ও মনে অসাধারণ শক্তি সঞ্চিত হইয়াছিল। লোকে এমন কি তদীয় পিতা ৬বিষ্ণু ভুঁইয়া পর্যন্ত জানিতেন—বিনোদ শুধু ভাত খায়, পরিশ্রম করে না; স্নতরাং বিরাট মাংসপিণ্ডে পরিণত হইতেছে। শারীরিক শক্তি তার আসিবে কোথা হইতে? কিন্তু ক্রমে ঘটনা পরম্পরায় ভুঁইয়ার ও জনসাধারণের এই ভ্রান্ত ধারণা বিদূরিত হইয়াছিল।

একদা একদল করাতী একটা প্রকাণ্ড গাছ চিরিবার উদ্যোগ করিতেছে, ৬বিষ্ণু ভুঁইয়া দাঁড়াইয়া তত্ত্বাবধান করিতেছেন। গাছটিকে উঠাইয়া যথাস্থানে স্থাপন করিবার জন্ত বহু লোকের প্রয়োজন। ঘটনাক্রমে ব্রহ্মচারী নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। মিস্ত্রীরা তাঁহাকে গাছটা ধরিতে অনুরোধ জানাইল। ব্রহ্মচারী

তাহাদের সাগ্রহ আহ্বানে মৃদু হাসিয়া—১৫।১৬ জন লোকে যাহা উত্তোলন করিতে পারে না তাহা অবলীলাক্রমে দু'হাতে উঠাইয়া যথাস্থানে স্থাপন করিয়া দিলেন। তাঁহার পিতা দূর হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার বহুদিনের ভ্রান্তি বিদূরিত হইল। বুঝিলেন প্রচুর মংস-মাংস-ডিম-ভক্ষণকারী তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয় অপেক্ষা এই লবণান্ন-তৃণ কনিষ্ঠ পুত্রটী কম বলবান তো নহেই; বরং ঢের বেশী বলিষ্ঠ।

আর একদিন অনেকে মিলিয়া একখানি নৌকা টানিয়া তুলিতে গিয়া অকৃতকার্য হইলে তিনি একক নৌকাখানিকে টানিয়া তুলিয়া দিলেন; সকলে তাঁহার শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইল। আবার একদিবস বহুলোকে মিলিয়া একটি গাছ কাটিতেছিল; বারো আনা পরিমাণ কাটা হইয়া গেলে গাছটী সশব্দে পড়িয়া গেল। কিন্তু গাছটীর অবশিষ্ট যতটুকু বাধিয়াছিল, সেইটুকুকে টানিয়া ছাড়াইয়া গাছটীকে স্থানান্তরিত করিতে পারিল না। সেই সময়ে ব্রহ্মচারী নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। সকলে গিয়া তাহাকে ধরিল যে গাছটী সরাইয়া দিতে হইবে। তিনি প্রথমে কিঞ্চিৎ আপত্তি প্রকাশ করিলেও পরে তাহাদের অহুরোধে স্বীকৃত হন। তিনি যখন গাছটী ধরিলেন, তখন তাহার শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্ম ইচ্ছা করিয়াই আর কেহ গাছ ধরিল না। তিনি গাছটীকে একটি হাচকা টানে ছিড়িয়া স্থানান্তরিত করিয়া দিলেন। এইরূপে ব্রহ্মচারীর শারীরিক বলবোধের কথা প্রচারিত হইয়া পড়িল। লোকে অনেক সময়ে শারীরিক শক্তি দেখাইবার জন্ম তাঁহাকে অহুরোধ করিত। অবশ্য তিনি তাহাতে রাজী হইতেন না।

আজকাল একটা ধূষা উঠিয়াছে—পুষ্টিকর খাদ্য না খাইলে স্বাস্থ্যরক্ষা বা বলবৃদ্ধি হয় না। শরীরকে সুস্থ ও বলশালী করিতে হইলে ঘৃত,



দুগ্ধ, মংস্ত, মাংস, ডিম ইত্যাদি পুষ্টিকর খাণ্ড উপযুক্ত পরিমাণ আহার করা প্রয়োজন। আর আজকাল যত উপদেষ্টা তরুণের দুঃখে দরদভরে লিখেন ও বক্তৃতা করেন. তাহাদের সকলের মুখে এই এক বাঁধা বুলি— যথেষ্ট পরিমাণ পুষ্টিকর খাণ্ডের অভাবে দেশবাসীর শারীরিক অবনতি ঘটতেছে। কিন্তু কেহ একবার ভ্রমক্রমেও উল্লেখ করেন না—(এমন কি আবাল্য ব্রহ্মচারী আচার্য পি, সি, রায় পর্যন্ত) যে শুধু পুষ্টিকর খাণ্ড কি করিবে, যদি ইন্দ্রিয়-সংযমের অভাবে আহাৰ্য্যালব্ধ শক্তি অপব্যয়িত হয়? ছিদ্রযুক্ত কলসীতে জল ঢালিয়া কি কদাচ উহা পূর্ণ করিয়া রাখা যায়?

ফলে পুষ্টিকর খাণ্ডের নামে উত্তেজক দুপ্পাচ্য খাণ্ড খাইয়া অসংখ্য জনগণ ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ও হীনবীৰ্য্য হইয়া পড়িতেছে! চিকিৎসকগণ উক্ত ধারণায় ইন্ধন যোগাইয়া যমরাজের দৌত্যগিরি করিয়া দেশবাসীর মৃত্যুর পথ সহজ ও সরল করিয়া দিতেছেন। যে যক্ষ্মারোগ মাত্র অর্দ্ধ শত বর্ষ পূর্বেও বঙ্গদেশে এক প্রকার অজ্ঞাত ছিল আজ তাহা ম্যালেরিয়ার হ্রায় মহামারীর আকার ধারণ করিয়াছে; দেশের সর্বত্র প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যক্ষ্মা-হাস-পাতাল নিম্নিত হইতেছে। কিন্তু মূলে কেহ হাত দিবে না। যথার্থ ক্ষয়ের পথ যেখানে সেদিকে কেহই নজর দিবে না। কারণ প্রায় সকলেই যে সেই এক আত্মহত্যার মহাপাপে পাপী। কে কাকে নিষেধ করে।

ব্রহ্মচারী বিনোদের জীবন এই প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার ও পদ্ধতির তীব্র জলন্ত প্রতিবাদ। শুধু ছুন ভাত খাইয়া তিনি এই সময়ে কেবল কঠোর তপস্বী ব্রহ্মচারী বলিয়া নয়, পরন্তু শারীরিক বলবিক্রমেও বিখ্যাত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে স্বীয় পদাঙ্কানুসারী ও পতাকাবাহী “ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকে” স্বীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত ও গঠন

করিয়া গিয়াছেন ; শুধু ভাল ভাত ও যৎকিঞ্চিৎ তরকারী আহাৰ্য্যরূপে গ্রহণ করিয়া সজ্জের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও সেবকগণ সমগ্র ভারতে ও বহির্ভারতে অক্লান্তভাবে কঠোর পরিশ্রম করিয়া আচার্য্যের বাণী প্রচার ও আদিষ্ট কৰ্ম্মের বিস্তার করিতেছে। স্বাস্থ্য, শক্তি, কষ্টসহিষ্ণুতায় ও বিপদবরণে তাহারা কাহারো অপেক্ষা কম নয় ;—তাহা দেশবাসী অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছেন।

যাহারা আত্মপ্রবঞ্চনা না করিয়া সত্যগ্রহণে অভিলাষী, তাহাদিগকে এই অভ্রান্ত ধারণা স্বীকার করিয়া নিতে হইবে যে—সংযম-সাধনা ও বীৰ্য্যধারণই শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সৰ্ব্ববিধ শক্তিলভের একমাত্র উপায়। পরিমিত লঘুপাক সাধারণ খাদ্য এবং নিয়মিত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম—ইহাই স্বাস্থ্য, আয়ু, আরোগ্যের রাজপথ।

ব্রহ্মচারীর এই দৈহিক বল বীৰ্য্যের কথা প্রচার হইয়া পড়িলে একদা কয়েকজন শক্তিশালী মুসলমান সর্দার ভূঁইয়ার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। তাহারা ভূঁইয়াকে সবিনয়ে প্রার্থনা জানাইল যে তাহারা ভূঁইয়ার ছেলের কথা শুনিয়া তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে ; তাহাকে একবার দেখাইতে হইবে। ব্রহ্মচারী এই সময়ে বহির্কুঠীতে পূৰ্ণ সীমানায় অবস্থিত একখানি ঘরের মধ্যে প্রায় সৰ্বদা অবস্থান করিতেন। ভূঁইয়া উহাদিগকে সেই ঘর নির্দেশ করিয়া দিলেন। আগন্তুক লোকগুলি গৃহদ্বার বন্ধ দেখিয়া ফাঁক দিয়া উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগিলে ব্রহ্মচারী বাহির হইয়া আসিলেন। জিজ্ঞাসিত হইয়া লোকগুলি বলিল যে তাহারা ব্রহ্মচারীর বলবীৰ্য্যের কথা শুনিয়া পরিচয় নিতে আসিয়াছে। ব্রহ্মচারী নানা কথা বলিয়া তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে চাহিলেন ; কিন্তু তাহারা পুনঃ পুনঃ শক্তি পরখ করিবার জ্ঞ জিদ করিতে লাগিল। যে লোকগুলি আসিয়াছিল—

তাহারা সকলেই বেশ বলবান্ এবং তজ্জন্ম তাহাদের অন্তরে একটু আত্মশ্লাঘাও ছিল। লোকগুলি যখন কিছুতেই নিবৃত্ত হইতে চাহিল না, তখন ব্রহ্মচারী তাহাদের ধরিয়া ধরিয়া এক এক করিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন ; তাহারা ওস্তাদ বলিয়া সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

বাজিতপুরে এই সময়ে জনৈক মুসলমান সর্দার শারীরিক বলবিক্রমের জন্ম খ্যাত ছিল। স্বীয় শক্তির অহঙ্কারে সে কাহাকেও গ্রাহ্য করিত না। একদিন সে বাজারের মধ্যে ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি হিন্দুগণকে গালি দিল ও মারিবে বলিয়া ভয় দেখাইল। তাহার এই দুর্ব্যবহারের কথা গ্রামে প্রচারিত হইল বটে, কিন্তু লোকটা গ্রামের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও গুণ্ডা-প্রকৃতির ছিল বলিয়া কেহ কোনো প্রকার প্রতীকার প্রচেষ্টায় সাহসী হইল না। ব্যাপারটা যখন ব্রহ্মচারীর শ্রবণে প্রবেশ করিল, তখন তিনি সর্দারটীর বেয়াদপি সায়েস্তা করিয়া দিতে মনন করিয়া বাজার হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে খালের ধারে একদিন অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। সর্দারটা বাজার হইতে প্রত্যাবর্তন কালে যেমনি তাহার নিকটে উপস্থিত হইল অমনি ব্রহ্মচারী কঠোর কণ্ঠে জিজ্ঞাসিলেন—“সর্দারের পো? তুই নাকি বামুন কায়তেকে গালাগালি দিচ্িস্, মারবার ভয়ও দেখাইচ্িস্?” সর্দারটা কিছুমাত্র না দমিয়া উদ্ধত কণ্ঠে কহিল—“কইছিই তো! তাতে হইছে কি? কমুই তো! মারমুই তো! কি অরুবা?” আর কথা বলিবার অবসর না দিয়াই চক্ষের পলকে ব্রহ্মচারী সর্দারটীর দুই পা ধরিয়া শূণ্ণে তুলিয়া ছুড়িয়া ফেলিলেন। নিক্ষেপণের বেগে লোকটি ছিটকাইয়া আট দশ হাত দূরে পড়িল। তার পরেই ছুটিয়া আসিয়া “ভুইয়া তুমি আমার ধর্মের বাপ্; আর কহনো এমন কাম করম না” বলিয়া ব্রহ্মচারীর পায়ে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিষ্কৃতি পাইল।

উক্ত ঘটনা যখন রাষ্ট্র হইয়া পড়িল তখন বাজিতপুর ও নিকটবর্তী গ্রামসমূহের হিন্দু-মুসলমান অধিবাসিগণের প্রাণে ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে বিশেষ সম্মত জাগিল। এতদঞ্চলের দুষ্ট-দুর্ভিক্ষগণ ব্রহ্মচারী ও তাহার দলের যুবকগণের ভয়ে সর্বদা সমুদ্র খাকিত। ব্রহ্মচারীর এই দল যেমন চোর, গুণ্ডা, বদমায়েসের সম ছিল; তেমনি আর্ত, পীড়িত, দুঃস্থের বন্ধু ও আশ্রয় ছিল। তাহারা ব্রহ্মচারীর নির্দেশে মুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া দরিদ্রগণকে সাহায্য করিত; দীর্ঘকালব্যাপী কঠিন ব্যাধিতে রাত্রি জাগরণ করিয়া রোগীর সেবাশুশ্রূষা করিত; আত্মীয়স্বজন-বিহীন মৃত ব্যক্তিকে সংস্কার করিত। বিপদাপদে সর্বদা গ্রামবাসীদিগকে সহায়তা দানে উন্মুখ থাকিত। প্রয়োজন হইলে তাহারা দুষ্ট দুর্ভিক্ষগণকে কঠোর হস্তে দমন করিত। ফলে গ্রামের জন-সাধারণ ব্রহ্মচারীর প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইতেছিল; দুর্ভিক্ষগণও অপেক্ষাকৃত সাবধান ও সংযত হইয়া ব্রহ্মচারীর সমুদ্র কামনা করিতেছিল।

পরবর্তী জীবনে যিনি হিন্দুধর্ম-সংস্থাপক আচার্য্যরূপে বর্তমান প্রচলিত তথাকথিত হিন্দুধর্ম যে অধর্ম বা অপধর্ম, ক্রীব-কাপুরুষ-অকর্মণ্যের ধর্ম—যথার্থ হিন্দুধর্ম নয়;—তাহা দেখাইয়া দিয়া খাঁটি হিন্দুধর্ম,—শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম, ভীমার্জ্জুনের ধর্ম, রামায়ণ-মহাভারতের ধর্ম, গীতাচণ্ডীর ধর্ম, রামদাস-গুরুগোবিন্দের ধর্ম,—প্রচার ও অঙ্কুশান করিয়া বীৰ্য্যবান দিগ্বিজয়ী হিন্দুজাতির ভিত্তি পত্তন করিয়াছিলেন;—তাহার বাল্যকালের কার্য্য-কলাপের মধ্যেও সেই মহাভাবের অঙ্কুর পরিস্কার ভাবে লক্ষিত হইয়াছিল। বিরাট অগ্নি মহীকূহ সর্বপ-প্রমাণ ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে সূক্ষ্মতম আকারে লুকায়িত থাকে। ইংরেজ কবির ভাষায় “Child is the father of the man।”

স্বীয় গৃহ হইতে অনতিদূরে খালের তীরে শ্মশান ক্ষেত্রে বসিয়া

তিনি সমস্ত রাত্রি ধ্যানে ডুবিয়া থাকিতেন। একদা শ্রুশানে বসিয়া তিনি দেখিলেন—অদূরবর্তী একটা মুসলমানগৃহে অগ্নি সংযোগ হইয়াছে। অবিলম্বে ছুটিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া একাকী দুইটি জ্বলের বৃহৎ জালা লইয়া জল বহন করিতে লাগিলেন। আগুণ এরূপ বেগে জলিতেছিল যে কেহই নিকটে যাইতে সাহস করিতেছিল না। ব্রহ্মচারী জল বহন করিয়া দিয়া সমবেত সকলকে হাঁড়ি ও ধামায় করিয়া জল দূর হইতে ছিটাইয়া দিতে আদেশ দিলেন, এই ভাবে কয়েক ঘণ্টা কাজ করিবার পর অগ্নি নির্বাপিত হয়!

এইরূপে ব্রহ্মচারী কখনো একাকী, কখনো সদলবলে সর্বদা বিপদা-পদে সকলের সহায়-সম্মল স্বরূপ হইয়া উঠিয়া হিন্দু মুসলমান সকলের অতি প্রেমাম্পদ হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি ‘সাধু’ বা সাধু “ভুইয়া” বলিয়া অভিহিত হইতেন।

ব্রহ্মচারীর অসামান্য দৈহিক শক্তির কথা আরও বহু ঘটনায় জানা গিয়াছিল। একদা তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কলিকাতায় যাইতেছিল। ব্রহ্মচারী তাহাকে নৌকায় করিয়া চারি মাইল দূরবর্তী রাজোর ষ্টীমার ষ্টেশনে যাইবার পথে মাইল দেড়েক দূরে কামালদির খাল পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া বাড়ীতে আসিয়া দেখেন—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধু কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে। সেই মুহূর্ত্তে তিনি একখানি নৌকায় চাপিয়া বেগে চালাইয়া—রাজোর ষ্টেশনে পৌছিবার পূর্বেই তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নৌকা ধরিয়া তাহাকে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে শ্রীমৎ আচার্যদেব যখন নৌকায় ভ্রমণ করিতেন, তখন কথা-প্রসঙ্গে কখনো কখনো এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিতেন—সেদিন এমন বেগে নৌকা বাহিয়াছিলাম যে নৌকা যেন উড়াইয়া নিয়া গিয়াছিলাম।

আবার 'একদিন ব্রহ্মচারী স্বীয় সঙ্গীগণকে নিকটস্থ বাগান হইতে একটি গাছ কাটিবার আদেশ দেন এবং গাছটি কাটা হইলে ভাল পালা ছাটিয়া বাড়ীতে লইয়া আসিতে বলিয়া দেন। গাছটি কাটিতে কাটিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল; সুতরাং গাছটি কাটিয়া রাখিয়া ছেলেরা চলিয়া গেল; পরদিবস আরও বেশী লোকজন আসিয়া গাছটি বাড়ী লইয়া যাইবে স্থির করিয়া গেল।

কিন্তু ব্রহ্মচারীর সমগ্র জীবনের নীতিই ছিল—কোনো কর্মের সম্বন্ধে সঙ্কল্প অন্তরে উদয় হওয়া মাত্রই কাজ আরম্ভকরা এবং শেষ না করিয়া নিবৃত্ত না হওয়া। ছেলেরা যখন চলিয়া গেল তখন একাই সেই গাছটিকে স্বন্ধে উঠাইয়া বাড়ীতে আনিয়া ফেলিলেন। গাছটি অত্যন্ত ভারী ছিল; বহন করিয়া আনিতে অন্ততঃ দশ বারো জন লোক আবশ্যক। গাছটি কাঁধে উঠাইবার সময়ে ব্রহ্মচারীর পিঠে একস্থানে একটু বেদনা লাগে। পরবর্ত্তী জীবনে কোনো সময়ে কোনো কারণে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা লাগিলে পিঠের সেই স্থানটিতে খুব ব্যথা বোধ করিতেন; তখনই উক্ত ঘটনার উল্লেখ করিতেন।

এইরূপে ব্রহ্মচারী বিনোদের তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যসাধনার খ্যাতির সহিত দৈহিক বলবীৰ্য্যের খ্যাতিও সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে দেশের প্রধান প্রধান কস্মিগণ এবং অগ্ৰাণ্য শত শত বালক ও যুবক তাঁর সংশ্রবে আসিতেছিল। তাহারা ব্রহ্মচারীকে আপনাদেরই একজন মনে করিয়া নিঃসঙ্কোচে নিজেদের জীবন-গঠন সম্বন্ধে অভাব অভিযোগ ব্যক্ত করিত এবং আবশ্যক পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিত।

বিপ্লবী দলের যুবকগণের সংঘত জীবন যাপন, শক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা, নির্ভীকতা, কর্মোৎসাহ, দৃঢ়-সঙ্কল্পতা, বিলাসহীনতা প্রভৃতি

সদৃশ-সমূহ ব্রহ্মচারীকে ঘনিষ্ঠভাবে তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। ব্রহ্মচারী যথার্থই তাহাদিগকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন ও তাহাদের কল্যাণ চিন্তা করিতেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে ও স্নেহের আকর্ষণে বহু বালক ও যুবক বিপ্লববাদের পথ পরিত্যাগ পূর্বক দেশ-সেবাকল্পে জাতির গঠন-মূলক কার্য-ধারা বরণ করিয়াছিল।

ব্রহ্মচারীর তপশ্চর্যা ক্রমশঃ কঠোরতর হইতেছিল। অটুট ব্রহ্মচর্য ও যোগসাধনার ফলে অপূর্ণ পবিত্রতার জ্যোতিঃ তাঁর অঙ্গে অঙ্গে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। মুখমণ্ডল নিয়ত মহাভাবাবেগে স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতির্ময়। ক্রমে তিনি বাহ্য-সংশ্রব যথাসম্ভব পরিহার পূর্বক অধিকাংশ সময় স্বীয় কুটির মধ্যে অবস্থান করিতেন। শুধু ভাত বা আলু-সিদ্ধ ভাত—ইহাই তাঁর আহার; শয়নের জগ্গ একখানি কঞ্চল; নিদ্রা নাম মাত্র; তাও বসিয়া বসিয়া; সটান হইয়া শুইয়া নিদ্রা যাইতেন না। রাত্রির অধিকাংশ সময় স্বীয় সাধন-কুটীরে অথবা খালের তীরে শ্মশান ক্ষেত্রে জপধ্যান-যোগসাধনায় অতিবাহিত হইত। ক্রমে তিনি নিদ্রা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং একাদিক্রমে ছয়টি বৎসর সম্পূর্ণ বিনিদ্র ছিলেন। শ্মশানে যখন তিনি সাধনা করিতেন, তখন রাত্রিতে পার্শ্ববর্তী রাস্তা দিয়া যাতায়াত কালে পথিকগণ অকস্মাৎ তাঁহাকে দেখিয়া ভীত আতঙ্কিত হইয়া পড়িত। এরূপ কয়েকটি ঘটনা ঘটিবার পর ব্রহ্মচারী স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভোলাকে ত্রিশূল বা খড়্গ হাতে লইয়া রাস্তার মোড়ে পাহারায় নিযুক্ত রাখিতেন।

উত্তরকালে ভোলার প্রসঙ্গে আচার্য্যদেব বলিতেন—“ভোলা ছিল যেন রামের ভাই লক্ষণ; যখন যা আদেশ করিয়াছি, অকুণ্ঠিত চিন্তে তাহাই পালন করিয়াছে। সে বলিত—‘দাদা! তোমার



ব্রহ্মচারী বিনোদ





আশ্রমের সমস্ত কাজ আমি একাই চালাইব!” শ্মশানে যোগসাধনা-কালে সে সমস্ত রাত্রি ত্রিশূল হাতে দাঁড়াইয়া পাহারা দিত। ভোলা ছিল—আমার যথার্থ উত্তরস্বামক। আমার চেয়েও তার গায়ে শক্তি হইয়াছিল বেশী। ভোলাই আমার সর্বপ্রথম শিষ্য; তার মৃত্যু-শয্যার আমি তাকে দীক্ষা দান করি। জপ করিতে করিতে তার মৃত্যু হয়। ভোলার খুব আশা ভরসা ছিল—যে দাদা এতবড় যোগী; নিশ্চয়ই তাহাকে বাঁচাইয়া দিবে। তা হয় না—ভগবানের বিধান, অগ্রথা করিবে কে? ভগবানের ইঙ্গিত না পাইলে যোগীগণ কদাচ যোগ-শক্তি প্রকাশ করেন না। ভোলার মৃত্যুতে মনে হইয়াছিল যেন আমার দক্ষিণ হস্ত চলিয়া গেল।”

ব্রহ্মচারীর এই সাধন-জীবনের ভিতরের সংবাদ কেহই জানিত না; তিনিও কদাচ কাহারও নিকট বিন্দুবিসর্গ উল্লেখ করিতেন না। একদা যোগ-সাধন কালে—বাসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। কুন্তকে রুদ্ধ বায়ুর বেগ মস্তিষ্কে আঘাত করে। ফলে মস্তিষ্ককোশ-সমূহ গুরুতর ভাবে আহত হয়। পরে ব্যুথিত অবস্থায় তাঁর নাসিকা-পথে শোণিতপাত হইতে থাকে। ব্রহ্মচারীর পিতামাতা ও অগ্রাগ্র অভিভাবকগণ আতঙ্কিত হইয়া চিকিৎসক ডাকাইবার চেষ্টা করিতে থাকেন। ৬বিষ্ণুভূঁইয়া গভীর প্রকৃতি রাশভারী ব্যক্তি; তাঁর সহিত আলাপ করিতে সবাই সঙ্কস্ত। ব্রহ্মচারী একেই কথা নিতান্ত কম বলেন; পিতার সহিত কোনো দিন স্বেচ্ছায় কথা বলেন নাই। স্মৃতরাং তিনি যখন দেখিলেন যে ব্রাহ্ম ধারণাবশে ডাক্তার কবিরাজ ডাকাইয়া একটা চিকিৎসা-বিভ্রাট সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে, তখন পিতার নিকট কোনো কথা বলিবার ভরসা না পাইয়া পিতৃবন্ধু ৬কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট

গিয়া কহিলেন—“দেখুন ঠাকুর মশায়! আমার নাক দিয়া যে রক্ত পড়িতেছে, তাহা কোনো ব্যারামের দরুণ নয়; উহা যোগক্রিয়ার ব্যতিক্রমের ফল। বিপরীত প্রক্রিয়ার দ্বারাই উহা সারিয়া যাইবে। ডাক্তার কবিরাজ ডাকিলে কি হইবে?” চক্রবর্তী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি আবার যোগ সাধনা-শিখলে কোথায়? তুমি তো বাড়ী থেকে কোথায়ও যাওনি!” ব্রহ্মচারী বলিলেন—“ওসব আমার জানা জিনিস; কারো কাছে শিখতে হয় নি!” চক্রবর্তী মহাশয় চমকিত স্তম্ভিত হইলেন—এ বালক নিশ্চয়ই কোনো যোগভ্রষ্ট মহাপুরুষ। তিনি সানন্দে তৎক্ষণাৎ বালকের পিতাকে উহা জানাইলেন। চিকিৎসক ডাকাডাকির পর্ব স্বগিত রহিল! পিতার ধারণা উচ্চতর হইল এবং পুত্রের প্রতি যে স্নেহ ছিল তাহা সেদিন হইতে শ্রদ্ধায় পরিণত হইল। পুত্রটির সম্বন্ধে যাহা কিছু অনাস্থার ভাব ভুঁইয়ার মনের কোণে এতকাল ছিল, এই ঘটনার পর হইতে তাহা বিদূরিত হইল; ভুঁইয়ার দৃষ্টি-কোণ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইল।

ক্রমে ব্রহ্মচারীর চেতনা নিয়ত অতীন্দ্রিয় স্তরে অবস্থান করিল। অভ্যাস বশে যন্ত্রের দ্বারা শারীরিক ক্রিয়া ও ব্যবহারিক কাজকর্মগুলি চলিয়া যাইত; দিব্যরাত্রির অধিকাংশই ভাবমগ্ন অবস্থায় থাকিতেন। এক একদিন দেখা যাইত—বই খুলিয়া রাখিয়াছেন—যেন পড়িতেছেন, সামনে আলো জলিতেছে; কিন্তু তাঁর মন প্রাণ কোন্ অনন্ত অসীমে হারাইয়া গিয়াছে—কে জানে? বাহ্য জ্ঞান আদৌ নাই। এমনি ভাবে সারাটা রাত্রি কাটিয়া গেল। পরদিন সকলের ডাকাডাকিতে হুঁস হইল। এই অবস্থা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। বাহ্যসংশ্রব ক্রমেই স্বাভাবিক ভাবে কমিয়া আসিতেছিল। স্বীয় অতি প্রয়োজনীয় শারীরিক ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে তাঁর একান্ত উদাসীনতা ঘটিতে লাগিল। সে কথা পরে আলোচিত হইবে।

ব্রহ্মচারীর দিকান্ত ছিল—আলস্য, নিদ্রা, তন্দ্রা, জড়তা, দীর্ঘসূত্রতা—এই গুলিই যথার্থ শত্রু। তজ্জগু তিনি সর্বদাই কঠোর জাগ্রতভাবে অবস্থান করিতেন; উক্ত মহাশত্রুগুলিকে জীবনে ক্ষণেকের জগুও প্রশ্রয় দেন নি। একদা শীতকালে শয়নের তন্দ্রা-খানির উপর কঞ্চল গায়ে দিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে তন্দ্রাবেশ উপস্থিত হয় এবং শরীরটা একটু আলস্ত-অবশ হইয়া আসে; অমনি বীর বিরমে কঞ্চলখানিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া লাফাইয়া উঠিলেন—“কি! আমার আবার আলস্ত জড়তা; কঞ্চল আর গায়ে দেবো না!” ইহার পর আর কঞ্চল গায়ে দেন নাই। খালি গায়ে বসিয়া বসিয়া একটু বিশ্রাম করিতেন মাত্র। পরবর্তীকালে আচার্য্যরূপে তিনি আশ্রিত সন্তানগণকে জীবনগঠনে উৎসাহিত করিয়া বলিতেন—“রোজ রোজ ঘুম কিসের? মাসের মধ্যে এক রাত্রি ঘুমায়েই যথেষ্ট।”

জীবাত্মাই—অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি, অনন্ত আনন্দের আধার—পরমাত্মা বা ভগবান্। জীব আপনার এই অনন্ত-স্বরূপের কথা ভুলিয়া গিয়াছে; তাই মানুষ নিজেকে দুর্বল, অক্ষম মনে করিয়া দুঃখ-শোক-ভয়-মোহে অভিভূত হইয়া হাহাকার অশ্রুজলে ভাসিতে থাকে। কিন্তু মানবের এই শোক-দুঃখ-ভয়-মোহ চিরদিনের তরে চলিয়া যায় যদি সে স্বীয় অমৃত-স্বরূপের কথা জানিতে পারে। স্বীয় অমৃত-স্বরূপকে জানিবার যে উপায় তাহাই ধর্ম-সাধনা; এই আত্মস্বরূপকে জানিবার জগু মানুষ উপাসনা, জপধ্যান, যোগযাগ, তপস্শ্রাদি করে। বিষয়-ভোগের তৃষ্ণাই মানুষকে দিবারাত্র চারিদিকে ছুটাইয়া নিয়া বেড়াইতেছে; এক মুহূর্তও স্থির থাকিতে দিতেছে না। স্বতরাং মানুষ স্বীয় ভগবৎ-স্বরূপের কথা চিন্তা করিবার অবসর পাইতেছে না।

বিষয়ভোগবাসনাই—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ মদ, মাংসর্ঘ্য—  
ষড়রিপুরুপে প্রকাশিত হইয়া ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে মানুষকে ঘুরাইয়া  
মারিতেছে। বিষয়-ভোগ-বাসনাকে নাশ করিতে পারিলেই—শান্তি,  
মুক্তি, অমৃত, অভয়। বিষয়-ভোগ-বাসনা নাশের জন্ত চাই—রিপু-  
দমন ও ইন্দ্রিয়-সংযম। তাই সকল ধর্ম ও সাধন-পদ্ধতির  
সারতত্ত্ব হইতেছে—রিপু-দমন ও ইন্দ্রিয়-বিজয়। এই রিপু-  
দমন ও ইন্দ্রিয়-সংযম-সাধনাই—ব্রহ্মচর্য্য। এই জন্ত শাস্ত্র বলিয়াছেন—  
ব্রহ্মচর্য্যই সকল সাধনায় ভিত্তি। যিনি যে পথ বা মতকে আশ্রয়  
করিয়া ভগবৎপলকি চান না কেন—ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ রিপুদমন ও  
ইন্দ্রিয়-সংযমের সাধনাই—মূলমন্ত্র না থাকিলে সমস্তই মিথ্যা, ভণ্ডামি,  
আত্মপ্রতারণা, নিফল।

ন তপস্তপ ইত্যাহব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্।

উর্দ্ধৈরেতা ভবেদ্যস্ত স দেবো নতু মানুষঃ ॥

ব্রহ্মচর্য্য—রিপু-দমন ও ইন্দ্রিয়-সংযমের সাধনাই—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপস্তা।  
অন্য কোনো তপস্তাকে যথার্থ তপস্তা বলে না। যিনি ব্রহ্মচর্য্য  
সাধনায় সিদ্ধিলাভ পূর্ব্বক উর্দ্ধৈরেতা হইয়াছেন, তিনি দেবতা,—মানুষ  
নন। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, যোগ—প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে যে-সাধনপদ্ধতি  
নিযে চলুক না কেন, যতদিন না মানুষ রিপু ও ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণ জয়  
করিয়া উর্দ্ধৈরেতা হইতে পারে, ততদিন মুক্তি, ভগবৎপ্রেম, ব্রহ্মজ্ঞান,  
ব্রহ্মনির্বাণ, স্থিতপ্রজ্ঞার—যাহা মানবের সর্ব্বোচ্চ সাধ্যবস্তু;—তাহা  
লাভ হইতেই পারে না। পক্ষান্তরে যদি কোনো ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য-  
সাধনে সিদ্ধিলাভ পূর্ব্বক উর্দ্ধৈরেতা হইতে পারেন তবে তাঁকে—  
অবতার বল, পরিত্রাতা বল, হুতথাগত বল, জীবনুত্ত বল, আচার্য্য

ধারণপূর্বক বিনিদ্ধ হইয়া রিপু-ইন্দ্রিয়ের মোহরূপী মহীরাবণের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত না থাকিলে “জাগা ঘরে চুরি” হইয়া যায়।

বাক্-সংযমের প্রতি ব্রহ্মচারীর বিশেষ লক্ষ্য আবাল্যা ছিল ; স্বভাবতঃ তিনি নিতান্ত স্বল্পভাষী ছিলেন। তাঁর উপদেশ—“বাক্য ও বীৰ্য্য—এই দুইটিকেই রূপণের গ্যায় পরম যত্নে রক্ষা কর।” বাক্-সংযম না থাকিলে সংকল্প-শক্তি নষ্ট হইয়া যায় ; ভাবের গাঙ্গীৰ্য্য, মনের স্বেৰ্ঘ্য, চিত্তের একাগ্রতা এবং চিন্তার গভীরতা, অন্তরের শান্তি বিনষ্ট হয়। ফলে মানুষ সঙ্কল্পিত কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পাদনে অক্ষম হইয়া পদে পদে মিথ্যাচরণ করিতে বাধ্য হয়। বাক্-সংযম ভিন্ন মনঃসংযম আকাশ-কুসুম।”

তিনি নিজে নিতান্ত প্রয়োজন ভিন্ন কথা বলিতেন না, যাহা বলিতেন তাহাও অল্পক্ষণের ; যাহাকে বলিতেন সে ভিন্ন অল্প লোকে শুনিতে পাইত না। অথচ এই মুছ মধুর কথাগুলি বজ্রের শক্তি লইয়া শ্রোতার হৃদয়ে প্রবেশপূর্বক তাহার অন্তরের আমূল পরিবর্তন ঘটাইয়া দিত। বাক্-সংযম—অন্তের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষার অথবা অনভিপ্রেত ব্যক্তির সংশ্রব এড়াইবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। বেশী কথা বলিলে সব কথা রক্ষা করা যায় না ; অনেক কথাই মিথ্যা হইয়া যায়। এক বাক্-সংযমের দ্বারা সাধন-পথের বহু বিঘ্ন অতিক্রম করা যায়।

ব্রহ্মচারীর সিদ্ধান্ত ছিল—সঙ্কল্প-রক্ষাই সত্যের সাধনা। তিনি নিজে আজন্ম ক্ষুদ্র বৃহৎ—কোনো সঙ্কল্পই ব্যর্থ হইতে দেন নাই। ‘সঙ্কল্প হ’তে বিচ্যুত হওয়ার পূৰ্বেই যেন প্রাণবায়ু বহির্গত হয় ; —ইহাই ছিল তাঁর আশৈশব প্রতিজ্ঞা এবং তাঁর অন্তিমবর্তী সাধকগণের

প্রতি প্রথম ও প্রধান উপদেশ। জীবনে তিনি কদাচ তাঁর সঙ্কল্প হইতে চুলমাত্র বিচলিত হন নাই। তাঁর মুখে নিয়ত এই উৎসাহ-বাণী ছিল—  
**সঙ্কল্পে যে অটল, প্রতিজ্ঞায় যে অবিচলিত, যাবতীয় সিদ্ধি তাঁর করতলগত ; - সকল সাধনার বীজমন্ত্র ইহাই।** এই সঙ্কল্প-সাধনার পথে স্তরে স্তরে কিরূপে আরোহণ করিতে হয়, কিরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্কল্প গ্রহণপূর্বক অক্ষুণ্ণভাবে পালন করিতে করিতে সঙ্কল্প-শক্তির বিকাশ ও দৃঢ়তা ঘটে ;—তাহা তিনি আচরণ ও শিক্ষাদান করিতেন। এইটুকু পরিমাণে খাণ্ড থাইব, এতটুকু সময় ঘুমাবো, এই কয়টা মাত্র কথা বলিব, এত পরিমাণে জপ না করিয়া খাইব না, ঘুমাবো না, এতদিন মোন থাকবো, কোনো স্বাস্থ্য বস্তু খাইব না, জামা গায়ে দিব না, জুতা পায়ে দিব না—ইত্যাদি ছোট ছোট প্রতিজ্ঞা গ্রহণ পূর্বক তাহা অটুটভাবে পালন করিতে করিতে শরীর-মনের দৈর্ঘ্য, স্থৈর্য ও সহিষ্ণুতা বাড়িতে থাকে এবং ইচ্ছাশক্তির বিকাশ, পরিপুষ্টি ও দৃঢ়তা ঘটে ; ক্রমে কঠোরতর বিষয়ে সঙ্কল্প রক্ষার সামর্থ্য ও সাহস আসে।

ব্রহ্মচারী এমনিতির ভাবে সঙ্কল্প গ্রহণ পূর্বক নিয়মিত ভাবে এবং নির্দিষ্ট সময়ানুযায়ী (punctually) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আচরণ করিতেন। এইভাবে ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে সঙ্কল্পশক্তির দ্রুত বিকাশ ঘটিয়াছিল ;—তাহা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি। অতীতকালের মধ্যে এমনি সঙ্কল্পশক্তি ঔহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিল যে তিনি অনেক অসম্ভবকে সম্ভব ও অসাধ্যকে সাধন করিয়া ফেলিতেন। তিনি সঙ্কল্প করিয়া নিদ্রাত্যাগ পূর্বক একাদিক্রমে ছয়টি বৎসর নিদ্রা যান নাই ;—সেকথা পূর্বেই বলিয়াছি। এইরূপে সঙ্কল্প-সাধনার ফলেই তিনি সিদ্ধ-সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে আমরা স্বীয় অভিজ্ঞতা

হইতে দেখিয়াছি—তঁার মুখে যখন যে বাণী নির্গত হইয়াছে, যত অসম্ভব বোধ হউক না কেন—তাহা সম্ভব হইয়াছে। ক্রমে আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা তাহার পরিচয় পাইব। সঙ্কল্প-সাধনার বলে তঁার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ও প্রভাব অমোঘ হইয়াছিল। যতই উদাসীন বা বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন হোক না কেন ব্রহ্মচারীর সংস্পর্শে আসিলে যে কোন ব্যক্তিকে মস্ত-মুগ্ধ ভূজঙ্গের মত নত হইয়া পড়িতে হইত।

মৃত্যু-চিন্তা বা বৈরাগ্য-সাধনা ব্রহ্মচারীর পরম প্রিয় বস্তু ছিল। জগতের নশ্বরতা, দেহের শোচনীয় পরিণাম, ভোগ্যবস্তুর অকিঞ্চিৎকরতা;—এই চিন্তা-চেতনাকে জীবন্ত ও জলন্ত ভাবে মানুষের নয়ন-মনের উপর ধরিয়া রাখিতে পারিলে মানুষের সংসারের আসক্তি ছুটিয়া যায়, রিপুর মোহ বিচলিত করিতে পারে না, ইন্দ্রিয়ের কুংসিত প্রবণতা মানুষকে ভোগের ক্রীতদাস করিয়া রাখিতে পারে না। ব্রহ্মচারী এই বৈরাগ্য-সাধনার চরমে উঠিয়া দেহ-জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। স্বীয় পরিচিত মৃত-ব্যক্তিগণের তালিকা প্রস্তুত করিয়া সম্মুখে ঝুলাইয়া রাখিতেন; স্বীয় মৃত ভাতৃপুত্রের মাথার কঙ্কালটি হাতে করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা, রাতের পর রাত মৃত্যুচিন্তা ও বৈরাগ্য-বিচারে ডুবিয়া থাকিতেন।

এই দেহের চরম পঞ্চিত—চিতা-শয্যায় দুই মুষ্টি ভস্ম মাত্র;—বাস্তব দৃশ্যের দ্বারা তঁার চোখের উপরে ভাসিত। উত্তর কালে আশ্রিত ত্যাগী সন্তানগণকে উপদেশ ও উৎসাহ প্রদানকালে স্বীয় জীবনের এই অভিজ্ঞতাকে তিনি জলন্তভাবে বর্ণনা করিতেন—“তখন কী অবস্থাই গেছে! মড়ার মাথা হাতে করে রাত কেটে গেছে; দিন রাত্রি কোথা দিয়ে চলে গেছে—হুঁস্ নেই! আমার এমন প্রিয় বস্তু, আমার



দিবারাত্রি সাধনার সঙ্গী গদা-জোড়াটি—যা’ অন্ততঃ পাঁচ হাজার বার ভাজতাম ;—তার উপরেও মন দিতে পারিনে ; হাতে করে উঠাতে যাই, হাত থেকে পড়ে যায়। **এই মৃত্যু-চিন্তা বা বৈরাগ্য-সাধনাই বিবেকীর একমাত্র সম্বল।** মৃত্যুচিন্তা রিপু-ইন্দ্রিয়ের প্রভাবকে নষ্ট করে, লুপ্ত তেজোবীৰ্য্যকে জাগিয়ে তোলে, আলস্ত-নিদ্রা-তন্দ্রা-জড়তার মোহকে ধ্বংস করে অনন্ত কর্মশক্তি ও উত্তম, উৎসাহ, অধ্যবসায়কে জাগাইয়া তোলে। মৃত্যুচিন্তাই মানুষের হৃদয়ে আত্মচিন্তা আনিয়া দেয় ; নান্না-মোহ, বিভ্রম-বিভ্রান্তির ঘোর ভাঙ্গিয়া তাকে আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞানের পথে এগিয়ে দেয়। **এই মৃত্যুচিন্তা বা বৈরাগ্য-সাধনার দ্বারাই—বুদ্ধের বুদ্ধত্ব, শঙ্করের শঙ্করত্ব, চৈতন্যের চৈতন্যত্ব।”**

আজন্ম উর্দ্ধরেতা ব্রহ্মচারীর কঠোর তপশ্চর্যা ও অপ্রতিহত সঙ্কল্পশক্তির ফলে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মস্বাতন্ত্র্য-বোধ এমনি দুর্বীর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে নিজে প্রত্যক্ষ অনুভব না করিলে কোন কিছুই তিনি গ্রাহ্য করিতেন না ; সাক্ষাৎ প্রমাণ পরিচয় না পাইলে, জানিয়া, বুঝিয়া, বাজাইয়া না নিয়ে—বেদবেদান্ত-শাস্ত্র-পুরাণে আছে বলিলেই—তিনি স্বীকার করিতেন না। যথার্থ আচার্য্যের ইহাই প্রধান লক্ষণ।

ঋষিবৃন্দের অপরোক্ষানুভূতিই শাস্ত্র। সেই শাস্ত্রীয় সত্য-তত্ত্বগুলি যতক্ষণ না যুগের মানুষের মধ্যে ফুটিয়া উঠে, ততক্ষণ সাধারণ মানুষ তাহা বিশ্বাস করিবে কিরূপে ? তথাপি যে বিশ্বাস করিতে দেখা যায় ;—উহা গতানুগতিকতা। সে বিশ্বাসের মূল্য বিশেষ কিছুই নাই। যিনি উত্তরকালে আচার্য্যরূপে লোক শিক্ষা দিবেন, তিনি তো গতানুগতিক ভাবে বিশ্বাস করিয়া যাইতে পারেন না ; তিনি

পরিচালন পূর্বক আকাজ্জিত সফল প্রসব করিয়াছিল। উপযুক্ত গুরুলাভের জন্ত যে আগ্রহ, আকুলতা ও অমুসন্ধিৎসা সাধক-জীবনে দেখা যায় তাহা ব্রহ্মচারীর জীবনে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমরা দেখিতে পাই নাই। তদীয় প্রধান শিক্ষক অধ্যাপক বীরেন্দ্রবাবুর প্রদত্ত বিবরণ :—

“সংসারে থেকে কিছু হবে না, কাহাকেও কিছু সাহায্য করা যাবে না ;—এই ভেবে বিনোদ মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো। একটা ‘পালাই’ ‘পালাই’ ভাব তার মধ্যে মাথা তুলছিল। কথাপ্রসঙ্গে আমার নিকট একদিন বলে ফেলেছিল— তার এ বৈরাগ্য-কাহিনী—“ভালো লাগছে না মাষ্টার মশায় ! সংসার ছেড়ে বেরিয়ে যাবো, সন্ন্যাসী হবো ;—না হলে কিছু করা যাবে না, দেশকে বাঁচানো যাবে না ; বালক ও যুবকদের নৈতিক দুর্বস্থা চোখে দেখা যায় না, অসহ !”—এই ভাবের কথা সে প্রায়ই বলা শুরু করলো। আমি চিন্তাশ্রিত হয়ে পড়লাম। কারণ আমার স্বকীয় অভিজ্ঞতা হইতে জানা ছিল— অনেক যুবক মুহূর্তের উত্তেজনার, সাময়িক বিরক্তিতে বেরিয়ে পড়ে জীবন নষ্ট করে। বিনোদকে বলতুম—কোথায় যাবে ? কার পাশায় পড়ে জীবনটাকে নষ্ট করবে ? থাকো, অপেক্ষা কর। এইভাবে ২৩ বৎসর বয়স্ক প্রধান শিক্ষক প্রবোধ দিতাম ১৭ বৎসর বয়স্ক ছাত্রকে। বিনোদ তথাপি অস্থির হয়ে উঠলো ; তখন তাকে বললুম—আমি বাপু বুঝে উঠতে পারছি। যদি যাবি তো যা’ একজনের কাছে, যার কাছে আমি মাথা বিকিয়েছি ; তিনি তোকে প্রতারিত করবেন না, ঠিক পথ বলে দেবেন।

‘মানুষ কি গুরু হতে পারে মাষ্টার মশায় ?’ ছাত্রের প্রশ্নে সন্তোষ হ’লুম। বাদ প্রতিবাদ কিছুদিন ধরে চললো ! মানুষ কেন গুরু

হবে? গুরু কেন করবো? মানুষের নিকট মাথা কেন নত করবো? এই সব আলোচনার মধ্য দিয়ে অন্তর্ধ্যামী গুরু ধীরে ধীরে বিনোদকে বুঝিয়ে দিলেন—গুরুগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা; অবশেষে সিংহশিশু বাগ মান্‌লো। সময় এসেছিল তাই অযোগ্য শিক্ষকের মারফতে ডাক্‌ এলো। হঠাৎ একদিন বিনোদ বলে ফেল্‌লো—মাষ্টার মশায়! আমি যাবো! দীক্ষা নেবো—বলে হাস্তো লাগলো।”

উপরোক্ত বিবরণ হইতে বোঝা যায় যে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ১৭ বৎসর বয়সেই ব্রহ্মচারীর তপস্যা এবং বৈরাগ্য চরম সোপানে উঠিয়াছিল; কিন্তু তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার ইঙ্গিত লাভের জ্ঞাত গুরুর আশ্রয়লাভে তত ব্যাকুল ছিলেন না, যতটা অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন—দেশের সর্বত্র যে ধর্মের গ্লানি ও নৈতিক অদঃপতন চারিদিকে সর্বদা তাঁর চোখে পড়িতেছিল—সে সকলের প্রতীকারের উপযুক্ত উপায়ের সন্ধানে।

বুদ্ধদেব যে সংসার ত্যাগ পূর্বক নির্বাণের অল্পসন্ধানে বহির্গত হইয়াছিলেন—সেও তাঁর ব্যক্তিগত শাস্তি ও মুক্তির জ্ঞান নয়; জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর দৃশ্য তাঁহার চোখে সংসারের বাস্তব বীভৎস দুঃখময় রূপটী উন্মুক্ত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিল;—তাই তিনি বিশ্বমানবের জ্ঞাত নির্বাণের সন্ধানে কঠোর তপশ্চর্যা স্বীকার করিয়া-ছিলেন—“খুঁজিব সে মুক্তিপথ, খুঁজিব নির্বাণ এই দাবাগ্নির; ধরা করিব শীতল!”

ব্রহ্মচারী বিনোদও আত্মমুক্তির জ্ঞাত আদৌ চিন্তিত ছিলেন না; অত্যাচ্ছ আধ্যাত্মিক সম্পদ এবং অদম্য পৌরুষবলে তিনি বাহ্যিক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেনই। কিন্তু “বিশ্বময় দুঃখ ক্লেশ প্রতিটী স্পন্দনে

দণ্ডে শতবার, জাগায় ক্রন্দন মম বুকে মর্ষণাতী বেদনা অপার ;”—  
ইহাই ছিল এই সময়ে ব্রহ্মচারীর অন্তর-বেদনা ।

প্রধানশিক্ষক মহাশয়ের পুনঃ পুনঃ উপদেশেও যে তিনি কোনো  
মানুষ-গুরুর নিকট নত হইতে চাহেন নাই এবং পরিশেষে নত হইতে  
স্বীকৃতও হইয়াছিলেন ;—তাহার রহস্য এই যে সত্যই তিনি আত্মনিষ্ঠ  
ও আত্মপ্রতিষ্ঠ ছিলেন—“নানবাপ্তং অবাপ্তব্যং”—তঁার অপ্রাপ্ত বা  
প্রাপ্তব্য কিছুই ছিল না । এজন্ত তিনি গুরু গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা  
দেখিতেছিলেন না । তিনি ব্যাকুল হইয়াছিলেন—দেশ ও জাতির  
মহামুক্তির পন্থার সন্ধানে ; তারই সন্ধানে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া  
সন্ন্যাস নেওয়ার আগ্রহই প্রকাশ করিতেছিলেন । শিক্ষক মহাশয়  
তঁাহার অন্তরের ভাবের একাংশ ঠিকই বুঝিয়াছিলেন ।

গুরুগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা প্রথমে না দেখিলেও পরে যখন অন্তরে  
নিয়ন্তার নির্দেশ স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিলেন ; তখনই গুরুগ্রহণ সম্বন্ধে  
আর প্রশ্ন রহিল না । বস্তুতঃ ব্রহ্মচারীর জীবনের আত্মোপাস্ত  
আলোচনা ও বিচার করিলে দেখা যায় যে তিনি আজন্ম ভগবচ্ছক্তির  
নির্দেশ ও প্রেরণায় চলিতেন । ঐশী নির্দেশ ভিন্ন কিছুই করিতেন না ।  
সাধন-জীবনে তিনি ঐশী নির্দেশে চলিয়াছেন । ঐশী নির্দেশেই  
তিনি গুরু গ্রহণে স্বীকৃত হন । লেখকের স্মরণ আছে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে  
যখন লেখক এবং অন্যান্য কয়েকজন আচার্য্যদেবের নিকট হইতে  
সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সেই মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে এক একজন করিয়া  
যখন আচার্য্যের শ্রীচরণ প্রাপ্তে উপনীত হইয়া সন্ন্যাসমন্ত্র গ্রহণ করিতে-  
ছিলাম, সেই সময়ে লেখককে সন্ন্যাসমন্ত্র দানের প্রাণ্ড মুহূর্ত্তে বলিয়া-  
ছিলেন—“আমি যা কর্ত্তে যাচ্ছি,—আজ যদি নাথজী উপস্থিত  
থাকতেন—যাঁর আদেশে চন্দ্রসূর্য্য কক্ষচ্যুত হতে পারতো,—তবে তিনিও

বুঝাতেন কিনা—সন্দেহ।” এ সম্বন্ধে বিচার যথাস্থানে করা যাইবে। এইস্থলে বক্তব্য এই যে ব্রহ্মচারী সমগ্র জীবন আপন অন্তরের ঐশী নির্দেশবশেই চলিতেন। তিনি নাথজীর নিকট দীক্ষা নিয়াছিলেন বটে; কিন্তু অন্তরে সৰ্বনিয়ন্তার দ্বারাই তাঁর জীবন ও লীলা নিয়ন্ত্রিত হইত।

“মাতুষ্য কি গুরু হতে পারে মাষ্টার মশায়?” একথা বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য ইত্যাদির মত ভগবদ্বিভূতি-সম্পন্ন আচার্য্য বা অবতারগণের মুখেই শোভা পায়। ব্রহ্মচারী বিনোদও এই শ্রেণীর অদ্ভুত-শক্তি-সম্পন্ন সাধক ছিলেন; সংসারের ধূলিমলিনতার অনেক উদ্ধে, মানবীয় বৃত্তি ও দুর্বলতার বহু উচ্চে,—অনবণ, অকলঙ্ক, নিখুঁত। যোগ-শাস্ত্রে এরূপ অধিকারীকে—“অধিমাত্রতম” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে। শাস্ত্রকথিত মতে এরূপ অধিকারীগণ যোগমার্গে ছয়মাসের মধ্যেই সিদ্ধিলাভ করেন। ব্রহ্মচারীর গুরুর প্রয়োজনীয়তা—সাধারণ লোকের যেরূপ প্রয়োজনীয়তা—সেরূপ ছিল না। তাঁহার জীবন-বস্ত্রের মধ্য দিয়া বিশ্বনিয়ন্তার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির যে ইঙ্গিত দিনের পর দিন পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল;—তারই জগৎ সূতীর ব্যাকুলতা এই সময়ে লক্ষিত হইয়াছিল।

পরবর্তী জীবনে যখন আচার্য্যরূপে জাতির পুরোভাগে দণ্ডায়মান, তখন তিনি আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন—“একজনে একটা পুকুর কাটে লক্ষ লক্ষ লোকে তা’ থেকে জলপান করে পিপাসা নিবারণ করে। তেমনি নিয়ন্তার নির্দেশে এক এক যুগে এক একজন (মহাপুরুষ) এসে সেই যুগের জগৎ স্বীয় তপস্যার ফল সঞ্চিত রেখে যান। কোটি কোটি নরনারী সেই তপঃশক্তির সহায়তা প্রাপ্ত হয়। এ যুগের তপস্যা আমিই করে রেখেছি;

মানুষের পক্ষে এই কঠোর তপস্যা সম্ভব নয়। আমাকে অনুসরণ করে আমার আদেশ নির্দেশ পালন করলেই আমার মহান্ তপঃশক্তির সহায়তা তারা পাবে। বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি আচার্য্যগণও এক এক যুগের পতিত, তাপিত, দুর্গত মানবের জন্য তপস্যা করেছিলেন।”

১২১৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ৩বিজয়ার পর দিবস ব্রহ্মচারী গোরক্ষপুর মঠের তদানীন্তন অধ্যক্ষ এবং নাথ-সম্প্রদায়ের নেতা অলৌকিক-যোগৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন মহাত্মা বাবা গম্ভীর নাথজীর নিকট দীক্ষিত হন। দীক্ষাদানের সময়ে নাথজী ব্রহ্মচারীকে প্রথমে বলেন—“তোমার সাধনা তো হয়েই গেছে! দীক্ষার কী প্রয়োজন?” তৎপরে স্বীয় যোগদৃষ্টিতে ব্রহ্মচারীর ভবিষ্যৎ জীবনের ভগবন্নির্দিষ্ট কর্মলীলা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁকে সম্মেহে দীক্ষাদান করেন। সম্মাসের কথা উঠিলে নাথজী তখন নিষেধ করায় ব্যাপারটা স্থগিত রহিয়া গেল। এরূপ প্রশ্ন স্বভাবতঃ মনে জাগে যে ব্রহ্মচারী যদি স্বাভাবিক শক্তির বেগে সাধনমার্গে উঠিয়া উচ্চতম স্তরে পৌঁছিয়া থাকেন, তবে দীক্ষা দেওয়া বা নেওয়ার কথা আসে কেন? জিজ্ঞাসা আদৌ অস্বাভাবিক নয় যে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি ভগবৎ-শক্তি-সম্পন্ন অবতার ও আচার্য্যগণের গুরু গ্রহণের আবশ্যকতা কি? তাঁহাদের তো কিছুই অপ্রাপ্য ছিল না। তাঁদের কোনো পথপ্রদর্শকেরও তো আবশ্যক হয় না। তবে তাঁহারা কেন গুরুবরণ করিয়াছিলেন?

শ্রীরামচন্দ্র—বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের নিকট দীক্ষিত হন; শ্রীকৃষ্ণ—সান্দীপনি মুনির শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। বুদ্ধদেব—আড়ারকালাম ও রুদ্রকের শরণাপন্ন হন; আচার্য্য শঙ্কর—গোবিন্দপাদের এবং মহাপ্রভু

শ্রীগোবিন্দ—ঈশ্বরপুরী ও কেশবভারতীর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন ! এই দীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য কি ? এই দীক্ষা না নিলেও কি চলিত না ? ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধেও এই কথা—যিনি ভবিষ্য জীবনে স্বয়ং আচার্য-রূপে লক্ষ লক্ষ নরনারী কর্তৃক ভগবদবতার রূপে পূজিত হইয়াছেন ; সাধন-জীবনেও যিনি কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করেন নাই—এমনতর ব্যক্তি আচার্য-পদবীতে আরোহণপূর্বক স্বীয় তপঃ-শক্তির বিস্তার এবং কর্মচক্রের প্রবর্তনের প্রাক্কালে প্রথমতঃ গুরুগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিয়াও পুনঃ কেন গুরুর নিকট দীক্ষা নিয়াছিলেন ?

এই সমস্ত অলৌকিক মহামানবদের কার্যকলাপের উদ্দেশ্য কি—তাহা মাত্র তাঁহারাই বলিতে পারেন। আমরা যাহা ভাবি বা বলি, সে আমাদের অভিজ্ঞতার তারতম্যানুযায়ী। বিচার করিলে এই দীক্ষা গ্রহণের দুইটি কারণ অনুমিত হয় :—

(১) প্রথম—গুরুকরণ প্রথার মর্যাদা রক্ষা করা। আচার্য্যগণ যাহা আচরণ করেন, জনসাধারণ তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণপূর্বক তাহাই করিয়া থাকে। সুতরাং এই প্রথার মর্যাদা রক্ষা না করিলে তাঁহাদিগকেই বা লোকে গুরু বা আচার্য্যরূপে স্বীকার করিবে কেন ?

(২) দ্বিতীয়—যুগান্তকারিণী বিশ্বহিতৈষিণী মহাশক্তির উদ্বোধন। কামানের মধ্যে বারুদ গোলা ভর্তি থাকিলেও, গোলা নিক্ষেপের জন্ত বারুদের সহিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সংযোগ চাই ; তবেই কামানের বিরাট শক্তি প্রত্যক্ষ হয়। অলৌকিক আচার্য্য বা অবতারগণের মধ্যে ঐশী শক্তি পুঞ্জীভূত থাকে—সত্য ; কিন্তু সেই মহাশক্তিকে কার্যকরী করিয়া তুলিবার জন্ত প্রজ্জ্বলিত আধ্যাত্মিক অগ্নি হইতে একটি স্ফুলিঙ্গ চাই। হয়তো একটু তুচ্ছ আধার হইতে, ক্ষুদ্র একটা আধ্যাত্মিক

শক্তির স্ফুলিঙ্গ পাঠিয়াই বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তির আধার (Spiritual Magazine) ভীম বেগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে।

শ্রীরামচন্দ্র জগতের অত্যাচারী রাক্ষস ও দানবকুলের ধ্বংস সাধন এবং মানব-সমাজে আৰ্য্য আদর্শের প্রতিষ্ঠা-পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ্যস্থাপন করিয়া যান; তিনি স্বয়ং সে শক্তির আধার হইয়াই জন্মিয়াছিলেন; সাধনা ও অতুশীলনের দ্বারা তাহা অর্জন করিতে হয় নাই। গুরু বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের আধ্যাত্মিক শক্তি-স্ফুলিঙ্গ রামচন্দ্রের হৃদয়স্থিত মহাশক্তির বিস্ফোরক-ভাণ্ডারে (Magazine) পতিত হইয়া প্রলয়ঙ্কর লীলা সজ্জাটিত করিয়াছিল। শ্রীগৌরান্দের জীবনে ঈশ্বরপুরীর সহায়তা এরূপ কাব্যই সাধন করিয়াছিল। মহাপ্রভুর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জীবনে উজ্জিতা কৃষ্ণভক্তি ও প্রেমের কোনো বিকাশ-প্রকাশ দেখা যায় নাই; তবে তিনি মাঝে মাঝে বৈষ্ণবগণকে বলিতেন—আমি এমন বৈষ্ণব হইব যে বিধি বিমুখ আমার শরণাগত হইবে। বাস্তবেও তাহাই ঘটিল। ৩৭ব্রাহ্মধামে ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণের পরেই তাঁর অন্তরস্থ কৃষ্ণপ্রেমের তরঙ্গ-প্রবাহ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল এবং মহাবেগে দেশ ও জাতিকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল।

ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধেও সেই কথা। অতি শৈশবকাল হইতে মাঝে মাঝে হঠাৎ তিনি এমন সব কথা বলিতেন—আকাশিক উচ্ছ্বাসভরে অস্বাভাবিক ভাবে;—যাহার তাৎপর্য্য কেহ বুঝিত না; উহার মধ্যে তাঁর ভবিষ্য কার্য্যকলাপের ইঙ্গিত থাকিত। তদীয় প্রধান শিক্ষকের বিবরণ হইতে দেখিতে পাই—একটা ভাগবতী মহাশক্তি তাঁর মধ্যে, আত্মপ্রকাশ করিতে আকুলি ব্যাকুলি করিতেছে। যতই তিনি চাষিদিকে ধর্ম্মশ্রম—অনাচার, কদাচার, ব্যভিচার দেখিতেছিলেন, ততই যেন তিনি অস্থির হইয়া উঠিতেছেন এবং এই উদ্দেশ্যেই সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস



গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। শিক্ষক মহাশয় তাঁর অন্তরের অবস্থা সম্যক্ অবধারণ করিতে না পারিয়া ভাবিয়াছিলেন—বিনোদ বোধ হয় নিজ জীবনের সাধনার পথ নির্ণয় করিতে পারিতেছে না; নিজস্ব শক্তি ও চেষ্টায় যতদূর সম্ভব অগ্রসর হইয়াছে। এখন উপযুক্ত গুরু চাই—পথ প্রদর্শনের জন্ত।

কিন্তু ব্রহ্মচারীর অন্তরে সর্বনিয়ন্তার অনন্ত করুণা ও মহাশক্তির নিৰ্ঝর কাঁদিয়া মুক্তির জন্ত আকুলি ব্যাকুলি করিতেছিল :—

“আমি ভাঙিব পাষণ-কারা,

আমি ঢালিব করুণাধারা,

আমি জগৎ প্রাবিয়া

বেড়াব গাহিয়া আকুল পাগলপারা।”

“যতকাল আছে বহিতে পারি,

যতদেশ আছে ডুবাতে পারি,

তবে আর কিবা চাই,

পরানের সাধ তাই।”

এই উন্মাদ ব্যাকুলতা ক্রমশঃ বদ্ধিতায়তন হইয়া ব্রহ্মচারীর গ্রাম ধৈর্যের হিমালয়কেও বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল।

যোগীরাজ গম্ভীরনাথজীর আধ্যাত্মিক শক্তির সংস্পর্শে ব্রহ্মচারীর হৃদয়-গুহায় আবদ্ধ মহাশক্তি-নিৰ্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হইল। ক্রমে আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিব কিরূপে সেই মহাশক্তি-শ্রোত জাহ্নবীধারার গ্রাম উত্তাল তরঙ্গে প্রবাহিত হইয়া দেশ জাতি ও সমাজকে প্রাবিত করিয়া নবযুগের সূচনা করিয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে—নাথজী ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাস দিলেন না কেন? একথা কদাচ তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করি নাই; এরূপ অনাবশ্যক

প্রমোত্তরের সুযোগ তিনি কদাচ দিতেন না। তবে বিচারে বোঝা যায়—সন্ন্যাসের যথার্থ অবস্থা যাহা, তাহাতো ব্রহ্মচারীর লাভ হইয়াছিল। বাকী যাহা ছিল, তাহা হইল—একটু আধটু বাহ্য অল্পাশ্রম। সে তো যে কোনো সন্ন্যাসীর নিকট হইতে যে কোনো সময়ে নেওয়া যাইতে পারে। তাহা ছাড়া তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মচক্রকে ধীরে ধীরে পত্তন করিবার জন্ত তাঁকে আরও কিছুকাল পূর্বাশ্রমে থাকিবার প্রয়োজন ছিল। ভবিষ্যৎ জীবনে যাহাদিগকে লইয়া তাঁহার ধর্মচক্র ও কর্মচক্র রচিত হইবে, সেই সব ত্যাগী সন্তানগণ এই সময়ে নানা সূত্রে তাঁর সংশ্রবে আসিতে থাকে। পরবর্তী ঘটনা পরস্পরায় আমরা তাহা দেখিব।

আরও একটি প্রশ্ন আসে যুগাচার্য্যগণ স্বয়ং ভগবচ্ছক্তির আধার হইয়াও এবং তাহাদের প্রাপ্তব্য বা অপ্রাপ্ত কিছু না থাকিলেও সাধনার ক্লেশ কেন স্বীকার করেন? এ প্রশ্নের মীমাংসা পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে—( ১ ) বিশ্বমানবের জন্ত মহাতপস্তার ফল সঞ্চিত রাখিয়া যাওয়া ; ( ২ ) লোকশিক্ষা।



## সমাধি ও সিদ্ধি

দীক্ষার মুহূর্ত হইতেই ব্রহ্মচারীর অবস্থান্তর ঘটিল ; তিনি অতি মাত্র অন্তর্মুখীন ও বাহ্যবোধ-রহিত-প্রায় হইয়া পড়িতে লাগিলেন । আধ্যাত্মিক বিস্ফোরক ভাণ্ডারে ( spiritual magazine ) যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষিপ্ত হইল ; অমনি সেই প্রচণ্ড মহাশক্তি—প্রকাশোন্মুখ । বিস্ফোরক ( বারুদ ) পুড়িয়া বাষ্প-সঞ্চয় সম্পূর্ণ হইলেই প্রচণ্ড বেগে কামানের গোলা ছুটে । ব্রহ্মচারীর হৃদয়স্থিত বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তি-ভাণ্ডারে মহাত্মা গম্ভীরনাথজীর যোগশক্তির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষিপ্ত হইলে উহা বহুতর দাবানলের ত্রায় প্রদীপ্ত তেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়া সমাজ ও জাতির মধ্যে যুগযুগ-সঞ্চিত পাপ-তাপ-কুসংস্কাররাশি ভস্মীভূত করিতে অগ্রসর হইল ;—আলোচনা-ক্রমে আমরা তাহাই লক্ষ্য করিব ।

যে কয়েকদিন গোরক্ষপুরে ছিলেন, ব্রহ্মচারী অধিকাংশ সময় নির্জনে বোপ জঙ্গলের মধ্যে সমাহিত হইয়া রহিতেন ; নাথজী লোক পাঠাইয়া আনাইয়া কিছু খাওয়াইয়া দিতেন ;—ইহা পরবর্তী কালে আচার্য্যদেবের নিকট শুনিয়াছি । ক্রমে ক্ষুধাতৃষ্ণাদি শারীরিক প্রয়োজনের প্রতি থেয়াল রাখা তাঁর পক্ষে তখন সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া উঠিতে লাগিল । নাথজীর অহুমতি-ক্রমে তিনি কাশীধামে আসিয়া অসিঘাটে একটা পরিত্যক্ত নির্জন বাড়ীতে কিছুদিন অবস্থান করিতেন । এই সময়ে তাঁর আবশ্যক দ্রব্যাদি ও আহাৰ্য্যাদি কিরূপে আসিয়া জুটিত—সে সব সংবাদ রাখিবার মত অবস্থা তাঁর রহিল না । দিব্যাত্র তিনি অন্তর্দর্শা বা অর্দ্ধ

বাহু দশায় থাকিতেন। আশ্চর্য্য রূপেই তাঁর যোগক্ষেম নির্বাহ হইত। পরবর্ত্তী কালে আচার্য্যের শ্রীমুখেই শুনিয়াছি—সেই সময়ে নাথজী মধ্যে মধ্যে অলৌকিক দেহে ব্রহ্মচারীর নিকট আসিতেন। ব্রহ্মচারী স্মরণ করা মাত্রই তিনি উপস্থিত হইতেন। নাথজীর প্রসঙ্গে আচার্য্যদেব বলিয়াছিলেন—“নাথজীর মত যোগৈশ্বর্য্যশালী মহাপুরুষ কোথায়? তাঁর ইঙ্গিতে চন্দ্র সূর্য্য কক্ষচ্যুত হতে পারতো! কে তাকে যথার্থ চিনছে? তিনি থাকতেন সাধারণ লোকের মত।” সত্যই সমকক্ষ ব্যক্তি না হইলে কি মহাপুরুষদিগকে কেহ চিনিতে পারে?

ব্রহ্মচারীর আকর্ষণে নাথজী কেন আসিতেন? ব্রহ্মচারীই বা কেন নাথজীকে আহ্বান করিতেন? তিনি আসিতেন ব্রহ্মচারীর আকাঙ্ক্ষায় স্বীয় যোগৈশ্বর্য্যগুলি ব্রহ্মচারীকে প্রত্যক্ষ করাইয়া সেগুলি তাঁহার মধ্যে সঞ্চার করিয়া দিবার জন্ত। কারণ নাথজী ব্রহ্মচারীকে পাইয়াই বুঝিয়াছিলেন—সর্ব্বোত্তম আধার তাঁর নিকট উপস্থিত যার মধ্যে তাঁহার যোগসিদ্ধিগুলি সঞ্চার করিলে সেগুলির সদ্যবহারে দেশ-জাতি-জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হইবে।

বিচার করিলে আমরা বুঝিতে পারি—যখন কোনো ভগবৎ-শক্তির আবার জগৎ-কল্যাণের জন্ত আবির্ভূত হন, তখন পারিপার্শ্বিক ভগবদনুকূল শক্তিগুলি তাঁর মধ্যে আসিয়া কেন্দ্রীভূত হইতে থাকে। শ্রীরামচন্দ্র যখন রাক্ষস-বংশ ধ্বংসপূর্ব্বক জগৎকে ধর্ম্মগ্লানির কবল হইতে মুক্ত করিতে আসিলেন—তখন দেখি—বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, ভরদ্বাজ, মাতঙ্গ, শরভঙ্গ, সূতীক্ষ, অগস্ত্য প্রভৃতি মহাযোগী ও তপঃ-শক্তিশালী ঋষিমহর্ষিগণ তাঁহাদের অজ্জিত শক্তি শ্রীরাম-চন্দ্রের মধ্যে সঞ্চার করিতেছেন! তাঁহারা প্রত্যেকে শ্রীরামচন্দ্রকে

চিনিতে পারিয়াছিলেন। বিভিন্ন সাধন-পন্থার সিদ্ধ পুরুষগণ আসিয়া ৮পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তাঁহাদের অনুভূতি ও শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। মহাবীর হুম্মান মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলে যখন পক ফল জ্ঞানে সূর্য্যকে ধরিতে গিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রে আহত হইয়া মৃতপ্রায় হন—তখন দেবরাজ ইন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় প্রধান প্রধান দেবতাগণ আসিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ ও স্বীয় স্বীয় শক্তি সঞ্চার করিয়া দেন।

কাশীধামে অবস্থান-কালীন ব্রহ্মচারী অকস্মাৎ ভয়ঙ্কর জ্বরে আক্রান্ত হইলেন; উত্তাপ এত বেশী হইয়াছিল যে মাটিতে বসিলে বা শুইলে যেন মাটি পুড়িয়া কালো হইয়া যাইত। জ্বরের প্রচণ্ড তাপে, তিনি সম্পূর্ণ অচেতন হইয়া রহিতেন। পরবর্তী কালে একদা যখন গুরুতর ব্যাধিতে শয্যাশায়ী ছিলেন, তখন কথা-প্রসঙ্গে কাশীর এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—“ঐ সময়ে একটা বৃদ্ধা পুত্রের হ্রায় সযত্নে আমার সেবা-শুশ্রূষা করিত! সে না থাকিলে ঐ সময়ে দেহ কোনো মতেই রক্ষা পাইত না।” অবশ্য সেই বৃদ্ধা কে—সে কথা আর জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। বৃদ্ধা যেই হউক না কেন—তাঁর মধ্য দিয়া জগনিয়ন্ত্রী মহামায়া নিশ্চিতই লীলা-বিগ্রহধারী তদীয় সন্তানের এই দেহ-যন্ত্র জগৎ-কল্যাণার্থ রক্ষা করিয়াছিলেন—সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

অবশ্য প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক যে ব্রহ্মচারীর এই জ্বর কি ও কেন? এ কথা তাঁকে কোনো দিন জিজ্ঞাসা করি নাই। তবে ব্রহ্মচারীর তখনকার অবস্থা এবং শাস্ত্রোক্ত বিচার ও মহান্ আচার্য্য-গণের জীবন-লীলা দৃষ্টে নিঃসংশয়ে বলা যায়—যে ঐ জ্বর—সাধারণ জ্বর নয়; উহা প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তির প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া স্বরূপ

দেহে উৎপন্ন তাপ। আধ্যাত্মিক শক্তির প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাস যখন উদ্ভিত হয়, তখন উহার প্রচণ্ড বেগ রক্ত-মাংসের শরীরের পক্ষে সহজে সহ্য করা কঠিন। যে সব মহাপুরুষ সর্বনিয়ন্তার বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত আসেন, তাঁহাদের শরীর ঐ বেগ ধারণ করিতে সমর্থ হয় বটে; কিন্তু প্রবল প্রতিক্রিয়ায় তাঁহাদের শরীরও অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। সাধারণ মানব যখন সাধন-বলে সমাধিতে পৌঁছে, তখন তাদের শরীর গলিত বৃক্ষ-পত্রের ত্রায় একুশ দিনে নষ্ট হয়।

এই ভাবে কিছু দিন নিরন্তর সমাহিত অবস্থায় থাকার পর ব্রহ্মচারীর শরীর-মন ক্রমশঃ সহিষ্ণু হইয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন। তখন নাথজীর নির্দেশে তিনি বাজিতপুরে প্রত্যাবর্তন করেন।

এই সময়ের একটা ঘটনা স্মরণীয়—যাহা পরবর্তী কালে বিরাট সফল প্রসব করিয়াছে—গোরক্ষপুরের পথে ব্রহ্মচারী স্বর্গত পিতার শ্রাদ্ধ-পিণ্ডাদি দানের জন্ত মাতা ভ্রাতাদের নির্দেশানুসারে গয়া ধামে উপস্থিত হন। ষ্টেশনে নামিলেই পাণ্ডার ছড়িদারগণ তাঁহাকে ধরিয়া টানাটানি করিতে থাকে। তাহাদের এক্রপ অভদ্র ব্যবহারের প্রতিবাদ করতেই তাহারা দলবদ্ধ হইয়া ব্রহ্মচারীকে আক্রমণের আয়োজন করে। ব্রহ্মচারী তখন রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ পূর্বক তাহাদিগকে দণ্ডদানে সম্মুখ হন। তাঁহার ভীম মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পাণ্ডার চাকরগণ দমিয়া যায়। এই ঘটনাটির প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন—  
“সেই দিনেই আমার সঙ্কল্প জাগলো গয়া তীর্থের সংস্কার করবো।”

কাশী হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ব্রহ্মচারী বাজিতপুরে রহিলেন। দিবাভাগে স্বীয় ক্ষুদ্র কুটীরে এবং রাত্রিতে গৃহের অদূরবর্তী খালের

তীরে শ্মশানক্ষেত্রে ধ্যানে সমাহিত হইয়া রহিতেন। পূর্বোক্ত প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র বাবুর বিবরণ :—“ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে স্নান করে এসে বসতো; দুপুরের পরে তার মা বা বোন্ এসে কিছু খাইয়ে দিয়ে যেতো; তারপর আবার ডুবে যেতো ধ্যানে। একাদিক্রমে নয়দিন নয়রাত্রি এইভাবে একাগ্রনে সমাধিস্থ থাকার ফলে তাঁর প্রবল জ্বর হয় এবং শরীর দারুণ অসুস্থ হইয়া পড়ে।”

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে দীক্ষার পরে ১৯১৪ ও ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ—এই দুইটী বৎসর তিনি নিজ মহাভাবে সমাহিত ছিলেন। ইহার পরেই তিনি একবার চট্টগ্রাম অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য কি ছিল তাহা তাঁর নিকট কোনোদিন জিজ্ঞাসা করি নাই। তিনি ৮৮শ্রনাথ ও সীতাকুণ্ড দর্শন পূর্বক জগৎপুরে ৮স্বামী পূর্ণানন্দের আশ্রমে গিয়াছিলেন—শুনিয়াছি। আরও কোনো কোনো স্থানে ভ্রমণ করেন এবং কিছুদিন পরেই বাজিতপুরে ফিরিয়া আসেন।

ভ্রমণের উদ্দেশ্য অনুধাবন করিতে গেলে মনে হয়—তাঁর অন্তরে যে মহাশক্তি প্রকাশ লাভের জন্ম তীব্র বেদনা সৃষ্টি করিয়াছিল, কোথায় তাহার উপযুক্ত আধার, কোথায় বা সেই স্থান? এই অনুসন্ধিসাই তাঁকে নানাস্থানে পরিভ্রমণে বাধ্য করাইতেছিল। গর্ভকাল পরিপূর্ণ হইলে গর্ভিণীর জন্ম যেমন সৃতিকাগার রচনার প্রয়োজন—যে স্থানে গর্ভিণী নিরাপদে সন্তান প্রসব করিবেন; তেমনি ব্রহ্মচারীর অন্তরে যে মহাভাগবতী শক্তি পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই জগৎ-কল্যাণের জন্ম আনুপ্রকাশের স্থান ও পাত্র খুঁজিতেছিল।

বুদ্ধের জীবনেও দেখিতে পাই—গয়াধামে নির্ঝগ লাভের পর তিনি সেই সত্যপথ মানব-কল্যাণের নিমিত্ত প্রকাশ ও প্রচার করিবার জন্ম অধীর হইয়া নানাস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে কাশীধামের অনতিদূরে

বর্তমান সারনাথ, এাচীন যুগদাবে উপস্থিত হন ; তাঁর উপলব্ধ এই সত্য ধারণ করিবে কে—এই চিন্তা করিয়া তাঁর পূর্বের পঞ্চ শিষ্টকেই পাত্র নির্ণয় করিয়াছিলেন ।\*

\* বুদ্ধের সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচারিত যে তিনি সাপনজীবনে প্রথম ছয় বৎসর কঠোর তপস্শায় শরীর পাত করিয়া দেখিলেন অভীষ্ট লাভ হইল না ; তখন তিনি পুনঃ খাওয়াদি গ্রহণ পূর্বক শরীরকে কথঞ্চিৎ পুষ্ট ও বলিষ্ঠ করিয়া লইয়া ধ্যানে বসিলেন—সেই রাত্রেই তিনি নির্বাণ লাভ করিলেন । ইহা হইতে এই উপদেশও প্রচারিত হইয়া থাকে যে কঠোরতার দ্বারা অভীষ্ট লাভ হয় না ; মধ্যপথই অবলম্বনীয় । এই ভাব যারা জীবনী ও কাব্যে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, নিশ্চিতই তাহারা বুদ্ধের জীবনের মূলতত্ত্ব জানেন না ; নিজেরাও জীবনে সাধনার পথে বিচরণ করেন নাই ।

প্রকৃত তত্ত্ব এই যে বুদ্ধদেবের জ্ঞান মহাশক্তিশালী আচার্য্যগণ যুগের মানবের কল্যাণ ও পরিব্রাণের জন্ত কঠোর তপস্শা করিয়া বান ; পর-বর্তী মানবগণকে আর অত কঠোর তপস্শা করিবার আবশ্যক হয় না । প্রাণমনকে আচার্য্যমুখী করিয়া নির্দেশিত পথে চলিলেই অভীষ্ট লাভ হয় । একব্যক্তি জলাশয় খনন করে, কোটা কোটা লোক তাহা হইতে পিপাসা নিবারণ করে ।

বিশ্বমানবের জন্ত আচরিত তপস্শা সিদ্ধ হইলে—বুদ্ধদেব জগৎ-কল্যাণের মহাসঙ্কল্প গ্রহণ করেন । বোধিচক্রম-মূলে—তখন ভগবৎ-নির্দেশে মানবকল্যাণের পন্থা ও কর্তব্যগুলি চিত্রের জায় সম্মুখে ভাসিতে থাকে ; ত্রিশী করুণার প্রেরণায় তখন তাঁহার অন্তর উবেলিত, উন্মত্ত হইয়া উঠে ; বিশ্বজীবের মহামুক্তির জন্ত তখন স্বীয় দেহ-মন-প্রাণ—জীবন বলিক্রমে সমর্পণ করেন ।



ব্রহ্মচারীর হৃদয়েও এই সময়ে ঠিক বৃদ্ধেরই মত ব্যাকুলতা ঘনীভূত হইয়া তাঁহাকে যোগ্য স্থান ও পাত্রের অনুসন্ধানে অধীর করিয়া তুলিয়া-ছিল। নানাস্থান ঘুরিয়া অবশেষে ঐশী নির্দেশে তিনি বাজিতপুরেই প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ঐশী নির্দেশে বাজিতপুরকেই ব্রহ্মচারী স্বীয় ধর্মচক্র ও কর্মচক্রের মূল কেন্দ্রস্থলরূপে স্থির করিলেন।

ব্রহ্মচারীর পিতৃভবনের সম্মুখে বাজিতপুর থালের পূর্বতীরে অসংখ্য শ্রীওড়া বৃক্ষ ও বেতস কুঞ্জে সমাচ্ছন্ন একটা দুর্গম স্থান ছিল। এই স্থানটা খালের অপর পারে থাকায় প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রাম হইতে বিচ্ছিন্ন; স্তবরাং যেমন দুর্গম তেমনি ভগ্নাবস্থ ছিল। এই স্থানে শ্রীওড়া গাছেব তলায় বুড়াঠাকুরাণীর (বনদুর্গাদেবী) পীঠ স্থাপিত; তথায় স্থানীয় হিন্দুগণ দেবীর পূজা নিবেদন করিত। সাধারণতঃ কেহ সেই স্থানে যাতায়াত করিত না। স্থানটির পরিমাণ কয়েক বিঘামাত্র। কিন্তু এই স্বল্প-পরিসর স্থানের মধ্যে ণতশত শ্রীওড়া গাছ ছিল। ঘন-সন্নিবিষ্ট নিবিড় পত্র-পরিপূর্ণ বৃক্ষকুঞ্জে পরিশোভিত স্থানটা ভয়ঙ্কর হইলেও মনোরম এবং নির্জনতাপ্রিয় সাধকের লোভনীয় বস্তু ছিল।

ব্রহ্মচারীর রাত্রিকালের সাধনক্ষেত্র—শ্রাশানটা ঠিক এই জঙ্গলটির পশ্চিমপারে থালের তীরে অবস্থিত ছিল। ব্রহ্মচারী যখন শ্রাশানক্ষেত্রে ধ্যানে বসিতেন; অথবা কদাচ যখন খালের নির্জন তীরদেশে একাকী পাদচারণা করিতেন, সম্ভবতঃ তখন হইতেই খালের পরপারস্থ এই শ্রামল বিটপীবল্লী-পরিশোভিত শান্তিময় নির্জন নিভৃত স্থানটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। স্থানটা তখন নীচু থাকার জন্ত বর্ষাকালে বানের জলে ডুবিয়া যাইত এবং বৎসরের মধ্যে প্রায় ছয় মাস স্থানটা জলময় বা স্রোতসেতে থাকিত। সম্ভবতঃ এই কারণেই ব্রহ্মচারী সেই

জঙ্গলটীর পরিবর্তে শ্মশানক্ষেত্রটিকেই প্রধান ধ্যান-ভূমিরূপে নির্বাচন করেন। শীত ও গ্রীষ্মকালে অনেক সময়ে তিনি উক্ত নিভৃত বৃক্ষ-কুঞ্জের মধ্যে ধ্যানে সমাহিত থাকিতেন। ১৯১৫।১৬ খৃষ্টাব্দে যখন ব্রহ্মচারী ঐশী প্রেরণায় স্বীয় মানব-কল্যাণ মহাভাব ও মহাশক্তির মহাপ্রকাশে সমুদ্রত হইয়া উপযুক্ত স্থানের অন্বেষণ করিতেছিলেন, তখনই এই জঙ্গলময় স্থানটীর প্রতি পুনরায় তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল। তিনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিলেন—এই স্থানটাই তাঁহার ভবিষ্যৎ লীলার সিদ্ধপীঠ হইবে। বৃদ্ধের জীবনেও আমরা দেখি—প্রথম ছয় বৎসর কঠোর তপস্তার পর যখন বোধিলাভ আসন্ন হইয়া উঠিল, তখন তিনি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে বর্তমান বোধগয়ার বোধিবৃক্ষ-তলেই সিদ্ধাসন নির্ণয়পূর্বক ধ্যান-সমাহিত হইয়া নির্বাণ লাভ করেন।

ব্রহ্মচারীর শরীর-মনরূপ আধারে ভগবৎশক্তি পূর্ণরূপে সঞ্চিত হইয়া আত্মপ্রকাশ চাহিতেছিল, সেই প্রকাশের তীব্র প্রেরণায় বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণান্তর উক্ত জঙ্গলময় স্থানটী তিনি উপযুক্ত স্থান বলিয়া বুঝিলেন। তখন ব্রহ্মচারী সহকর্মীগণ সহ ঐ স্থানের জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করেন এবং মাটা কাটিয়া খানিকটা স্থান উচু করিয়া বাঁধান হয়। তাঁর সঙ্গী বহু বালক, যুবক ও প্রৌঢ় এই সব কার্যে অল্প বিস্তর সহায়তা করিয়াছিল।

ইং ১৯১৭ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে মাঘীপূর্ণিমা তিথিতে প্রথম উৎসবাত্মক সম্পন্ন হয়;—এই মাঘীপূর্ণিমা তিথি যুগান্তকারী মহাপুরুষের জন্মদিবসরূপে যেমন স্মরণীয়, তেমনি তাঁহার সিদ্ধিলাভের শুভ তিথিরূপে ততোধিক প্রসিদ্ধ। ইং ১৯১৬ সালের পূণ্যা মাঘীপূর্ণিমা তিথিতে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন।

মাঘ মাস, চন্দ্রালোক-প্লাবিত ধরণী—দিগন্তপ্রসারী উন্মুক্ত গলিত  
রজতধারা-প্লাবিত শশভরা প্রান্তর, পাপিয়ার তানে, কোকিলের গানে  
মৃদুমূর্ছ গগনমণ্ডল ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত—সে স্বপ্নময় রাজ্য। ঘন  
বিটপীকুঞ্জ-সমাবৃত আশ্রম-প্রাঙ্গণে আনন্দে মাতোয়ারা ভক্তবৃন্দের প্রাণ-  
ঢালা হরিনাম-কীর্তন; যে কীর্তন-তরঙ্গে দিবারাত্র আনন্দের প্রাবন  
বহিতেছে। সকলেরই প্রাণে যেন কি জানি কিসের, কোন্ অনন্ত  
অমৃতরাজ্যের একটা আভাস জাগিতেছে। ব্রহ্মচারী আজ বাহুবিরহিত;  
মহাভাবের প্রেরণায় বিহ্বল; একটি কদম্ব বৃক্ষতলে তিনি সমাধিস্থ!  
তাঁহার দেহ-মন-বস্ত্রে আজ যুগ-নিয়ন্ত্রী ভাগবতী শক্তির পরিপূর্ণ  
বিকাশ। আজ তাই সকলেরই অন্তরে বাহিরে স্তবঃ উৎসারিত আনন্দ-  
হিল্লোল। ব্রহ্মচারীর অন্তরাকাশে ভাসিয়া উঠিল—তাঁর ভবিষ্য মানব-  
কল্যাণ “ধর্মচক্র ও কর্মচক্রের” সমুজ্জল মানচিত্র এবং প্রতিধ্বনিত  
হইল ভাগবতী নির্দেশবাণী। পবনবিস সমাধি ভঙ্গে অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায়  
তাঁর শ্রীমুখের প্রথম অমৃতময় আশ্বাসবাণী—“এ যুগ—মহাজাগরণের  
যুগ! এ যুগ—মহামিলনের যুগ! এ যুগ—মহা সমন্বয়ের  
যুগ! এ যুগ—মহামুক্তির যুগ!”

এই মাঘী পূর্ণিমার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে পরবর্তীকালে সম্মাসী  
শিষ্যগণের নিকট স্বলিখিত উপদেশপূর্ণ পত্রে দেখিতে পাই—“আগামী  
মাঘী পূর্ণিমার দিনে—তপঃশক্তি ও তপস্তেজের পূর্ণ বিকাশের  
সময়ে যাহাতে সজ্বনেতার তপঃপ্রভাব ও শুভদৃষ্টি গ্রহণ  
করিঙে পার এমনতর প্রাণের আকুলতা-ব্যাকুলতা নিয়া উপহিত হইতে  
যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।”—সজ্বগীতা।

অপর একখানি পত্রে দেখি—“আগামী মাঘী পূর্ণিমার দিনে তপঃ-  
শক্তি, তপস্তেজঃ, তপঃপ্রভাবের পূর্ণ বিকাশের সময়ে যাহাতে

তোমরা সকলে সজ্জনেতার সমীপে উপস্থিত হইয়া তার পূর্ণ তপস্তুজের বিকাশের সময়ে তাঁর শুভদৃষ্টি, শুভাশীর্বাদ ও তপঃপ্রভাব গ্রহণ করিতে পার—প্রাণে মনে এরূপ আকাঙ্ক্ষা, আকুলতা, ব্যাকুলতা লইয়া আসিতে প্রস্তুত হও ।”—সজ্জগীতা ।

যে কদম্ব বৃক্ষতলে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন, পরবর্ত্তীকালে সেই বৃক্ষটী মরিয়া যায়, তখন তথায় একখানি ছোট খড়ের চালা নির্মাণপূর্ব্বক সিদ্ধাসন স্থাপিত হয়—ইং ১৯২৫ সালে । পরে ইং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে টিনের ঘর এবং ইং ১৯২৯ সালে তথায় বর্ত্তমান “ত্ৰীত্ৰীপ্রণবমঠের” সিদ্ধপীঠ মন্দির নিৰ্ম্মিত হইয়াছে । প্রথম মাঘী-পূর্ণিমা-তিথিতে সিদ্ধিলাভের দিবসে ব্রহ্মচারীর মধ্যে যে ভাগবতী শক্তি পরিপূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, ক্রমে প্রতিবৎসরেই সেই মাঘী-পূর্ণিমার দিবসস্বয়ং তাঁর মধ্যে সেই মহাশক্তি পরিপূর্ণরূপে বিরাজ করিত—ইহা আমরা তাঁর স্ব-লিখিত উপদেশ-পত্রে দেখিলাম । বর্ত্তমানে তাঁর স্থূল দেহের অবসানেও প্রতি বৎসর মাঘী-পূর্ণিমা় সিদ্ধপীঠে তাঁহার অলৌকিক মহাতপঃশক্তি পূর্ণরূপে বিরাজিত থাকিবে ;—এ বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হইবে ।

প্রশ্ন উঠিতে পারে—সিদ্ধিলাভ ব্যাপারটা কি? সিদ্ধিলাভ বলিতে অনেক কিছু বুঝা যাইতে পারে । সাধনার উদ্দেশ্য অহুসারে সিদ্ধিলাভের তাৎপৰ্য্য নির্ণীত হয় । ঐহারা মুক্তি, আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের জগ্ন সাধনা করিতেছেন ; উক্ত বস্তুলাভই তাঁহাদের পক্ষে সিদ্ধিলাভ । ঐহারা যোগ-সাধনা করিতেছেন তাঁহাদের পক্ষে সবীজ বা নিক্বীজ সমাধিই সিদ্ধিলাভ বলিয়া কথিত হয় । ভক্তের পক্ষে ইষ্টদর্শনই হয়তো সিদ্ধিলাভ । কিন্তু ব্রহ্মচারীর হ্রায় যুগ-প্রবর্ত্তক আচার্য্যের সিদ্ধিলাভ সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার ।

ব্রহ্মচারী আজন্ম আত্মজ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞানী । সাধনা-তপস্যার দ্বারা

তাকে উহা লাভ করিতে হয় নাই। ব্রহ্মর্ষি শুকদেবের গ্রাম, আচার্য্য শঙ্করের গ্রাম নিত্যশুদ্ধ, নিত্য মুক্ত,—মায়া-লেশ-শূন্য। সঙ্কল্প-সিদ্ধিই ব্রহ্মচারীর সিদ্ধিলাভ। আজন্ম ব্রহ্মচারীর মধ্যে ভাগবতী প্রেরণায় মানব-কল্যাণকর মহাসঙ্কল্প ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল। অটুট ব্রহ্মচর্য্য ও কঠোর তপশ্চর্য্যার প্রভাবে উক্ত ঐশী ইচ্ছার পূর্ণতর ও দ্রুততর বিকাশ ঘটতেছিল; পরিশেষে উক্ত মাঘী-পূর্ণিমা তিথিতে সেই ভাগবত সঙ্কল্পের পরিপূর্ণতম বিকাশ ঘটিয়াছিল। তখন ব্রহ্মচারীর দেহ-মন-বুদ্ধি ভাগবত শক্তির বিকাশ প্রকাশের বিরাট যন্ত্ররূপে পরিণত এবং তাঁর নিকট ভবিষ্য লীলার আলেখ্য উদ্ঘাটিত হইল। ব্রহ্মচারীর সিদ্ধিলাভের তাৎপর্য—ইহাই।

তথাপি প্রশ্ন উঠে—ব্রহ্মচারী যদি ভগবৎ-প্রেরিত আচার্য্য, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণময় দেহধারী; স্ততরাং মায়ালেশ-বিরহিত, তবে তাঁহার জীবনে পুনঃ সাধনা-তপস্ত্রা কি প্রয়োজন ছিল? শাস্ত্রাদিতে ইহার বিস্তারিত বিচার আছে। তন্মধ্যে আমরা সহজ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করিতেছি :—

(১) এক ব্যক্তি জলাশয় খনন করে, কোটা কোটা লোকের জল পিপাসার শান্তি ঘটে। যুগপরিহ্রাতা আচার্য্য স্বীয় জীবনে কঠোর সাধনা ও তপশ্চর্য্যার দ্বারা কোটা কোটা মানবের শান্তি ও মুক্তির অমৃত সঞ্চিত রাখিয়া যান।

(২) “আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়”—ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হইলেই যুগ-প্রবর্তক আচার্য্যের আবির্ভাব হয়। আচার্য্য লোকশিক্ষার্থ স্বীয় জীবনে যুগের আদর্শ ও ধর্ম আচরণপূর্ব্বক মানবগণকে সেই পথে প্রবর্তন করাইয়া যান।

(৩) ভগবদ্রিদ্ভিষ্ট আচার্য্যের মধ্যে ভাগবত সঙ্কল্পের বীজ নিহিত

থাকে। সেই বীজ অঙ্কুরিত ও বিকশিত হয়—যুগোপযোগী ভাব, আদর্শ ও সাধনার অবলম্বনে।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সহজ কথায় বুঝাইয়াছেন—“লাউ কুমড়োর আগে কল, তারপরে ফুল। ভগবৎ-প্রেরিত আচার্য্যগণ নিত্যসিদ্ধ, পূর্ণ; লোকশিক্ষার জন্য তাঁদের সাধনা-তপস্শ্রা।”

আরও একটা প্রশ্ন এই প্রশ্নে আসে যে ব্রহ্মচারীর মধ্যে মাঘী-পূর্ণিমা তিথিতে ভাগবতী শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ প্রকাশ এবং অগ্ন্যগ্ন্য সময়ে আংশিক হইত কেন? সর্বদা একই প্রকার বিকাশ কেন থাকিত না? এই প্রশ্নের মীমাংসা কে দিবে? অনন্ত ভগবানের অনন্ত সঙ্কল শক্তির লীলাকোশল কে বুদ্ধি-বিচারের দ্বারা ধারণা করিবার স্পর্ধা রাখে? তবে জাগতিক তুলনামূলক অভিজ্ঞতা দ্বারা যাহা বোঝা যায় তাহা এই যে, বিশ্বব্যাপিনী শক্তি তরঙ্গাকারে প্রবাহিত; মহাশক্তির খেলায় হাস, বুদ্ধি, গতি, উচ্ছ্বাস—জোয়ার ভাঁটা আছেই। স্মৃতিরাজ সর্বনিয়ন্ত্রা ভগবানের বিধানেই বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্রহ্মচারীর মধ্যে মাঘী-পূর্ণিমা তিথিতেই ভাগবতী শক্তির পূর্ণতম বিকাশ—মহাপ্রকাশ ঘটিত; অগ্ন্য সময়ে এই প্রকাশ আংশিক থাকিত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জীবনে দেখি—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি মহাপ্রকাশের অবস্থায় শিষ্য অর্জুনকে গীতার বাণী শুনাইয়াছিলেন ও বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে অর্জুন কর্তৃক অম্লকৃদ্ধ হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, অর্জুন! তখন যোগস্থ হইয়া আমি যাহা তোমাকে বলিয়াছিলাম বা করিয়াছিলাম এখন আর তাহা বলা বা করা সম্ভব নয়। ইহা হইতেই জানা যায়—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জীবনেও বিশেষ বিশেষ সময়ে মহাপ্রকাশ ও অগ্ন্যগ্ন্য সময়ে আংশিক প্রকাশ ঘটিত। শ্রীকৃষ্ণের জীবনে এই মহাপ্রকাশ আরও দেখিতে পাই—রাসলীলায়,

কংসবধে, পাণ্ডবের রাজস্বয় যজ্ঞে, দুৰ্য্যোধনের সন্ধি-সভায়, দুৰ্জাসার অভিষাপে পাণ্ডবগণকে রক্ষাকালে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবনেও এই মহাপ্রকাশের লীলা দেখিতে পাই। তবে ব্রহ্মচারীর জীবনে মাঘী-পূর্ণিমায় মহাপ্রকাশ নিয়মিতভাবেই ঘটিত। অগ্ন্যাগ্ন বিশেষ বিশেষ সময়েও মহাপ্রকাশ লক্ষিত হইয়াছে ;—তাহা প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইবে।

—o—

## আচার্য্যভাবের উন্মেষ ও ক্রমবিকাশ

সর্বনিম্নস্তার বিশেষ বিধানে যুগপ্রবর্তক আচার্য্যরূপে বাহার আবির্ভাব, আচার্য্যভাব তাঁহার আজন্ম স্বাভাবিক ;—ইহা বলাই বাহুল্য। পূর্বেই বলিয়াছি বাল্যাবধি তাঁহার মধ্যে প্রবীণত্বের বিকাশ প্রকাশ লক্ষিত হইয়াছিল। ইং ১৯১১/১২ খৃষ্টাব্দে তিনি স্থানীয় তরুণ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব-পদে প্রতিষ্ঠিত ; বহু বালক ও যুবক তাঁর সহিত সংশ্লিষ্ট। প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র বাবুর প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায়—ইং ১৯১৩ সালে ব্রহ্মচারীকে কেন্দ্র করিয়া রীতিমত একটা দল গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহাদিগকে লইয়া তিনি মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ পূর্বক দরিদ্র প্রতিপালন, রোগীর শুশ্রূষা, বিপদাপদে গ্রামবাসীগণকে সহায়তা দান প্রভৃতি কাৰ্য্য করিতেছেন। আরও জানিতে পারি যে এই সময়-কার সমাদরের চূর্নোতি ও অদঃপতনের কবল হইতে কিশোর প্রাণ-গুলিকে কিরূপে রক্ষা করিবেন—এই চিন্তায় তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন।

তাঁর ব্রহ্মচর্য্যের খ্যাতি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দূরবর্তী গ্রাম সমূহ হইতে বালক ও যুবকগণ দলে দলে মধুলুঙ্গ ভ্রমরের তায় তাঁর নিকট আসিতে থাকে। বাহারা অভিভাবকগণের অনুমতি পাইত না, তাহারা রাত্রিতে গোপনে আসিত। শনি ও রবিবারেই ইহাদের ভীড় হইত খুব বেশী। কখনো কখনো ব্রহ্মচারী নিজে নৌকা বাহিয়া তাহাদিগকে বাড়ী পৌছাইয়া দিতেন। ব্রহ্মচারীর আদর, দরদ, অহৈতুকী কল্যাণ-চামনা এবং অলৌকিক আকর্ষণ শিক্ষার্থীদের প্রাণে এক অভিনব





কিন্তু কৈ এমনটি তো কোথায়ও দেখি না। সেদিন সত্যি বড় ইচ্ছা হইত—একবার তাঁহার কাছে ছুটিয়া যাই, একটা বার প্রাণ ভরিয়া কথা বলি, কিন্তু বালক আমি—তাঁহার সহিত কী কথা বলিব ? তাই অন্তরের সাধ অন্তরে বিলীন হইয়া যাইত, দূর হইতে দেখিয়াই তখন সন্তুষ্ট হইতাম।

স্কুলে গিয়া তিনি বসিতেন—একটা বড় জানালার পাশে। বাইরে তিনি বড় একটা আসিতেন না। কেবল মাধ্যাহ্নিক ছুটির সময়ে কোনো কোনোদিন লাইব্রেরী ঘরের বেড়া চেষ্টান দিয়া নিশ্চল প্রস্তর-মূর্তির আয় একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে দেখা যাইত। সেই স্বল্পভাষী গম্ভীর মূর্তির সম্মুখে সহপাঠীদের চাঞ্চল্য ও উচ্ছ্বলতা যেন আপনা হইতেই থামিয়া যাইত; শিক্ষকগণও তাঁহাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। স্কুলের “Good Conduct” এর বার্ষিক পুরস্কার তাঁরই একচেটিয়া ছিল। ছাত্র ও যুবক-সমাজে এই অলৌকিক কিশোর ( কারণ তখন তাঁর বয়স ১৫ বৎসর মাত্র ) সর্বজনপ্রিয় নেতা ছিলেন; সকলেই তাঁর উপদেশ ও নেতৃত্বে কাজ করিতে উৎসুক থাকিত। তরুণগণের যে কোনো অগুষ্ঠান তাঁরই নেতৃত্বে সম্পাদিত হইত। প্রত্যেকেরই একটা স্বাভাবিক বিশ্বাস ও ভরসা ছিল যে, তিনি যে কাজে হস্তক্ষেপ করিবেন তাহা সুসম্পন্ন হইবেই। তিনি যে কাজে হাত দিতেন না, সে কাজে কারও উৎসাহ আসিত না। তিনি ছিলেন আনন্দ ও উৎসাহের ঘনীভূত মূর্তি। নেতা হওয়ার জন্য তাঁকে কোনোদিন চেষ্টা করিতে হয় নাই। নেতৃত্বই যেন তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিত। তিনি ছিলেন জয়সিদ্ধ নেতা; তিনি—একাধারে—নেতা, তথা, স্বকৃত, উপদেষ্টা ও অভিভাবক। কারো পারিবারিক বা মানসিক অশান্তি ঘটিলে, কেহ, কোনোপ্রকার বিপদে পড়িলে, কাহারো সহিত বিবাদ

বিসম্বাদ ঘটিলে, যে কোনো সমস্যা উপস্থিত হইলে লোকে তাঁহার নিকট শরণ গ্রহণ করিত। যখন তিনি বালক ও যুবক তখনও ঠিক এমনভাবে তিনি সকলের সর্কাবস্থায় বন্ধু ও আশ্রয়দাতা ছিলেন।

স্কুলের সময়ে কথা না বলিলেও দেখিতাম ছুটির পরে তাঁর অনুরক্ত ছাত্রগণ তাঁহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ধরিত; তখন তাঁর ভাবগম্ভীর মুখে মৃদু হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিত। কখনো স্কুল প্রাক্ষণে, কদাচ নির্জন রাস্তায় দাঁড়াইয়া তিনি সকলকে সাদরে জীবন গঠনের উপদেশ দিতেন;—ইহা ইং ১৯১৪ সালের কথা। ইং ১৯১৭ সালে আমি তাঁরই এক অনুরক্ত ভক্তের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার সহিত পরিচিত হই ও দিব্য সঙ্গলাভ করিয়া তদীয় অপার্থিব স্নেহআর পাইয়া কৃতার্থ হই। উক্ত সালে এক বৈশাখ মাসের অপরাহ্নে তাঁহার প্রথম দর্শন ও সঙ্গলাভ করি। নিজ সাধন-কুটীরে অনাবৃত দেহে তিনি বসিয়া আছেন। কুটীরের ভিতরে প্রবেশ করিলে মনে হইল—কী এক অলৌকিক ভাব ও শক্তিতে ঘরখানি যেন ভরিয়া রহিয়াছে।

তিনি সন্মুখে ডাকিয়া কাছে বসাইলেন ও সাদরে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; তাঁর প্রতিটি কথায় আমার শ্রবণ-যুগলে মধুস্ফরণ হইতে লাগিল। এমন মধুর কথা, এমন মধুর ব্যবহার, এমন আদর যত্ন কি পার্থিব জগতে সম্ভব? আমরা যেন তাঁর চির পরিচিত আপনার জন, তাঁর সহিত যেন কত কালের নিবিড় সম্বন্ধ;—প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি বাক্যের মধ্য দিয়া এই ভাবই অনুভূত হইতে লাগিল। কত ভালো বাসিলেন, কত উপদেশ দিলেন! সে ভালোবাসার কাছে সংসারের স্নেহপ্রীতির বন্ধন বিস্বাদ মনে হইতে লাগিল।” ( শ্রীশ্রীযুগাচার্য সঙ্গ ও উপদেশামৃত )।

ইং ১৯১০।১১ সাল হইতে আর একজন বালক ব্রহ্মচারীর

অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিলেন ; এই বালক বাজিতপুরে থাকিয়া স্কুলে পড়িতেন। ব্রহ্মচারী এই বালককে স্থায়ী ভবিষ্যলীলার অগ্রতম প্রধান সহচররূপে চিনিয়াছিলেন, তজ্জন্ম তাঁহাকে অগ্রাগ্র বালকদিগের সংসর্গ হইতে নানাভাবে রক্ষা করিয়া নিজের ভাব ও আদেশে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। সন্ন্যাসী শিষ্যগণের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম ব্রহ্মচারীর সংশ্রবে আসিয়াছিলেন। **ইনিই বর্তমান সঙ্ঘাধ্যক্ষ—শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ।**

গোরক্ষপুর হইতে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচারীর জীবনে যে নূতন অধ্যায় উদ্ঘাটিত হইয়াছিল তাহার রহস্য তখন বুঝিবার মত লোক কেহ ছিল না। কি উদ্দেশ্যে—কে বলিবে—তখনকার আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ও সাধকগণের সহিত এই সময় তাঁহার যোগাযোগ ঘটিতে থাকে। উল্লিখিত বালকের নিকট শুনিয়াছি—এই সময়ে একদিন ব্রহ্মচারী তাহাকে বলিলেন—আজ তোমরা বিকালে আসিও, কর্ত্তন করিতে হইবে, “**প্রভু জগদ্বন্ধু**” আসিবেন।” সেদিন বালক—সদ্বাগণ সহ স্কুলের ছুটির পর উর্দ্ধ্বাসে ব্রহ্মচারীর সাধনকুটীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—দ্বার বন্ধ, ভিতরে কয়েকজন ভক্ত নাম সংকীৰ্ত্তন করিতেছে। কিছুক্ষণ পরে দরজা খোলা হইলেই বালক সাগ্রহে ব্রহ্মচারীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—“**প্রভু জগদ্বন্ধু** কি আসিয়াছিলেন?” ব্রহ্মচারী উত্তর দিলেন—“হাঁ। আসিয়াছিলেন।” বালকের দুঃখ হইতে লাগিল—কেন সে আরও আগে আসিয়া পৌছিতে পারিল না।

বিভিন্ন আধ্যাত্মিক শক্তিশালী সাধক তপস্বীর সহিত উক্ত প্রকার যোগাযোগের তাৎপর্য্য চিন্তা করিলে মনে হয়—ব্রহ্মচারী স্বয়ং আধ্যাত্মিক শক্তির মহান্ আধাররূপে বর্ধমানের অবতীর্ণ হইয়া মজ্জ-সংগঠনের প্রারম্ভে পারিপার্শ্বিক শুক্ল শক্তিগুলিকে আবর্ষণ

করিতেছিলেন। পরবর্তীকালে যখন সজ্জসংগঠকরূপে তিনি আত্ম-প্রকাশ করেন তখন তাঁহাকে প্রায়ই বলিতে শোনা যাইত—  
**“কাউকে অবজ্ঞা করতে নেই, পিপড়ার বলও বল!”** এই ভাবে যিনি সমাজের তুচ্ছতম, ক্ষুদ্রতম ও ক্ষীণতম শক্তি ও ব্যক্তি হইতে বৃহত্তম ও মহত্তম শক্তি ও ব্যক্তিগুলিকে পর্যন্ত সহযোগিতাসূত্রে গাঁথিয়া জাতিগঠন কার্যের আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; তিনি যে ধর্ম-সংস্থাপয়িতা ও সজ্জনেতারূপে আত্মপ্রকাশ করিবার পূর্বে চতুর্দিকের ক্ষুদ্র বৃহৎ আধ্যাত্মিক শক্তিগুলির সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিবেন;— ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

প্রভু জগদ্বন্ধুকে তিনি বেশ উচ্চ স্থান দিতেন ও বলিতেন—  
**“জগদ্বন্ধু কঠোর ব্রহ্মচারী ও তপস্বী।”** মনে হয় এজগুই ব্রহ্মচারী প্রভু জগদ্বন্ধুর প্রতি এত বেশী আকৃষ্ট ছিলেন। অবশ্য স্থূলভাবে এই দুই আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের কোনদিন সাক্ষাৎ হয় নাই।

৮গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে বিশেষ সূখ্যাতি করিয়া তিনি বলিতেন—  
**“গোসাইজী বাঙ্গলার গার্হস্থ্য জীবনে গুরুভক্তি ও সাধনার আদর্শ ও প্রেরণা জাগাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁর প্রভাবে সমাজের গার্হস্থ্য-জীবনের প্রচুর কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল।”** ৮ভোলানন্দ গিরির সহিত তিনি পরে নানাভাবে ঘনিষ্ঠ হইয়াছিলেন;—সে কথা পরে আসিবে।

ব্রহ্মচারী একদিকে যেমন পারিপার্শ্বিক বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তি-গুলির সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতেছিলেন; অপরদিকে শান্তি ও উন্নতি-প্রয়াসী ভক্ত-প্রাণগুলিকেও সাহায্য প্রদান করিতেছিলেন। এই সময়ে ব্রহ্মচারীর সহিত গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের শিষ্য মাদারীপুরের উকীল ৮যজ্ঞেশ্বর সেনের সহিত ও মাদারিপুর সহর হইতে আট মাইল দূরবর্তী মাইজপাড়া গ্রামনিবাসী তান্ত্রিক সাধক ৮বিপিন বিহারী

গাঙ্গুলীর সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়। ঔষজেশ্বর বাবু ব্রহ্মচারীকে প্রাণের সহিত ভালোবাসিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন। পরবর্ত্তীকালে মাদারিপুর্নে “ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও সেবাশ্রম” প্রতিষ্ঠিত হইলে ঔষজেশ্বর বাবু প্রায়ই আশ্রমে যাইতেন; আশ্রমের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও বিদ্যার্থীগণকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ ও শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি তাহাদিগকে লইয়া দল বাঁধিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামের কোনো ভক্ত গৃহস্থের বাড়ীতে যাইতেন; (ঔষজেশ্বর বাবুই ভক্ত গৃহস্থকে উপদেশ দিতেন—সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও বিদ্যার্থীগণকে সেবা করিবার জ্ঞান;—এই ভাবে ভক্তির সহিত তাহারা আশ্রমবাসীগণকে নিমন্ত্রণ করিত); তথায় সারাদিন ধরিয়া কীর্ত্তন, যজ্ঞ, পূজা, আরতি হইত; আনন্দের হাট বসিত; ঔষজেশ্বর বাবু আনন্দে গলিয়া যাইতেন। পরে সকলে আনন্দে প্রসাদ গ্রহণান্তর আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন।

ইহারও কিছুকাল পরে ব্রহ্মচারী যখন আচার্য্যরূপে লক্ষ লক্ষ লোকের আশ্রয়দাতা সঙ্গুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন; সেই সময়ে মাদারিপুর্ন আশ্রমের বার্ষিক মহোৎসব-সম্মেলনে যখন শতশত নরনারী—পূজার আসনে উপবিষ্ট আচার্য্যদেবকে পূজারতি ও ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিত এবং আচার্য্যদেব অবিরত মস্তক স্পর্শ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ দান ও শক্তি সঞ্চার করিতেন, তখন অতিবৃদ্ধ ঔষজেশ্বর বাবু যষ্টি ভর দিয়া কম্পিত দেহে আসিয়া আচার্য্যের পায়ে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক গদ্ গদ্ কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেন। উপস্থিত জনমণ্ডলী সে করুণ ভক্তি-দৃশ্য দেখিয়া মোহিত হইত। আচার্য্যদেবও পরম স্নেহ-প্রেমভরে তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক সাগ্রহে আশীর্ব্বাদ করিতেন।

ব্রহ্মচারীর জ্যেষ্ঠাগ্রজের স্বপুত্র ফরিদপুর জেলার সদরদি গ্রাম নিবাসী ঐবহারীলাল ঘোষ গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের অগ্রতম শিষ্য শ্রীধর

ঘোষের ভ্রাতা। তিনি শৈশবকাল হইতেই ব্রহ্মচারীকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং সাংক্ষাৎ মত উৎসাহ দিতেন। ৬বিহারী ঘোষের পাণ্ডিত্য ও তেজস্বিতার কথা পরবর্ত্তীকালে আচার্য্যদেবের মুখে বহুবার শুনিয়াছি। এইরূপে উক্ত অঞ্চলে ধার্মিক ও সাধনশীল যে সমস্ত ব্যক্তি ছিলেন, তাহাদের প্রায় সকলেই ব্রহ্মচারীর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, ব্রহ্মচারীও তাহাদের সহিত বিভিন্নভাবমূত্রে সংশ্লিষ্ট হইয়া তাহাদের কল্যাণ সাধন করিতেন।

এই সময়ে বাঙ্গালাদেশের পল্লীগ্রামে সর্বত্র হরিনাম সংকীৰ্ত্তন প্রচলিত ছিল, সন্ধ্যায় গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় নাম-সংকীৰ্ত্তন ও পদকীৰ্ত্তনের উৎসব লাগিয়া যাইত। নগর-সংকীৰ্ত্তন ও হরিলুট মহা-সমারোহে চলিত; আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই হরিনামে মাতিত। কীৰ্ত্তনীয়াদের যথেষ্ট আদর ও সম্মান ছিল। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনের সহিত জাতির মনোবৃত্তির কী শোচনীয় পরিবর্ত্তন! আজ গ্রামে প্রচারে বাই—হরি-সংকীৰ্ত্তনের দল খুঁজিয়া পাই না; যদি বা গায়ক এক আধজন পাই, খোল করতাল জুটানো দুষ্কর হইয়া পড়ে। সন্ধ্যা হইতেই অধিকাংশ গ্রাম নিস্তরু; মনে হয় যেন একটা মৃত্যুর করাল বিভীষিকা রাজত্ব করিতেছে। কোনো কোনো গ্রামে হয়তো আড্ডাধারীগণ তাস-দাবা-খেলার পৈশাচিক উল্লাসে সেই নিস্তরুতার শ্রোতে আলোড়ন জাগাইতেছে,—যেন নির্জ্জন শ্মশানক্ষেত্রে শিবাকুলের বিকট চীৎকার! উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ তো হরিনামে শ্রদ্ধা একেবারেই হারাইয়াছে; হরিনাম সংকীৰ্ত্তনকে অসভ্যতা ও অশোভনীয় ভাবে; এমন কি তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মনোবৃত্তিও হরিনাম-সংকীৰ্ত্তনের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

হরিনাম-সংকীৰ্ত্তন ব্রহ্মচারীর প্রিয়বস্তু ছিল। তিনি সাধারণতঃ স্বয়ং

কীৰ্ত্তন করিতেন না। কিন্তু কীৰ্ত্তনের আসরে স্থাপুর গায় অবস্থান করিতেন। প্রধান শিক্ষক বীরেন্দ্রবাবু কীৰ্ত্তন-প্রিয় ছিলেন, “বিনোদকে” না হইলে তাহার কীৰ্ত্তন জমিত না। এই কীৰ্ত্তনকে উপলক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মচারী তাঁর সংগঠন কার্য্যের ভিত্তি পত্তন করিতে ছিলেন। বহু ভক্ত এবং বালক ও যুবক এই কীৰ্ত্তনকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া তাঁহার সংগঠিত কাৰ্য্যে সহায়তা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাঁর ভবিষ্য লীলাসঙ্গী বালক ও যুবকগণ এই সময় হইতে তাঁর সহিত পরিচিত হইয়া ঘনিষ্ঠ হইতে আরম্ভ করে।

এই সময়ে যেসকল বালক ও যুবক তাঁর সহিত আসিয়া জুটিতে-ছিল, তার মধ্যে অনেকে বিপ্লববাদী ছিল। তাহারা ব্রহ্মচারীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিত এবং তাঁহাকে সখা, সুলভ ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার গায় আপনার বোধ করিত; ব্রহ্মচারীও তাহাদিগকে অন্তরের সহিত স্নেহ করিতেন ও তাহাদের কল্যাণ কামনা করিতেন। কর্ম্মজীবনে তাহারা ব্রহ্মচারীর সহিত বিযুক্ত হইয়া পড়িলেও পরবর্ত্তী জীবনে আচার্য্যদেব কথা-প্রসঙ্গে ইহাদের বিষয় পুনঃপুনঃ উল্লেখ পূর্ব্বক সঙ্ঘের প্রথম পরিকল্পনা ও কার্য্যপ্রবর্ত্তন কালে ইহারাই তাঁহার প্রধান সহকারী ছিল—তাহা বিবৃত করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন।

ব্রহ্মচারী এই সব বালক ও যুবকগণকে সর্বদা নৈতিক জীবন-গঠন-মূলক উপদেশ ও নির্দেশ দিতেন। ব্রহ্মচারী যখন বাজিতপুরে আশ্রম স্থাপনপূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করেন এবং ধীরে ধীরে ত্যাগী কাম্বীদল তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিতে থাকে, তখন বিপ্লববাদী দলের অনেকের মানসক্ষে “আনন্দমঠের সন্তানদলের” চিত্র ভাসিয়া উঠিত এবং অনেকে সত্য সত্যই আলোচনা করিত যে ব্রহ্মচারী যে সঙ্ঘ (Organisation) গড়িয়া তুলিতেছেন, তাহা হইবে নবযুগের



“আনন্দ মঠ”। কিন্তু সজ্জ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে যখন উহার কর্তৃপক্ষতি নতন ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল, তখন তাহাদের অনেকেই ঠিক ঠিক ভাবটা বুঝিতে না পারায় প্রথমতঃ মনঃক্ষুণ্ণ হন ; বহুবৎসর পরে আচার্যের মুখে সজ্জের জাতিগঠন-মূলক কার্যাবলীর রহস্য শুনিয়া বুঝিয়া তাহারা সান্ত্বনা পান।

ব্রহ্মচারীর ব্যক্তিত্বের রহস্য ছিল এই যে বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলেই তাঁর সংস্পর্শে আসিয়া এক মুহূর্ত্তেই ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িত এবং ব্রহ্মচারীর উদ্দিষ্ট কর্ম্মে যে যেদিক দিয়া যতটুকু পারে সহায়তা দান করিত। সকল মতের, সকল পথের, সকল বাদের লোকই তাঁর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া তাঁর কার্যে যোগ দিয়াছে এবং যার যতটুকু করিবার করিয়া দিয়া গিয়াছে। আজন্ম আজীবন সকলের সহিত তার যোগ, সকলকে নিয়াই তার কাজ ;—জাতিভেদ ছিল না, সম্প্রদায় ভেদ ছিল না, মত-ভেদ ছিল না। বৈষম্য ও পার্থক্য তো সর্বত্র আছে ; কিন্তু তিনি সর্বদা মিলনের ভিত্তি ও সূত্রগুলি অবলম্বন করিয়া সকলকে আকর্ষণ করিতেন। পরবর্ত্তী কালে আচার্য্যরূপে তিনি জাতিগঠন কার্যে—এই তত্ত্বই বিরাট আকারে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন ;—যথাস্থানে তাহা বিচার করিব।

# আচার্য্য ভাবের বিকাশ

ও

## সজ্জ-গঠনের সূত্রপাত

ব্রহ্মচারী বিনোদ আজন্ম আচার্য্য ; সে পরিচয় আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁর বাল্যকাল হইতেই পাইয়াছি। কিন্তু সর্ব-নিয়ন্তার বিশেষ বিধানে যেদিন তাহার দেহমানে ভাগবতী শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটিল এবং যুগাচার্য্যের আসনে স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ হইলেন, সেই আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও সিদ্ধিলাভের দিবস হইতে তিনি ধীরে ধীরে আচার্য্যভাবে বাহ্যতঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর নিয়মিত স্তবপাঠ, কীটন ইত্যাদি অবলম্বনে অল্পরোগী বালক, যুবকগণকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং তাহাদের জীবন গঠনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণপূর্বক আদেশ, উপদেশ ও নির্দেশ দান করিতে লাগিলেন। একদিকে মুষ্টিভিক্ষা ও সেবাকার্য্যাদি চলিতে লাগিল ; অপর দিকে কর্ম্মীগণকে এবং বালক ও যুবকগণকে সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, বৈরাগ্য প্রভৃতির আদর্শ, সাধনা, রীতিপদ্ধতির মধ্য দিয়া শিক্ষাদানপূর্বক ক্রমে ক্রমে গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। শত শত যুবক এই সময়ে তাঁহার সংশ্রবে আসে ; অবশ্য তন্মধ্যে অতি অল্প কয়েকজনই ত্যাগীর জীবন যাপন-পূর্বক তাঁহার কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিল ; কিন্তু ত্যাগীর জীবন বরণ না করিলেও অনেকেই পরবর্ত্তী কালে নানা সূত্রে নানাভাবে তাঁহার সজ্জের কার্য্যাবলীর সহিত যুক্ত হইয়া সহযোগিতা করিয়াছে।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত স্তবপাঠ ও কীর্তন হইত। খোল করতাল বাজাদি সহকারে “দিনমপি রজনী সায়াং প্রাতঃ। শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ। কালঃক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥ ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মুচ্যমতে। প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুরুঞ্ করণে ॥” ইত্যাদি শঙ্করাচার্য্য রচিত এই চর্পট পঞ্জরিকা স্তোত্রটী গীত হইত। “একং নিতং পূর্ণং সৰ্ব্বাধিষ্ঠানং” ইত্যাদি মহাদেবের স্তোত্রটী পাঠ হইত। তৎপরে নামকীর্তন হইত। কখনো “ওঁ জনার্দন মধুসূদন রাম,” কখনো “কৃষ্ণ গোবিন্দ মধুসূদন রাম নারায়ণ হরে”—নাম গান হইত। সকলে সমবেত কণ্ঠে কীর্তন করিত; ব্রহ্মচারী মহারাজও মধ্যে মধ্যে উহাতে কণ্ঠ সংযোগ করিতেন।

এই সময়ে আচার্য্যরূপে ব্রহ্মচারী মহারাজ কি ভাবে, কি উপাদানে তাঁর ভবিষ্য উত্তর-সাধকগণকে গঠন করিতেছিলেন তাহা জনৈক অনুরাগী বালকের\* ডায়েরী হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলেই সহজে বোধগম্য হইবে। শনিবার ও রবিবারেই বড় ছেলে আসিত। অগ্ন্যাগ্ন বারেও কতক ছেলে আসিত। ব্রহ্মচারী মহারাজ সকলকেই সমান আদরে উপদেশ ও নির্দেশ দিতেন বটে; কিন্তু তন্মধ্যে বাহারা তাহার ভবিষ্য লীলার সহায়তা করিবার জন্ত ত্যাগীর জীবন বরণপূর্বক আত্মোৎসর্গ করিবে, দর্শন মাত্রই তাহাদিগকে চিনিয়া অগ্ন্যাগ্ন সকলের সংসর্গ হইতে বাঁচাইয়া জলন্ত উপদেশ দ্বারা স্বীয় মনোমতভাবে গড়িয়া তুলিতেছিলেন :—

“শ্রীশ্রীযুগাচার্য্য সঙ্গ ও উপদেশায়ত”—বৈশাখ সন ১৩২৪, ইং ১৯১৭ খৃঃ।

.....“ভগবানের যে নাম তোমার খুব ভালো লাগে সেই নামের প্রথমে ‘ওঁ’কার যোগ করিয়া প্রতিদিন নিয়মিতভাবে

\*নিকুঞ্জ—পরবর্তীকালে-স্বামী আত্মানন্দজী

কিছু সময় জপ করিবে। সঙ্গে সঙ্গে সেই মূর্তিটীও ধ্যান করিবে। রাত্ৰিতে উঠিয়া জপধ্যান করিবে। ধ্যান করিতে বসিলে যদি নিজাতন্ত্রা আসে তবে কয়েক মিনিট বন্ধপদ্মাসন করিবে; তাহাতে ঘুম ও আলস্যজড়তা বিদূরিত হইবে।”

“নিজ আসনের সম্মুখে একটা সাদা বা সবুজ কাগজের গোলক রাখিবে এবং প্রত্যহ প্রাতে বন্ধ-পদ্মাসন করিয়া কিছু সময়ে নিষ্পন্দ, নিষ্পলকভাবে তৎপ্রতি তাকাইয়া থাকিবে। এই সময়ে নড়িলে ক্ষতি হয়; স্ততরাং শরীর যাহাতে না নড়ে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে। এই ভাবে কিছুদিন ট্রাটিক সাধন অভ্যাস করিবে।”

“বৃথা বাক্য বলিও না; বাজে আলাপ আলোচনায় যোগ দিও না; তাতে মন হাল্কা হয় ও শক্তি হ্রাস পায়। কথা বলার একটা নিয়ম করিয়া নিতে হয়। প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গে সঙ্গ করিয়া উঠিবে যে, আজ সমস্ত দিনে আমি এই কয়েকটা কথা বলিব। ইহার অতিরিক্ত কিছুতেই বলিব না। মধ্যো মধ্যো মৌনব্রত অবলম্বন করিতে হয়;— ইহাতে মানসিক শক্তির বৃদ্ধি হয়।”

“প্রত্যহ কিছু সময় মৃত্যু চিন্তা করিবে; বিচার করিবে তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? এ জগতে কতদিন থাকিবে? তোমার এই দেহ, জীবন, যৌবন—এর পরিণামই বা কি? এইভাবে প্রত্যহ স্বীয় দেহ এবং এই দৃশ্য জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া বৈরাগ্য আনয়ন করিবে। তাহাতে কুচিন্তা কুভাবনা, কোনো প্রকার পাপ প্রলোভন তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।”

\* \* \* \* \*

“বৈশাখের শুক্ল পক্ষ, জ্যেষ্ঠা-ধবলি : রাত্ৰি। আমমা মাঠ

অতিক্রম করিয়া আচার্য্যের সাধন-কুটীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ভক্তকণ্ঠ-গীত সঙ্গীতলহরী শুনিতে পাইলাম—

“এই কর হরি দীন দয়াময়,  
তোমায় আমায় যেন ভেদ নাহি রয়,  
যেমন জলেরি তরঙ্গ জলে কর লয়

চিদ্বন শ্রামসুন্দর।”

আচার্য্যের সাধন-কুটীরের একটা দিকে গৈরিক বজ্রাচ্ছাদিত একটা প্রকোষ্ঠ। তথায় বিস্তৃত অজিনাসনের সম্মুখে একখানি জলচৌকীর উপর ও দেওয়ালের চারিদিকে নানা দেবদেবীর ও মহাপুরুষদের ছবি। অপর দিকে ইটের উপর একখানি পুরু তক্তা। সকল ঋতুতে তাঁর এই একইভাবে কাটে। চাদরখানিই সম্মল; ঘরের ভিতরে বড় প্রকোষ্ঠটিতে পুরু পাটী পাতা। এখানে কীর্ত্তন হয় এবং আচার্য্যদেব সমবেত ভক্ত, অহুরাগী লোকজনের সহিত আলাপ এবং উপদেশ দান করেন। ইতস্ততঃ ছুঁচারিখানা পুস্তক ও ব্যায়াম-সঙ্গী এক জোড়া স্বরূহং মুদগর ছাড়া আসবাবের বাহুল্য নাই।

আমরা গৃহে প্রবেশ করিয়া বসিলাম। কীর্ত্তন ক্রমে ক্রমে খুব জমিয়া উঠিল। রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত এইভাবে কীর্ত্তন চলিবার পর আচার্য্যদেব ভাব-জগৎ হইতে বাস্তব জগতে নামিয়া আসিলেন। বহু স্কুল কলেজের ছাত্র। শনিবার রবিবার তাহার অধিক সংখ্যায় যোগ দিয়া থাকে। কীর্ত্তন অবসানে ভক্তগণ একে একে বিদায় নিবার পর আচার্য্যদেব আমাকে আহ্বান করিয়া কাছে বসাইলেন এবং স্নেহসিক্তকণ্ঠে বলিলেন—

“যে ভাবে চলিতে বলিয়াছি, ঠিক সেই ভাবেই চলো। সর্ব্বদা নিজের ভিতরে একটা স্বাতন্ত্র্য বোধ চাই। জীবনের লক্ষ্য কি? গন্তব্যস্থল কোথায়? তাহা চিন্তা করিবে। প্রতি নিয়ত স্মরণ

রাখিবে যে তোমার জীবনের একটা মহান উদ্দেশ্য আছে, গতানুগতিক ভাবে গড়ালিকা প্রবাহে ভাসিয়া যাইবার জন্ত তোমাদের জীবন নয়। তোমাদের জীবন দ্বারা বিশ্ব-নিয়ন্ত্রার এক মহান উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। তাই সেই জীবনকে গড়িয়া তুলিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা চাই। সর্বদা জীবনের মহোচ্চ আদর্শের কথা স্মরণ থাকিলে জীবন গঠনের প্রচেষ্টা প্রবল হইতে থাকিবে। এখানে মাঝে মাঝে আসিও যথাসাধ্য সাহায্য করা যাইবে।”

২১শে অগ্রহায়ণ, সন ১৩২৫, ইং ১৯১৮ খৃঃ

বহুদিন হইতে আচার্য্যের দর্শনলাভের আকাজক্ষায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছি। মনের মধ্যে অসংখ্য সংশয়-সমস্তা; মীমাংসা না হইলে চলে না; স্কুলের ছুটির পর আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইলাম।..... সম্মুখে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার পর বলিলেন—“তোমরা কাহারো সহিত বন্ধুতা, পরিহাস বা আমোদ-প্রমোদ ছলেও এক সঙ্গে বসিয়া এক পাত্রে আহাৰ করিবে না; কারো উচ্ছিষ্ট কদাচ গ্রহণ করিবে না; ভগবানে নিবেদন করিয়া প্রসাদ-স্বরূপ আহাৰ্য্য গ্রহণ করিবে। তাহা হইলে আহাৰে সংযম প্রতিষ্ঠিত হইবে; দেহ মন স্বস্থ, শান্ত, সংযত হইবে।”

“কারো সহিত এক শয্যায় শয়ন করিবে না; শয্যার অভাবে বসং বসিয়া, দাড়াইয়া, বেড়াইয়া রাজি কাটাইয়া দিবে, তথাপি এই নিয়ম ব্যতিক্রম করিবে না। কোনো জ্বীলোকের মুখের দিকে চাহিয়া কথা বলিবে না। দৃষ্টি সর্বদা নীচের দিকে রাখিয়া কথা বলিবে। রাস্তায় চলিবার সময়ে, কাজকর্ম করিবার সময়ে দৃষ্টি সর্বদা নীচের দিকে রাখিবে; এইরূপে দৃষ্টি-সংযমে অভ্যস্ত হইলে বহু পাপ-প্রলোভনের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। আমরা প্রতিনিয়ত যে ব্যক্তি বা

বস্তু দেখি তাঁর একটা ছাপ অজ্ঞাতসারেও আমাদের মনের উপরে পড়ে।.....দৃষ্টি-সংঘের দ্বারা বিষয়ের এই সংস্পর্শ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া সাধকগণ ভোগকাজ্জ্বার মূল উৎপাটনে সমর্থ হন। চারা গাছকে যেমন বেড়া দিয়ে রক্ষা করিতে হয়, শিশু-মনকে সংঘের বেড়া দিয়া রক্ষা না করিলে, পরে উদ্ধাম প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া আত্মরক্ষার সামর্থ্য জন্মে না।.....তোমাদের ছাত্রজীবনে পড়াশুনা মনকে অন্ততঃ দশ ঘণ্টা ডুবাইয়া রাখিবে।”

১০ই পৌষ, সন ১৩২৫, ইং ১৯১৯ খৃঃ

অপরাক্ষ; আচার্য্যাদেব সাধন-কুটারের বহিঃ-প্রকোষ্ঠে বসিয়া আছেন। বহু সংশয় সমস্তা প্রাণে লইয়া প্রবেশ করিলাম। সংশয়, সন্দেহ জিজ্ঞাসা—মনে থাকে, কোনো দিন উত্থাপনে সাহস পাই নাই, প্রয়োজনও হয় না। প্রাণের জিজ্ঞাসাগুলি টানিয়া বাহির করিয়া তিনি মৌমাংসা করিয়া দিতেন। তজ্জন্ত তিনি যে সর্বদর্শী, অন্তর্দর্শী—এই বোধ এত সহজে ও অজ্ঞাতসারে আসিয়া গিয়াছিল যে মনে কোনো দিনই এ প্রশ্ন জাগিবার অবসরই পায় নাই যে তিনি আমার প্রাণের কথা জানেন কি না? তিনি সবই জানেন; স্ততরাং কিছুই জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই; এই ভাবই অন্তরে স্থায়ী হইয়া গিয়াছিল! আচার্য্য সন্নেহে বলিলেন :—

“আলস্তই সাধনের পরম শত্রু, সাধনার সবচেয়ে বড় বিঘ্ন; কিছুতেই উহাকে প্রত্নয় দিবে না। আলস্ত, নিদ্রা, তন্দ্রা, জড়তা ও দীর্ঘহুত্বতাকে একবার প্রত্নয় দিলে, মুহূর্ত্তের মধ্যে উহার সাধনশক্তিকে নিশ্চিন্ত করিয়া ফেলে।.....সাধককে নিরলস হইতে হইবে। সর্বদা সাধনার তীব্রতা রক্ষা করিতে হইবে; না হইলে জীবনের উন্নতির আশা স্বদূর্ব-পর্যাহত।...সাধন-জীবনের প্রথমে চেষ্টা-যত্নের যে তীব্রতা

দেখা যায়, কিছুদিন পরে তাহা চলিয়া গিয়া শিথিলতা ও উদ্যম, উৎসাহের অভাব দেখা দেয়। সাধনা—নিয়ম-প্রণালীর অনুসরণ—তখন নীরস ও তিক্ত বোধ হইতে থাকে। এই সময়ে খুব সতর্ক হইয়া বিচার-বুদ্ধিকে আশ্রয়পূর্বক জোর করিয়া সাধনপথে চলিয়া নিয়ম-নিষ্ঠাকে অটুট রাখিতে হয়। কিছুদিন সাবধান হইয়া চলিতে পারিলে পর প্রাণমনে সরস সহজ ভাব ফিরিয়া আসে। ধৈর্য, স্বৈর্য, সহিষ্ণুতাই মহাশক্তি; উদ্যম, উৎসাহ, অধ্যবসায়ই—মহামিত্র। চাই দৃঢ় সঙ্কল্প, অটুট প্রতিজ্ঞা।

\* \* \* \*

শীতকালে হয়তো শীতের জগ্ৰ উঠিতে ইচ্ছা করে না; আমার এক দিন এরূপ হইয়াছিল। তখনি প্রতিজ্ঞা করিলাম—আর কিছুই গায়ে দিব না। ৪।৫ হাজার বার মুণ্ডর ভাজিয়া, ডন দিয়া রক্ত গরম করিয়া নিতাম। সেদিন হইতে মাজায় কাপড় বাধিয়া, গায়ে কিছু না দিয়া, শুধু চোকির উপর শুইয়া থাকিতাম; শীতের বাবাও কাছে ঘেসিতে পারে নি।

\* \* \* \*

চারি ঘণ্টার বেশী ঘুমাইবে না। যে বত অধিক ঘুমাইবে, আলস্য জড়তা তাহাকে তত ঘিরিয়া ধরিবে। অতিরিক্ত নিদ্রায় বীৰ্য্যক্ষয়, কর্মশক্তি ও কর্মপ্রবণতা নষ্ট হয়।”

জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ সন, ইং ১৯১৯, মে

“.....এবার পরীক্ষার বৎসর খুব পড়বে; ভাল result করা চাই। শীগ্গীর পাশ করে ফেলো। আর কতদিন ডুবে থাকবে? একটা বছর loss হলে আর একটা বছর আটকে থাকবে। তোমাদের সামুনে কত বড় দারিদ্র্য!



..... একদিকে পড়াশুনা, অন্যদিকে জীবন গঠনের দায়িত্ব ও সাধনা;—দুটো জিনিষ পাশাপাশি সমান চলবে। একটা জীবনকে গড়ে তোলা কি সহজ কথা! এজগৎ যথেষ্ট চেষ্টা যত্ন চাই। বিনা চেষ্টায়, শুধু উপদেশ শুনে গেলে লাভ নেই!..... যার যত চেষ্টা-যত্ন-উদ্যম বেশী তার জীবনেই তত তাড়াতাড়ি উন্নতি হয়।...শৈশবে আমার সাহায্য করবার কেউ ছিল না; কোনো বই পড়িনি; সবই নিজে নিজে সমাধান করে নিতে হয়েছে। সৰ্ব্বদা একটানা তন্ময়ভাবে থাকতাম, বাইরের জগতের কোনো জ্ঞান থাকতো না! হয়তো পড়তে বসেছি, বই হাতে রয়েছে, আলো জ্বলছে! কিন্তু কোনো জ্ঞান নেই। সমস্ত রাত্ কেটে গেছে। ভোরবেলা কেউ এসে ডাক দিলে চৈতন্য সঞ্চার হয়েছে।.....

একি একদিনে হয়? এর জন্ত কত কষ্ট করতে হয়েছে; কত খাটুতে হয়েছে। চেষ্টা যত্ন থাকলে সবই হয়। 'চেষ্টা, যত্ন, উদ্যম, অধ্যবসায় যথানে, সফলতা সেখানে স্থানিচিত। জগতে কারো দিকে তাকাতে নেই! যে যা বলে বলুক, কোনো দিকে ভ্রক্ষেপ করবে না। যা সত্য বলে জান্বে তা' সৰ্ব্বদা ধরে থাকবে। পৃথিবী-শুদ্ধ লোকও যদি বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এক চুলও টলবে না। যা মিথ্যা বুঝবে তা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করবে। আমি যা করবো না, জগতে কে আছে যে আমাকে দিয়ে তা করাবে?

সঙ্কল্পের জোর চাই। ভিতরে সঙ্কল্প যত দৃঢ় হবে, বাইরে বিরুদ্ধ বাদীর বিরুদ্ধতাও তত শিথিল হয়ে আসবে। যে যা বলে বলুক না কেন, সৰ্ব্বদা মুখটা বুজে নিজের কাজ করে যাবে। এমনি ভাবে কিছুদিন চলতে থাকলে আপনা আপনি সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এ জগতে যাদের অতি আপনার জন মনে কর, তারা তোমার জীবনের ভার

নেবে না। তোমার জীবনের দায়িত্ব তোমাকেই বহন করতে হবে ; সুতরাং অস্ত্রের কথায় কাণ দিলে চলবে কেন ? এজন্য বড় বাধা-বিলম্ব আশ্রক না কেন, তোমাকে তা বরণ করতে হবে

খুব আত্মবিশ্বাস চাই। তুমি যে কিছু করতে পার, তোমার অনেক কিছু করবার শক্তি আছে ;—এ বিশ্বাস দৃঢ় থাকা চাই। জগতে অসম্ভব বলে কিছু আছে কি ? আজ যা' অসম্ভব মনে হচ্ছে, কাল বা দুদিন পরে তা' অসম্ভব থাকবে না !.....নিয়ত বিশ্বাস রাখবে অনন্ত শক্তি তোমাদের আছে ; তোমরা যখন যা ইচ্ছা তাই করতে পার।

এই আত্মবিশ্বাস কি করে আসে ? প্রথমে ছোটো খাটো বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করে তা' অটুট ভাবে পালন করতে হয়। আমি এতদ্ব্যন্থ ঘুমাবো, এই পরিমাণ এই এই দ্রব্য খাবো, এতটার সময়ে উঠবো, এত হাজার জপ করবো, এই কয়েকটি কথা বলবো, অমুক বারে কথা বলবো না ;—এমনি সব প্রতিজ্ঞা করে তা' পালন করতে পারলে, তখন আত্ম-শক্তির উপর বিশ্বাস আসবে।.....আত্মবিশ্বাসই জীবন গঠনের মূল উপাদান। যে আত্মবিশ্বাস বলে বলীয়ান সেইই প্রকৃত বীর। যথার্থ শক্তিশালী।

আর চাই—উদগ্র স্বাতন্ত্র্য-বোধ ( Speciality )। Speciality is Chastity. লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যেও তোমার একটা স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে ;—এই বোধ সর্বদা জাগ্রত রেখে চলবে। এই স্বাতন্ত্র্য-বোধই তোমাদের দুর্ভেদ্য বর্ধ। বাদের জীবনের কোন আদর্শ নেই, উদ্দেশ্য নেই, বারা পবিত্র জীবন বাপন ও ইন্দ্রিয় সংযমের চেষ্টা করে না, তাদের জীবনের সহিত কি তোমাদের জীবন এক হতে পারে ?...তোমাদের জীবনের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, একটা

বিশেষ আদর্শ নিয়ে চলছে;—এ বোধ নিয়ত জলন্ত রাখতে হবে। জীবন-গঠনে আত্মবিশ্বাস যেমন চাই, আত্মমর্যাদা-বোধও তেমন চাই।... যাদের সঙ্গে মিশলে তোমার ভাব নষ্ট হয়, তাদের সঙ্গে কদাচ মিশবে না, কদাচ তাদের সংস্পর্শে যাবে না। সপ্তাহের মধ্যে একটি রাত্রি জপ ধ্যান করে কাটাতে হবে। তাও যদি সম্ভব না হয় তবে রাত্রি একটায় সময় উঠে ভোর পর্যন্ত জপধ্যান করবে। গভীর রাত্রিই ধ্যানের সময়; কোন লাভকেরই ঐ সময়ে ঘুমান উচিত নয়।...

লোকে বিতৈশ্বর্ষ্যের জন্ত, সাংসারিক উন্নতির জন্ত কত খাটে; ছেলেরা পরীক্ষায় পাশ করিবার জন্ত কত পরিশ্রম করে; আর ধর্মজীবনে কি বিনা পরিশ্রমেই সব কিছুই হয়ে যাবে?”

বৈশাখ, সন ১৩২৬, ইং ১৯১২

“.....একটা আসন অভ্যাস করবে; দিনের মধ্যে একটা সময় নির্দিষ্ট করে নেবে; প্রতিদিন সেই সময়ে বসবে। অল্প সময়ে সুবিধা না হলে শয়নের সময়ে বা ঘুম থেকে জেগে বিছানায় বসেও করতে পার। ধীরে ধীরে ৩৪ ঘণ্টা আসনে বসে থাকা অভ্যাস করে নিতে হবে। এতে আলস্য জড়তা দূর হবে, উদ্যম উৎসাহ বাড়বে, শরীর মন সজীব সতেজ হবে।.....কুচিন্তা কুভাবনাকে অন্তরে কদাচ স্থান দিও না। যদি কদাচ মনে কুচিন্তা আসে ১০৮ বার নাম জপ করে প্রায়শ্চিত্ত করবে। সঙ্কল্প করবে—কুচিন্তা কিছুতেই আসতে দেবো না।.....মৃত্যুচিন্তা যদি সর্বদা জাগ্রত রাখা যায়, তবে কুচিন্তা কদাচ আসতে পারে না। শরীরের নখরতা, জগতের অনিত্যতা বিষয়ে বিচার জাগ্রত থাকলে কুচিন্তার মূল নষ্ট হয়ে যায়।...সঙ্কল্প চাই—ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, বুকের সঙ্কল্প, প্রহ্লাদের দৃঢ়তার কথা চিন্তা করবে। যা করবো তা করবোই, কিছুতেই পেছ পা হবো না; আর যা করবো

না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একত্র হলেও তা আমাদের দিয়ে করাতে পারবে না;—  
এমনি দৃঢ়তা চাই। বুকের সঙ্কল্পের কথা স্বরণ কর :—

“শরীর শুকায় যাক্

জক্ অস্থি মাংস যাক্ রেণু রেণু হয়ে,

সঙ্কল্পের এ আসন তাজিব না কভু

বহু কল্প সূচক্ৰান্ত বোধি নাহি লভি।”

যখন পড়বে তখন পড়বেই; যখন জপধ্যান করবে, তখন জপধ্যানই করবে; অন্য কোনো চিন্তাকে আসতে দেবে না। প্রথম প্রথম অন্য দিকে গেলেও পুনঃ পুনঃ ফিরিয়ে এনে অভীষ্ট বিষয়ে লাগাতে হবে। যখন যে কাজ করবে তাতে সমস্ত প্রাণমন ডুবিয়ে দেবে। যদি না পারো তবে বুঝতে হবে মন তোমার দাস নয়, তুমিই মনের দাস।...  
ত্যাগ সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্য্যই—জীবনের বনিয়াদ। এই চারিটি জিনিস যার আছে, তার সবই আছে। যার ইহা নেই, তার কিছুই নেই।  
...রাত্রিতে একবার ঘুম ভাঙলে আর ঘুমাতে না। উঠে বসে জপধ্যান করবে। জপের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়াবে। নাম জপের দ্বারা অন্তরের পাপ তাপ, কলুষ কালিমা দূর হয়। সূর্য্যাকিরণ যেখানে, সেখানে কি অন্ধকার থাকতে পারে? কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা **বীৰ্য্যধারণ ও ইন্দ্রিয় সংযম**। এরই জন্ত যত কিছু সাধন ভজন।”

শ্রাবণ, সন ১৩২৬, ইং ১৯১২

“..... জীবনে যেটি ধরবো, সেটিকে সফল না করে নিবৃত্ত হবো না;—এ যাদের পণ, জীবনে তারাই বড় হয়। জীবনে অনেক বড় কাজ করতে হবে; বৃহত্তর ও মহত্তর দায়িত্ব পড়ে আছে। সময় খুব কম।.....কয়দিনের জীবন? কখন মৃত্যু আসবে কে জানে? কয়দিনের স্বাস্থ্য? একটু সময়ও যেন নষ্ট না হয়, একটি নিমেষও যেন বৃথা না

বাঘ।.....শুকভাব ও তিক্তভাব অনেক সময়ে আসে। ক্ষুদ্র তিলের মত একটু সস্তাব ও সং-সংস্কার; চারিদিকে বিরুদ্ধ ভাব, বিরুদ্ধ আব-হাওয়া; সাধক-জীবনের ভীষণ পরীক্ষা।.....একুপ পরীক্ষায় দমে যেয়োনা। বীরের মত সানন্দে লড়াই করবে। নিয়ম-নিষ্ঠাই এইসব অনভিপ্রেত ভাব থেকে তোমাকে রক্ষা করবে।.....নিজেকে ছোট ভাবতে নেই। এসব আদর্শ যদি তোমাদের জ্ঞান না হয়, তবে কাদের জ্ঞান? তোমাদের মত ছেলে দেশে কয়জন আছে? এমনি ভাবে জীবন গঠনের জ্ঞান কয়জন struggle করছে?...জীবনে বাড়বাগ্না বিপদাপদ আসেই; বীর যে, সে তাতে ক্রক্ষেপ করে না।”

শ্রাবণ, ১৩২৬ সন, ইং ১৯১২

“প্রহ্লাদের দৃঢ়তা, শঙ্করের জ্ঞান, শ্রীচৈতন্যের প্রেম, বুদ্ধের ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা চিন্তা করবে। ত্যাগেই সুখ, ত্যাগেই শাস্তি, ত্যাগেই আনন্দ; ভোগাকাজ্জা যেখানে, সেখানেই অসুখ, অশাস্তি।..... ভারতবর্ষ ত্যাগীর দেশ, ধর্মের রাজ্য; ভারতবাসী অমৃতের সন্তান! তাকে আবার স্বীয় আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সমগ্র দেশময় ত্যাগের আব-হাওয়া, নৈতিক আব-হাওয়া সৃষ্টি করতে হবে। ত্যাগীর দল চাই, তাদেরই উন্নত আদর্শে, তাদেরই সাধনা ও তপস্যায় দেশের ভোগ-পঙ্কিল আব-হাওয়া শুদ্ধ পবিত্র হবে।.....তখন সেই নূতন সাধনার ভিতর দিয়ে জন্ম নেবে—আদর্শবান, নীতি-পরায়ণ, স্বধর্মনিষ্ঠ খাঁটি ভারতীয় জাতি।”

ব্রহ্মচারীর জর্নৈক অমরক সন্তানের ডায়েরী হইতে উদ্ধৃত উপরোক্ত উপদেশাবলী আলোচনা করিলে আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাই :—

(১) তিনি স্বীয় সনাতন আদর্শে প্রতিষ্ঠিত, স্বধর্মনিষ্ঠ ভারতীয় (আর্য্য হিন্দু) জাতির গঠন চাহিতেছেন।

(২) উক্ত কার্য-সাধনের জন্ত—সমাজ ও জাতির সেবায় উৎসর্গিত-জীবন একদল ত্যাগী কর্মী চাহিতেছেন।

(৩) এই ত্যাগী কর্মীগণকে স্বীয় আদর্শে—ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্যের ভিত্তিতে গঠনপূর্বক সমাজ ও জাতির সম্মুখে স্থাপন করিতে চাহিতেছেন।

(৪) হুনিপুণ শিল্পীর হায়ে অসীম ধৈর্য সহকারে অবিরত উৎসাহ, উপদেশ ও নির্দেশ দিয়া তাহাদিগকে মনোমত ভাবে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন।

(৫) এই ত্যাগী কর্মীগণের দ্বারা তিনি যে মহান্ কার্য সম্পাদন করাইয়া নিবেন—তার আভাস ও ইঙ্গিত তিনি তাদের নিকট ধরিয়া দিতেছেন।

(৬) রিপু দমন ও ইন্দ্রিয়-সংযম ও বীর্ঘ্য-ধারণই যে সকল প্রকার সাধন ভজনের উদ্দেশ্য এবং ধার্মিক ও মহান্ জীবনের ভিত্তি—তাহাই শিক্ষা দান করিতেছেন।

(৭) তিনি যে ভগবন্নির্দিষ্ট আচার্য্য; সমাজ ও জাতির—তথা জগতের কল্যাণকর বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত আবির্ভূত;—সেই ভাবের কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছেন।

বস্তুতঃ তিনি আজন্ম আচার্য্য-ভাবে ভাবিত থাকিলেও, এই সময় হইতে তাঁর জীবনে আচার্য্য-ভাবের বিশেষ প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছিল।

—

# ধর্মচক্র ও কর্মচক্রের প্রেরণা

ও

## জন-সেবার আদর্শ বিস্তার

আলৌকিক ব্রহ্মচারীর সিদ্ধপীঠে সমাধিস্থ সত্যায় ভগবন্নির্দেশ ও যুগনিয়ন্ত্রী শক্তির প্রেরণা কেন্দ্রীভূত হওয়ার পর তাঁহার হৃদয়ে জীবপ্রেম-প্রবাহ উদ্বেল হইয়া উঠিল। সে প্রেমে জাতি-বর্ণ-ধর্ম আভিজাত্যের গাণ্ডী ভাঙিয়া সমগ্র জগৎ প্রাবিত করিতে চাহিতেছিল।

কালবৈশাখীর বঙ্কর পূর্বে যেমন বিশ্ব-প্রকৃতির একটা স্তম্ভভূত ভাব লক্ষিত হয় ; সিদ্ধিলাভের পর হইতে কয়েকটা বৎসর ব্রহ্মচারীর হৃদয়ের উদ্বেল করুণারাগি তেমনি অন্তরে অন্তরে গুহায় আবদ্ধ নিব্বারের জলরাশির স্থায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল। ব্রহ্মচারী বাহ্যতঃ যেমনি ধীর, স্থির, শাস্ত, তেমনই ভাবে অবস্থিত রইলেন। কোন পথে, কী অবলম্বনে, কিরূপ পদ্ধতিতে তাঁর এই জীব-প্রেম-ধারা প্রবাহিত হইবে—তার জন্ম সময়ের অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁর দেহ-মনোবুদ্ধি তখন যুগনিয়ন্ত্রী মহাশক্তির হস্তে যন্ত্ররূপ। পরবর্তীকালে সজ্ঞ-সন্তানগণের কোনো কোনো অনভিপ্রেত মানসিক অবস্থায় তিনি হৃদয় দিয়া বলিভেন—“জন্মাবধি আমি নিজের ইচ্ছায় কোনদিন চলিনি ; কিছুই করিמי ; এই সঙ্ঘ তাঁরই ইচ্ছার স্রষ্টি ; তাঁরই আদেশ ইজিত ভিন্ন কিছুই করা হয় না ; আমার ইচ্ছায় যদি এসব হয়ে থাকে, এখনি ধ্বংস হয়ে যাক ; আর যদি সর্ব-

নিয়ন্তার ইচ্ছায় হয়ে থাকে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কোনো ব্যক্তি বা শক্তি নেই যে এর কেশাণ্ড স্পর্শ করতে পারে।” পরবর্তীকালে একবার দারুণ গ্রীষ্মে গয়া, কাশী, বিজ্ঞাচল প্রভৃতি স্থানে কার্যোপলক্ষ্যে ছুটাছুটি করিবার ফলে তাঁহার শরীরে কতকগুলি বিস্ফোটক উৎপন্ন হয় ; তখন ৬পূরীধামে রথযাত্রার সেবাকার্য্য ও বাসিক উৎসব ও সম্মেলন ; প্রাতি বৎসর ঐ সময়ে তিনি তথায় উপস্থিত থাকিতেন । জ্বরে তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া শয্যাশায়ী-প্রায় হইয়া থাকলে আমরা এবং চিকিৎসকগণ সকলেই গুরুতর আপত্তি করিলাম, তিনিও প্রথম যেন আমাদের মতেই মত দিলেন । কিন্তু পরদিনই অকস্মাৎ এই অবস্থায় সদলবলে পুরী রওনা হইলেন । তথায় এক সপ্তাহ বাবৎ নিদারুণ পরিশ্রম ও অনিয়ম চলিল । শরীরের অবস্থা দিনের পর দিন ভয়াবহ ; তিনি কিন্তু সঙ্কল্প বলে হাজার হাজার যাত্রী ও কর্ম্মী লইয়া দিবারাত্রি নানাবিধ কার্য্যে পরিশ্রম করিলেন । পরে যখন কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন তিনি সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী, জ্বরে প্রায় সংজাহীন ; সমস্ত বিস্ফোটকগুলির বিষ কেন্দ্রীভূত হইয়া পিঠে শিরদাঁড়ার উপর এক প্রকাণ্ড পৃষ্ঠত্রণ উৎপন্ন হইয়াছে । তখন আমরা চিকিৎসকের নিষেধ বাক্য উল্লেখ-পূর্ব্বক পুরীধামে যাওয়া উচিত হয় নাই এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—“যেতে তো ইচ্ছা ছিল না । আর সে অবস্থায় কেউ কখনো যায় না ; কিন্তু না যেয়ে তো পারলাম না ; গলায় যেন বেত দিয়ে টেনে নিয়ে গেল ।”

যুগাচার্য্য ব্রহ্মচারীর ভাগবত জীবনের রহস্য এইখানে । এই রহস্যটির প্রাতি মনোযোগ করিলে আমরা তার মানব-কল্যাণমূলক—“কর্ম্মচক্র ও ধর্ম্মচক্র”র তাৎপর্য্য ধরিতে ও বুঝিতে পারিব । মানব



—যত বড় সাধক বা যোগী হউক না কেন—কাজ করে—স্বীয় শুদ্ধ মনোবুদ্ধির প্রেরণায় বা সদগুরুর সাক্ষাৎ আদেশ-নির্দেশে। কিন্তু ব্রহ্মচারীর জায় যুগমানবগণের সৃষ্ট কর্মচক্র—তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; উহা ভগবদ্বিনির্দেশের ও ভাগবতী শক্তিরই নিজস্ব অবদান।

ঐশী বিধানক্রমে ব্রহ্মচারীর অন্তরে উদ্ভেল ভাগবতী করুণাধারা—জীবসেবার ধারা ধরিয়া প্রথম আত্মপ্রকাশ করিল। তাহার “আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও জন-সেবার আদর্শ বিস্তারের” মধ্য দিয়া তাহা প্রথমে লক্ষিত হইয়াছিল।

### জনসেবার কার্য্যারম্ভ

সন ১৩২৬ সালে ( ১৯১৮ খৃঃ ) আশ্বিন মাসে এক ভয়ঙ্কর বাতাবর্ষ সমগ্র পূর্ববঙ্গের উপর দিয়া বহিয়া যায়। লোকের দুঃখবস্থা অবর্ণনীয় হইয়া উঠে। তখন ব্রহ্মচারী মহারাজ তদীয় অমুগত সেবকদলসহ সেবাকার্য্যে অগ্রসর হন। মাদারিপুরের ( ফরিদপুর ) তদানীন্তন জননেতা সুরেন্দ্রনাথ বিখাস প্রমুখ ব্যক্তিগণের চেষ্টায় গঠিত রিলিফ কমিটির সহিত সহযোগিতায় এই সেবাকার্য্যের পত্তন হয়। কলিকাতায় ব্যোমকেশ চক্রবর্তী প্রমুখ নেতৃবর্গের উদ্যোগে গঠিত East Bengal Cyclone Relief Committee—”র সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হয়। বহু যুবক কর্ম্মী এই সেবাকার্য্যে ব্রহ্মচারীর সহিত যোগদান করিয়াছিল।

এই ঝটিকা সেবাকার্য্যের মধ্য দিয়া ব্রহ্মচারীমহারাজের অভীষ্ট জন-সেবার প্রেরণা একদিকে যেমন উৎসাহী যুবকদিগের প্রাণে কর্মশক্তি জাগাইয়া তুলিল, তেমনি অন্য দিকে ফরিদপুর জেলার তথা পূর্ববঙ্গের সর্বত্র ব্রহ্মচারীমহারাজের খ্যাতি পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। এই

সেবাকার্যের পরে সন ১৩২৬ সালের শেষ ভাগে (১৯১৯ খৃঃ) উক্ত স্বদেশী বাবু এবং অক্সাণ্ড বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উদ্যোগে ও আগ্রহে “**মাদানিপুর সেবাশ্রম**” স্থাপিত হয়। জৈনিক ত্যাগী সেবক স্থানীয় উৎসাহী বালক ও যুবকগণের সহায়তায় মুষ্টি শিক্ষা ও চান্দা আদায়, দরিদ্রের ও দুঃস্থের সাহায্য, রোগীর সেবা, স্বজন-পরিত্যক্ত মৃতের সংস্কার প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্য করিতে থাকে।

১৯২০ খৃঃ জুলাই (সন ১৩২৭) “বাজিতপুর সেবাশ্রমের” জন্ত অর্থ সংগ্রহার্থ দুইজন সেবক কর্মী\* খুলনা সহরে আসিয়া স্থানীয় জননেতা—উকীল জনগেন্দ্র নাথ সেনের গৃহে অবস্থান করিতে ছিলেন, তখন উকীল শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের গৃহ-শিক্ষক দীর্ঘকাল রোগে শয্যাগত জানিতে পারিয়া উক্ত কর্মী দুইজন তাহার সেবা-শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে! জ্যোতিষবাবুর সম্মতিক্রমে কিছুকাল সেবা শুশ্রূষার পর রোগীটি প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু জ্যোতিষ বাবু যুবক কর্মী দুইটির অক্সাণ্ড সেবা-নৈপুণ্যে অতিমাত্র আকৃষ্ট হন। তাহাদের কণ্ঠে গীত—“দিনমপি রজনী সাযং প্রাতঃ শিশির বসন্তো পুনরায়াতঃ। কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যাযু স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ুঃ। ভজ গোবিন্দং” ইত্যাদি বৈরাগ্যমূলক গীতি শুনিয়া ও ধর্ম্মালোচনা করিয়া শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তিলাভ করেন। তিনি সানন্দে সহরের যাবতীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত উহাদের পরিচয় করাইয়া দেন।

আলাপ, আলোচনা ও আদর্শে মগ্ন হইয়া সকলে খুলনাতে একটি সেবাশ্রম স্থাপনের প্রস্তাব করেন। সকলের অহুমোদনে এক জনসভায় “**খুলনা সেবাশ্রম কমিটি**” গঠিত হইয়া সেবাশ্রম স্থাপিত হয়।

\* কুমুদ ও মধু—বর্তমানে শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী ও স্বামী যোগানন্দজী।

দুইজন সেবক কর্মী উক্ত আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত ও জ্যোতিষবাবু সম্পাদক ও অভিভাবকস্বরূপ থাকেন। অবশ্য আশ্রম স্থাপনের অল্পমতি ব্রহ্মচারী মহারাজের নিকট হইতে লওয়া হইয়াছিল। তখন সাময়িক ভাবে আশ্রমটি স্থানীয় ধর্মসভাগৃহে অবস্থিত রহিল। ১৯২০ ও ১৯২১ খৃঃ— (সন ১৩২৬ ও ১৩২৭ সাল) এই দুইটি বৎসর সেবাশ্রম সেখানেই ছিল।

মুষ্টিভিক্ষা ও চাঁদা সংগ্রহপূর্বক দুঃস্থদরিদ্রের সাহায্য, রোগীর শুশ্রূষা, আত্মীয়-স্বজন-হীন মৃতের সংকার প্রভৃতি জনহিতকর কার্য চলিতে থাকে। সহরের একদল স্কুল ও কলেজের ছাত্র উৎসাহের সহিত আশ্রমের কার্য পরিচালনায় সহায়তা করিতে থাকে। উহারা আশ্রমে অহুষ্টিত দৈনন্দিন সাক্ষ্য উপাসনাতে অনেক সময়ে যোগদান করিত। খোলকরত্নালাদি সংযোগে “দিনমপি রজনী ইত্যাদি” চপটপঞ্জরিকাস্তোত্র, “ভবসাগর-তারণ-কারণ হে” ইত্যাদি গুরুবন্দনা ও “অজ্ঞান তিমিরাক্ত ইত্যাদি” গুরুপ্রণাম মন্ত্র এবং “একং নিত্যং পূর্ণং ইত্যাদি” মহাদেব স্তোত্র সমবেত কর্তে গীত হইত।

### কলিকাতার নেতৃবৃন্দের সহিত পরিচয় ও প্রচার

এইরূপে ব্রহ্মচারী মহারাজের কর্মচক্রের পরিধি বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিল। তিনি কখনো মাদারিপুর, কখনো বাজিতপুর, কখনো খুলনা, কখনো বা কলিকাতা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে অবস্থানপূর্বক কার্য পরিদর্শন, কর্মীগণকে উৎসাহদান, কর্মীগণের হৃদয়ে স্বীয় ভাব ও আদর্শের প্রেরণা সঞ্চার এবং সেবাকার্যের জন্ত অর্থ সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতেছিলেন। এই সময়ে তিনি এক আধজন সহকারী সঙ্গে লইয়া পরিচিত লোকের গৃহে অবস্থানপূর্বক কলিকাতার উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ ও নেতৃবৃন্দের সহিত স্বীয় পরিকল্পিত কর্মপদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা পরিচয় করিতে থাকেন। তদানীন্তন ইংরাজী ও বাঙ্গলা সংবাদপত্র

সমূহে ব্রহ্মচারী মহারাজের আদর্শ-ও উদ্দেশ্য প্রচারিত হইতে থাকে। ৮ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, ৮দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, ডাঃ বিধান রায়, ৮ডাঃ জে, এন মৈত্র, পণ্ডিত শ্রীমসুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতি নেতৃবর্গের সহিত আলাপ পরিচয়ে সকলেই ব্রহ্মচারীমহারাজের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের দ্বারা আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হন।

### অবিরত কর্মরত অথচ শাস্ত সমাহিত

এই সময়ে ব্রহ্মচারীকে অসম্ভব পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত। অবশ্য পরিশ্রম অক্লান্ত ভাবেই তিনি জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত করিয়াছেন; তাঁর সমগ্র জীবন শারীরিক ও মানসিক তপস্যার হোমাগ্নিকুণ্ড ছিল; কিন্তু এই সময়ে দুই চারজন ছাড়া তাঁর সহকারী ছিল না। স্মরণ্য একাকীই তাহাকে সর্বপ্রকার ভূমিকায় কাজ করিতে হইত। পদব্রজে তিনি সমগ্র কলিকাতা সহরে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রচার ও অর্থ সংগ্রহ করিতেন। তাঁর বিরাট শরীর, তদুপরি নিদারুণ পরিশ্রমে দাবানলের আয় ক্ষুধা। কিন্তু গৃহস্থের কষ্ট ৬ অসন্তোষ হইবে ভাবিয়া একবেলা আহার করিতেন। রাত্রিবেলা উদর পূরিয়া জল পান পূর্বক শুইয়া থাকিতেন।

ব্রহ্মচারী মহারাজ আশৈশব পিতৃগৃহে স্থায়ী গৃহ-প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ এবং প্রায় মোন থাকিতেন; স্মরণ্য তাঁর পক্ষে পরাম-প্রত্যাশী হইয়া পরগৃহবাসে সঙ্কচিত জীবন-বাপন—কতটা ক্লেশকর সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তিনি এমনি স্বাভাবিক ও সহজভাবে এইসব অবস্থার মধ্যে চলিতেন যেন তাঁর বিলুপ্ত অসুবিধা বা ক্লেশ নাই। তিনি ভাগবতী মহাশক্তির করে লীলায়ত্ন হইয়া সর্বাবস্থায় শাস্ত, স্বস্থ, সমাহিত থাকিতেন। “কুর্কল্পপি ন লিপ্যতে”—সব কিছু করিয়াও তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও বিকার-রহিত।

পরবর্তীকালে যখন তিনি শত সহস্র কর্মী লইয়া দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত কর্মতরঙ্গে ভাসিয়াছেন, লক্ষ লক্ষ জন-সমাগমে অসংখ্য প্রকার সমস্তার চিন্তা, সমাধান ও কর্ম-পরিকল্পনা নিয়া অতলভাবে কর্মরত; এবং তৎপলক্ষ্যে দেশের নানা প্রান্তে পরিভ্রমণ করিতেন; তখনও সবাই দেখিত তিনি স্থির, ধীর, গম্ভীর, শাস্ত, সমাহিত, আত্মস্থ; তাঁর অলৌকিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে অদ্ভুত সমন্বয়লীলা। পৃথিবী ও গ্রহাদি যেমন দ্রুত ভ্রমণশীল হইলেও স্থির অচল বলিয়া বোধ হয়, তেমনি তিনিও অবিশ্রাম-অতলভাবে অসংখ্য জনসমাগমে কর্মরত থাকিয়াও অচলপ্রাতিষ্ঠ, স্থিতপ্রজ্ঞ। তাঁর জীবনের এই ভাব-সমন্বয় দৃষ্টে স্বভাবতঃ মনে হয় মহাযোগী, মহাকর্মী, মহাসংগঠক শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জীবন এবং তদীয় গীতার স্থিত-প্রজ্ঞত্বের আদর্শ আচার্য্যের মধ্যে মূর্তিপরিগ্রহ করিয়াছিল।

এই সময়ে একাকী তিনি যেন একশত হইয়া দশদিকে দশ প্রকার কার্য্য করিয়া: পরিকল্পিত ভবিষ্যৎ সজ্জের ভিত্তি পত্তন করিতেছিলেন। কর্মকেন্দ্রে কার্য্য পরিদর্শন, সংবাদপত্রে প্রচার ব্যবস্থা, দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ-পরিচয়-প্রসঙ্গে স্বীয় উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কার্য্য ধারার প্রচার, অর্থ-সংগ্রহ, কর্মী সংগ্রহ, কর্মীগণকে শিক্ষাদান প্রভৃতি বহু কার্য্য একাকীই সম্পাদনপূর্ব্বক মাসের পর মাস সঙ্কলিত ব্রত-উদ্‌ঘোষনে পরিচালিত করিতেছিলেন। অথচ কলিকাতা সহরে তাঁর কোনো নিদিষ্ট আহার ও বিশ্রামের স্থান ছিল না।

স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক “রামকৃষ্ণ মিশন” প্রতিষ্ঠার পর হইতে জনসেবার আদর্শ ও পোষণ (সেবার্থ) দেশবাসীর হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতেছিল—সত্য; তদানীন্তন কলিকাতা প্রেগ, দামোদর বস্ত্রার, সেবা-কার্য্য প্রভৃতি উপলক্ষ্যে দেশের তরুণ-সমাজে বেশ সাড়া পড়িয়াছিল এবং সাময়িকভাবে বহু যুবক বস্ত্রা-তুর্ভিক্ষ-মহামারী প্রপীড়িতের

সেবাকল্পে প্রশংসনীয় তৎপরতা ও আন্তরিকতা দেখাইয়াছিল—সত্য ; কয়েকটা বৎসর ব্যাপী “স্বদেশী আন্দোলনের” যে প্রবল উত্তেজনা বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনে অভিনব প্রাণ-শক্তির প্রবাহ ও দেশপ্রেমের প্রেরণা আনিয়াছিল, তাহার ফলে বহু ত্যাগী কর্মী দেশসেবার প্রেরণায় “রামকৃষ্ণ মিশন” প্রভৃতিতে যোগদান করিয়াছিল ;—তাহাও সত্য । কিন্তু তথাপি সর্বসাধারণের মধ্যে দেশ-জাতি-সমাজের সেবার আদর্শ ও প্রেরণা এখনকার মত সার্বজনীন হইয়া উঠে নাই । রামকৃষ্ণ মিশন ভিন্ন তখন আর কোনো উল্লেখযোগ্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ছিল না ।

আর একদল উৎসাহী তরুণের হৃদয়ে নবজাগ্রত দেশ-সেবার প্রেরণা রাজনৈতিক পন্থা গ্রহণ পূর্বক বিপ্লবের অগ্নি জ্বালাইয়াছিল । ব্রহ্মচারী মহারাজ বহুবিপ্লবপন্থীকে ধর্মের ভিত্তিতে জীবন-গঠনপূর্বক দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগের প্রেরণা দিয়াছিলেন । পূর্বের উদ্ধৃত তদীয় প্রধান শিক্ষকের প্রদত্ত বিবরণের মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছি— তখনকার দিনে তরুণের সম্মুখে বিপদ ছিল দুই প্রকার—নৈতিক ও রাজনৈতিক ; এই উভয় প্রকার বিপদ হইতে তরুণ জীবনগুলিকে রক্ষা করিয়া কি প্রকারে সমাজ ও জাতির কল্যাণজনক কার্যে প্রয়োগ করা যায়—ইহাই ছিল তখন ব্রহ্মচারী মহারাজের জীবনের সর্বপ্রধান চিন্তার বিষয় । বস্তুতঃ আমরা বিচার করিলে দেখিতে পাইব—১৯১৯ হইতে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জন-সেবার যে প্রবল আন্দোলন নানাক্ষেত্রে ব্রহ্মচারী মহারাজের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় চলিয়াছিল, তদ্বারা এই সেবার আদর্শ সার্বভৌমিক ও সার্বজনীন হইয়া উঠিয়াছে । আজ দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সেবার আদর্শ যেরূপ বোঝে ও স্বীকার করে, বিশ বৎসর পূর্বে দেশের জনসাধারণ তার কিছুই উপলব্ধি করিত না ।

তখনকার দিনে শিক্ষিত জনগণের মনোবৃত্তিই এমনি ছিল যে যদি পরিবারস্থ কোনো তরুণ কোনো আশ্রমের বা সেবামূলক কোনো প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্রব রাখিত, তবে অভিভাবকগণ অস্থির হইয়া উঠিতেন; বালক হইলে ধমকাইয়া মারিয়া ধরিয়া এবং বয়স্ক যুবক হইলে কলে কৌশলে বিবাহ দিয়া গৃহে আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করিতেন। ছেলে মাতাল, চোর, লম্পট হইলেও ততটা দুঃখ হইত না, যতটা হইত—সে ত্যাগী হইয়া জাতি ও সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলে। “খুলনা সেবাশ্রম” প্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গে উল্লিখিত দুইটা যুবকের মধ্যে একজনকে তদীয়া মাতাঠাকুরাণী অস্থির হইয়া খুলনা পধ্যস্ত ছুটিয়া আসিয়া বাড়ীতে ফিরাইয়া নিয়া যান।

একটা বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের নিকট যাতায়াত করিত ও তদীয় আদেশ উপদেশ মত চলিত বলিয়া অভিভাবকগণ তাহার উপর নানাবিধ শাসন ও নির্ধ্যাতন করিতেন; কিন্তু শত চেষ্টাতেও তাহাকে গৃহকোণের মায়ায় বাঁধিয়া রাখিতে পারেন নাই। ব্রহ্মচারীর অসীম স্নেহপ্রেমের মধ্যে যে ভূমা জীবনের আনন্দ পাইয়াছিল, সেই “শ্রামের মোহন বাঁশরী” তাহাদিগকে কুল হইতে টানিয়া অকুলে ভাসাইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ মিশনের অবদান—ত্যাগ ও সেবার আদর্শ; ব্রহ্মচারী মহারাজের এই সময়কার কার্য—সেই ত্যাগ ও সেবার আদর্শকে জাতি ও সমাজের সর্বত্র ছড়াইয়া দেওয়া। বস্তুতঃ ব্রহ্মচারী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত “ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের” সার্বভৌমিক সেবার প্রেরণাই দেশের জনসাধারণের হৃদয়ে সেবাধর্মের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ অতিক্রান্ত প্রবেশ করাইয়া দিবার পথে প্রচুর সহায়তা করিয়াছে! ব্রহ্মচারী মহারাজের জীবন ও কার্যাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিব।

## অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ও সজ্জ-সন্তানগণের আগমন

১৯২১ খৃষ্টাব্দ ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় যুগান্তর। এই সময়ে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর **নন-ভায়োলেন্ট নন-কো-অপারেশন** নীতি গৃহীত হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিলেন। দেশবন্ধুর বিরাট ত্যাগ ও মহাপ্রাণতা বাঙ্গালা দেশে নব প্রাণপ্রবাহ সঞ্চার করিল; চতুর্দিকে উৎসাহের বন্যা ছুটিল। স্কুল কলেজ বন্ধ; গৃহে গৃহে চরকার “ঘেনর ঘেনর” এবং তাঁতের ‘ঠকাম্ ঠকাম্’। বালক ও যুবকগণ হুজুগে মাতোয়ারা! বালক বালিকা, যুবক যুবতী, প্রোট প্রোট, বুদ্ধ বুদ্ধা, দলে দলে সরকারী শ্রমের অতিথি; চারিদিকে একটা অনাগত স্বাধীনতার আশাস-বাণীতে জন-গণ-মন উত্তেজিত, উল্লসিত, পুলকিত। অর্থ ও স্বার্থ, স্বপ্ন ও স্বাচ্ছন্দ্য, মান ও প্রাণ অকাতরে দেশের মুক্তিযজ্ঞে আহুতি নিবেদিত!

সজ্জের যারা বর্তমান প্রধান সম্মাসী তারা অধিকাংশ এই সময়ে স্কুল কলেজ পরিত্যাগ পূর্বক দেশহিতকর কার্যে ঝুঁকিয়াছিলেন; কেহ কেহ পূর্ব হইতেই ত্যাগীর জীবন যাপনের সঙ্কল্প লইয়া প্রস্তুত ছিলেন। তাহারাও এই শুভসুযোগে আত্মগঠন ও সমাজ-সেবার কার্যে আত্মনিয়োগে সমুদ্যত। এক্ষণে বহুযুবক এই সময়ে নানা কর্ম-সূত্রে ব্রহ্মচারী মহারাজের কর্মচক্রে আত্মদান পূর্বক তাঁর আশ্রয় লাভ করেন।

আনন্দোন্মত্ত তরুণ-দল রাজনীতির উত্তাল তরঙ্গে ভাসমান। এক্রপ শতশত যুবকের সমারোহের মধ্যেও কিন্তু অত্যাশ্চর্য্য কৌশলে—ভবিষ্যতে যাহাদিগকে লইয়া ব্রহ্মচারীর “কর্মচক্র ও কর্মচক্র” রচিত ও



পরিচালিত হইবে—তাহারা যত্নচালিতবৎ অজ্ঞাতসারে পরস্পর আকৃষ্ট ও মিলিত হইতে লাগিলেন।

### খুলনা দুর্ভিক্ষ সেবাকার্য্য

অশুভের মধ্য হইতেই শুভের উৎপত্তি ; দুঃখ-বিপদের অভিষাপের মধ্য দিয়াই ভগবানের আশীর্বাদ আসে! কংস-কারাগারেই না শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উদয়? শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের নির্বাসনের মধ্য দিয়াই না ত্রিভুবন-ত্রাস, দুর্দান্ত দশাননের সবংশ নিপাত? ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বিধাতার অভিষাপের বজ্ররূপে যে ভীষণ দুর্দৈব খুলনা জেলার সাত-ক্ষীরা মহাকুমার উপর নিপতিত হইয়াছিল, তাহার মধ্য দিয়াই ব্রহ্মচারী মহারাজের অভীষ্ট জগৎ-কল্যাণ—মহাসংজ্ঞের সূচনা।

উক্ত বৎসর এপ্রিল মাস হইতে খুলনা জেলায় স্তম্ভরবন অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দেখা দিল! পরপর কয়েকটা বৎসরের অজন্মায় স্থানীয় অধিবাসিগণের দুর্দশা চরমে উঠিল। সরকারী কর্মচারিগণের নিকট আবেদনে এবং সংবাদপত্রে আলোচনায় ব্যাপারটা দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ একযোগে প্রতিকারার্থ বন্ধকটী হইলেন। বাঙ্গালা তথা ভারতের নানাপ্রদেশ হইতে প্রচুর অর্থ সাহায্য সংগৃহীত হইতে লাগিল!

### সেবক ও কর্মিগণের মধ্যে ব্রহ্মচারীর প্রেরণা

ব্রহ্মচারী মহারাজ স্বয়ং কর্মী সংগ্রহ পূর্বক সেবাকার্য্যের ভারগ্রহণ করিলেন। তিনি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে শত শত যুবককে সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া দুর্ভিক্ষ সেবাকার্য্যে নিয়োগ করিলেন। ক্রমে ক্রমে পাঁচ শতাধিক কর্মী এই সেবাকার্য্যে

যোগদান করিয়াছিল এবং কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। এই বিরাট সেবাকার্য্য দেশময় যে সেবাত্রত ও সেবার আদর্শের তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছিল, তৎপরবর্তীকালে পর পর “উত্তর বঙ্গ বজা” “উড়িয়া বজা ও দুভিক্ষ,” “মেদিনীপুর বজা” “পাবনা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা” প্রভৃতি দুর্ঘটনায় প্রসীড়িত লক্ষ লক্ষ নরনারীর সেবার উদ্যোগ ও আয়োজনের মধ্য দিয়া সেই সেবাদর্শের তরঙ্গকে আরও সার্বজনীন করিয়া তুলিয়াছিল, ক্রমে ক্রমে আমরা উহা লক্ষ্য করিব।

ব্রহ্মচারী মহারাজের অদ্ভুত কর্ম্মশক্তি ও সংগঠন-নৈপুণ্য এবং অমানুষিক পরিশ্রম—রাজা, জমিদার, নেতৃবৃন্দ, সরকারী কর্ম্মচারী—যাহারাই তাহার সংস্পর্শে আসিলেন—সকলকে মুগ্ধ, বিস্ময়াব্বিত করিল; সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

এই দুভিক্ষ সেবাকার্য্যের প্রথমার্ধে কর্ম্মীগণকে অসামান্য দুঃখকষ্ট-বিপদকে বরণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মচারী মহারাজের উৎসাহ ও অদৃশ্য শক্তির প্রেরণায় কর্ম্মীগণ দুঃখকে স্মৃৎ বলিয়া আলিঙ্গন করিত। ব্রহ্মচারী মহারাজের কথায় তাহারা জীবন বিপন্ন করিয়া নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দিতেও দ্বিধাবোধ করে নাই। স্থলরবনের গ্রামে ‘ভাঙার বাঘ, জলে কুমীরের দেশ’, কামোট যেখানে জলে কিলবিল করে,—সেখানে কর্ম্মীগণ নোকার অভাবে জল সাঁতরাইয়া খালবিল পার হইয়া ছুটিত। জলের অভাবে পচা, দুর্গন্ধ বীজাণু-দূষিত জল পান করিতে বাধ্য হইত। ভীষণ ঝড়বাদলের মধ্যে উত্তাল-তরঙ্গ-সমাকুল বিস্কুল নদীবক্ষে চাউল বোঝাই নোকা দুঃসাহসে চালাইয়া যাইত। অনাহারে সমস্ত দিবস গ্রামে গ্রামে পরিদর্শন ও তালিকা সংগ্রহ পূর্ব্বক রাত্রিতে কাঁচা কলা-সিদ্ধ ভাত রাঁবিয়া উদর পূরণ করিত; কিছু না জুটিলে অনাহারেই

থাকিত। সকলেই বেশ অল্পভব করিত—কী যেন একটা অদৃশ্যশক্তি অন্তরে থাকিয়া কর্মীগণকে ছুটাইয়া নিত। তখন বৃদ্ধি নাই—ব্রহ্মচারীর অমোঘ সঙ্কল্পশক্তিই কর্মী ও সেবকগণকে সেবার প্রেরণা ও বীৰ্য্য জোগাইত। ব্রহ্মচারীর বিশ্বগ্রাসী প্রেম ও সমবেদনার তরঙ্গোচ্ছ্বাস কর্মীগণের হৃদয়কেও উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছিল।

খুলনা রিলিফ কমিটির সম্পাদক শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি দিবারাত্র ত্রুভিক্ষ-সংক্রান্ত কার্যে ডুবিয়া থাকিতেন। তাহার ওকালতী ব্যবসায় বন্ধ হইয়া গেল; সুতরাং অর্থাভাবে পরিবারবর্গের কষ্ট হইতে লাগিল; কিন্তু সে দিক দৃষ্টি দিবার অবসর তাহার ছিল না। বস্তুতঃ এই সময়ে যাহারাই এই সেবাকার্য্যে অংশগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের সকলের মধ্যেই এমনিতির প্রেরণা দেখা গিয়াছিল। সজ্জের ভবিষ্য ত্যাগী সন্ন্যাসিগণ অনেকেই তখন এই সেবাকার্য্য উপলক্ষ্যে একত্র হইয়াছিল।

## চিহ্নিত সন্তানগণের সহিত ব্রহ্মচারীর সংযোগ ও

### স্বীয় আচার্য্যত্বের ইঙ্গিত

ব্রহ্মচারী মহারাজ যখন সেবাকার্য্য পরিদর্শনে আসিতেন, তখন তিনি তাঁহার এইসব চিহ্নিত উত্তরসাধক সন্তানগণকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া নানা ভাবে তাহাদের হৃদয়ে ত্যাগের প্রেরণা সমুজ্জ্বল এবং বহুপ্রকার আলাপ ও আচরণের মধ্যদিয়া স্বীয় অলৌকিক ব্যক্তিত্ব ও ভবিষ্য কল্প-পরিকল্পনার আভাস তাহাদের হৃদয়-মনে মুদ্রিত করিয়া দিতেন।

এই সময়ে একদা ভীষণ জ্বরে শয্যাশায়ী হইয়া জর্নৈক যুবকের উৎসঙ্গে মস্তক স্থাপন পূর্বক কাতর আর্তনাদ করিতেছেন, তখন

যুবকটির মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইল—“ইনি আবার কেমনতর যোগী ব্রহ্মচারী! সাধু মহাপুরুষ যারা তারা কি ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইলে এমনতর আর্তনাদ করে?” সেই মুহূর্ত্তে ব্রহ্মচারী মহারাজ সম্পূর্ণ শাস্ত স্থির হইয়া যুবকটির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—“একুপ. ব্যাধি বুদ্ধশব্দেরও হতো! মহাপ্রভুরও এমনি অসুখ হয়েছিল।” এই কথাটি বলিয়া তিনি পুনরায় পূর্বের মত আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। যুবক বিস্মিত হইল—তিনি তাহার অন্তরের সংশয় কেমন, করিয়া জানিলেন? এতো তাহার অন্তরের প্রশ্নেরই উত্তর। কয়েক বৎসর পরে যুবকের সংশয় চিরদিনের তরে মিটিয়া গিয়াছিল। ব্রহ্মচারীর অলৌকিক তপঃশক্তি যখন উক্ত যুবকের অন্তরে বাহিরে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটাইয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে ব্রহ্মচারী যথার্থই বুদ্ধ-শব্দর-চৈতন্যের গ্রায় ভগবৎ-প্রেরিত আচার্য্য তখন সে ব্রহ্মচারীকে জগদগুরু আচার্য্যরূপে বরণ পূর্বক দেশবাসীর নিকট প্রচার করিয়াছিল।

দুর্ভিক্ষ সেবার্ধ্য উপলক্ষ্যে যে সকল চিহ্নিত সন্তান ব্রহ্মচারীর সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের সকলেরই অন্তরে অমনিতর সংশয় ছিল। কিন্তু তথাপি সকলেই অপরিহার্য্য আকর্ষণে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। ব্রহ্মচারী মহারাজ তখন সাদা কাপড় পরেন—শ্বেত উত্তরীয়, শ্বেত বহিরীয়াস; গুরুভাব বা আচার্য্যভাব অন্তরে প্রচ্ছন্ন। সকল কন্মীগণই তাঁহাকে অতি আপনাদরদায়ী বন্ধু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গ্রায় জ্ঞান করিত। কিন্তু তাঁর বিরীতি তেজঃপুঞ্জ কলেবর, অটুট গাভীর্ধ্য, বিপুল ব্যক্তিত্ব এবং অটল অব্যর্থ নির্দেশের সম্মুখে সকলের অন্তিত্ব যেন ডুবিয়া যাইত। কিন্তু তাঁহার আদব-কায়দায়, চালচলনে, আলাপ-ব্যবহারে কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব বা ক্ষমতা-প্রিয়তার ভাব কিছুমাত্র দেখা

ষাইত না। তাঁহাকে মনে হইত দূর দিকচক্রবালের জায় ঘেন 'ধরাছোঁওয়ার' মধ্যে কিন্তু ষতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই দূরে সরিয়া যায়—নাগালের বাহিরে ;—“ধরি ধরি করি ধরিতে না পারি”; অথচ তাঁর চৌম্বক আকর্ষণ বিভিন্ন প্রকৃতির কর্মীগণকে একত্র যুক্ত করিয়া রাখিত ;—এ এক অভূত রহস্য।

### আশাশুনী সেবাশ্রম ও পল্লী-সংগঠন

দুর্ভিক্ষ সেবাকার্য ইং ১৯২১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত চালাইয়া বন্ধ করিয়া দিয়া সংগঠনমূলক সেবাকার্যের পরিকল্পনা গৃহীত হইল। গ্রামে গ্রামে চরকা চালান হইল; তাঁতের কারখানা বসিল—সূতা, কাপড়, সতরঞ্চ প্রস্তুত হইতে লাগিল; মাদুর শিল্প ও বেত্র শিল্পের কারখানা খোলা হইল। দরিদ্র গ্রামবাসীগণ মজুরী ও শিক্ষা উভয়ই পাইতে লাগিল। রিলিফ কমিটির উদ্ভূত তহবিল হইতে জমিক্রয় পূর্বক আশাশুনিতে প্রধান আশ্রম এবং বুধহাটা, তেতুলিয়া ও প্রতাপনগরে শাখা আশ্রম স্থাপিত হইল। জনসাধারণের মধ্যে নীতি ও ধর্ম-বিস্তারের জন্য গ্রামে গ্রামে ধর্মসভা এবং শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন পূর্বক বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ চলিতে লাগিল। বহু ভ্যাগী কর্মী ও সাময়িক স্বেচ্ছাসেবক এই কার্যে আত্মনিয়োগ করিল। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে লইয়া এই সব কেন্দ্রের কার্যাদি পরিদর্শন করিতে আসিয়া আনন্দে আপ্ত হইতেন। তিনি প্রাণের আবেগে একদা তথাকার আশ্রমাধ্যক্ষকে লিখিয়াছিলেন :—“আমি যদি শত প্রকার কষ্টের মধ্যে ব্যাপৃত না থাকিতাম, তাহা হইলে এই সমস্ত আশ্রমে জীবন-সন্ধ্যা অতিবাহিত করিয়া ধন্য হইতাম।”

নিঃস্বার্থ কর্মীর কর্মশক্তি ও কর্মোৎসাহকে উদ্দীপিত করিয়া রাখিতে হইলে—শক্তি ও আনন্দের উৎস সৃষ্টি করা চাই—“কর্মশক্তি যেথা লভে প্রাণ, কর্ম যেথা নিস্পন্দ নিথর”—এমনিতির আশ্রম বা তপোবন সৃষ্টি করা প্রয়োজন যেথায় ত্যাগ, সেবা, সত্য, সংঘম, ব্রহ্মচর্যের আদর্শে উৎসাহ গঠিত কর্মী ও প্রচারকগণ অনন্ত উদ্যম, উৎসাহ, শক্তি-সামর্থ্যের জীবন্ত বিগ্রহরূপে এই কর্মভীরু, শ্রমবিমুগ্ধ, হীনবীৰ্য্য, জাতিসমাজদূর দেশ ও জাতির মধ্যে দুর্বীর কর্ম-প্রেরণা জাগাইয়া দিবে। তাই ব্রহ্মচারী মহারাজের প্রেরণায় উক্ত কর্মকেন্দ্রগুলি ধর্মভিত্তিতে আশ্রম বা তপোবন রূপে গড়িয়া উঠিল। একদিকে পূজা, আরতি, জপধ্যান, তজ্ঞনকীর্তন, স্বাধ্যায় ইত্যাদি, অপরদিকে নিঃস্বার্থ ও জনহিতকর কর্মের প্রবাহ,—এইরূপে ধর্ম ও কর্মের সমন্বয়ে নবযুগের জাতিগঠন-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রিলিফ-কমিটির অর্থানুজ্ঞায় খুলনা সহরের ঠিক অপর পারে ভৈরব-নদতীরে জমিক্রয় পূর্বক “খুলনা সেবাশ্রম” তথায় স্থানান্তরিত হয়। ত্যাগী কর্মীগণ ক্রমে ক্রমে তথায় আসিয়া জুটিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ সেবাকার্যের পত্তন হইল। “খুলনা সেবাশ্রম ও আশাশুনি সেবাশ্রম” এই দুইটিকে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্মৃতিকাগার বা বোজভূমি বলা যাইতে পারে। কারণ অদূর ভবিষ্যতে যাহারা ব্রহ্মচারীর পদাঙ্কানুসরণ পূর্বক তদীয় জাতি-গঠনমূলক কার্যের বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন এই দুইটি আশ্রমে উগ্ধ ও অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

### অগঙ্কিতায় সর্বত্যাগী তরুণদল

দেশ ও জাতির কল্যাণ-কল্লে আত্মোৎসর্গকামী তরুণদল কর্মোৎসাহে আত্মাহারা, কাজকর্মের অবসরে তাহারা জীবন ও জাতিগঠনের

জল্লানা-কল্লানায় নিরত। সকলের প্রাণ যেন একভাব, একতাল, এক ছন্দে মিলিয়া গেল। ব্রহ্মচারী মহারাজের ইচ্ছিত ও প্রেরণায় এই তরুণদলের মধ্যে কতিপয় জন অদূরবর্তী মাঘীপূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে বাজিতপুর আশ্রমে তাঁহার সিদ্ধপীঠে সৰ্ব্বত্যাগের সঙ্কল্প সহ “মৈষ্ঠিক ব্রহ্মচার্য সংস্কার” গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিল।

মাঘীপূর্ণিমা তিথিতে বাজিতপুর আশ্রমে সিদ্ধপীঠে মহোৎসব। যথাসময়ে আমরা ২৫।৩০ জন যুবক নৌকাযোগে খুলনা হইতে বাজিতপুর সিদ্ধপীঠে যাত্রা করিলাম; সে এক অপূৰ্ব আনন্দাভিযান! এতগুলি উৎসাহী তরুণ যুবক—সংসারের কোনো চিন্তাভাবনা, গ্লানিগ্লানির রেখা যাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; হতাশা-নৈরাশু, দুঃখ-অবসাদের তপ্ত শ্বাস যে প্রফুল্ল কমলদলের অঙ্গে লাগিবার স্বযোগ পায় নাই; যাদের হৃদয়ে অতীন্দ্রিয় ভাবের উচ্ছ্বাস, প্রাণে অভিনব আশা-উৎসাহের তরঙ্গ, চিতে স্ফটনোন্মুখ কল্লনারাশি, নয়নে স্বপ্নময় দৃষ্টি! আনন্দোল্লাসের স্রোত বহিল। কীর্তনে, ভজনে, আলাপ-আলোচনায় সকলে আত্মহারা।

মাঘমাস, নির্মল আকাশ, মধুময় বাতাস, উন্মুক্ত নদীবক্ষ, শুভ্রোজ্জ্বল জ্যোৎস্না-বিধৌত নদীসৈকত, দিগন্ত-বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে রবিশস্যের সবুজ সমারোহ, ইত্যন্ততঃ বিচরণশীল দেখুপাল, ক্রীড়োন্মত্ত পল্লীকিশোর দলের প্রাণখোলা হাসি;—সমস্তই যেন তরুণ প্রাণে আসন্ন মুক্তির আশ্বাস ও আনন্দ বহাইয়া দিল। আমরা আনন্দ-সাগরে ভাসিতে ভাসিতে বাজিতপুরে সিদ্ধপীঠে উপনীত।

### বাজিতপুর সেবাশ্রমে ব্রহ্মচারীর সিদ্ধপীঠ

আশ্রমটী সত্যই মনোরম—শান্ত গাভীঘূর্ণ। গ্রামের মধ্যে হইলেও উভয় দিকে—উত্তরে ও পশ্চিমে—স্রোতস্বিনী পরিবেষ্টিত থাকায় গ্রাম

হইতে বিচ্ছিন্ন; নিবিড় বৃক্ষকুঞ্জ-পরিশোভিত। হিমালয়ের ক্রোড়ে ঋষিকেশ ও লছমনঝোলায় আশ্রমগুলি দেখিয়াছি—অতি সুন্দর, মনোহর; হয়তো—হয়তো কেন—নিশ্চয়ই—বাজিতপুরের এই আশ্রম হইতে সুন্দরতর। শতশত সাধুসন্ন্যাসী বাস করেন সেখানে। সেই সাধুসন্ন্যাসী দলের সহিত মিশিয়া মাধুকরী দ্বারা উদর পূরণ পূর্বক সাধন-ভজন-স্বাধ্যায়ে মাসের পর মাস কাটাইয়াছি; পতিতোদ্ধারিণী সুরধনীর তুষার-শীতল বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে চাহিয়াছি; কিন্তু শান্তি পাই নাই, তৃপ্তি আসে নাই—“মন বৃদ্ধে প্রাণ বোঝে নাই।” সবই আছে, তথাপি যেন কিসের অভাব, কী যেন নাই। ক্ষোভে বিরক্তিতে বাঙ্গলা দেশে ফিরিয়া আসিয়াছি।

বাজিতপুর আশ্রমে—সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা, মলয়জ-শীতলা, কাননকুন্তলা, প্রান্তর-বিপুলা বঙ্গমায়ের ‘ঘরোয়া’ মূর্তি। হরিদ্বার, ঋষিকেশ, লছমনঝোলায় পার্শ্বত্যাগান্তরী তথায় নাই, গিরি-তরঙ্গিনীর ভৈরব আরাব নাই, শশক-ময়ূর-হরিণের নির্ভীক বিচরণ নাই, জাহ্নবী-স্রোতে কণ-প্রসাদ-লোভী নিরীহ মৎস্যকুলের স্বচ্ছন্দ বিহার দৃষ্ট হয় না, শতসহস্র সাধু-তপস্বীর জনতা তথায় বিরল, নৈকর্ষ্যের স্নিগ্ধ নীরবতা তথায় দুপ্রাপ্য; কিন্তু তথাপি বাঙ্গলার এই আশ্রমপাদেই শান্তির সন্ধান পাইয়া, আদর্শের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া আপ্তকাম। কিসে, কেন? সেই কথাই বলিবার জন্য এই গ্রন্থ।

সিদ্ধপীঠে ব্রহ্মচারী মহারাজকে একটু মনোযোগ দিয়া দেখিবার সুযোগ পাইলাম। তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবের সন্ধান করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও উৎসব সংক্রান্ত কার্যাবলীর মধ্য দিয়া তাঁর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক বিচারদৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। খেত বহির্কাস ও উত্তরীয়ে আশ্বিন-চরণ আবৃত বিপুল-দেহ, স্বল্পভাষী, সম্ভ্রতবদ, প্রিয়বদ,



নিরন্তর কৰ্মরত, অথচ সৰ্বদা আত্মসমাহিত ;—আমাদের জীবনের আদর্শ যেন মূর্ত হইয়া নয়ন সমক্ষে বিচরণশীল ।

### মাঘীপূর্ণিমা মহোৎসব ও ব্রহ্মচর্য্য-সংস্কার

মাঘীপূর্ণিমা ; দলেদলে কীৰ্ত্তনীয়ার ধোংদান ; দিবারাত্র প্রাণারাম হরিনাম কীৰ্ত্তনের রোলে আকাশ বাতাস মথিত ; সে চলমান আনন্দ-স্রোতে সৰ্ব্বশ্রেণীর হিন্দু, তথা মুসলমানগণও সমবেত হইয়া ভাসমান । “ব্রহ্মচর্য্য-সংস্কার”-প্রার্থী তরুণদল নিয়মামুযায়ী সংযম, উপবাস, মুণ্ডনাদি করিয়া হৃদয়ে পবিত্র ত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্যের সূদৃঢ় সঙ্কল্প জাগাইয়া প্রস্তুত । আবশ্যক কোপীন বহির্কাস ও হোম দ্রব্যাদি আহরিত । শুভ চন্দ্রলোক-সমুজ্জল শুভা মাঘীপূর্ণিমা রাত্রি ; বিশ্বপ্রকৃতি যেন গলিত রজত-ধারায় স্নাত । পাপিয়ার গানে, কোকিলের কুহু তানে আর হরিনাম ধ্বনিতে গগন পবন প্রকম্পিত ; সে মধুর পবিত্র পরিবেশের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যকামী ত্যাগব্রতী সাধকগণের অন্তর অজানা পুলকে মুহুমূহু শিহরিত ।

যথাসময়ে মন্দির-গৃহে হোমাগ্নি জালিয়া বৈদিকমন্ত্রে আছতি নিবেদন , পূর্ব্বক সঙ্কল্প-মন্ত্র পঠিত হইল :—

১। ত্যাগরূপ যে মহামন্ত্র গ্রহণ করিলাম, জীবনে তাহা কদাচ পরিত্যাগ করিব না ।

২। আত্মোপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত এই ত্যাগীর বেশ পরিত্যাগ ও সন্ন্যাসের কোনো বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করিব না ।

৩। রিপু ও ইন্দ্রিয়গণকে কদাচ প্রশ্রয় দিব না ।

৪। সতত সত্যকে অবলম্বন পূর্ব্বক সত্যস্বরূপ সনাতন পুরুষকে লাভ করিতে চেষ্টা করিব ।

৫। চিরকোমার ব্রত অবলম্বন করিয়া সমগ্র জীবন যাপন করিব।  
ব্রহ্মচারী অতঃপর একে একে সকলকে ডাকিয়া কোপীন-বহির্কাস  
দান করিলেন।

সাক্ষী করি অগ্নিদেব  
অন্তরাত্মা সাক্ষী করি  
সাক্ষী ধর্ম মহাকাল  
সমস্বরে সমতান লয়ে  
এই পুত ত্যাগ বেশ;  
ইন্দ্রিয়-সংযম নিত্য ;—  
অদ্বিতীয় সত্য লক্ষ্য  
সঙ্কল্প-সাধনে নিত্য  
অগ্নি যদি ত্যজে তাপ,  
পর্বত কাঠিগ্র ত্যজি  
যুগাচার্য্য-চরণ পরশি  
শত বিঘ্ন বিপদ যুঝিয়া

সাক্ষী করি চন্দ্রমা তপন,  
সাক্ষী করি দেব-ঋষিগণ,  
সাক্ষী চরাচর সব লোক  
উচ্চারিল প্রতিজ্ঞা পঞ্চক ;—  
ব্রহ্মচর্য্যব্রত-নিষ্ঠা আর,  
স্বথ-সাধ-বাসনা সংহার,  
যতদিন দেহে রহে প্রাণ ;—  
প্রাণপণে করিব সংগ্রাম।  
জল করে শৈত্য পরিহার।  
ধরে স্নিগ্ধ নবনী-আকার ;—  
অঙ্গীকার করিহু যে ব্রত—  
রক্ষা তাহা করিব নিয়ত।

\*

\*

\*

যাও বীর ! নির্ভয়-হৃদয়  
মায়াব পিঙ্গব ভাঙি  
অগণিত ত্যাগী ঋষি  
মহামুক্তি তবে বরি নিল ;

আশিষ্ট দ্রিষ্ট শুদ্ধপ্রাণ !  
মুক্ত-আত্মা কেশরী সমান !  
তপস্বী নাথক মহাপ্রাণ—  
মুক্ত আজি সেই দেবযান।

ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্যাকামী ত্যাগী সন্তানগণকে নীরবে কোপীন বহির্কাস  
দিলেন, কোনো কথাটা বলিলেন না। সেদিন সত্যই সকলে  
অনুভব করিয়াছিল—তোতাপাখীর গায় রাশি রাশি উপদেশ দিতে

পারে—এমনতর গুরুর অভাব দেশে কোনো কালে হয় নাই। . অস্তরে অস্তরে শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চার পূর্বক শিষ্যের জীবন-শতদলকে পরতে পরতে ফুটাইয়া তুলিতে পারে—এমন সিদ্ধ আচার্য্য কোথায় ? “গুরুস্ত মোন-ব্যাখ্যানং শিষ্যস্ত ছিন্নসংশয়াঃ”—এমন গুরু কোথায় ? এমন শিষ্য কোথায় ?—‘লাখে না মিলয়ে এক।’

### কলিকাতায় কার্য্যালয় স্থাপন

এই সময়ে ব্রহ্মচারী পর্যায়ক্রমে বাজিতপুর, মাদারিপুর, খুলনা ও কলিকাতায় থাকিতেন। এই সময়ে শ্রীযুত প্রিয়নাথ দাসের অর্থ সাহায্যে একখণ্ড জমি ক্রয় পূর্বক “মাদারিপুর সেবাশ্রম” নিজস্ব জমিতে স্থানান্তরিত হয়। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বাগ্‌বাজারে ডিস্‌পেন্সারী লেনে তিন টাকা ভাড়ায় একখানি খোলার ঘর নেওয়া হয়। তথায় চারি পাঁচটি ছেলে সহ ব্রহ্মচারী অবস্থান করিতেন। ছেলেরা বাক্সে করিয়া ট্রামে, বাসে, ট্রেনে অর্থ সংগ্রহ করিত। কিন্তু ঘরখানি ছিল—অন্ধকুঠী; তথায় রান্নাবাড়া করিয়া আহাৰাস্তে ব্রহ্মচারী সকলকে নিয়া গঙ্গার ঘাটে শুইয়া থাকিতেন। বৃষ্টি নামিলে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া ঐ ঘরেই আশ্রয় নিতেন।

গ্রামের ছেলেরা নূতন সহরে আসিয়াছে। কলিকাতার মত এত বড় সহরে তাহাদের পথ হারানো স্বাভাবিক। এমনো ঘটিয়াছে যে কেহ কেহ পথ হারাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে দুইদিন অনাহারে কাটাইয়া অতিকষ্টে আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এইরূপে এই বালক ও কিশোর কর্মীগণকে সন্তানবৎসলা মাতার গ্নায় স্নেহে বৃকে করিয়া অশেষ কষ্ট-ভোগের মধ্য দিয়া ব্রহ্মচারী অভীষ্ট সঙ্কল্প বীজ বপন করিতেছিলেন। ১৯২২ সালে ভাদ্রমাসে শোভাবাজার ষ্ট্রীটে আঠারো

টাকায় দুইখানি কোঠা ভাড়া লইয়া তথায় কলিকাতা আশ্রম স্থানান্তরিত হয়। জনৈক ব্রহ্মচারী ও কয়েকটা সেবক তখন সেখানে থাকিয়া কার্য্য করিতে থাকেন। ব্রহ্মচারী মহারাজও মাঝে মাঝে গিয়া থাকিতেন।

কলিকাতা অপরিচিত স্থান। বিনা পরিচয়ে সেখানে মাসিক চাঁদা সংগ্রহের প্রচেষ্টা বড়ই ক্লেশকর। ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মী ব্রহ্মচারীকে \* অশেষ লাঞ্ছনা ও অপমান সহিতে হইত। দুই আনা, কি চারি আনা চাঁদার জন্ত তিনি পায়ে হাঁটিয়া কালিঘাট ভবানীপুর যাতায়াত করিতেন; বহু বড়লোকের বাড়ীতে দারোয়ানের নিকট দুর্ব্যবহার ভোগ করিতে হইত; হাত হইতে চাঁদার খাতাটি কাড়িয় নিয়া ড্রেনের মধ্যে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিত। ব্রহ্মচারীর অলৌকিক প্রেরণা তাহাকে যেন যন্ত্রের গ্রাস চালাইয়া নিতেছিল; এক একদিন ব্রহ্মচারী বলিতেন—“দেখ ও যদি চাঁদার খাতা হাতে করে ফুটপাতে পড়ে মরেও, তথাপি মুক্তি ওর করতলগত।” তাহাকে আশ্বস্তি স্বরণ করাইয়া দিবার অণু তিনি উপদেশপূর্ণ পত্রে লিখিয়াছিলেন :—

“তোমার বিপুল বিক্রম ও প্রবল পরাক্রমের,—তোমার অনন্ত উদ্যম অধ্যবসায়ের উপর সজ্জের একটা দিক নির্ভর করিতেছে……সন্ন্যাসীর জীবনের মূতন আদর্শ দেশকে দেখাইতে হইলে তোমাদের গ্রাম কতক সন্ন্যাসীকে জীব-জগতের মহাকল্যাণ ও মহামুক্তি বিধানার্থে শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দ্য ভুলিয়া দেহের বিন্দু বিন্দু শোণিত দেশের এই মহামলিনতা বিমোচনার্থ ব্যয় করিতে হইবে।…”

—সজ্জগীতা

১২২৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে সজ্জের কার্যালয় ১১৮নং শোভাবাজার হইতে ২৭নং বহুবাজারে উঠিয়া আসে। ১২২৬ খৃষ্টাব্দে ১৬২নং

\* সজ্জের বর্তমান ভাইস্-প্রেসিডেন্ট শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী।

কর্ণওয়ালিস্ ট্রাটে কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়। ১২২৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কার্যালয় ২৪।৩ মির্জাপুর ট্রাটে উঠিয়া আসে। পরে বালিগঞ্জে ডিহি শ্রীরামপুরের একটি বাড়ীতে কয়েক মাস থাকার পর ১২৩২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে সজ্জের প্রধান কার্যালয় বালিগঞ্জে নিজস্ব জমি ও বাড়ীতে স্থাপিত হইয়াছে।

ব্রহ্মচারীর প্রবর্তিত কার্যাবলীকে তৎকালীন কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকগণ বিশেষ সহায়ভূতির দৃষ্টিতে দেখিলেন। ইংরাজী, বাঙ্গলা ও হিন্দী পত্রিকাসমূহ—“নায়ক”, “বসুমতী”, “সন্ধ্যা”, “হিন্দুস্থান”, “করোয়ার্ড”, “সার্ভান্ট”, “স্বতন্ত্র”, “বিশ্বামিত্র”, “বেঙ্গলী”, “অমৃতবাজার” প্রভৃতি দৈনিক পত্রিকায় এবং “বসুমতী” ও “প্রবাসী” প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় বহুমুখীন সেবাকার্যের অসংখ্য সংবাদ ও সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইত। প্রায় প্রত্যেক দিনই সংবাদপত্রে কিছু না কিছু দেখা যাইত।

ব্রহ্মচারী পরবর্তী কালে অনেক সময়ে কথা-প্রসঙ্গে বলিতেন—“আমি তখন অজ্ঞাত, অখ্যাত, কপর্দকহীন; সমস্ত সংবাদপত্রগুলি আমার কার্যের প্রচার করিয়া বিস্তর সহায়তা করিয়াছে; তাহাদের কাছে সজ্জের ঋণ অপরিশোধ্য।” শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (বসুমতী সম্পাদক), ৮পীযুষকান্তি ঘোষ (অমৃতবাজার), ৮মৃণালকান্তি ঘোষ (অমৃতবাজার), ৮পণ্ডিত শ্রামসুন্দর চক্রবর্তী (সার্ভান্ট), ৮পৃথ্বীশচন্দ্র রায় (বেঙ্গলী), দেশবন্ধু ৮চিত্তরঞ্জন প্রভৃতির সহিত ব্যক্তিগত ভাবে তিনি পরিচিত এবং দেশবন্ধু ভিন্ন অবশিষ্ট কয়েকজনের সহিত এই সময়ে ও পরবর্তীকালে বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

১২১২ খৃষ্টাব্দ হইতে ব্রহ্মচারী মহারাজ যে জন-সেবার আদর্শ বিস্তারে ব্রতী হন, তাহা পর পর কয়েক বৎসর যাবৎ অসংখ্য সেবাকার্যের মধ্য দিয়া

সর্বত্র ক্রমত সঞ্চারিত হইয়া একটা সার্বজনীন সেবার আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। সংক্ষিপ্ত হিসাবে দেখিতে পাই :—

১। ১৯১৯—২০ খৃঃ—পূর্ববঙ্গ বাত্যা-সেবাকার্য ও মাদারিপুর সেবাশ্রম স্থাপন।

২। ১৯২০—২১ খৃঃ—খুলনা সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা ও খুলনা দুর্ভিক্ষ সেবাকার্য।

৩। ১৯২২ খৃঃ—আশান্তনি সেবাশ্রম স্থাপন এবং হুন্দরবন অঞ্চলের গ্রামে পল্লী-সংগঠন ও শিল্প-বিস্তার।

৪। ১৯২৩ খৃঃ—উত্তরবঙ্গ বহা ও মাদারিপুর বহা সেবাকার্য ও উত্তরবঙ্গ সেবাশ্রম ও নাটোর কালাজুর সমিতির প্রতিষ্ঠা।

৫। ১৯২৪ খৃঃ—সাতক্ষীরা মহামারী ও গয়ামে পিতৃপক্ষ মেলায় সেবাকার্য ও গয়া সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা।

৬। ১৯২৫ খৃঃ—উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষ ও বহা সেবাকার্য ও পুরী জেলায় পল্লী-সংগঠন কার্য।

৭। ১৯২৬ খৃঃ—পুরী সেবাশ্রম স্থাপন ও রথযাত্রা মেলায় সেবাকার্য; কাশীতীর্থ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা, পাবনা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সেবাকার্য; মেদিনীপুর জলপ্রাবনের ও মাদারীপুর বহা সেবাকার্য; শোনপুর ও অন্নকূট মেলায় সেবাকার্য।

উপরোক্ত সাময়িক সেবাকার্য এবং সংগঠন কার্যের পরিচালনার্থ সহস্র সহস্র কর্মীকে ও স্বৈচ্ছাসেবককে নিয়োগ করিতে হইয়াছিল; এবং প্রয়োজনীয় ব্যবতীয় অর্থ দেশবাসী জনসাধারণের নিকট হইতে শিক্ষা দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছিল। ফলে সমগ্র দেশময় জনসেবার আদর্শ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

এইভাবে ব্রহ্মচারী বিনোদ ভদ্রায় “ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের” মধ্য

দিয়া সেবার মহান আদর্শ সার্বজনীন ও সার্বভৌমিক করিয়া তুলিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। আমরা জীবনী-গ্রন্থে পরবর্তী অধ্যায়ে তাহা লক্ষ্য করিব।

-----

## সন্ন্যাসী গঠন ও সঙ্ঘ গঠন

আশ্রম-প্রতিষ্ঠা ও জনসেবার আদর্শ বিস্তারের মধ্য দিয়া ব্রহ্মচারী একদিকে যেমন—দেশ-জাতি-সমাজের বিপদে আপদে দুঃখে দুর্বিপাকে সেবা ও সহায়তার ব্যবস্থা ও প্রেরণা দান করিতেছিলেন; তেমনি স্বীয় ভবিষ্য “ধর্মচক্র” ও “কর্মচক্রে”র প্রাণস্বরূপ যারা তদীয় বিশ্ব-কল্যাণ-যজ্ঞে আত্মাহুতি দান করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে;—সেই সকল ত্যাগী তরুণ-দলকে প্রত্যেকের কৃতি, প্রতিভা, ক্ষমতা, প্রবণতা, জন্মগত সংস্কারাভ্যাসী বিভিন্ন প্রকার কর্মের মধ্য দিয়া তাহাদের জীবন ও চরিত্র গঠন ও শক্তির বিকাশের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। ব্রহ্মচারীর উদ্দেশ্য ছিল—বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন কার্য ও অহুষ্ঠানের মধ্যে রাখিয়া শিক্ষাদীক্ষা-প্রাপ্ত ও সঙ্ঘবদ্ধ এই তরুণ ত্যাগী কর্মীদলকে স্বীয় অভীষ্ট ভাব ও আদর্শে গঠন পূরক এক বিরাট “**ধর্ম-সংস্থাপন ও জাতি-গঠন মূলক**” সঙ্ঘ সংগঠন। অটুট ধৈর্য্য, অনন্ত অধ্যবসায়, অটল সহিষ্ণুতার সহিত কত স্নেহ-প্রীতি-আদর-দরদভরা নীতি-কৌশলে, কী অতুলনীয় সংগঠনী-প্রতিভাবলে তিনি ধীরে ধীরে—সন্ন্যাসী-গঠন ও সঙ্ঘ গঠন করিয়াছিলেন—ভাবিতে গেলে নির্বাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হয়।

১৯২২ ও ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে যে সমস্ত ত্যাগী কর্মী ব্রহ্মচারীর সহিত স্থায়ী

ভাবে কর্মস্থত্রে যুক্ত হয়, তাহাদের কতক আশাশুনি সেবাশ্রমে, কতক কলিকাতা কার্যালয়ে, কতক মাদারিপুর সেবাশ্রমে, কতক বাব্রিতপুর সেবাশ্রমে নানাবিধ কর্মে নিযুক্ত ছিল। কখনো কখনো এক আশ্রমের কর্মীকে অগ্র আশ্রমে পরিবর্তন করাও হইত। ব্রহ্মচারী মহারাজ এই সমস্ত আশ্রমগুলিতেই মধ্যে মধ্যে যাইতেন, দু'চার দিন করিয়া থাকিতেন। নানাভাবে উৎসাহ দ্বারা কর্মীগণকে উদ্বীপিত এবং উচ্চতাবের ও আদর্শের ইঙ্গিত দ্বারা চিন্তার প্রসারতা ও দায়িত্ববোধ জাগাইবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু বাহ্যতঃ তিনি একটু নিলিপ্ত থাকিয়া কর্মীগণকে সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা দান করিতেন; সাক্ষাৎভাবে তেমন কোনো আদেশ দিতেন না। অথচ প্রত্যেকের আলাপ আচরণ, কাজকর্ম স্তূতি দৃষ্টিতে পরোক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করিতেন।

বড়শীতে ম'চ গাঁথিয়া টানিয়া ডাঙায় তোলার পূর্বে যেমন মৎস্য-শিকারী কিছুকণ গোলাইয়া মাছটিকে কাবু করিয়া লয়, তেমনি ব্রহ্মচারী মহারাজ তাগ ও জীবসেবার সঙ্কল্পের বড়শীতে গাঁথিয়া সংশ্লিষ্ট কর্মী যুবকগণকে স্বীয় স্বীয় স্বাধীনভাবে চলিতে দিয়া তাহাদের মনোবৃত্তিগুলিকে সুসম্পূর্ণে সুকোশলে স্বীয় অভিমুখী করিয়া তুলিতেছিলেন। সুগন্ধি “চার” ফেলিয়া লুক্ক মৎস্যকুলকে একত্র আকর্ষণপূর্বক ধীরে যেমন জাল ফেলিয়া তাহাদিগকে ধরে; তেমনি জন্ম-সেবার সূত্রে আকৃষ্ট সং-সংস্কার-বিশিষ্ট তরুণগুলিকে তিনি স্বীয় সঙ্কল্প-শক্তির জাল ফেলিয়া আটকাইতেছিলেন।

এই সকল যুবকদের কাহাকেও তিনি সঙ্গ রাখিতেন, কাহাকেও ইঙ্গিত ও উপদেশ দিতেন, কাহাকেও কর্মের নির্দেশ ও উৎসাহ দিতেন। কাহারো উপর সন্ধানী দৃষ্টি রাখিতেন, কাহারো সম্মুখে সজ্জের দায়িত্ব ধরিয়া দিতেন, কাহাকেও জলন্ত তাগ-



বৈরাগ্যের বাণীতে উদ্দীপিত করিতেন; কিন্তু কাহারো সংস্কারের উপর আঘাত না দিয়া প্রত্যেকের মনোভাব-মত কর্ম, উৎসাহ ও কল্পনা জোগাইয়া তিনি সকলকে ঘনিষ্ঠতর ভাবে নিজের সহিত যুক্ত করিয়া নিতেন; আবার কখনো কখনো স্বযোগ বুঝিয়া তীব্র আঘাতে তাহাদের মানসিক জড়তা ও গতাহুগতিকতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করিতেন।

### ব্রহ্মচারীর বাণী

একদা জনৈক ব্রহ্মচারী তাঁর নিকট বলিতেছেন—“আপনার পরিকল্পিত সঙ্ঘের ভাব ও আদর্শ লোকে বোঝে না; রাজনৈতিক (অহিংস অসহযোগ) আন্দোলনেই তাহারা মতিয়া রহিয়াছে।” অমনি তিনি বজ্র-গম্ভীর স্বরে হুঙ্কার দিলেন—“তোমার সঙ্ঘকে কি তুমি বুঝেছ? তবে অগ্রে বুঝবে কি প্রকারে? আগে তুমি বোঝো, বুঝতে চেষ্টা কর, দেখবে তখন লোকে বুঝবে।”

অপর একজন ব্রহ্মচারী একদা কথাপ্রসঙ্গে তাঁর নিকট উল্লেখ করে—“মহাত্মা গান্ধী এখন দেশের নেতা ও নির্দোষ; তাঁর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে জাতি আজ মাতোয়ারা।” অমনি তিনি গজ্জিয়া উঠিলেন : “দেশ কি চায়, সমাজের কী দাবী, জাতির কিসের অভাব—তা’ কে বোঝে? কয় জনে বোঝে? যে-মন, যে-বুদ্ধি কামনা-বাসনার জালায় জর্জরিত, রিপু-ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত, সেই মন, সেই বুদ্ধি দিয়ে কি কদাচ দেশ-জাতি-সমাজের সমস্তার সমাধান হয়? যদি ব্যাস-বশিষ্ঠ-বাল্মীকির মত ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি, বুদ্ধ-শঙ্কর-চৈতন্যের ত্রায় কোনো সিদ্ধ সমাহিত মহাপুরুষ থাকে, তবে সে-ই বলতে পারে—আমি যে পথ আজ তোমাদের দেখাচ্ছি—এ ছাড়া অন্য পথ নেই।”

একদিন জনৈক ব্রহ্মচারী জপধ্যানের আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁকে

বলেন—“জপের সময়ে সংখ্যা রাখা কি নিতান্তই প্রয়োজনীয়? সংখ্যা রাখিবার চেষ্টায় মনের একাগ্রতা নষ্ট হয় না? তাইতো অনেক উপদেষ্টা বলেন—যে-মনটুকু দিচ্ছে সংখ্যা রাখবে, সেটুকুও জপের দিকে দাও।” তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন—“একথা যারা বলে তারা impractical ( অকর্ম্ম ) ; জপ তারা কোনো দিন করেনি ; জপের ফলও পায়নি ; জপের সাধনা জানেই না। সংখ্যা না রাখলে জপই হয় না। ও সব কথায় কাণ দিয়ে না। সঙ্কল্প না থাকলে কি জপ হয়? যখন হরিদাস নিত্য তিন লক্ষ নাম জপ করে সিদ্ধ হয়েছিল। লোকের কোন্ অবস্থায় জপের সংখ্যা রাখার প্রয়োজন থাকে না? স্বাস্থ্যপ্রস্থাসে যখন অজপা জপ চলতে থাকে। সে কথা আলাদা।” \*

আর একদিন সহকর্ম্মীদের মধ্যে পরস্পর আলোচনা হয় যে “সারা-দিন নানাপ্রকার কর্ম্মের ভিতর ডুবে থাকি ; ফলে রাত্রিতে যখন জপে বা ধ্যানে বসি. তখন সেই সব চিন্তার বুদ্ধি মনের ভিতর জেগে ওঠে। মনতো কিছুতেই একাগ্র হতে চায় না! কর্ম্ম ও সাধনার সমন্বয় কিরূপে সম্ভব?” কাহারো নিকট এই আলোচনার কথা শুনিয়া তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিয়াছিলেন—“কাঁজ না করে পারে না, তাই করে ;

\* জপ-সাধনা—কায়মনোবাক্যে করিতে হয় ;—আসনে স্থির ভাবে বসে ( কটি, বক্ষ ও স্কন্ধ সমরেখায় সরল ভাবে ), ললাটে জ্ঞানচক্রের মধ্যভাগে—গুরু বা ইষ্ট মূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে,—নিজে বোঝা যায় অথচ অণ্ডে শুনিতে না পায়—এরূপ নিঃশব্দে জিহ্বার দ্বারা, হাতে বা মালায় সংখ্যা গণনা পূর্ব্বক নিদিষ্ট সংখ্যক জপ করিতে হইবে। পুরো দম নিয়ে জপ করিতে করিতে দম-শেষ হলে, পুনরায় পুরো দম নিয়া জপ করিবে ;—ইহাই জপের সাধারণ রীতি।

প্রবৃত্তিই কাজ করিয়ে নিয়ে বেড়ায়। আমার জন্তে যেদিন কাজ করবে—আমার আদেশ নির্দেশে—উঠবে বসবে, চলবে, সেদিন যেন দেখে—জপধ্যানে মন একাগ্র হয় কিনা!”

খুলনা আশ্রমে একটি বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারী মহারাজের অতিশয় অমুরক্ত ছিল। আমরা তখন ব্যক্তিগত ভাবে ব্রহ্মচারীর সেবা-শুশ্রূষায় অনভ্যস্ত। শুধু তাই নয়, তখন উহা কর্তব্য বলিয়াও বোধ করিতাম না। কিন্তু বালকটি অমুরাগের সহিত ব্রহ্মচারী মহারাজের সেবাশুশ্রূষা করিত। একদিন বালকটির কথা উল্লেখ করিয়া সকলকে বুঝাইলেন—“খুলনা আশ্রমে আসবো মনে হলেই ও-র কথাটাই সর্বপ্রথম মনে হয়; আশ্রমে যখন প্রবেশ করি তখন ওকেই প্রথম দেখতে ইচ্ছা হয়; ও যখন জলের ঝারিটি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন প্রয়োজন না থাকলেও যেন আমি যেতে বাধ্য হই। এটা ভাবের রাজ্য, ভাব যেখানে নেই, সেখানে কিছুই নেই।”

১/ তিনি জনৈক ব্রহ্মচারীকে উপদেশপত্রে লিখিয়াছিলেন “তোমাদিগকে ত্যাগের জলন্ত প্রতিমূর্তি হইতে হইবে। তোমরা সনাতন আদর্শে গঠিত হইয়া আর্য্য ঋষিদের আসনে উপবেশন পূর্বক এই অধঃপতিত দেশকে নীতি ও ধর্ম্মের পথে পরিচালিত করিবে। নীতি ও ধর্ম্মের কথা প্রচার করিবার জন্ত, ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্য্যের মাহাত্ম্য বিঘোষণার জন্ত তোমরা জন্মিয়াছ।.....নিজে প্রস্তুত হও। যথোচিত শক্তি-সামর্থ্য সংগ্রহ কর। তোমরা এক একজন এক একটা সিংহশিশু; অযুত হস্তীর বল তোমাদের আছে।”

অপর একজনের নিকট লিখিয়াছিলেন—“মাহুষ স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়ার পূর্বে অনেক সময়ে অনেক চঞ্চলতার পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু দৃঢ়-সঙ্কল্প যারা, আরক্ত ও সঙ্কলিত কর্ম্ম সংসাধনে আত্মোৎসর্গ

করিতে প্রস্তুত যারা এমন ব্যক্তি নিজেদের ধৈর্য্য, স্বৈর্য্য, সহিষ্ণুতাকে পরিত্যাগ করিয়া, আত্ম-মর্যাদা ও আত্মনির্ভরতাকে জলাঞ্জলি দিয়া সাময়িক চঞ্চলতার বশবর্তী হইয়া, সাময়িক উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া যখন তখন যা' তা' করিতে প্রস্তুত হয় না।.....স্বীয় স্বীয় দায়িত্বের গুরুত্ব স্বরণ করিয়া আরও কৰ্ম্ম-কৃতিত্বের সহিত সম্পন্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হও।”

“মানুষের শক্তিই সেখানে, মানুষের মনুষ্যত্ব, বীরের বীরত্বই। সেখানে, যেখানে মানুষ অনন্ত উদ্যম অধ্যবসায় লইয়া যাবতীয় দুঃখ দৈন্ত্য-দুর্বিপাককে উপেক্ষা করিয়া সঙ্কল্পিত ব্রত উদ্যাপনে অবিচলিত ভাবে, অচঞ্চল ভাবে,—অচল, অটল, অটুট ভাবে অবস্থান করে।.....”

অন্য একজনকে লিখিলেন—“তোমরা অমৃতের সন্তান; কোনোরূপ বিচলিত হইও না। তোমরা স্বতঃ পবিত্র, স্বতঃ শুদ্ধ, তোমাদের কোনো ভয় নাই। তোমাদিগকে কেনষ্ট করিতে পারে? তোমরা ধীর স্থির হও, আত্মবিশ্বাসী হও; আত্মশক্তি বিকাশের জন্য স্বতঃ চেষ্টিত হও।.....তোমরা বীরের সন্তান, তোমাদের আবার দুর্বলতা কি?”

“মানুষের জীবনে যা' কিছু করা সম্ভবে, তোমাদের জীবনে তা' কেন সম্ভব হবে না? তোমাদের জীবনে যদি কোনো কিছু না হয়, তবে অন্তের জীবনে কোনো কিছু হওয়া কিরূপে সম্ভবে?.....বিপুল বিক্রম ও প্রবল পরাক্রমের সহিত আরও কৰ্ম্ম প্রকৃত বীরের হ্রায় করিয়া যাও।”

আর একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—“.....আত্মবিশ্বাস-বলে বলীয়ান হইয়া, আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া শত শত সহস্র সহস্র সম্ভ্রান্ত প্রাণকে সুশীতল করিবার জন্য তোমাদের সজ্জকে উপযুক্ত

করিয়া তোলো। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুলিকে সম্মিলিত করিয়া বিরাট সজ্জশক্তি গঠন কর।.....ভুলিয়া যাও রিপূর উত্তেজনা, বিস্মৃত হও—পাপ-তাপ, আধি-ব্যাধি; এইরূপে নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব হইয়া পরিব্রাজ কর—পতিতকে, রক্ষা কর—বিপন্নকে, শান্তি স্থখ দাও—সন্তপ্তকে, আশ্রয় দাও—নিরাশ্রয়কে.....এমন দিন তোমাদের সজ্জের শীঘ্রই আসিতেছে, যখন সহস্র সহস্র লোক এই সজ্জের সংস্পর্শে আসিয়া জীবন-জনমের উদ্দেশ্যলাভে সফলমনোরথ হইবে.....সর্বনিয়ন্তা স্বয়ং তোমাদের সজ্জের পরিচালনা ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন; সেখানে কেহ চালাকী চাতুরী করিয়া সজ্জকে কলুষিত করিতে চেষ্টা করিলে বিফলমনোরথ হইবে।.....”

অপর একখানি পত্রে লিখিলেন—“তোমাদিগকে—পাপ-তাপ-আধি-ব্যাধি-ক্লিষ্ট জনগণকে মহামুক্তির পথে প্রবর্তন করিতে হইবে, যাহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া, যাহার শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া এদেশ আবার জাগিয়া উঠিবে।.....”

“তোমাকে ধৈর্য্য স্থৈর্য্য সহিষ্ণুতার জলন্ত জীবন্ত মূর্তি পরিগ্রহ করিতে হইবে। তোমার প্রসন্ন ও প্রশান্ত মুখমণ্ডলের জ্যোতিঃ এবং তোমার অন্তরের জ্ঞানালোক এই সজ্জকে আলোকিত করিয়া সমগ্র দেশকে ত্যাগ-রূপ মহাব্রত গ্রহণে উৎসাহিত করিবে। সতত মনে রাখিবে যে এই দেহ—কাম-কাঞ্চন ভোগ করিবার জন্ত নহে; এই দেহ—নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত-স্বভাব ব্যক্তির লীলাক্ষেত্র.....”

“ধর্ম্মের প্রাণ—অনুভূতি, অনুষ্ঠান ও আচরণে। শাস্ত্র পড়িয়া, লোক-মুখে শাস্ত্র-কথা শুনিয়া কেহ কদাপি ধর্ম্ম লাভ করিতে পারে না। যে-মন ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় নিরন্তর তাড়িত, রিপূর উত্তেজনায় নিয়ত উত্তেজিত, কামনা-বাসনার জ্বালায় জর্জরিত;

—সেই মন, সেই বুদ্ধি লইয়া যদি কেহ ধর্মতত্ত্ব উদ্ভেদ করিতে যায়, তবে তাহাকে বাতুল বৈ আর কি বলা যাইতে পারে? .....একথা অজান্তে সত্য যে তোমাদের ভিতরের প্রস্তুত শক্তির উদ্বোধন, বিকাশ-প্রকাশের পক্ষে এই সজ্জের (সজ্জনেতার) সাহায্য সহায়ভূতি বিশেষ অল্পকূল হইবে.....”

এই রূপে অবিরত অসংখ্য আদেশ, উপদেশ, আশ্বাস, সহায়ভূতি, সমবেদনা, উৎসাহের বাণীর দ্বারা ব্রহ্মচারী মহারাজ তরুণ ত্যাগী সন্তানগণকে গড়িয়া তুলিতেছিলেন।

### ব্রহ্মচারীর শিক্ষাদান-পদ্ধতি

ব্রহ্মচারী মহারাজ কথিত ও লিখিত উপরোক্ত উপদেশ, উৎসাহ-বাণী ও মন্তবাণুলির প্রতি মনোযোগ করিলে আমরা তদীয় আশ্রিত ত্যাগী ব্রহ্মচারী কর্মীগণের জীবন-গঠনের জ্ঞান কিরূপ স্বকোশলে পরোক্ষে (indirect) প্রভাব-জাল বিস্তার করিতেছিলেন তাহা বুঝিতে পারি :—

(১) আশ্রিত কর্মীগণের স্বীয় স্বীয় কর্মক্ষেত্রে স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতেন না।

(২) অধিকন্তু কর্মীগণের অন্তরে প্রস্তুত শক্তি ও অক্ষুট উচ্চতর বৃত্তি ও ভাবগুলির প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক আত্মবিশ্বাস, আত্ম-নির্ভরতা, বীরত্ব ও দায়িত্ববোধ জাগাইয়া দিতেছেন।

(৩) তাঁহার বিরাট ভবিষ্য সজ্জ-গঠন-পরিকল্পনার আভাস প্রদান পূর্বক সজ্জের প্রাণ-স্বরূপ ত্যাগী কর্মীগণকে দায়িত্ব গ্রহণের ইঙ্গিত দিতেছেন।

(৪) কর্মীগণের উপচীযমান মহত্ব, উন্নতির আশা ও আশ্বাস দ্বারা তাহাদিগকে নিশ্চিত, নিঃসংশয় করিতেছেন।

(৫) পরোক্ষ ভাবে তাহাদের ভ্রান্তি ও কুসংস্কারগুলির উপর প্রবল আঘাত হানিয়া অন্তরের তামসিকতাকে চূর্ণ করিতেছেন।

(৬) শ্রদ্ধা ও সেবার মধ্য দিয়াই যে আচার্য্যের শক্তি ও ভাব অমুরক্ত শিষ্যে সঞ্চারিত হয়—তাহার ইঙ্গিত দিতেছেন।

(৭) আচার্য্যের শরণাগত হইয়া তদীয় আদেশ নির্দেশে সম্পাদিত যে কর্ম তদ্বারা জগতের কল্যাণ ও কর্ম্মীর চিত্তশুদ্ধি ঘটে,—তাহাই কর্ম্মযোগ ;—এরূপ ইঙ্গিত দিয়া আচার্য্যের শরণাগত হইতে পরোক্ষ ভাবে আহ্বান করিতেছেন।

(৮) তিনি যে—যুগের আচার্য্য, জাতির কল্যাণ-পথ-নির্দেশী—এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন।

(৯) দূরে বা নিকটে যেখানেই তিনি অবস্থান করুন না কেন তিনি ভবিষ্য ত্যাগী সন্তানগণের প্রতি স্মৃতিস্মৃ দৃষ্টি রাখিয়া প্রত্যেককে ভাবের ও সংস্কারের পরিপোষক উৎসাহ প্রদান এবং আনন্দবর্দ্ধক বাণীর দ্বারা উদ্বীপিত করিতেছেন।

✓ কেহ কেহ নির্জনে সাধন-ভজনাতির আগ্রহ প্রকাশ করিলে ব্রহ্মচারী মহারাজ দৃঢ়কণ্ঠে গম্ভীর স্বরে কহিতেন—“সঙ্কল্পিত মনই নির্জনে গিরি গুহা। যাকে যে দায়িত্ব-কর্তব্য দিয়ে যেখানে রাখা হয়েছে, তাকে সেখানটাই হিমালয়ের গিরি গহ্বর—মনে করে থাকতে হবে। আমার এই যে অকলঙ্ক নিখুঁত জীবন এঁক কোনো নির্জনে গিরি-গহ্বরে তপস্যার ফল? দৃঢ় সঙ্কল্প যেখানে, মুক্তি সেখানে।”

এরূপ স্পষ্ট নির্দেশেও তাহাদের সংশয় মিটিত না, তাহাদিগকে তিনি একটা ইঙ্গিতে কল্পনা-লোকে প্রেরণ করিতেন—“গয়ায় পাহাড়ের কাছে আশ্রম করবো, তথায় সম্যাসীরা নির্জনে জপ ধ্যান

করতে চাইলে—করবে।’ সংশয়ীর মন আনন্দে গলিয়া নবোৎসাহে মাতিয়া উঠিল।

চাঁদা আদায় করিতে গিয়া কর্মীগণ নানা লোকের সঙ্গে নানা বাজে তর্ক বিতর্কে লাক্ষিত, ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ক্ষুণ্ণ মনে প্রত্যাবর্তন করিল ; ভাবিতেছে—এমন ভাবে এ কাজ কতদিন করিতে পারিব ? এত আত্ম-গ্লানি কতদিন সহিবে ? অমনি ব্রহ্মচারী মহারাজ মধুর হান্তে সম্মেহ দৃষ্টিতে তাহার চিত্তের অবসাদ মুছিয়া নিয়া বলিলেন—“আমরা ত্যাগী সম্মাসী, আমাদের কাজ সাধন-ভজন-তপস্যা—ধর্ম-প্রচার। এইসব সুসেবাকাজ কি আমরা চিরকাল করবো ? আমরা পথ দেখাচ্ছি। দেশের লোকে যখন এইসব কাজের ভার নেবে, তখন আমরা আমাদের কাজ করবো। আত্মরা তো কারো অধীন নই, কারো ছকুমেও আমরা কাজ করিনে। স্বেচ্ছায়, সানন্দে, দেশের কল্যাণের জগু করি। শীঘ্রই এমন ব্যবস্থা করবো—যে যখন ইচ্ছা করবে—তখন সে কিছুদিন নির্জনে বাসপূর্বক সাধন ভজন তপস্যা করবে।”—কর্মীর মনের ম্লানিমা ঘুচিল। প্রাণে অভিনব আশা-কল্পনার চিত্র আঁকিয়া নূতন উদ্দীপনা নিয়া কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িল।\*

জনৈক ব্রহ্মচারীর (১) মনে আবাল্য একটা কল্পনা ছিল—দেশে গুরুগৃহ বা ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠাপূর্বক প্রাচীন বৈদিক আদর্শে বালক বিদ্যার্থীগণকে শিক্ষাদান করিব। বিদ্যাথিগণ—সরল, অনাড়ম্বর, বিলাসহীন কঠোর জীবন যাপন ও বীৰ্য্যধারণে অভ্যস্ত হইবে। তার সেই কল্পনায় ইন্ধন জোগাইলেন—ব্রহ্মচারী মহারাজ। তিনি উৎসাহ দিলেন—খুলনা আশ্রমেই “ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়” স্থাপন কর।

---

\* গয়ার আশ্রম স্থায়ী নিবাস জমিতে স্থাপনের জগু প্রথমে ব্রহ্মষোনি পাহাড়ের নিকট একটি জমি দেখা হইতেছিল।



অপর একজন ব্রহ্মচারী (২) বৈরাগ্য ও নির্জনে সাধন-ভজনের প্রতি অত্যন্ত পক্ষপাতী, জনসেবার কার্যে অরুচি। ব্রহ্মচারী তাহাকে বৈরাগ্য ও নির্জন-সাধন-মূলক উপদেশ ও উৎসাহ দান করিলেন। সে মনে ভাবিল ব্রহ্মচারী মহারাজ ঠিক আমার ভাবের ভাবুক। অপর একজন ব্রহ্মচারীর কল্পনার পরিপোষকরূপে তাহাকে বলিলেন—“তোমাকে পরিব্রাজক প্রচারকরূপে সজ্জ্বর আদর্শ ও বাণী প্রচার করিতে হইবে।” সে ব্রহ্মচারীর উৎসাহবাণীতে উদ্দীপিত হইল।

একজন ব্রহ্মচারীর (৩) সেবাকার্যে ও পল্লী-সংগঠনে বিশেষ অগ্রদূত ; তাহাকে সেই বিষয়ে উৎসাহ দানপূর্বক তার অল্পশ্রুতি কার্যাবলীর প্রশংসা করিলেন ; তাহাতে ব্রহ্মচারীর প্রতি কর্ম্মটির আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পাইল। চিন্তা ও অল্পশ্রীলনের দ্বারা সন্তানগণের হৃদয়ে যাহাতে অভীষ্ট আদর্শ ও ভাব বিকশিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্ত ব্রহ্মচারী মহারাজ একখানি মাসিক পত্রিকা প্রবর্তন করিতে উৎসাহ দিলেন। “ভারত-সেবক” নামে উহা আত্মপ্রকাশ করিল। (৪)।

এমনি ভাবে যাহার যে প্রকার ভাব, তাকে ঠিক তার মনের মত ভাব, পরিকল্পনা, আশ্বাস, উৎসাহ দিয়া তাহাদের শক্তির ও ভাবের বিকাশ ও পরিপুষ্টি লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে নিজের সহিত অচ্ছেদ্যরূপে সংযুক্ত করিয়া নিতে লাগিলেন।

### ত্যাগী কর্ম্মীর জন্ত ব্রহ্মচারীর ব্যাকুলতা

ব্রহ্মচারী মহারাজ—স্থির, গভীর, প্রশান্ত মহাসাগরের ত্রায়, স্বল্পভাবী, কিন্তু তাঁর মুহু অথচ বজ্রগর্ভ ওজস্বিনী বাণীর মধ্য দিয়া তাঁর অন্তরের বাড়বাগ্নি আত্মপ্রকাশ করিত ; সে বাণীতে পাষাণের ত্রায় অমূল্যভূতিহীন প্রাণেও নব ভাব ও উৎসাহের স্পন্দন জাগিত। ব্রহ্মচারীর হৃদয়ে অনাগত ত্যাগী-কর্ম্মীগণের জন্ত ব্যাকুলতা অত্যাগ্রহণীয় উদ্ভিগ্ন ছিল।

সুগ্ৰভার-প্রপীড়িতা জননী যেমন দুগ্ধ-পোষ্য শিশুর জন্তু অস্থির হন ; তিনিও তেমনি তদীয় মহাভাব ও মহাশক্তি ধারণপূর্বক যাহাবা তাঁর অভীষ্ট ধর্মচক্র ও কর্মচক্রে আত্মদান করিবে—সেই সকল আগত ও অনাগত শুদ্ধসত্ত্ব আধার—বালক ও যুবকগণের জন্তু তীব্র ব্যাকুলতায় অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। একটি যুবক একদা আশ্রম-বাসের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে ব্রহ্মচারী স্বয়ং ভীষণ রুষ্টি-বাদলের মধ্যে শেষ রাত্রিতে নদী পার হইয়া ষ্টেশনে গিয়া তাহাকে ষ্টীমারে তুলিয়া দিয়া আসিলেন। এই সামান্য কাজটা যে কেহ করিতে পারিত।

শত শত যুবক স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে আশ্রমের নানাবিধ কাৰ্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহাদিগকে লইয়া ব্রহ্মচারী মহারাজ প্রায়ই বিনিত্র রজনী যাপন পূর্বক তাহাদের হৃদয়ে ত্যাগ-বৈরাগ্যের ভাব ফুটাইয়া তুলিবার জন্তু প্রয়াস করিতেন। যাহাদের মধ্যে কিছু শুভ সংস্কার থাকিত, তাহারা ব্রহ্মচারী মহারাজের এই তীব্র সঙ্কল্পের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিত না। পাঁচ দশ বৎসর ত্যাগীর জীবন যাপনপূর্বক সজ্জের উদ্দিষ্ট কাজ করিতে বাধ্য হইতই।

### সজ্জের সর্বপ্রকার কর্ম্মীর স্থান

ব্রহ্মচারী মহারাজের পরিকল্পিত জাতিগঠন-মূলক কর্ম্মচক্রে সর্বপ্রকার কর্ম্মীরই আবশ্যকতা ছিল ও আছে। সুতরাং তিনি সকল প্রকৃতির কর্ম্মীকেই স্বীয় তপঃশক্তির দ্বারা আকর্ষণ করিতেন এবং যাহার নিকট হইতে যতটা সম্ভব সেবা ও সহায়তা গ্রহণ করিতেন। অবশ্য এই অসংখ্য প্রকৃতির কর্ম্মী-দলকে লইয়া তিনি এবং সজ্জের ভারপ্রাপ্ত ব্রহ্মচারী-সন্ন্যাসিগণ অনেক সময়ে বিপন্ন ও বিব্রত হইয়া পড়িতেন। ব্রহ্মচারীর স্ব-লিখিত একখানি পত্রে দেখিতে পাই—

“.....সংজ্ঞের তপঃশক্তির আকর্ষণে কত স্থান হইতে কত শত লোক আসিবে ; তাহাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্বীয় স্বীয় স্বার্থের ব্যাঘাত হওয়ায় বক্রত-মস্তিষ্কের দ্বারা কত সময়ে কত কি প্রলাপ বকিবে।..... সর্বনিয়ন্তা স্বয়ং তোমাদের সংজ্ঞের পরিচালনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন ; সেখানে কেহ চালাকী চাতুরী করিয়া সংজ্ঞকে কলুষিত করিতে চেষ্টা করিলে বিফলমনোরথ হইবে।

“এ সংজ্ঞ কোনো ( সাধারণ ) আশ্রম, মঠ, Congress Office বা relief centre নয় ; এখানে ঠিক্ ঠিক্ বৈরাগ্যবান্ মোক্ষার্থী ভিন্ন কেহ দৈর্ঘ্য ধরিয়া থাকিতে পারিবে না।”

ব্রহ্মচারী মহারাজের নীতি ছিল যে, তিনি যাহাকে একবার আশ্রয় দান করিবেন, শত অপরাধ করিলেও,—সে নিজে জোর করিয়া আশ্রয় পরিত্যাগ না করিলে, তিনি কদাচ তাহাকে সরাইয়া দিবেন না। উত্তর কালে সহস্র সহস্র লোক তাঁহার বিরাট দেশব্যাপী কর্মযজ্ঞে যোগদান করিয়াছিল ; কিন্তু শত অপরাধ, দোষ, ত্রুটি সত্ত্বেও তিনি কাহাকেও আশ্রয়-চ্যুত করেন নাই। অবশু এখানকার কঠোর সংযম-মূলক আবহাওয়া যখন সহ্য করিতে পারে নাই, তখন আত্মগ্লানিতে অভিভূত হইয়া আপনা হইতে বহু কর্মী চলিয়া গিয়াছে। সে ক্ষেত্রেও ব্রহ্মচারী আশা-আশ্বাস-উৎসাহ, আদর-যত্ন-স্নেহ দিয়া সংশোধনের সর্বপ্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে বলিতেন—  
“কোথায়ও যার আশ্রয় নেই, তার আশ্রয় আমার সংজ্ঞ : আমার সংজ্ঞের আশ্রয়ে যে থাকতে পারবে না, দুনিয়ার কোথায়ও তার আশ্রয় নেই।”

কর্মীগণের এমন কল্যাণকামী দরদী-মরমী ব্যথার বাথী আর কোথায় মিলিবে ? প্রত্যেক কর্মীর ধারণা ছিল—সেই-ই ব্রহ্মচারী মহারাজের

সর্বাপেক্ষা প্রিয়। কর্ম্মীগণের কতজনকে গর্ব্বভরে বলিতে শুনিয়াছি—  
“আমি বাবার আফ্লাদে পোলা!( আছুরে ছেলে ); আমার সঙ্গে তাঁর  
আলাদা সম্বন্ধ।”

যে সময়কার কথা বলিতেছি—( ইং ১৯২২-২৩-২৪ ) তখন আমরা  
ব্রহ্মচারী মহারাজকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতাম—যেমন অভিভাবকের  
প্রতি ছেলেদের থাকে। শিষ্যের মতন অল্পবয়স, শরণাগত হইয়া  
তাঁকে গুরুরূপে বরণ করিবার মত ভক্তি-প্রবণতা আমাদের মধ্যে আসে  
নাই।

ব্রহ্মচারীমহারাজকে গুরুরূপে গ্রহণ না করিলেও এই সময়ে আমাদের  
ভজনের আগ্রহ-আকুলতা ছিল, এবং সেই আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষার প্রেরণায়  
আমরা স্বীয় স্বীয় কুটীরে সাধন-ভজন করিতাম। নৈকে মাঝে মাঝে  
অনাহারে অনিদ্রায় জপ-ধ্যানাদির উৎকট চেষ্টা করিতে করিতে দেহ ও  
মস্তিষ্কের বিপর্যায় ঘটাইয়া বসিত ও সাময়িক উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করিত

### সঙ্ঘের নামকরণ ও ব্রহ্মচারীর ‘আচার্য্য’ পদবী গ্রহণ

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে মাঘী পূর্ণিমায সকলে যোগদান করে।  
উৎসবান্তে ব্রহ্মচারী মহারাজের নায়কত্বে যে আলোচনা-সভা বসে তাহাতে  
তদীয় অভীষ্ট সঙ্ঘের নাম “ভারত সেবাস্রম সঙ্ঘ” নির্দ্ধারিত হয়।  
সঙ্ঘের আদর্শ, উদ্যোগ ও কর্ম্মপদ্ধতিসূচক যে সব কাগজপত্র প্রস্তুত হইল  
উহাতে প্রতিষ্ঠাতা ব্রহ্মচারীর নামের আদিতে “আচার্য্য” অভিধাটা  
বশাইবার জগু তিনি স্বয়ং নির্দেশ দান করিয়া বলেন—“সঙ্ঘ, সমিতি,  
আশ্রম, মঠ তো আজকাল রামা গ্রামা—সকলেই করে। আমার সঙ্ঘ  
হবে দ্বিতীয় বুদ্ধে সঙ্ঘ। আমি সমগ্র দেশ ও জাতিকে বুদ্ধ শব্দ-  
চৈতন্যের মত নূতন আদর্শ ও তপঃশক্তিতে সঞ্জীবিত করিতে চাই।”

স্বয়ং আচরণ করে যিনি শিক্ষা দেন তিনিই আচার্য্য। এ যুগে ব্যক্তি, সমাজ, জাতির পক্ষে যা' কল্যাণকর, আমি তা' আমার চিন্তা, বাক্য, কার্যের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলে শিখিয়ে দেখিয়ে যাব। গুরু অনেকে হতে পারেন, কিন্তু আচার্য্য আসেন এক এক যুগে এক এক জন।

“ভারত সেবাত্রম সঙ্ঘ” নাম নির্মাচন প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন—“আমি সঙ্ঘ-শক্তি সৃষ্টি করতে চাই, স্মতরাং নামের মধ্যে সঙ্ঘ-শক্তিসূচক শব্দ থাকা চাই। সমগ্র ভারত এই সঙ্ঘের কর্মক্ষেত্র, ভারতীয় জাতীয়তার পুনর্গঠন—এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য, স্মতরাং ‘ভারত’ কথাটি রাখা আবশ্যক। সনাতন বৈদিক আদর্শ হবে—এই সঙ্ঘের ভিত্তি, স্মতরাং ‘আত্মা’ শব্দটিও বাদ দেওয়া চলবে না। জাতি-সমাজ-ব্যক্তির সর্ববিধ সেবাই সঙ্ঘের কার্য্য; স্মতরাং ‘সেবা’ কথাটিও থাকবে।”

### আত্মগঠনের সাধনায় শুদ্ধতা ও বিঘ্ন-বিপদ

বহুবিধ সেবামূলক কার্য্যাবলীর মধ্যেও নবীন ব্রহ্মচারীগণের আত্মগঠনের প্রচেষ্টা কিরূপ চলিতেছিল—তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পূর্বেই দিয়াছি। কিন্তু সাধনার পথ—আত্মোপলব্ধির পথ তো কুসুমাকীর্ণ নয়। বরং প্রাতি পদে পদে অবিরাম সংঘর্ষ ও সংগ্রাম। আত্মগঠনের আগ্রহ, আকুলতা ও প্রচেষ্টা যত বেশী, সংগ্রামের তীব্রতা তত অধিক।

কিছুদিন বেশ আনন্দে কাটে—জপে আনন্দ, উপাসনা-কীর্তন-স্তবপাঠে আনন্দ, কর্ম্মে উৎসাহ, অধ্যয়নে আগ্রহ, শরীর-চর্চায় ও নানাবিধ কার্য্যে নিয়মাত্মবর্ত্তিতা,—সবই সরস, সুন্দর। কিন্তু ক্রমে শুদ্ধতা হৃদয় অধিকার করে, সমস্ত কার্য্যই তিক্ত হইয়া দাঁড়ায়; ঔষধ গিলিবার মত কোনো ক্রমে করিয়া যাওয়া হয়। অন্তরে রিপু ও



সন্ন্যাসী-দৃষ্টি সংগঠক  
আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ



ইন্ডিয়ের উৎপীড়ন শুরু হয়। প্রাণমন জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠে। কিছুদিন এমনিভাবে চট্‌ফট্‌ করিবার পর আবার সরসতা ও উৎসাহ ফিরিয়া আসে। নবীন ব্রহ্মচারীগণের জীবনে এই উঠানামা চলিতেছিল। বুদ্ধদেবের গ্রাম অবতার-কল্প জগদগুরুগণের সাধন-জীবনেও “মারের” উৎপীড়ন দেখা গিয়াছে; স্তব্ধ সাধারণ সাধকের কা কণা ?

এই শুষ্কতা ও তিক্ততায় অতিষ্ঠ হইয়া কেহ কেহ নির্জন স্থানে সাধন ভজনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কেহ কেহ তীর্থপর্যটনের দ্বারা শাস্তি খুঁজিলেন, কেহ উচ্চতর সাধকের সহায়তার সন্ধানে ফিরিলেন। কিন্তু ফল কিছু হইল না। তবে লাভ এইটুকু হইল যে সকলেই ক্রমে ক্রমে বুঝিলেন যে ব্রহ্মচারীর আশ্রয় ছাড়া শ্রেষ্ঠ আশ্রয় আর কোথাও নাই— “শান্তিনিকেতন ছাড়া কোথা শান্তি পাবে বল ?” ব্রহ্মচারীর চিহ্নিত লীলা-সঙ্গী যারা, তারা তাঁহাকে ছাড়িয়া কোথায় কেমন করিয়া থাকিবে ? তাঁহার অলৌকিক আকর্ষণ সকলকে অনতিবিলম্বে ফিরাইয়া যথাস্থানে আনিয়ন করিল। সকলেই বুঝিলেন—যেখানে যাই ন। কেন—অস্তুর্দ্বন্দ্ব সঙ্গে সঙ্গে চলিবেই। নির্জন অরণ্যে বা পর্বত-গহবরে গিয়াও নিষ্কৃতি নাই।

নবীন ব্রহ্মচারীগণের বিপদ যে শুধু ভিতরেই ছিল—তা নয়। বাইরের বিপদও কম ছিল না। সংসারত্যাগী নবীন ব্রহ্মচারীগণের আত্মীয়-স্বজনগণ নানা অছিলায় অবিরত চেষ্টা করিত—হলে বলে কৌশলে তাহাদিগকে গৃহে ফিরাইয়া নিতে। গোপনে আকস্মিকভাবে ধরিয়া নিতেও বহু ক্ষেত্রে চেষ্টা করিয়াছে। এমনিতর জোয়ার ভাঁটার মধ্য দিয়াই ব্রহ্মচারী মহারাজের অভীষ্ট চিহ্নিত সন্তানগুলি আসিয়া ক্রমে ক্রমে সজ্জকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতেছিল।



### নবীন ব্রহ্মচারীদের বেদান্তবাদ

নবীন ব্রহ্মচারিগণ এই সময়ে অতিমাত্র বেদান্তবাদী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কেহ ১০৫° জরের মধ্যেও ‘পান্তো ভাত’ খাইয়া স্নান করিয়া বিচার করিত “জর আমার নয়, শরীরের; আমার কি যাঘ আসে?” বেদান্ত-বিচারের তোড়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা ইত্যাদি প্রায় ভাসিয়া গেল। যদিও আশ্রমে সকালে সন্ধ্যায় স্তবপাঠ, কীর্তনাদি হইত; উহাকে অবশ্য কর্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতাম না। বরং ধারণা জন্মিয়াছিল—যাহারা উচ্চতর বিচার ও সাধনার অনধিকারী, তাহাদের পক্ষে উহা প্রয়োজনীয় বটে; শাস্ত্রীয় নজীর উদ্ধৃত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা হইত—

\* “উত্তমো ব্রহ্মসদভাবো ধ্যানভাবস্ত মধ্যমঃ ॥

স্তুতিজপোঃধমো বাহপূজা ধমাদমা ।”

সুতরাং বাহপূজা—যাহা “ধমাদমা” তার মধ্যে যাইব কেন? এমনি চিন্তাই তাহাদের চিত্ত অধিকার করিতেছিল। অবশ্য অচিরকাল মধ্যে বুঝিয়াছিল—“ধমাদমার” অধিকারও তাহাদের তখন হয় নাই; এবং এই বাহপূজার হাতে খড়ি দিয়াই তাহাদিগকে ধর্মজীবনের পত্তন করিতে হইয়াছিল; সমগ্র জীবনকে নূতন করিয়া ঢালিয়া সংজ্ঞিতে হইয়াছিল;—ক্রমে তাহা লক্ষ্য করিব।

ব্রহ্মচারী স্বীয় আশ্রিত সম্ভানগণের কার্য-কলাপ আচরণগুলির উপর সাক্ষাৎভাবে হস্তক্ষেপ না করিলেও ইঙ্গিত-উপদেশাদির দ্বারা পরোক্ষভাবে তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন। ক্রমে

\* ব্রহ্ম সত্যায় ভূবিয়া থাকা উত্তম; ধ্যান-ধারণা মধ্যম; স্তুতিজপ অধম এবং বাহ পূজা—পুষ্প চন্দন ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদির দ্বারা পূজা অধমেরও অধম।

ক্রমে তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও দায়িত্ব সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা ও গুরুত্ব-বোধ বৃদ্ধি পাইল। পূর্বাশ্রমের স্মৃতি ও সংস্কারগুলি তিস্তপট হইতে প্রায় মুছিয়া গেল। স্বাভাবিক ভাবেই তখন তাহাদের হৃদয়ে সন্ন্যাস লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইল। ব্রহ্মচারী মহারাজ স্বয়ং তাহাদের নির্দিষ্ট কয়েকজনের এই আগ্রহকে অনুমোদন করিলেন।

### ব্রহ্মচারী মহারাজের সন্ন্যাস গ্রহণ

ব্রহ্মচারী মহারাজ তাঁহার ভবিষ্য উত্তর সাধকগণের জীবনগঠনের প্রাথমিক পক্ষ লক্ষ্য করিতে করিতে ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করিতেছিলেন। কাল অমুকূল ও পরিপূর্ণ দেখিয়া তিনি ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রয়াগধামে অর্দ্ধকুস্ত্র মেলায় গমন করেন। তথায় স্বামী গোবিন্দানন্দ গিরি নামক জনৈক সন্ন্যাসী গুরুর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্বক “আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ” নাম গ্রহণ পূর্বক বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এখানে দুটি প্রশ্ন উঠিতে পারে:—

- (১) তিনি পূর্বেই সন্ন্যাস গ্রহণ কেন করেন নাই ?
- (২) অজ্ঞাত-পরিচয় সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্ন্যাস তিনি কেন গ্রহণ করিলেন ?

এ সম্বন্ধে তাঁকে কোনোদিন প্রশ্ন করি নাই, তিনিও স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া কোনো কৈফিয়ৎ দেন নাই। তবে বিচারে ইহাই বুঝি যে—তিনি নিত্যসিদ্ধপুরুষ, আজন্ম সন্ন্যাসের পূর্ণ অবস্থা তাঁর জীবনে প্রকট; সুতরাং তাঁর পক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ—একটা লৌকিক ও শাস্ত্রীয় প্রথা রক্ষা করা মাত্র; সুতরাং তাহা প্রয়োজনানুসারে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর কোনো পরিচিত মণ্ডলেশ্বর বা সাম্প্রদায়িক গুরুর নিকট তিনি সন্ন্যাস নেন নাই—এইজন্য যে তিনি বর্তমান

সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের গতাহুগতিকতা ভাঙিয়া সন্ন্যাসের যুগোপযোগী আদর্শ দেখাইবার জন্য নবীন সন্ন্যাসী-সম্মত গঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গৌরাক্ষ মহাপ্রভুও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন একজন সাধারণ সন্ন্যাসীর নিকট। গৌরাক্ষ প্রভুকে সন্ন্যাস দিয়াই কেশব ভারতী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। মহাপ্রভুও সন্ন্যাসীর রাজা প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে সংশোধন করিয়া সমগ্র সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন প্রেরণা দান করিয়াছিলেন।

### সঙ্ঘের ত্যাগী সন্তানগণের সন্ন্যাস

মাঘী পূর্ণিমার শুভক্ষণে সমবেত সঙ্ঘ-সন্তানগণের মধ্যে পূর্বনির্দিষ্ট কয়েকজন ব্রহ্মচারী সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। শাস্ত্রীয় বিধি-অমুখ্যায়ী সংযম, উপবাস, মুণ্ডনাদি সমাপনান্তে শ্রাদ্ধতর্পণাদি সম্পন্ন হইল। বৈদিকমন্ত্রে অগ্নি স্থাপন পূর্বক অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সমাপনান্তে সকলের শিখাসূত্রাদি কর্তন পূর্বক গৈরিক-রঞ্জিত কোপীন-বহির্কাসাদি দান করিলেন। পরে এক এক জন করিয়া সিদ্ধপীঠে ডাকিয়া নিয়া সন্ন্যাস-মন্ত্রাদি দান পূর্বক সন্ন্যাস নাম দিলেন। সন্ন্যাস দানকালীন আচার্য্যদেব নবীন সন্ন্যাসিগণকে বলিয়াছিলেন—“আমি যার কাছে মাথা বিকাইয়াছি সেই বাবা গভীরনাথজীর গ্রাম অসীম যোগৈশ্বর্য্যশালী মহাপুরুষ—যাঁর ইচ্ছায় চন্দ্রসূর্য্য কক্ষচ্যুত হতে পারতো—তিনি যদি আজ এখানে উপস্থিত থাকতেন তবে তিনিও—আমি কি করিতে যাইতেছি—তাহা বুঝিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।”—এই কথাটা তিনি কেন এবং কী অর্থে বলিয়াছিলেন তাহা তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করি নাই। তবে আমরা বুঝিয়াছিলাম যে তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে এবং সঙ্ঘ-সন্ন্যাসীর জীবনের গুরুত্ব ও দায়িত্ব বিষয়ে তাহাদের ধারণা ও চিন্তাধারাকে উচ্চে তুলিয়া ধরিবার

দ্রষ্টা তিনি ইহা বলিয়াছিলেন। সন্ন্যাস দানকালে তিনি প্রত্যেক সন্তানকে যখন শক্তি-সঞ্চার করেন, তখন তাহারা অন্তরে অদ্ভুত প্রভাব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। জৈনিক সন্ন্যাসীর নিকট শুনিয়াছি যে তর্জিনী, মধ্যমা, অনামিকা—তিনটি অঙ্গুলী দ্বারা যখন আচার্য্যদেব তাহার মস্তক স্পর্শ করিলেন তখন মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া যেন বৈদ্যুতিক তরঙ্গ খেলিয়া গেল এবং সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার বহুকালের অন্তর্দ্বন্দ্ব—সংশয়-সন্দেহ, অ বিশ্বাস-তর্ক-যুক্তি ইত্যাদির বেগ স্তব্ধপ্রায় হইয়া মনোবৃত্তিগুলি আচার্য্যের ভাবের একান্ত অঙ্গুকুল হইয়া উঠিল।

। এই শুভদিনে মহাত্মা ভোলানন্দ গিরি মহারাজ বাজিতপুর আশ্রমে শুভ পদার্পণ করেন। তিনিও আচার্য্যদেব একই আসনে পাশাপাশি সমাসীন হইলে গিরি-মহারাজের জৈনিক সন্ন্যাসীশিষ্য আরতি করিলেন। স্তবপাঠ শেষ হইলে পর তরুণ সন্ন্যাসিগণ একে একে প্রণাম নিবেদন করিতে থাকিলে আচার্য্যদেব এক এক জনের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক গিরিমহারাজের নিকট পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন।

আচার্য্যদেবের অভীষ্ট নববৃগের আদর্শ সন্ন্যাসি-সজ্জের ভিত্তি পত্তন হইল।

\*

\*

\*

\*

সকল-আরুঢ়

ত্যাগ-ব্রতীন্দল

জালিলেক হোমানল

সমস্তরে সবে

মন্তপূত করি

আহুতি দানে কেবল।

জীবনের যত

ফামনা-বাসনা

শুভাশুভ স্থগ-জুগ,

দেহমন-প্রাণ

পুণ্য ও পাপ

লাভালাভ ভুলচুক,

ষড়রিপুগণ

ইন্দ্রিয়-মন

বুদ্ধি-অহঙ্কার ;—

ব্রহ্ম-অগ্নি

দহি দহি কর

নিঃশেষে সংহার।

বিরজ বিপাপ      শুদ্ধ আত্মা      নগ্ন নিঃসংশয়,  
বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে      আলোকিত হোক      জীবন অমৃতময়।”

\*

\*

“নিয়ন্তার শুভ আশীৰ্বাদে  
খুলে দিচ্ছ নিজ হাতে তাই  
জগতের কল্যাণ সাধনে  
তোমাদের জীবন-সাধনা  
জগতের মহামলিনতা  
জীবন ভরিয়া হবে তাই  
যে সজ্জের সেবাত্রেতে সবে  
কোটা কোটা মানবের তরে  
ত্যাগে প্রেমে সেবার অমৃতে  
বিরচিত হবে জাতীয়তা  
মনে রেখ ক্ষুর-ধার সম  
সজ্জনেতা-শুভদৃষ্টিপাতে

ধন্য জন্ম তোমা সবাংকার ।  
সন্ন্যাসের মহামুক্তি-দ্বার ।  
মানবের মহামুক্তি তরে,  
অমৃত বিলাবে ঘরে ঘরে ।  
ঘুচাবারে তোদের জনম ।  
রক্ত বিন্দু করিতে মোক্ষণ ।  
দীক্ষা আজি করিলে গ্রহণ  
সেই সজ্জ হয়েছে স্বজন ;  
বিন্দু বিন্দু শক্তি গাঁথিয়া  
অভিনব বিশ্বমানবতা ।  
এই পথ দুর্গম কঠিন ;  
শুধু তাহা হবে বাধা-হীন ।”



## জন-সেবাকে

### ধর্ম-সেবা ও সমাজ-সেবায় রূপদান

#### সেবার ব্যাপক রূপ

গোমুখী-গহ্বর-নির্ধারিত ক্ষীণ জাহ্নবীধারা চলিতে চলিতে ক্ষুদ্র  
দৃশ্য অসংখ্য নিব্বা-ধারায় পরিপুষ্ট ও পরিবদ্ধিত ও উপনদীর প্রবাহ-  
সমূহের সহিত যুক্ত হইয়া বিরাট ভাগীরথীরূপে উদ্ভাল তরঙ্গ-রঙ্গে  
প্রবাহিত হইতেছেন ; ব্রহ্মচারীর হৃদয়-গোমুখী হইতে ক্ষরিত ঐশী  
করণার জাহ্নবী-প্রবাহ জীব-সেবার খাতে বহিয়া বহিয়া পারিপাশ্বিক  
অনুকূল শক্তিগুলিকে আত্মসাৎপূর্ব্বক ক্রমশঃ বিরাটতর প্রবাহে উদ্ভেল  
হইয়া ছুটিল ।

“বিশ্বময় দুঃখ ক্লেশ প্রতিটী স্পন্দনে

দণ্ডে শতবার

জাগায় ক্রন্দন মম বৃকে নর্ম্মঘাতী

বেদনা অপার ।”

তাই জনসেবার নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র খাতের দৃকুল প্রাবিত করিয়া  
উচ্ছ্বসিত করুণা-প্রবাহ সমাজ-সেবার বিস্তীর্ণতর পথ করিয়া নিল ।

‘সেবা’ সম্বন্ধে লোকের সাধারণতঃ ধারণা—দুর্ভিক্ষ, প্লাবন,  
মহামারী প্রভৃতি দৈব-দুর্কিপাকে পীড়িত নরনারীর—অন্ন, বস্ত্র, অর্থ,  
ঔষধপত্রাদির দ্বারা সহায়তা দান । রামকৃষ্ণ মিশনের “নরনারায়ণ সেবা”  
ও “দরিদ্র নারায়ণ সেবা”—জনসাধারণের মনে সেবার উক্ত রূপটী  
আঁকিয়া দিয়াছে ।

কিন্তু মানুষ বলিতে কি শুধু দেহটাকেই বুঝি? গোটা মানুষটির মধ্যে আছে—দেহ, মন, বুদ্ধি ও জীবাত্মা। সুতরাং অন্নবস্ত্রাদির সাহায্যে মানুষের যে শারীরিক সেবা তাহা সেবার আংশিক রূপ। মানুষের সর্বাঙ্গীন সেবা হয় তখনই যখন মানুষের দৈহিক অভাবের সহিত তার মন, বুদ্ধি, আত্মার দাবী পূরণের ব্যবস্থা হয়।

মানুষের জীবনের একাংশ যেমন ব্যক্তিগত, তেমনি তার জীবনের—পারিবারিক, সামাজিক, ধার্মিক, রাষ্ট্রিক—বিভিন্ন দিক আছে। মানুষের শুধু ব্যক্তিগত জীবনের শিক্ষা-দীক্ষা-দায়িত্ব-বোধ জাগাইয়া দিয়া সেবার কায সম্পূর্ণ হয় না; পরন্তু পারিবারিক, সামাজিক, ধার্মিক, রাষ্ট্রিক জীবনের সেবা অত্যাवশ্যক।

আমরা লক্ষ্য করিব—সজ্জ-নেতা আচার্য্যদেব কিরূপে জনসেবাকে ধার্মিক ও সামাজিক সেবার রূপদান করিয়াছিলেন এবং দৈহিক সেবার সহিত জাতির মুনোবুদ্ধি-আত্মার সেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেবার আদর্শকে সার্বজনীন ও সার্বভৌমিক করিয়া জন-সেবাকে সমাজ-সেবার আকৃতি দান—সজ্জ-নেতা আচার্য্যদেবের অনন্ত-সাধারণ অবদান। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা তাহাই লক্ষ্য করিব।

### সজ্জের কর্ম-বিস্তার

১৯২২ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে মাদারিপুরে বণ্টা হয়; আচার্য্যদেব স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং কলিকাতাস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহায়তায় দীর্ঘকালব্যাপী সেবাকার্য্যের ব্যবস্থা করেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তখন এতদঞ্চল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। বহু যুবক এই সেবাকার্য্যে অংশগ্রহণ করে; উহাদের মধ্যে কতকগুলি যুবক আচার্য্যদেবের জলন্ত উপদেশ ও প্রেরণায় ত্যাগের পন্থা বরণপূর্ব্বক সজ্জের আশ্রয় গ্রহণ করে। উহার মধ্যে একটি বালক খুব সরল, কর্ম্মঠ ও আমুদে ছিল।

আচার্য্যদেব তাহাকে তাঁহার চিকিত্ত সন্তান বলিয়া চিনিতে পারেন।  
বালকটি প্রথম দিবস প্রায় সাতাটী দিন আচার্য্যদেবের সঙ্গে সঙ্গেই  
ছিল। রাত্রিতে যখন তাঁর পাদ-সন্ধান করিতে গিয়া পায়ের মাংসপেশী  
লোহের গ্রায় শক্ত অনুভব করিল, তখন সে বাহিরে আসিয়া তাহার  
পরিচিত একটা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিল—“তুই যে ব্রহ্মচারীপ কথা  
বল্লি, তিনি কোথায়?” ছেলেটা বলল—“কেন? তুই যে সারাটা

• সম্মান নাম স্বামী শঙ্করানন্দ; বিদ্যা-বুদ্ধি তেমন কিছু না  
থাকিলেও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সরস হাস্য-কৌতুক দ্বারা যে সকলকে  
বশীভূত করিত। তর্কে তাহাকে কেহ আঁটিতে পারিত না। যুক্তি  
তর্কের ধার বড় ধারত না। একদা কোনো সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি  
তাকে বলে—“দেখুন! আমাদের রম-তত্ত্ব সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ।” শঙ্করানন্দ  
তুরূপ জবাব দিল—“মশায়! আমাদের রম-তত্ত্ব সকল তত্ত্বের উপরে।  
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই তত্ত্ব এড়াতে পারেন নি!”

আচার্য্যদেবের নিকট সে বালকের গ্রায় নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার করিত  
এবং আলাপে ব্যবহারে হাস্যরসের অবতারণা করিত। একবার  
অসুস্থ থাকা কালীন আচার্য্যদেব একটা মোড়া ওয়াটারের কিছুটা খাইয়া  
বোতলটী শঙ্করানন্দকে দিয়া বলেন “নে, খেয়ে ফেল্”; সে অমনি  
“জয় ভোলা, জয় ভোলা” বলিয়া এক চুমুকে খাইয়া মাতালের  
ভঙ্গীতে বোতলটী ঠুকিয়া মেঝের রাখিল।

১৯২২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ—এই ২০ বৎসর যাবৎ সে সজ্জের  
অমুরক্ত সেবক সন্তানরূপে সজ্জের কাণ্ডে নিরত থাকিয়া ১৯৪২  
খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে সজ্জ-সিদ্ধ-পীঠে দেহত্যাগ করে। মৃত্যুর পূর্বে  
দেড় বছর যাবৎ সে সিদ্ধপীঠে আচার্য্যের সমাধি-মন্দিরে সেবাপূজার  
জীবন কাটাইয়াছিল।



দিনট তাঁর কাছে আছিল!” তখন সে বিস্মিত হইয়া বলিল—“ও হরি! তা’হলে এই তোর ব্রহ্মচারী! আমি তো এতক্ষণে মনে ভেবে আসছি—এক বুড়া মাতাডী (বৃদ্ধা মাতাজী); পায়ের মাসল (মাংসপেশী) শক্ত দেখে আমার সন্দেহ হলো।” এই ছেলেটি আচার্য্যদেবের খুব প্রিয় ও ভক্ত ছিল। আচার্য্যদেবের রূপালাভ করিয়া সে সজ্জের সন্ন্যাসীগণের মধ্যে অগ্রতম হইয়াছিল। ছেলেটি যেমন কৰ্ম্মঠ, তেমনি কৌতুকপ্রিয়। অনেক সময়ে হাস্য-সরস কৌতুকালাপ দ্বারা সে আচার্য্যদেবকে অনাবিল আনন্দ দান করিত।

সজ্জের কৰ্ম্মক্ষেত্র ও কার্য্যাবলী হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিতেছে। সজ্জের সন্ন্যাসী ও কৰ্ম্মীগণ দায়িত্ব গ্রহণপূৰ্ব্বক নব নব কার্য্যের সূচনা করিতে লাগিল। ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দে সূন্দরবন অঞ্চলে গ্রাম-সংগঠন কার্য্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রশংসা অর্জন করিল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে স্মরণীয় উত্তরবঙ্গ বন্যায়—আচার্য্যদেব বহু কৰ্ম্মীসহ যোগদান করেন। উক্ত সালে মে মাসে নওগাঁ মহকুমায় ব্যাপক কলেরা মহামারীর সেবাকার্য্যের ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে পায়ে ইঁটিয়া দুর্গম পল্লী পথে এক একদিন ২০।২৫ মাইল পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াছেন—শুনিয়াছি।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মাদারিপুৰ আশ্রমে “ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়” প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন গুরুগৃহের আদর্শে বালক বিদ্যার্থীগণকে বিলাস-হীন, কৰ্ম্ম-পরায়ণ, স্বাবলম্বী, কঠোর সংযমময় জীবন যাপনের সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী পাঠ্য শিক্ষা দেওয়া হইত।

উক্ত সালের আগষ্ট মাসে আচার্য্যদেব নওগাঁতে “উত্তরবঙ্গ সেবাপ্রায়” প্রতিষ্ঠা করেন; “পরে নাটোরের কালাজর সমিতি” প্রতিষ্ঠিত হয়; তৎপরে কিছুদিন পরে দিঘাপাতিয়ার দানশীল কুমার

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ‘রাজসাহী ট্রডেন্টস হোম’ স্থাপিত হয়। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আচার্যদেব প্রয়াগধামে অর্ধকুম্ভ মেলায় গমন করেন। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সমাজ-সেবার আদর্শ ও দায়িত্ব গ্রহণের প্রেরণা দান তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।\*

### গয়া সেবাশ্রম

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে আচার্যদেব সজ্জের বিপ্যাত “গয়া সেবাশ্রম” প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে গয়ায় তীর্থ-যাত্রীগণের উপর গয়ালী পাণ্ডাদের অত্যাচার চরমে উঠিয়াছিল। জুনমাসে কতকগুলি যাত্রীর উপর অমানুষিক অত্যাচার এবং একটি মহিলা যাত্রী নিহত হয়। স্থানীয় রায় বাহাদুর ওপূর্ণচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে আহত “Bengali

\* উক্ত সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী দৈনিক “ফরোয়ার্ড” এই উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত প্রকাশ করিয়াছিল :—

“Swami Pranabauanda, founder of the Bharat Seva Ashram Sangha, had been for a few days in Calcutta on his way from Ardh Kumbh. This young Sannyasi living a life of sacrifice and service has been doing much for the relief of our depressed masses ; he came accross some young souls full of sacrifice and Vedic culture, at Ardh Kumbh, who were anxious to join their hands with him for serving the deserving humanity in the way he was doing in Bengal.”

অনুরূপ মন্তব্য অন্যান্য বাঙ্গলা, ইংরাজী, হিন্দী প্রায় সমস্ত কাগজেই প্রকাশিত হয়।

Settlers Association" এর একটি অধিবেশনে গৃহীত একটি প্রস্তাবানুযায়ী এই অত্যাচার-কাহিনী সংবাদপত্রে প্রকাশ পূর্বক প্রতীকারের জন্ত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট আবেদন করা হয়।

আচার্য্যদেব পূর্ব হইতেই সঙ্কল্পিত ছিলেন। এই আহ্বান প্রাপ্তি মাত্র তিনি কয়েকজন সন্ন্যাসী ও স্বেচ্ছাসেবক লইয়া স্থানীয় ব্যক্তিগণের উৎসাহে ও সহায়তায় “গয়া সেবাশ্রম” স্থাপন করিলেন। গয়ালী পাণ্ডাগণের জুলুম ও অত্যাচার নিবারণ এই আশ্রমের মূখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, ইহার কর্মপদ্ধতি কোনো হিংসা বা বিদ্বেষ-মূলক পন্থায় কখনো অগ্রসর হয় নাই। এই সময়ে তারকেশ্বরের মোহাস্তকে গদীচ্যুত করিবার জন্ত মহাবীর দলের সত্যাগ্রহ চলিতেছিল। গয়ালীরা মনে ভাবিয়াছিল—সেই আন্দোলনেরই একটি তরঙ্গ গয়ায় আসিয়া পৌছিয়াছে—গয়ালী পাণ্ডাগণের “পাণ্ডাগিরি” খসাইবার জন্ত। কিন্তু আচার্য্যদেব সে পন্থা গ্রহণ তো করেন নাই; বরং বলিতেন—“মোহাস্ত বা পাণ্ডাকে সরালে কি হবে? ও পদে যে বসবে—সে-ই ‘সতীশগিরি’ হয়ে দাঁড়াবে! দেশবাসী জনসাধারণের পক্ষ হইতে কোনো ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের ত্যাগী নিঃস্বার্থ কন্মিগণ যদি মোহাস্ত বা পাণ্ডাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে এবং তীর্থযাত্রীদের বিপদে আপদে আশ্রয় ও সাহায্য দিতে থাকে;—তবেই প্রতিকার সম্ভব। রাজ-নৈতিক ফন্দীতে ধর্মস্থান বা তীর্থস্থান সংস্কার হতে পারে না। এরূপ চেষ্টাতে এক দুর্ভূক্তের স্থানে ণত দুর্ভূক্তের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।” তাই আচার্য্যদেব সম্পূর্ণ নিষ্কিরোধ সেবা ও সংগঠন-মূলক পন্থা গ্রহণ পূর্বক যথার্থ সংস্কার ও সংশোধনের উপায় এই—“গয়া সেবাশ্রমের” মধ্য দিয়া দেখাইয়াছেন।

তদানীন্তন ষাণ্মাসিক সংবাদপত্রগুলিতে গয়ার পাণ্ডাদের অত্যাচার

মহাত্মীয় সংবাদ ও তীব্র মন্তব্য এবং গয়া সেবাশ্রমের প্রশংসনীয় উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী প্রকাশিত হইতেছিল। গয়া সেবাশ্রমের মূল উদ্দেশ্য শুধু যাত্রীগণের রক্ষণাবেক্ষণ নয়, পরন্তু তীর্থের সংস্কার—তীর্থস্থানের বহুশতাব্দব্যাপী অনাচার কদাচার ব্যভিচারকে দূরীভূত করিয়া পবিত্র ধার্মিক আবহাওয়ার প্রতিষ্ঠা;—তাহাও সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিত হইয়াছিল।

১৯২৪ সালে সার্ভান্ট পত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্য উদ্ধৃত হইল :—

“.....The Bengali residents issued an appeal in response to which a branch of Bharat Sevasram Sangha under the name of “Gaya Sevasram” is going to be established. As we have said above, the Ashram will not only seek to minister to the comforts of the Pilgrims and help them in distress but to create a moral and spiritual atmosphere and a spirit of self-reliance through this mission.

দৈনিক ফরোয়ার্ড ( ১১ই জুলাই ) পত্রে প্রসঙ্গতঃ মন্তব্য প্রকাশিত হয় :—

“The Pandas may at the outset misunderstand and create disturbance by opposing the movement, but at the end are bound to come round and Co-operate with the Seva Ashram.”—হইয়াছিলও তাই।

গয়ালী পাণ্ডারা প্রথম কয়েক বৎসর আশ্রমের কার্যাবলীর বিরোধিতা করিতে চেষ্টা ও আশ্রমের সন্ন্যাসী ও কর্মীগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিত;—বিবাদ বিসম্বাদ বাধাইতে চেষ্টা করিত। একবার স্বেচ্ছাসেবকসহ যাত্রীকে ধরিয়া নিয়া আটকাইয়া রাখিয়াছিল। মামলাও এজন্ম ২১ টা করিতে হইয়াছে। কিন্তু আশ্রমের কার্য-

ধারা কদাচ বিদ্বেষের পথ অবলম্বন করে নাই। ক্রমে ক্রমে পাণ্ডাগণ আশ্রমের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পরিত্যাগ করিয়া সহযোগিতার ভাব গ্রহণ করে দুইটি কারণে :—

( ২ ) সেবাশ্রমের উদ্দেশ্য পাণ্ডাদের স্বার্থের বিরোধী নয়—বুঝিল।

( ২ ) সেবাশ্রম অত্যল্পকালের মধ্যে সমগ্র হিন্দু-জনসাধারণের সাহায্য ও সহায়ভূতি পাইয়া বিরাট আকার ধারণ করিতে দেখিয়া বুঝিল—“সেবাশ্রম” সমগ্র হিন্দুজাতির আশ্রম।

এই সালেই সেপ্টেম্বর মাসে পিতৃপক্ষ উপলক্ষ্যে গয়ায়—সমাগত লক্ষ লক্ষ নরনারীর সেবাকার্যের বিরাট আয়োজন করা হয়। ইহার পূর্বে যাত্রী-সেবাকার্য কদাচ গয়ায় বা কোনো তীর্থস্থানে তেমন হইত না। তদবধি প্রতি বৎসর পিতৃপক্ষে এই সেবাকার্য সজ্জ হইতে চলিয়া আসিতেছে। আচার্য্যদেব জীবিতকাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর স্বয়ং এই সময়ে উপস্থিত থাকিয়া যাবতীয় কার্য নিজে তত্ত্বাবধান করিতেন।

অনতিকাল মধ্যে পাণ্ডারা আশ্রমের বিবিধবিধান স্বীকার করিয়া নিল। আশ্রমের যাত্রিনিবাসে যাহারা আশ্রয় নিত, আশ্রম হইতে নির্দিষ্ট তাহাদের সাধ্যমত ব্যয়ে পাণ্ডারা তীর্থকৃত্যাদি সম্পাদন করিয়া দিত এবং ১২৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গয়ালাই পাণ্ডারা উক্ত বিবি শিরোধার্য্য করিয়াছিল।

১২৩৭ খৃষ্টাব্দে সাময়িক বাঙ্গালী-বিহারী বিরোধকে ইন্ধন স্বরূপ পাইয়া পাণ্ডারা উপরোক্ত বিধির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিল। আশ্রমের যাত্রিনিবাসে আশ্রয়প্রাপ্ত যাত্রীগণের পিণ্ডাদি দানে বাধা দান করিতে লাগিল। আশ্রম হইতে নিযুক্ত পুরোহিত পাণ্ডাদের দ্বারা অপমানিত ও প্রহৃত হইল। তখন আচার্য্যদেব নিরুপায় হইয়া সমগ্র দেশময় জন-আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। বাঙ্গালার সহরে সহরে ও গ্রামে গ্রামে

পাণ্ডাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সভা ও প্রতিবাদ হইতে লাগিল। ষাণ্মাসিক সংবাদ পত্রে উক্ত প্রতিবাদ প্রকাশিত হইতে লাগিল। সংবাদ পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভেও পাণ্ডাগণের অত্যাচারের প্রতিবাদ মূলক সমালোচনা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছিল। এক্রূপ এক মাস তীব্র আন্দোলন চলিল। ফলে গয়ায় যাত্রী-সমাগম অত্যন্ত কমিয়া গেল। তখন পাণ্ডারা বেগতিক দেখিয়া সজ্জনেতা আচার্য্যদেবের চরণে বিনীত ভাবে শরণাগত হইয়া সজ্জের বিধান শিরোধার্য্য করিয়া নিল। গয়াধামে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

### চারণদল বা Procession party

১৯২৪ সালে সজ্জের কলিকাতা কার্যালয় শোভাবাজার হইতে বহুবাজারে স্থানান্তরিত হয়। এই সালেই সাতক্ষীরা (খুলনা) মহকুমায় মহামারী ও মাদারীপুর (ফরিদপুর) মহকুমায় বন্যা উপস্থিত হইলে সজ্জ হইতে সেবাকার্য্যের ব্যবস্থা করা হয়।

১৯২৩-২৪ এই দুইটি বৎসরের মধ্যেই সজ্জের অনেকগুলি স্থায়ী আশ্রম ও প্রতিষ্ঠান স্থাপিত এবং নানাবিধ কার্য্য এত দ্রুত বাড়িয়া গেল যে সজ্জের প্রচুর অর্থাগমের উপায় নির্দ্ধারণের আবশ্যক হইয়া পড়িল। এ ষাণ্মাসিক চাঁদা, ট্রেণে ও ট্রামে বাক্সে আদায় প্রভৃতি যে উপায়ে অর্থসংগ্রহ চলিতেছিল, তাহাতে সজ্জের বৃদ্ধিত ব্যয় সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব। সজ্জনেতা আচার্য্যদেব অর্থ-সংগ্রহের নূতন পন্থা প্রবর্তন করিলেন।

সজ্জের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও কন্মীগণের সহিত আচার্য্যদেব পরিচিত বালক, যুবক ও ছাত্রগণকে মিলাইয়া “চারণদল বা Procession Party” সৃষ্টি করিলেন। শনি ও রবিবারে অধিক সংখ্যক ছাত্রগণ

যোগদান করিত। সন্ন্যাসীগণের নেতৃত্বে এই চারণ দল হারমোনিয়ম, খোল, করতাল, ফ্লুট ইত্যাদি সহকারে দেশ ও জাতির গৌরব-সূচক গান করিতে করিতে কলিকাতার রাজপথে চলিতে থাকিত; দুইজন কন্ঠী একখানি চাদরের চারিকোণ ধরিয়া একটি থলির মত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলিত; কয়েকজন সন্ন্যাসী বিজ্ঞাপন দেখাইয়া গৃহস্থের বাড়ী এবং পথিকদের নিকট হইতে টাকা পয়সা ইত্যাদি চাহিয়া থলিতে জমা-করিত। প্রথম প্রথম কলিকাতা সহরেই চারণ-দল ভিক্ষা করিত; পরে সঙ্ঘের কার্য্য বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্দ্ধমান অর্থাভাব পূরণ করিবার জন্ত এরূপে চারণ-দল দেশের সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে প্রেরিত হইত। প্রথমে এরূপ দুইটি দল গঠিত; পরে ক্রমে ক্রমে দশটি দল গঠিত হইয়াছিল।

“চারণ-দলের” কণ্ঠে কণ্ঠে গীত জাতির অতীত মহিমা-গরিমার সঙ্গীত \* মূর্চ্ছনা এমনি ভাবের তরঙ্গ জাগাইত যে অত্যন্ত নীরস পাষণ্ড প্রাণেও সাময়িক আবেগ উচ্ছ্বাস বহিত।

\* কোথায় ধর্ম্ম কোথায় সত্য কোথায় পুণ্য কোথায় দান?

সুপ্ত দেব-মহিমা যে আজি লুপ্ত ভারতে আর্ঘ্য প্রাণ!

একদা যাহার সপ্তসিন্ধু প্রণবমন্ত্রে রাখিত তাল,

প্রভাতে পূত বৈদিক গীতে ফুটিয়া উঠিত কিরণ-জাল;

আশ্রমাগ্নি-আছতি-তুষ্ট প্রসবিত মেঘে জগত-প্রাণ;

এই কী সেইদেশ সেই সব নদী সেই যে সিন্ধু প্রবহমান।

একদা যাহার ক্ষত্রিয় রাজা ধর্ম্মের তরে পালিল দেশ,

প্রাণের মমতা তুচ্ছ করিল, হরিতে আর্ন্ত জনের ক্রেশ;

স্বর্গ হইতে সম্পদ নিল বিরাট ধনকে জুড়িয়া বাণ;—

তাদের বংশে জন্ম যদি গো কোথায় হারালে সে সম্মান।



কচ্ছদেশে ( গুজরাট ) সঙ্ঘের প্রচারবাহিনী ।





ইবিদার কুমিলার সজ্জা-সেবকদাহিণী ।

### অর্থ সংগ্রহের উপায় ও চারণ-দলের উদ্দেশ্য

এই গান শুনিবার জন্ত রাস্তায় তখন শত সহস্র পথচারী জমিয়া যাইত। জনতা কখনো কখনো এত অধিক হইত যে গাড়ী ঘোড়া চলাচল বন্ধ হইত। চারণ-দলের গান জাতীয় অতীত গৌরব-কাহিনীর স্মৃতির উদ্রেক করিয়া দিত। স্মরণ আছে একদা এক চারণ-দল বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন সহরে প্রচার ও অর্থসংগ্রহ করিতে করিতে জামালপুরে উপস্থিত হইলে একজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী চারণ-দলের কণ্ঠে এই সঙ্গীত শ্রবণে এতই মুগ্ধ হইয়াছিল যে পুনঃ পুনঃ বহুবার এই গান গাহিবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছিল এবং যতবার গানটি গীত হয় ততবার চারি টাকা করিয়া দিয়াছিল।

অর্থসংগ্রহের উপায় স্বরূপ এই চারণদল গঠিত হইলেও, এই চারণ-দলের আসল উদ্দেশ্য ছিল অনেক ব্যাপক ও গভীর। এই চারণ-দলের দ্বারাই সমগ্র দেশের জন-সাধারণের মধ্যে সজ্জের ভাব, আদর্শ ও প্রভাব এত দ্রুত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে; পক্ষান্তরে কোনো ধন-কুবেরের দুয়ারে 'ধন্য' না দিয়াও সমগ্র জন-সাধারণের স্বেচ্ছা ও সহানুভূতি-প্রদত্ত কপর্দক-সহায্য ও মুষ্টিভিক্ষালব্ধ অর্থসংগ্রহপূর্বক স্বাধীনভাবে স্বীয় আদর্শ, উদ্দেশ্য, নীতি ও কর্মপদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সজ্জের ধর্মপ্রচার, সমাজ-সেবা, শিক্ষা-প্রচার, তীর্থ-সংস্কার ও জাতিগঠন-মূলক কার্যাবলী সাধিত হইতেছে।

---

কোথায় দম্বীচি কে দিবে অস্থি ? কোথায় শিবি যে কাটিবে বুক ?

কর্ণ কোথায় সত্যের তরে কাটিবে পুত্রের হাস্যমুখ ?

হরিশ্চন্দ্র কোথায় আজ হবে চণ্ডাল করি পৃথিবী দান,

শৈব্যা কোথায় বিক্রীতা হয়ে করিবে রক্ষা স্বামীর মান ॥

এই “চারণ-দলে”র সৃষ্টি সজ্জনেতা আচার্য্যদেবের সজ্জ-সংগঠনীয় প্রতিভার অপূৰ্ণ অবদান :—

(ক) ইহা ধর্মবিস্তারে ও আদর্শ প্রচারের ধারাবাহিক প্রণালীবদ্ধ পদ্ধতি।

(খ) সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও কর্মীগণের এই সংহতি-জীবন-যাপন-পদ্ধতি একক জীবন যাপনের বিপদ, স্থলন ও প্রলোভন হইতে ত্যাগীর জীবনকে নিরাপদে রাখে।

(গ) “চারণ-দল” যেন চলমান (moving) আশ্রম; ত্যাগী সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, কর্মীগণ আশ্রমে যেমন নিজস্ব একটি পবিত্র, ধার্মিক আবহাওয়ার মধ্যে বাস করে; চারণ-দলেও ঠিক তেমনি পবিত্র ধর্ম-ভাবের আবহাওয়া—ত্রিসঙ্ক্যা পূজা-আরতি, ভজন-কীর্তন, জপধ্যানাদি অচুষ্ঠানের ধারা বর্তমান। আত্মানুশীলন (Self Culture) এবং নিষ্কাম কর্ম-যোগ (Selfless service) দু’য়েরই সমন্বয় এখানে।

(ঘ) যে কোনো সহরে বা গ্রামে জনসাধারণকে লইয়া অত্যল্প সময়ের মধ্যে কোনো সার্বজনীন বৃহৎ অচুষ্ঠান সূচাক্রমে সম্পন্ন করিতে হইলে (জন-সভা, যাগযজ্ঞ, পূজা-মহোৎসব ইত্যাদি) এই ‘চারণ দল’ এর সাহায্যে তাহা সহজেই সম্পাদিত হয়।

(ঙ) দেশে কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা বা দৈবদুর্ভিক্ষপাক উপস্থিত হইলে অবিলম্বে যদি তাহার প্রতীকার ব্যবস্থা আকস্মিক হয়, তখন উপায় কি? এই “চারণ-দল” গুলিই সজ্জের স্থায়ী কর্মীদল—সর্বদা সকল কার্যের জন্ত প্রস্তুত। “করিত-কর্মী” লোক না হইলে কাজ তো হয়ই না; হয়—অর্থদণ্ড, সময় নষ্ট ও পণ্ডশ্রম। সজ্জের দশটি দলে অন্ততঃ দুইশত কর্মী সর্বদা প্রস্তুত—যে কোনো প্রকার কর্মের জন্ত।

(চ) সজ্বনেতা আচার্যদেব ইচ্ছামাত্র বা ইঙ্গিতমাত্র বিরাট বিরাট কার্য সম্পাদন পূর্বক সমস্ত দেশে প্রবল সাড়া ফেলিয়াছিলেন—এই “চারণ দলের” কর্মীগণের সহায়তায়।

(ছ) এই “চারণ দলের”—দেশে দেশে, সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে প্রচারের ফলে—অত্যন্ত সময়ের মধ্যে সজ্বনেতার ও সজ্জের সহিত দেশের সমগ্র জনসাধারণের যোগ স্থাপিত হইয়া গণ-সংগঠনের (mass organisation) ভিত্তিপত্তন হইয়াছে।

(জ) শক্তি যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন—সংহতিবদ্ধ করিলে তাহার দ্বারা কত বৃহৎকার্য সম্পন্ন হইতে পারে, এই চারণ-দলের কর্পর্দক শিক্ষা ও মুষ্টি শিক্ষা দ্বারা এই বিরাট সজ্জের অসংখ্য কার্যাবলীর ব্যয়-নির্বাহ—তাহার জাজ্জল্যমান প্রমাণ।

(ঝ) চারণ-দলের বিলাসহীন, ক্রেশকর জীবন-যাপন-পদ্ধতি এবং প্রত্যাহ গড়ে ১৬ ঘণ্টার কঠোর পরিশ্রম—দেশের সম্মুখে সংযত ও কর্মময় জীবনের আদর্শ স্থাপন পূর্বক অলস, কর্মভীরু, অসংযত জনগণের মধ্যে নূতন ধারণা ও আশা প্রবর্তন করিয়াছে।

এইরূপে বিচার করিলে দেখা যাইবে—একমাত্র চারণ-দলের মধ্য দিয়াই আচার্যদেব—সন্ন্যাসী ও ত্যাগী কর্মীগণের জীবন গঠন, ধর্মভাব বিস্তার, আদর্শ প্রচার, কর্মীগণের কর্ম-জীবনের প্রবাহ রক্ষা, অর্থ সংগ্রহ, জনসাধারণের সহিত সজ্জের অবিচ্ছেদ্য সংশ্লিষ্ট স্থাপন প্রভৃতি বহু উদ্দেশ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি পরবর্তী কালে সন্ন্যাসিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন—“এই চারণদলই সজ্জের জীবন, সজ্জ যে আজ এত বিস্তৃত, প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ও জন-প্রিয় তার—একমাত্র কারণ এই Procession party; ইহাকে বাদ দিলে সজ্জ একদিনেই প্রাণহীন হয়ে পড়বে।”

## উড়িষ্যায় কৰ্ম-বিস্তার ও পুরী সেবাক্রম

সজ্জের কাৰ্য্য চারিদিকে দ্রুত গতিতে বিস্তৃত হইতে থাকিল। ১২২৫ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা প্রদেশে পুরী জেলায় জলপ্লাবন ও দুৰ্ভিক্ষ ঘটে। আচার্য্যদেব তথায় স্বয়ং পরিদর্শন পূৰ্ব্বক দীর্ঘকাল স্থায়ী সেবাকাৰ্য্যের বন্দোবস্ত করেন। সেবাকাৰ্য্য শেষ হইলে বালিপুট নামক স্থানে কেন্দ্র স্থাপন পূৰ্ব্বক সংগঠন-মূলক কাৰ্য্য আরম্ভ করা হয়। এই সময়ে উড়িষ্যার জনপ্রিয় শ্রেষ্ঠ নেতা ৬গোপবন্ধু দাসের সহিত আলাপ পরিচয় ঘটে। ৬গোপবন্ধু দাস সজ্জের সেবা ও সংগঠন কাৰ্য্যে বিশেষ সহায়ত্ব ও সাহায্য করেন। ক্রমে ১২২৬ খ্রীঃ “পুরী সেবাক্রম” নামে সজ্জের অন্ততম তীর্থ-সংস্কার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রথযাত্রার সময়ে সৰ্ব্বপ্রথম যাত্রিগণের সেবার জন্য বিরাট ব্যবস্থা করা হয়। ইহার পূৰ্বে পুরীধামে রথযাত্রার সেবাকাৰ্য্যের কথা কেহ চিন্তাও করিত না। সজ্জ হইতে পর পর প্রতি বৎসর সেবা কাৰ্য্যের যে ব্যবস্থা করা হইত—তাহা দেখিয়া তদনুসারে “পুরী সেবা সমিতি” এবং অন্যান্য সেবা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে।

১২২৫ খৃষ্টাব্দে জাম্বুয়ারী মাসে আচার্য্যদেবের প্রেরণায় “খুলনা ব্রহ্মচর্য্য” বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা; মার্চ মাসে লাজলবন্ধ মেলায় সেবাকাৰ্য্য। ১৪ই ফাল্গুন ৬ব্রহ্মচারী স্বরেশের মৃত্যুতে আচার্য্যদেব ব্যথিত হন।\*

---

\* ৬স্বরেশের বাড়ী বাজিতপুরে; ছাত্রাবস্থা হইতে আচার্য্যদেবের সংশ্রব ও স্নেহলাভে ধন্য এবং পরবর্তী কতিপয় বর্ষ বাবৎ আচার্য্যদেবের উপদেশ ও তত্ত্বাবধানে তাহার জীবন-গঠন। স্বরেশ তেজস্বী কৰ্মী ছিল। ১২২১ খৃষ্টাব্দে খুলনা দুৰ্ভিক্ষ সেবাকাৰ্য্যে

## মাদারিপুর ঘুর্ণীবাত্যা ও পাবনা দাঙ্গা

এই বৎসরেই গয়ায় পাণ্ডাদের সহিত সজ্জ্বর্ষ বাধে। পাণ্ডার লোকজন সেবাশ্রম হইতে জোর করিয়া ষাট্রী ছিনাইয়া লইতে চাহে এবং আশ্রমকর্মীদের প্রতি নানাপ্রকার দুর্ষ্যাহার করে। পুলিশ কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে এবং সংবাদপত্রে আন্দোলনের দ্বারা উহার প্রতীকার ঘটে। এই বৎসরে বহু নূতন ত্যাগী কর্মী সজ্জ্ব যোগদান করেন; **৮শ্রমী শিবানন্দ** তন্মধ্যে অগ্রতম।\*

১৯২৬ সালে মাদারিপুর মহকুমায় ভীষণ ঘুর্ণীবাত্যার ফলে

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট মি: ফকাস তাহার নির্ভীক কর্মকুশলতায় ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্য দেখিয়া প্রশংসা করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি বন্ধুর প্ররোচনায় “Circulating Library Movement” এ যোগদান করে এবং মাদারিপুরে একটা কেন্দ্র স্থাপন করে। মারাত্মক বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া তাহার মৃত্যু ঘটে। বরিশাল জেলায় বাটাঙ্গোড়ের বিখ্যাত সতীশ কবি ও বসন্ত কবি তাঁহার চিকিৎসায় মাসের পর মাস চেষ্টা করেন; কিন্তু কোনো ফল হয় নাই।

আচার্য্যদেব বলিয়াছিলেন—“৮শ্রমেশের মৃত্যুতে গুরুতর ক্ষতি হলো; এরূপ কর্মী পাওয়া দুষ্কর। তবে মৃত্যুতে সে অকলঙ্ক জীবন নিয়েই গেলো।”

\* পূর্বাশ্রমের নাম কালীপদ বিশ্বাস; ফরিদপুর জেলায় মাদারিপুরের নিকট পিয়ারপুর জন্মস্থান। প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময়ে বৈরাগ্যোদয়ে সে আচার্য্যদেবের আশ্রয়ে উপস্থিত হয় এবং অত্যল্পকালের মধ্যে স্বীয় গুরুভক্তি, কর্মকুশলতা ও চরিত্র-

বহু গ্রাম বিধ্বস্ত হইলে সজ্জের পক্ষ হইতে স্থানীয় রিলিফ কমিটির সহযোগিতায় সজ্জের পক্ষ হইতে সেবাকার্য পরিচালিত হয়। এই বৎসর এপ্রিল মাসে যশোহর জেলার অন্তর্গত মাগুরা মহকুমায় কলেরার প্রকোপ বিস্তৃত হইয়া পড়িলে সজ্জ হইতে ব্যাপক সেবাকার্যের ব্যবস্থা করা হয়। মে মাসে পূর্ণিয়া ও কাটাহারে এবং জুন মাসে বৌরভূম জেলার গ্রামে কলেরা মহামারী আকারে দেখা দেওয়ায় সজ্জ হইতে প্রত্যেক স্থানে যথাযোগ্য সেবাকার্যের ব্যবস্থা করা হয়।

### নানান্মানে সেবাকার্য

জুলাই মাসে পাবনা জেলায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বহি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। সহর হইতে বহুদূরবর্তী গ্রাম সমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া অত্যাচার, লুণ্ঠ-তরাজ, গৃহদাহ, নারীনির্ধ্যাতন প্রভৃতি জঘন্য

গাঙ্গার্যের দ্বারা সজ্জের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করে। সজ্জ-জীবনের সুদীর্ঘ ১৫ বর্ষ যাবৎ সে নেতারূপে সজ্জচারণদল লইয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও বহির্ভারতে সজ্জের বাণী ও আদর্শ প্রচার এবং অর্থ-সংগ্রহ কার্য করিয়াছিল। যেখানে যখন গিয়াছে—সেখানে সকলেই তাহার সহিত আলাপ পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়াছে।

জীবনের শেষ কয়েকটি বৎসর সে যখনই আচার্যদেবের নিকট আসিত, তখনই সে বাহিরের কাজকর্ম পরিত্যাগ করিয়া আচার্য-গত-প্রাণ ও আচার্য-সেবা-পরায়ণ হইয়া নিয়ত অবস্থান করিত। বাহ্যতঃ না বুঝিলেও, তার অন্তরাত্মা যেন অমুভব করিতেছিল— তাহার জীবনদীপ নির্কানের সময় সমীপবর্তী; তাই আচার্যদেবের প্রতি আকর্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯৪২ সালে মে মাসে তাহার মহাসমাধি লাভ ঘটে।

নারকীয় দৃশ্যের অবতারণা করে। সম্মুখ হইতে বহু সন্ন্যাসী ও কন্নী অবিলম্বে উক্ত অঞ্চলে সেবাকার্য্য এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি দ্বারা শাস্তি স্থাপন ও আশ্বাসদানের ভার গ্রহণ পূর্ব্বক কয়েক মাস ধরিয়া কাজ করে।

আগষ্ট মাসে মেদিনীপুরে ভীষণ জলপ্রাবন ঘটিল। সম্ভ্রম পক্ষ হইতে অবিলম্বে কতকগুলি কেন্দ্র স্থাপনপূর্ব্বক সেবাকার্য্যের ব্যবস্থা করা হইল এবং পরবর্ত্তী ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত মুক্তহস্তে চাউল, বস্ত্র, অর্থ, ঔষধ পথ্য বিতরিত হইতে লাগিল। জুনমাসে খুলনা জেলায় ব্যাপক ন্যালেরিয়া মহামারীতে সেবাকার্য্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

### সম্মুখ-সেবক সম্মিলনী

১৯২৬ সালের প্রারম্ভেই সম্ভ্রম কলিকাতা কার্যালয় ১৬২ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে উঠিয়া আসিল। এই বাড়ীতে প্রথম আচার্য্যদেব বালক ও যুবকগণের নৈতিক চরিত্র গঠনোপযোগী শিক্ষাদীক্ষা দান করিতে সক্ষম করিয়া “সম্মুখ সেবক সম্মিলনী”র প্রতিষ্ঠা করেন। সুবোধ গুপ্ত, মনোরঞ্জন দত্ত, ধীরেন সেনগুপ্ত, গজেন সরকার প্রভৃতি অমূল্য, উৎসাহী যুবকগণের সহায়তায় এই সম্মিলনীর কার্য্য অতি সুন্দরভাবে চলিতে থাকে। প্রতি রবিবার অপরাহ্নে এই সম্মিলনীর অধিবেশন হইত। আচার্য্যদেব ইহার অনতিকাল পরে (১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী) সহস্র সহস্র নরনারীর মধ্যে স্বীয় অলৌকিক তপঃ-শক্তি সঞ্চার করিতে প্রবৃত্ত হন; “সম্মুখ-সেবক-সম্মিলনী”র মধ্যেই তাঁর স্মৃতি দেখা গিয়াছিল।

### মুক্তপ্রদেশে কর্ম্মবিস্তার ও কাশীতীর্থ সেবাশ্রম

১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আচার্য্যদেব কাশীধামে “কাশীতীর্থ সেবাশ্রম” প্রতিষ্ঠা করেন এবং অক্টোবর মাসে কাশীধামে বিখ্যাত



অন্নকূট মেলায় সেবাকার্যের নিরাট ব্যবস্থা করেন। তদবধি প্রতি বৎসর অন্নকূট সেবাকার্য সজ্জের পক্ষ হইতে করা হইয়া থাকে। এই বৎসরে গঙ্গা ও শোণের সঙ্গম-ক্ষেত্রে শোণপুরের হরিহরছত্র মেলায় বহু লক্ষ বাত্রি সমাগমে সজ্জের পক্ষ হইতে সেবাকার্যের ব্যবস্থা করা হয়। তদবধি প্রতি বৎসর এই মেলার সেবাকার্য সজ্জের পক্ষ হইতে পরিচালিত হইয়া থাকে।

১৯২৪ হইতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ—এই তিনটা বৎসরের কার্যাবলী লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই—(১) এই তিন বৎসরে—উত্তর বঙ্গ সেবাশ্রম, রাজসাহী ষ্টুডেন্টস হোম, মাদারিপুর ব্রহ্মচার্য বিদ্যালয়, খুলনা ব্রহ্মচার্য বিদ্যালয়, গম্মা সেবাশ্রম, কান্দিপীঠ সেবাশ্রম, সঙ্ঘ-সেবক-সম্মিলনী—এতগুলি বিভিন্ন উদ্দেশ্য-মূলক স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে।

(২) বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যায় যে সব দৈব-দুর্বিপাক—বত্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ঘূর্ণীবাত্যা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উপস্থিত হইয়াছে—প্রত্যেক ব্যাপারে সঙ্ঘ পীড়িত, অত্যাচারিত, নিরাশ্রয়, বৃহৎ নরনারীকে সেবা ও সাহায্য করিয়াছে।

(৩) পিতৃপক্ষ, অন্নকূট, হরিহর ছত্র, রথযাত্রা, মান্দা, লাক্ষ্মবন্ধ প্রভৃতি ধর্মসংক্রান্ত মেলায় লক্ষ লক্ষ বাত্রি-সমাগমে সঙ্ঘ সেবাকার্যের ও ধর্মপ্রচারকার্যের ব্যবস্থা করিয়াছে।

(৪) দুইটা “চারণ-দলে” ( Procession party ) সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও কর্মীগণ বাঙ্গালা, বিহার ও যুক্ত-প্রদেশের প্রায় বাবতীয় সহরগুলিতে সজ্জের জাতি ও সমাজ গঠন এবং ধর্মপ্রচার-মূলক আদর্শ প্রচার—জনসভায় বক্তৃতা, ভজন কীর্তন এবং যাগযজ্ঞাদি অহুষ্ঠানের দ্বারা জন-সাধারণকে আকৃষ্ট করিয়াছেন।

(৫) কলিকাতা আশ্রমে “সজ্জ-দেবক-সম্মিলনী” প্রতিষ্ঠা পূর্বক বালক, যুবক ও ছাত্রগণকে রীতিমত ভাবে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ক উপদেশ ও সাধন দিয়া নৈতিক চরিত্র গঠন ও শক্তির অল্পশীলনের, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয় এবং বিদ্যার্থী-ভবনের মধ্য দিয়াও অল্পরূপ কার্য্য সাধিত হইয়াছে।

(৬) পাণ্ডা ও দুর্বৃত্তের জুলুম ও অত্যাচার নিবারণ পূর্বক তীর্থস্থানগুলির গ্লানি নাশ ও যাত্রিগণের নিরাপদ তীর্থকার্য্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করিবার জন্ত তিনটি প্রধান তীর্থে স্থানীয় আশ্রম স্থাপন করা হইয়াছে।

(৭) ধর্ম-সংক্রান্ত বিরাট মেলায় লক্ষ লক্ষ নরনারী সমাগমে তাহাদের সেবা, তত্ত্বাবধান ও আশ্রয় দানের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তীর্থের গ্লানি ও তাহার প্রতীকারের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রচার দ্বারা সমগ্র দেশে একটা সংস্কার-মূলক মনোবৃত্তি সৃষ্টি করা হইয়াছে। জনসাধারণ সংস্কার চাহিতেছে; পাণ্ডা ও পুরোহিতগণ বৃত্তিতে আরম্ভ করিয়াছে যে সংশোধন না হইলে উপায় নাই। অথচ এই সংস্কার-কার্য্যের মধ্যে বিঘেষ বা শত্রুতার প্রশ্নই নাই।

(৮) চারপ-দল অর্থ-সংগ্রহ ব্যাপদেশ প্রত্যেক গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে যাইতে বাধ্য হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে সজ্জের প্রচারিত ও আচরিত ভাব, আদর্শ, আচারানুষ্ঠান সহজে প্রবিষ্ট হইতেছে! সকলের স্বেচ্ছা-প্রদত্ত কপর্দক দানে সজ্জের ব্যাপক ও বহুমুখীন সমাজ-সেবা-মূলক কার্য্যাবলী পরিচালিত হইতেছে।

(৯) সজ্জের স্থায়ী কেন্দ্রগুলিতে বার্ষিক মহোৎসব-সম্মেলন—মাবী পূর্ণিমায়া বাজিতপুরে, বৈশাখী পূর্ণিমায়া মান্দারিপুরে, রাস পূর্ণিমায়া

খুলনা আশ্রমে, দোল পূর্ণিমায় আশাশুনি আশ্রমে, ৮সরস্বতী পূজায় রাজসাহী আশ্রমে—মহাসমারোহে প্রতিবৎসর অনুষ্ঠিত হইতেছে।

স্বরণ রাখিতে হইবে—সজ্জের যাবতীয় কাষ্ঠ্যাবলী আচার্য্যদেবের সাক্ষাৎ আদেশ-নির্দেশ ও পরিচালনায় সম্পাদিত হইত এবং এই সব কাষ্ঠ্যের জ্ঞান প্রত্যেকটি পয়সা তাঁহার হাত দিয়া ব্যয়িত হইত। প্রত্যেক স্থানে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিতেন। ইহা হইতে আমরা বোধহয় বুঝিতে পারিব আচার্য্যদেব এই সময় হইতে কী বিরাট মহাশক্তির লীলা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি যেন দশভুজা মহামায়ার গ্রায় দশ হস্ত দশ দিকে বিস্তার পূর্ব্বক তদীয় বিরাট কর্ম্মচক্রে দুনিবীক্ষ্য গতিবেগ সঞ্চার করিতেছিলেন।

এই সময় হইতে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ( ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর ) পর্য্যন্ত তাঁর কর্ম্মচক্রে গতিবেগ ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইয়াছে ; তাঁর আলৌকিক মহাশক্তি ভীমবেগে জাতি ও সমাজের স্তরে স্তরে সঞ্চারিত হইয়া মহাজাগরণ, মহাসমস্বয় ও মহামিলনের সূচনা করিয়াছে ; আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তাহা লক্ষ্য করিতে থাকিব।

---

# আচার্য্য-বরণ

ও

## সাজ্বর অধ্যাত্ম-সাধনার সূত্রপাত

বীজের নিজস্ব শক্তি আছে—সত্য ; কিন্তু ক্ষেত্র যদি উপযুক্ত না হয়, তবে বীজ অঙ্কুরিত হয় না ; হলেও বৃদ্ধি পায় না, বৃদ্ধি পাইলেও স্তম্ভ প্রসব করিতে পারে না। সজ্জনেতা আচার্য্যদেব ভগবদ্গির্দেশে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেও, তাঁর ভাব ও শক্তি প্রকাশের উপযুক্ত পাত্র ও পারিপাশ্বিক প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে ধৈর্য্যসহকারে কালের অপেক্ষা করিতে হইতেছিল। আকুল আগ্রহ ও অমাহুষিক অতন্ত্র পরিশ্রমে পাত্র ও ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছিলেন। এই কার্য্যের জন্য তাঁহাকে কত কষ্ট, কত বিরক্তি, কত অবমাননা,—কত দুঃখ সহিতে হইয়াছে—তাহা তাঁর অন্তরঙ্গ সম্যাসী সন্তানগণ ভিন্ন অন্তের পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব। স্বীয় অভীষ্ট ত্যাগী সন্তানগণের বিচার-মুঢ়তা ও অশ্রদ্ধায় ব্যথিত হইয়া তিনি এক এক সময়ে বলিয়া উঠিতেন—“যা তোরা ! আমি চাইনে কাকেও ; আমার উপর যে আদেশ আছে, আমি তা’ মাটির পুতুলের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেও করে যাবো।” সত্যই পরবর্ত্তী কালে তার বিপুল কর্ম্ম-প্রবাহের দিকে দৃকপাত করিলে দেখা যায়—তিনি অতি সাধারণ গাছ পাথরের ন্যায় অমুভূতিহীন ব্যক্তির মধ্যেও স্বীয় শক্তি ও ভাব সঞ্চার পূর্ব্বক অসম্ভব—সম্ভব করিয়া গিয়াছেন। জৈনিক সন্তানের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব (religious sentiment) সঞ্চারের চেষ্টায় পুনঃপুনঃ ব্যাহত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন—“আমি পাথরের গায়েও

দাগ বসাতে পারি, কিন্তু আটটি বছরের মধ্যে ওর হৃদয়ে একটা আঁক দিতে পারিনি।”

### উপযুক্ত পাত্র ও অনুকূল পারিপার্শ্বিক গঠন

জনৈক চঞ্চল-চিত্ত সন্তানকে নির্দিষ্ট কল্যাণকর পন্থায় স্থির রাখিবার জন্য তিনি বহু প্রকার চেষ্টা ও কৌশল করিতেছেন—“যে স্থানে আছ, সেই স্থানকেই হিমালয়ের গুহা মনে করিয়াই থাকিতে হইবে। দৈর্ঘ্য ধরিয়াই চলিতে হইবে। দৈনিক কত ঘণ্টা কাজ করিতেছ? যেরূপ কার্য্য করিতেছ—তাহা গন্তব্য পথে পৌছিবার পক্ষে যথেষ্ট কি না?—চিন্তা করিও।”

—সজ্জগীতা

নানাবিধ অন্তর্ঘর্ষে ব্যতিব্যস্ত সন্তানকে আশ্বাস দিতেছেন—“ভ্রান্তি-বশতঃ আজ তোমরা তোমাদের শক্তি-সামর্থ্যের পরিমাপ করিতে পারিতেছ না; কিন্তু বিশেষ ব্যস্ত হইও না। এরূপ অবস্থা পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই মানুষ গড়িয়া উঠে।.....৮বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ভিতর একদিন এমনি দুর্বলতা আসিয়াছিল যে তিনি আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।.....তারপর দেখিলেন—তার অনেক মলিনতা কাটিয়া গিয়াছে।” ব্যাধিগ্রস্ত বিব্রত সন্তানকে স্মরণ করাইয়া দিলেন—“শারীরিক ব্যাধির জন্য বিশেষ ভাবিলে চলবে না। এই মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার উপরেই তোমার উন্নতি অনেকটা নির্ভর করিতেছে।”

—সজ্জগীতা

### আশ্রিত সন্তানগণের শিক্ষাবিধানে আচার্য্যের প্রযত্ন

আত্মবিস্মৃত ও অবাধ্য সন্তানকে তিনি পুনঃপুনঃ শত শত অপরাধ মার্জনা পূর্বক সংশোধন করিয়া নিবার জন্য শত ভাবে চেষ্টা করিতেন

“তোমার যথাসৰ্ব্বস্ব যিনি, অস্তিত্বে, চরমে, পরিণামে—তুমি আপনার বলিয়া বাহাকে ধরিবে, বাহার শরণ লইয়া তুমি দ্বিতাপ-তাপিত প্রাণকে শূশীতল করিবে, সেই পরমাত্মীয়, পরমবন্ধু আপনার জনকে ছাড়িয়া রিপু-ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় তাড়িত হইয়া একজন সাধারণ ব্যক্তি—বাহাক দ্বারা তুমি কোনো ক্রমেই কোনো কিছু সাহায্যের আশা করিতে পার না—তাহার চিন্তা লইয়া অমূল্য সময় কাটাইলে চলিবে কেন?”

অপর একজন বিপথগামী সন্তানকে অভীষ্ট কল্যাণের পথে টানিয়া রাখিবার জন্য কত প্রয়াস পাইয়াছিলেন—“দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস অতীত হইয়া চলিল, তবু মায়াব ঘোর, মোহের আবরণ কিছুতেই কাটিল না। আর কতকাল একরূপ রিপু ও ইন্দ্রিয়, কামনা ও বাসনার তাড়নায় তাড়িত হইয়া জীবন-জনমকে নষ্ট করিবে? তোমার সেই পরম শত্রু-নিচয় মিত্রবেশে তোমার নিকট আসিয়া তোমার সৰ্ব্বনাশ সাধনের চেষ্টা করিতেছে। নিজের গোড়ামী ও মতলব পরিহার করিয়া নিজের অমূল্য জীবনকে রক্ষা কর। তোমার বুদ্ধি ও মতলব এখনো নিতান্ত অপরিপক্ব। যে পর্য্যন্ত বিবেক-বৈরাগ্য তোমার ভিতর প্রতিষ্ঠিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তোমার বুদ্ধি ও মতলবের কোনোই মূল্য নাই।”

“এই সব কথাব পରେও তোমার মনে হইতে পারে—যে আমাকে নিষেধ করিতেছে—সে কোন্ ব্যক্তি? সে ব্যক্তি ভবিষ্যৎ-বেত্তা কি না? সে ব্যক্তি অন্তশুদ্ধ বিশিষ্ট কি না? সে ব্যক্তি সিদ্ধ-সমাহিত কি না? কিন্তু যে ব্যক্তির নিষেধবাণী উপেক্ষা করিয়া অকাতরে তুমি স্বানাস্তরে বাইতে উদ্যত হইয়াছ—যে কোনো সিদ্ধসমাহিত মহাপুরুষ সেই ব্যক্তির আদেশ লঙ্ঘনে সাহসী হইত কি না—সন্দেহ।……তুমি স্বখে

শাস্তিতে, নিরাপদে ছিলে—যে পর্যান্ত তুমি “blind follower” ছিলে। যখন হইতে তুমি ভাবিয়াছ আমি আর blind follower নই, আমারও নিজের একটা অস্তিত্ব, ব্যক্তিত্ব আছে—তখন হইতেই তোমার মধ্যে নানা দুর্বলতা ঢুকিতে আরম্ভ করিয়াছে।... ..সিদ্ধ-সমাহিত মহাপুরুষদের নিকট সাধারণ মানুষের আবার একটা ব্যক্তিত্ব কি?..... “কত সময়ে, কত স্থানে, কত ভাবে পতিত হইয়াছিলে, যাহার মধ্য হইতে উঠা অসম্ভব ছিল; তখন সজ্বনেতাই তোমার একমাত্র রক্ষাকর্তা ও পরিব্রাতা ছিলেন।”.....সজ্বনেতার আদেশ ও বাণী—সর্বনিয়ন্ত্রার আদেশ ও বাণী বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।.....যে মুহূর্ত্তে তোমার ভিতরে এই চিন্তা আসিবে যে সজ্ব বা সজ্বনেতার সহিত তোমার কোনো সম্পর্ক নাই,.....সেই মুহূর্ত্তে অশেষ দুর্বলতা আসিয়া তোমাকে নিতান্ত বিপন্ন করিয়া ফেলিবে।”

“আমি তোমাদের নিতান্ত আপনার; আমার সহিত কি ছলনা বা প্রতারণা করা উচিত! তোমরা যখন যেরূপ ব্যবহার কর না কেন আমি তোমাদের ভ্রাতৃ যতদূর করা সম্ভব তাহা করিব।..... যদিও আমি তোমাদের সবই জানিতে ও বুঝিতে পারি—কিন্তু তোমাদিগকে আমি সাহায্য করিতে পারি—এমন অবস্থায় তোমাদের আসা দরকার।..... তোমার গোঁড়ামী বিসর্জন দিয়া প্রদর্শিত পথে চলিতে চেষ্টা কর।... .. নিজের বুদ্ধিতে চলিলে সর্বনাশ হইবে।”

—সজ্বগীতা

অপর একজন পথভ্রষ্ট সন্তানকে ফিরাইবার জন্ত বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন, “তুমি যাহার শরণাগত, তাঁহার উপর তোমার শ্রদ্ধার নিতান্ত অভাব।... ..তোমার মানসিক চঞ্চলতা এত অধিক হইয়াছে যে তুমি সজ্বনেতার শুভ আশীর্বাদ লাভের সুযোগ নিজকে দিতেছ না।”

“এ যাবৎকাল আমি যে কয়েক জনের জীবনের ভার গ্রহণ করিয়াছি তাহারা আমার নিকটে বা দূরে যখন যেখানে থাকুক না কেন, তাহাদের সমস্ত অবস্থা সর্ব সময়ে আমাকে বিশেষভাবে দেখিতে হয়। এখানে কেহ কোনোরূপ চালাকী, চাতুরী, প্রবঞ্চনা করিতে পারে না। তাহাদের ভূতভবিষ্যৎ জীবন লইয়া আমার নাড়াচাড়া করিতে হয়।”

—সজ্জগীতা

### আচার্যের কঠোর দায়িত্ব

সজ্জের বিরাট কর্মপ্রবাহ—বহুমুখীন ও জটিল; সেই বিশাল কর্মক্ষেত্রের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব আচার্যের নিজের উপর; তদুপরি মানব-কল্যাণের জন্য দেশ-জাতি সমাজের উন্নতি, শান্তি ও মুক্তির জন্য যে “ধর্মক্ষেত্র” প্রবর্তনের সঙ্কল্প তাঁহার ছিল, সেই “ধর্মক্ষেত্রের” অবলম্বন-স্বরূপ আগত ও অনাগত যাবতীয় ত্যাগী, অমূল্য শিষ্য—সম্মানিত-ব্রহ্মচারি-কর্মীগণের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব-ভারও আচার্যদেবের নিজস্ব স্মরণ্য দিনে ও রাত্রিতে তাঁর অবসর ছিল না। বিপরীত-প্রকৃতি-বিশিষ্ট এবং জটিল-সংস্কার-পূর্ণ শত শত বালক ও যুবককে স্বীয় অন্তর্কূল ভাবে গঠন এবং সমস্ত কিছু উপেক্ষা করিয়া, সকলের দাবী মিটাইয়া, ভালবাসিয়া, স্নেহ, যত্ন, আদর, উৎসাহ, আনন্দে ডুবাইয়া অবিভ্রান্ত কর্ম-তরঙ্গে ভাসাইয়া রাখা কত শক্ত তাহা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব।

রণজয় অপেক্ষা মনোজয় সহস্র সহস্র গুণ কঠিন। পৃথিবীর সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য করা অপেক্ষা মানবের হৃদয়-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হওয়া লক্ষ লক্ষ গুণ কঠিন। একদিকে দেশময় কর্ম-সাম্রাজ্য বিস্তার, সঙ্গে সঙ্গে কোটি কোটি নরনারীর হৃদয়-রাজ্যে আধিপত্য



প্রতিষ্ঠার আয়োজন। বাহাদিগকে অবলম্বন পূর্বক আচার্য্যদেব এই অলৌকিক কৰ্ম সাধন করিবেন—তদীয় লীলা-সহকারী সেই সজ্জ-সন্ন্যাসিগণকে তিনি স্বীয় জীবনের আদর্শের ছাঁচে গঠন করিতে প্রবল প্রয়াস করিতেছিলেন।

### সজ্জ-সন্তানগণের হৃদয়ে আধিপত্য-বিস্তার

১২২৪ খৃষ্টাব্দে মাঘী পূর্ণিমায় সন্ন্যাস গ্রহণান্তে সজ্জ-সন্তানগণ বিভিন্ন কৰ্মক্ষেত্রে চলিয়া গেল। কিন্তু অন্তর্জগতে নবীন সন্ন্যাসিগণের অজ্ঞাতসারে বিশেষ পরিবর্তন সূচিত হইয়াছিল। আচার্য্যদেব সজ্জ-সন্তানগণের হৃদয়ে প্রবেশের পন্থা খুঁজিতেছিলেন এবং তজ্জন্ত উপযুক্ত সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন। সজ্জ-সন্তানগণ স্বীয় স্বীয় পূর্ব সংস্কারাভ্যাসী চলিতে চলিতে ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে সজ্জনেতার অমোঘপ্রভাবে তদীয় ভাবের অমুকূল হইয়া উঠিয়াছিলেন। জনৈক সন্ন্যাসীর আত্মকাহিনী হইতে এই পরিবর্তনের ধারাটি লক্ষ্য করিতে পারি :—

“সন্ন্যাস-গ্রহণ-কালীন আচার্য্যদেবের আশীর্বাদ লাভের মুহূর্ত্ত হইতেই মনোজগতে এক গুরুতর পরিবর্তন উপস্থিত হইল। যে মন সংশয়-ভর্ক-প্রবণ ছিল, তাহা স্বতঃ-বিশ্বাসী হইয়া উঠিল; হৃদয়ে শুদ্ধতার স্থানে সরসতার আবির্ভাব হইল; আচার্য্যদেবের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ ও অমুরাগ অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। সন্ধানী আচার্য্য যেন সজ্জ-সন্তানগণের অন্তর-গুহায় প্রবেশের পন্থা খুঁজিতে-ছিলেন; সুবর্ণ-সুযোগে তিনি সজ্জ-সন্তানগণের হৃদয়ে স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিলেন।

ফাল্গুনমাস, দোল পূর্ণিমা, আশাশুনি আশ্রমে বার্ষিক মহোৎস-

সব। নির্মল আকাশ, নির্মল বিশ্ব-প্রকৃতি, মধুময় বাতাস, সুমধুর কুহুতান; চারিদিকে ‘সত্যং শিবং সুন্দরম্’এর আনন্দ-অভিযান! প্রেমাকুলকণ্ঠে সমবেত ভক্তকণ্ঠে অহোরাত্র হরিনাম সংকীর্তন; বাইরে আনন্দ, অন্তরে আনন্দ। কিন্তু আমার অন্তরের আনন্দ যেন সম্পূর্ণ হইতেছিল না। কেবলি মনে হইতে লাগিল—এই পূণ্যাতিথিতে আচার্য্যদেবকে পূজার অর্ঘ্য নিবেদন না করিয়া থাকি কিরূপে? কিন্তু আচার্য্যদেব তখনো প্রকাশ্যভাবে গুরুর আসনে বসিয়া পূজার অর্ঘ্য তো নেন না। সূত্রাং আকস্মিকভাবে উঠা করিই বা কেমন করিয়া? অত্যাগ্র সজ্জ-ভ্রাতৃগণকে বলিলাম; তাহারাও খুব ভয়সা দিতে পারিলেন না। ক্ষুণ্ণমনে অনাহারে শুইয়া রহিলাম। কিন্তু যিনি অলক্ষ্যে স্বীয় কুটীর মাঝে বসিয়া তদীয় মহাভাব বিস্তারের আয়োজন করিবার জন্ত আমার হৃদয়কে আকর্ষণ করিতেছিলেন, তাঁর ইচ্ছা আমাকে স্থির থাকিতে দিল না। ভাবিলাম—সঙ্কল্প যখন করিয়াছি, তখন তাহা পূর্ণ করিবই। পুষ্প-বিলপত্র-আবিরাদি লইয়া আচার্য্যদেবের গৃহে প্রবেশ পূর্বক শ্রীচরণে পূজা ও অঞ্জলি নিবেদন করিলাম। তিনি তাঁর স্নেহস্নিগ্ধ করুণাবর্ষী দৃষ্টিপাতে আমার হৃদয়ে আনন্দের প্রাবন বহাইলেন। অন্তরে প্রবলতর আকর্ষণ বোধ করিলাম। আমার কণ্ঠের, শুষ্ক বিচার-তর্ক-কঙ্করিত হৃদয় আচার্য্যের করুণাঘন স্নেহ-বারিষাতে সরস, কোমল, শাস্ত হইয়া উঠিল; আমার বে-পরোয়া প্রকৃতি ও আচরণ আচার্য্যের চরণে আশ্রয় নিবার জন্ত শ্রঙ্কায় অবনত হইতে চাহিতেছিল। অগ্রে না বুঝিলেও আমি বুঝিলাম—এক আকস্মিক অদ্ভুত পরিবর্তন।”

### জগদগুরুরূপে আত্মপ্রকাশ

কিছুদিন পরে আচার্য্যদেব উক্ত সন্ন্যাসীটাকে মাদারিপুৰ আশ্রমে নিয়া যান। তথায় তদীয় সান্নিধ্যে রাখিয়া আচার্য্যদেব তাহার হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করিলেন; সে শিশুর ন্যায় সরল নির্ভরশীল হইয়া আচার্য্যদেবের শরণাগত হইয়া উঠিল। নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত ঘটনার মধ্য দিয়া আচার্য্যদেবের অলৌকিক মহত্ত্ব তাহার নিকট প্রকাশিত হইতে লাগিল। ফলে—আচার্য্যদেবকে সে সৰ্ব্বজ্ঞ, সৰ্ব্বাস্তধ্যায়ী ও অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া বুঝিতেছিল; পুনঃ পুনঃ বহু ঘটনাপরম্পরার মধ্য দিয়া উহা উপলব্ধি করিতে করিতে স্বাভাবিক ভাবেই আচার্য্যের প্রতি তাহার ধারণা অত্যুচ্চ হইয়া উঠিল। এক মহা শুভদিনে সজ্জ-সন্তানগণের নিকট জগদগুরু আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া তিনি পূজার অর্ঘ্য গ্রহণ করিলেন। \*

---

\* ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ৮রাসপূর্ণিমা সজ্জের ইতিহাসে এক নব যুগান্তর সূচনা করিয়াছিল। এই দিবস সজ্জনেতা আচার্য্যদেব সৰ্ব্বপ্রথম জগদগুরুরূপে আত্মপ্রকাশপূর্বক সজ্জ-সন্তানগণের নিকট পূজার অর্ঘ্য গ্রহণ করিলেন। উক্ত সন্ন্যাসীর বিবরণ হইতে পাই—

“নিদ্রা আমাকে প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছিল; ৮রাসপূর্ণিমার পূর্ব রাত্রিতে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিয়াও প্রসন্নতা লাভে কৃতকার্য্য হই নাই। সমস্ত রাত্রি অত্যন্তদর্শন ও ভাবে বিহ্বল হইয়া কাটিল। দেখিলাম—অনন্ত গগনে অনন্ত জ্যোতিঃরাশি; ক্রমে চারিদিকে বৃদ্ধদের মত মূর্ত্তি-সমূহ ফুটিয়া উঠিতেছিল;—মধ্যস্থলে জ্যোতিমণ্ডল-পরিবেষ্টিত প্রণব (ওঁকার) মূর্ত্তির মধ্যে প্রকাশিত হইলেন—শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব—মুখ-কমলে স্নেহ-বাৎসল্যময়ী মাধুর্য্যের আভা, নয়নে অমৃতময়ী কঙ্কণাদৃষ্টি, উত্তোলিত, প্রসারিত করদ্বয়ে বরাভয়।

“আচার্য্য বরণের” দিন হইতেই আচার্য্যদেবের মধ্যে অপূৰ্ণ ভাবান্তর ঘটিল। উহার পূৰ্ণ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসের ভাব সজ্জ-সন্তানগণের থাকিলেও বাহ্যিক কোনো ক্রিয়াকলাপ বা অহুষ্ঠানের মধ্যে সূচিত হয় নাই—ইহা গেল এক দিকের কথা।

অপর দিকে—দেশে-সমাজে গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ, গুরুভক্তি ও গুরু-সেবার যে প্রকার নমুনা আজন্ম দেখিতে অভ্যস্ত ছিলাম; উহার অতিরিক্ত কোনো কিছু আমাদের জানা ছিল না।

### গুরুশিষ্য সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা

আচার্য্যদেব গুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াই প্রথমে চাহিলেন—  
**গুরুশিষ্য সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা।** তিনি পরিপূর্ণ গুরুভাবে অবস্থান করিয়া সজ্জ-সন্তানগণকে যথার্থ শিষ্যের ভাবে গড়িয়া তুলিতে চাহিলেন। অথচ তাঁর অভিপ্রেত ভাব তিনি কোনোদিন মুখে

চারিদিনে অমরবৃন্দ বন্দনারত। বোধ হইতে লাগিল—ভাগবতী-করুণা ও আশীর্বাদ মুগ্ধ হইয়া জগদগুরু আচার্য্যরূপে মর্ত্যধামে অবতরণ করিতেছেন : আমরা মর্ত্যমানব আকুল আগ্রহে তাঁকে বরণ করিবার উদ্যোগ করিতেছি।

প্রত্যুষে অপর সন্ন্যাসী ভ্রাতাকে এই দর্শন ও অহুভূতির কথা বলিয়া উভয়ে স্থির করিলাম—খুণ্ডা রাসপূর্ণিমা রাত্রিতে আচার্য্যদেবকে বরণ ও পূজাৰ্চনা করিব। আচার্য্যদেব তো তাহাই চাহিতেছিলেন। তাঁর মহান্ সঙ্কল্পই আমার হৃদয়ে এই অলৌকিক দর্শন ও অহুভূতি সঞ্চার করিয়াছিল। তিনি সানন্দে আত্মপ্রকাশ পূৰ্ব্বক পূজার অর্ঘ্য ও নৈবেদ্য ভোগাদি গ্রহণ করিলেন।” ভারত সেবাশ্রম সজ্জের “গুরু পূজার”— ইহাই সূচনা।

ব্যক্ত করিতেন না; তিনি চাহিতেন—সজ্জ-সন্তানগণ তাঁর অভিপ্রেত ভাব হৃদয়ে অনুভব করিয়া স্বীয় স্বীয় জীবনে—চিন্তায়, বাৰ্য্যে, আচরণে—তাহা ফুটাইয়া তুলিবে।

বহু বৎসর পরে কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন—“দেশে আজ নাস্তিকতা, অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা, অভক্তির যুগ। যেখানে শ্রদ্ধা নেই, সেখানে কোনো কিছু থাকতে পারে না। এই শ্রদ্ধার জাগরণ ও প্রতিষ্ঠা চাই! তজ্জন্ম চাই গুরু-পূজার অনুষ্ঠান এবং গুরুবাদের প্রচারের মধ্য দিয়া “গুরুশিষ্য-সম্বন্ধের” প্রতিষ্ঠা। গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ হো দেশ থেকে লোপ পেয়েছে; যেটুকু গতানুগতিক ভাবে আছে—তাহাও বিকৃত ও অন্তঃসারশূন্য; ফলে আজ সমাজে গুরুজনের প্রতি ভক্তি নেই; জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠের প্রতি শ্রদ্ধা নেই; শাস্ত্র ও মহাপুরুষের প্রতি আস্থা ও মধ্যাদা-বোধ নেই; সৰ্বত্র ঘোর উচ্ছৃঙ্খলতা, অনাচার।

আমি যে আদর্শ, যে শিক্ষা-সাপনার—দেশ ও জাতির মধ্যে প্রচার প্রতিষ্ঠা চাই, তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য সৰ্ব্বাঙ্গে আবশ্যক—গুরুশিষ্যের সম্বন্ধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা;—বৈদিক ভারতের গুরু-গৃহের সেই পাবিত্র আদর্শ গুরুশিষ্যের অলৌকিক আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ। ক্ষেত্র প্রস্তুত না কোরে আমার মহাভাব ও মহাশক্তির বাজ কি আকাশে বাতাসে ছড়াবো? লোকে কী বোঝে? কী বা জানে? যাতে দেশ ও জাতির যথার্থ কল্যাণ হবে—আমাকে তাই করতে হবে।”

### গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ পুনঃ প্রতিষ্ঠার কৌশল

তিনি চাহিতেন—সজ্জ-সন্তানগণ আদর্শ শিষ্য হইবে—চিন্তা-ব্যাক্য-আচরণে;—সৰ্বদা গুরুমুখীন, গুরু-সেবা-শুশ্রূষাপরায়ণ, গুরুর প্রতি নির্ভরশীল, আহার-বিহারাদিতে গুরুর যোগ্য মধ্যাদায় তৎপর।

হইয়া গুরুর অভিপ্রেত ভাবে জীবন যাপন ও প্রাণপণে গুরুর অভীষ্ট কৰ্ম সম্পাদন করিবে। কিন্তু আমরা যে ধরণের “দেশ-প্রচলিত” গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধের ধারণায় অভ্যস্ত তাহার সহিত আচার্য্যদেবের অভীষ্ট গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ আকাশপাতাল প্রভেদ। এজন্য আচার্য্যদেবের অভিপ্রেত ভাবে অবস্থান পূৰ্ব্বক ঠিক ঠিক তাঁর অভিপ্রেতভাবে কার্য্য-বাক্য-চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ গুরুতর কঠিন বলিয়া সজ্জ-সন্তানগণের নিকট প্রতিভাত হইতে লাগিল। অবশ্য আচার্য্যদেব কখনো সম্মুখে ইঙ্গিত দ্বারা, কদাচ উপদেশ-বাক্য দ্বারা, কদাচ ক্রটি প্রদর্শন ও শাসন করিয়া, কদাচ বিরক্তি ও উদাসীন প্রকাশ করিয়া,—নানা কোশলে সজ্জ-সন্তানগণের হৃদয়ে শরণাগতি ও গুরু-গুণসম্বার ভাব ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

আর একটি পন্থায় অতি সহজে সজ্জ সন্তানগণের হৃদয়ে গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ সঞ্চার করিয়া দিলেন। বিভিন্ন আশ্রমে কতকগুলি বালক ব্রহ্মচারী ও শিশু বিদ্যার্থী ছিল। আচার্য্যদেব তন্মধ্যে কতকগুলিকে অবলম্বন পূৰ্ব্বক গুরুর প্রতি শিষ্যের ভাব, কর্তব্য ও আচরণগুলি দেখাইতে লাগিলেন। সেই সরল শিশুগুলি আচার্য্যদেবের আদেশ-উপদেশমত গুরুসেবা, গুরু-পূজা এবং নিয়ত গুরুর প্রতি ভাবে, ভক্তিতে, নির্ভরতায় তন্ময় হইয়া থাকিত; আচার্য্যদেব অভিপ্রেত ভাবে তাহাদিগকে শাসন, সংযত ও গঠন করিতেন। আচার্য্যদেবের শিক্ষাদানের এই পরোক্ষ পদ্ধতিটি (indirect method) অতি দ্রুত প্রত্যক্ষ ফল প্রসব করিয়াছিল। নিত্য নিয়ত চোখের উপর বালকগুলির কার্য্যকলাপ ও আচরণগুলি দেখিয়া দেখিয়া সজ্জ-সন্তানগণ বাহ্য খুঁটিনাটি ক্রিয়া-কলাপ, আচারাহুষ্ঠানেও আচার্য্যের অভিপ্রেত ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন।

অগ্নি উত্তাপরূপে সর্বত্র বর্তমান ; কিন্তু সেই অগ্নিকে কাজে লাগাইতে হইলে যেখানে অগ্নি প্রজ্জলিত—সেই চুল্লী বা প্রদীপের সাহায্য নিতে হয়। বৈদ্যুতিক শক্তি সর্বত্র বিরাজিত ; সেই বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা কোনো কার্য সম্পাদন করিতে হইলে বৈদ্যুতিক শক্তি-ভাণ্ডারের সহিত (Electric Power House) যোগস্থাপন আবশ্যক। তেমনি ভগবৎ-শক্তি জগতের সর্বত্র বিদ্যমান ; সেই সর্বব্যাপিনী শক্তিকে জীবনে অর্জন ও প্রকাশ করিতে হইলে ভগবৎ-শক্তি-বিগ্রহ আচার্যের সহিত সর্বতোভাবে যুক্ত হইতে হইবে। আচার্যদেব তাহাই চাহিলেন—“আমি তো সর্বদাই সাহায্যের জগু প্রস্তুত ; কেউ যদি এক পা এগিয়ে আসে, আমি একশ’ পা এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরতে পারি। কিন্তু সেই অবস্থায় কেউ না আসলে আমি তো কিছু করতে পারিনে। যে যে-পরিমাণ প্রজ্ঞা-ভক্তি-ভাব-নিষ্ঠা নিয়ে গুরুমুখীন হয়ে থাকতে পারবে, আমার তপঃশক্তি ও তপঃপ্রভাব সেই পরিমাণে তার ভিতর সঞ্চারিত হবে !”

পূর্বেই বলিয়াছি—আচার্যদেবের রীতিই এই ছিল যে যাহাদিগের মধ্য দিয়া যে প্রকার শিক্ষা-সাধনার দ্বারা যে ভাব ফুটাইয়া তুলিতে চাহিতেন, সাক্ষাৎভাবে তৎসম্পর্কীয় আদেশ উপদেশ নির্দেশ তিনি বিশেষ দিতেন না। কিন্তু তিনি সুকৌশলে এমন অল্পকূল পারিপার্শ্বিক রচনা করিতেন যে তাহাদের অন্তরে স্বাভাবিক ভাবেই সেই বুদ্ধি, সেই বিচার, সেই প্রেরণা জাগিত ; তাহারাও যন্তচালিতবৎ তাহা অনুসরণ করিত। সমগ্র সজ্জের মধ্যে যে ভাব, যে আদর্শ, যে সাধনা, যে রীতি-পদ্ধতি, যে অনুষ্ঠান-সমূহ তিনি প্রবর্তন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তিনি ইচ্ছামত যে কোনো বালক, যুবক বা সজ্জের যে

কোনো ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসীর দ্বারা তাহা আচরণ করাইয়া সকলের মধ্যে প্রেরণা ভাগাইতেন।

প্রথমতঃ যে সমস্ত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের অবলম্বন করিয়া আচার্য্যদেব সজ্জের শিক্ষা, সাধনা ও গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধের স্বরূপ—সজ্জ-সন্তানগণের হৃদয়ে বিকশিত করিয়া তুলেন, তন্মধ্যে ৬ ব্রহ্মচারী বিজয় অন্ততম। \*

---

\* ব্রহ্মচারী বিজয়ের জন্মস্থান বাজিতপুরে। বাল্যাবস্থা হইতে আচার্য্যদেবের সংশ্রবে আসে। পরিশেষে বৈরাগ্যোদয়ে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে সংসার ত্যাগ করিয়া সজ্জের আশ্রয় গ্রহণ করে। বিজয় আচার্য্যদেবের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। আচার্য্যদেবের নিকট হইতে সাধন প্রাপ্তির পর আচার্য্যদেবের নির্দেশে প্রায় সর্বদা সকল কাজের মধ্যে নিজেই ভাবে ও জপে ডুবিয়া থাকিত। আচার্য্যদেবের নিকট বথনি আসিত তখন তাহার সেবান্তঃকরণ ভাবে তৎপর হইয়া থাকিত। জীবন-সংক্ষেপ বিধায় আচার্য্যদেব তাহাকে নিয়ত মৃত্যুচিন্তা, আত্ম-চিন্তা ও জপের নির্দেশ দিতেন। ১৯২৭ সালের মে মাসে বসন্ত রোগে ভৌতিক দেহত্যাগ করিয়া সে শ্রীগুরুপদে বিলীন হয়।

---



# আচার্য্যাদেবের মূল শিক্ষা-সাধনা

## ব্রহ্মচর্য্যম্

১। রাত্রি সাড়ে তিন ঘটিকায় শয্যা ত্যাগ পূর্ব্বক জপ, প্রার্থনা ও পূজা আরতি করিবে।

২। আলস্য, নিদ্রা, তন্দ্রা, জড়তা ও ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনার প্রতিকারের জন্য পদ্যাসন প্রভৃতি কোনো একটা আসন অভ্যাস করিবে।

৩। লঘুপাক দ্রব্য পরিমিত পারিমাণে আহার করিবে।

৪। আহারে বিহারে আলাপে সংযম অভ্যাস করিবে ;  
বিনা প্রয়োজনে কথা বলিবে না, কোথায়ও যাইবে না ;  
হাস্তালাপ আমোদ-প্রমোদে যোগ দিবে না।

৫। দুইজনে একত্র শয়ন করিবে না। চিৎ হইয়া শয়ন করিবে।

৬। শয়নের পূর্ব্ব অস্ত্রতঃ অর্দ্ধঘণ্টা নাম জপাদি করিয়া প্রার্থনা ও জপ করিতে করিতে নিদ্রিত হইবে।

৭। বিনা বিশেষ প্রয়োজনে কদাচ কারও অঙ্গ স্পর্শ করিবে না।

৮। করিলে ১০৮ বার নাম জপ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

৯। ত্যাগীৰ পক্ষে স্নেহ-মমতা-ভালবাসাই মহাপাপ, কদাচ কাহাৰও প্ৰতি একোপ ভাব আসিলে তৎক্ষণাৎ বিচাৰপূৰ্বক তাহা পৰিত্যাগ কৰিবে।

১০। কদাচ কুচিন্তা বা দুশ্চিন্তাকে প্ৰশ্ৰয় দিবে না; বিবেক-বিচাৰ-বৈরাগ্যেৰ শাণিত অসি সৰ্বদা উত্তত ৰাখিবে। এজন্ত মনকে সৰ্বদা সংচিন্তা, ভগবৎচিন্তা ও সংকাৰ্য্যো নিযুক্ত ৰাখিবে। কদাচ কুচিন্তা বা বাজে চিন্তা আসিলে নাম জপ উপবাসাদি কৰিয়া প্ৰায়শ্চিত্ত কৰিবে।

১১। ৰিপু ও ইন্দ্ৰিয়েৰ উত্তেজনা উপস্থিত হইলে শ্বাস বন্ধ পূৰ্বক জপ কৰিবে এবং ললাটে ত্ৰিশূলধাৰী শিবেৰ ৰুদ্ৰ মূৰ্ত্তি ধ্যান কৰিবে।

১২। নিয়মিত কৌপীন ব্যৱহাৰ কৰিবে।

১৩। দৈনিক অন্ততঃ ২ ঘণ্টা জপ ও ধ্যান কৰিবে।

১৪। নিয়মিত ডায়েৰী লিখিবে এবং সাধনাৰ পথে উন্নতি ও অগ্ৰগতিৰ বাধাবিঘ্ন ক্ৰটীগুলি লিখিয়া প্ৰতীকাৰেৰ চেষ্টা কৰিবে।

## ব্যাধি—উগ্ৰ তপস্যা

“ত্যাগীৰ দেহে যে ব্যাধি, উহা সাধাৰণ ব্যাধি নয়, উহা মহাতপস্যা; উহা চিন্তেৰ মলিনতা কাটাইয়া দেয়, বিবেক-বৈরাগ্যকে উজ্জল কৰিয়া দেহ,—ধন-জন-যৌবনেৰ অসাবতা প্ৰত্যক্ষ কৰাইয়া দেয়। ব্যাধিই ৰিপুৰ উৎপীড়ন ও ইন্দ্ৰিয়েৰ

উদ্ভেজনা হইতে সাধককে রক্ষা করে ; ব্যাধিই সাধককে প্রতি নিমেষে নিমেষে, পলকে পলকে দেহের চরম পরিণাম—চিঁতা-শয্যায় মুষ্টিমাত্র ভস্ম—এই কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ব্যাধিই সাধকের প্রাণে আত্মচিন্তা, আত্মবিচারণা ও আত্মবোধকে জাগরুক রাখে।

✓“মৃত্যুচিন্তা—ত্যাগী সাধকের পক্ষে অমৃতময় রসায়ন। মৃত্যুচিন্তার ফলেই বুদ্ধের বুদ্ধত্ব, শঙ্করের শঙ্করত্ব, চৈতন্যের চৈতন্যত্ব। যে প্রতিমূহূর্ত্তে হৃদয়ে—দেহের, জীবন-যৌবনের নশ্বরত্ব জাগাইয়া রাখিতে পারে ; মৃত্যুই দেহের অব্যর্থ পরিণাম—ধারণা করিতে পারে ; যে ব্যক্তি বিচার করে—এই দেহ যে কোনো মুহূর্ত্তে ধ্বংস হইতে পারে এবং জগতের যাবতীয় প্রিয় ব্যক্তি ও বস্তুর সহিত বিচ্ছেদ ঘটতে পারে ; তাহার হৃদয়ে রিপু-ইন্দ্রিয়ের আধিপত্য থাকে না। স্নেহ-মায়া-মমতার বন্ধন টুটিয়া যায়। বিবেক-বৈরাগ্য-আত্মজ্ঞান প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে।”

✓“আত্মচিন্তা—আত্মবিচারণা সাধকের মহাসম্বল। আমি কে ? কোথায় ছিলাম ? কেন আসিলাম ? কোথায় যাব ? জীবনের উদ্দেশ্য কি ? এই সকল প্রশ্ন নিয়া যে সর্বদা বিচার ও আলোচনা করে ; যে বিচার করে—সংসারের সহিত আমার সম্বন্ধ কি ? দেহ-গেহ, আত্মীয়-স্বজন—এরা কি আমাকে শান্তি দিতে পারে ? ইহাদের সহিত সম্বন্ধ আমার কয় দিনের ? আমার কৃতকর্ম্মের ফলাফল কি আমাকেই ভুগিতে হইবে না ?

—এমন সাধকের দেহাশুবুদ্ধি ও সংসারাসক্তি ক্ষীণ হইতে থাকে এবং হৃদয়ে আত্মজ্ঞানের আলোক জ্বলিয়া উঠে।”

“সজ্জনেতা যাহা বলিবেন—তাহা তোমাদের গম্যব্য স্থানে পৌঁছিবার একমাত্র সহায় মনে করিয়া নির্দেশিত পথে কাজ করিয়া যাইতে হইবে। এমন কে আছে যে বলিতে পারে যে একশত বৎসরের উন্নতি এক বৎসরেই করিয়া দিব। এমন লোক পাইয়াও তোমরা বুথা সময় নষ্ট করিবে?”

“চারণ-দলে ( Procession party ) একটা ভাব নিয়া থাকৃবি। যখন যে কাজ করবি—বাইরে যেন সেই কাজ যন্ত্রের মত করিয়া যাইতেছি; অন্তরে আত্মচিন্তার প্রবল স্রোত বহিতেছে—এমন ভাবে করা চাই। আশ্রমে আসিয়া অমনি গভীর ধ্যানে ডুবিয়া যাবি। খাওয়া-দাওয়া, হাঁটা-চলা, কাজ-কর্ম—সব কিছুর মধ্যে মনে মনে নিয়ত নাম জপ চলিবে। মনকে এক মুহূর্ত্তও অবসর দিবি না। এক জায়গায় বসিয়া সকলেই নিজের ভাব ঠিক রাখিতে পারে। কিন্তু যে শত শত বিঘ্ন-বিপদের মাঝেও নিজের ভাব নিয়া চলিতে পারে—সেইই যথার্থ বীর! সজ্জনেতার আদেশ উপদেশ মত চলিলে তোর একগাছি কেশও কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না।”

✓ “ওঁকারের ধ্যান করবি।” ওঁকারই পরব্রহ্মের মূর্ত্তি। ওঁকারই শিবের স্বরূপ; ওঁকারই—গুরুর মূর্ত্তি। ওঁকারের মধ্যে গুরুমূর্ত্তির ধ্যান করবি।”

“সাবধান সজ্জনেতার শুভদৃষ্টি হতে যেন দূরে সরিয়া না পড়;

সর্বদা সজ্জনেতার আদেশ উপদেশ মত চলিবে ; ব্যতিক্রম হইলেই দূরে সরিয়া পড়িবে—সাবধান ! সজ্জনেতার আদেশ মত চলিলে—মুক্তি তোদের করতলগত ; পাপতাপ, বিভ্রম বিভ্রান্তি তোদের একটা কেশও স্পর্শ করিতে পারিবে না ।”

“শুধু গৈরিক পরিলেই হয় না। অন্তরে যদি আত্মচিন্তা ও মৃত্যুচিন্তার ভাব জাগ্রত না থাকে ; স্বীয় জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ যদি ঠিক না থাকে ; জীবন যদি উচ্ছৃঙ্খলতার পথে চলে ; তবে গৈরিক বসনের কি মূল্য ও মর্যাদা থাকে ?”

“গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভয় থাকা উচিত। তিনি দুঃখ, ক্লেশ, শাস্তি দিলেও তাহা আশীর্বাদ জ্ঞান পূর্বক সানন্দে গ্রহণ করিতে হয়। গুরুই শিষ্যের একমাত্র আপনার জন ; তিনি যাহাই করেন, তাহা নিঃসংশয়ে শিষ্যের কল্যাণের জন্য—এ বিশ্বাস চাই। গুরুর একটা কথাও উপেক্ষা করিতে নাই।”

“দুর্বল ব্যক্তি কদাচ আত্মজ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে পারে না। শুধু শারীরিক ও পাশবিক বল—বলই নয়। ব্রহ্মচার্যের বল, ধর্মের বলই যথার্থ বল। যে সঙ্কল্পে দৃঢ়, প্রতিজ্ঞায় অবিচলিত, যে জিতেন্দ্রিয়, কায়মনোবাক্যে গুরুর আদেশ পালনে অনলস ;—সেই ব্যক্তিই মহামুক্তির অধিকারী।”

“কেবলমাত্র কায়িক সেবাই গুরু-সেবা নয়। কায়িক সেবাশুদ্ধিয়ার সুযোগ সুবিধা কয়জনের ঘটে ? গুরুর আভি-

প্রেত ভাবে, গুরুর জীবনের আদর্শে জীবন গঠন ও যাপন এবং গুরুর অভীষ্ট কর্ম-সম্পাদনে জীবন পণ ;—ইহাও গুরুসেবা ।”

“নিজেকে সর্বদাই গুরুর একটা অংশ বা অঙ্গরূপে চিন্তা করিতে হয় ।”

“রাত্রি ওটার পরে আর ঘুমাইতে নাই । এই সময়ে আসনে বসিয়া জপধ্যান ও প্রার্থনা করিতে হয়—

“হে গুরুদেব ! আমাকে সর্বপাপ মুক্ত কর ! আমাকে শুদ্ধ, শান্ত, সমাহিত কর । আমাকে নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক কর । তোমার মধ্যে আমাকে মিলাইয়া নাও, যেন কোনো প্রভেদ না থাকে ।”

“এ সঙ্ঘ আমার নয়, এ সঙ্ঘ সর্বনিয়ন্তার ; আমি তো উপলক্ষ্য মাত্র । আর কয়েক বৎসর পরে সমগ্র ভারতবর্ষ সঙ্ঘের ছত্রচ্ছায়াতলে আসবে ।”

“গুরুশিষ্যের মৌনাবস্থাতেই ভাবের বিনিময় হয় । ধর্ম—গয়া, কাশী, হরিদ্বারে নাই ; নিজের সঙ্কলিত মনই—নিজ্জন গুহা ; সেই গুহাতেই ধর্মের তত্ত্ব নিহিত । গুরুর ইচ্ছা ও রূপাতেই সব হয় । তাই ২৪ ঘণ্টা গুরুর ভাব ও স্মৃতি নিয়া থাকা আবশ্যিক । সর্বদাই তিনি সঙ্গে আছেন—এই বিশ্বাস ও ধারণা দৃঢ় রাখা প্রয়োজন । গুরুর প্রতি—নিয়ত শ্রদ্ধা-ভক্তি-অনুরাগের ভাবে যুক্ত হইয়া থাকিবে ।”

“তোমরা যে প্রতিদিন ১২।১৪ ঘণ্টা হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিতেছ; কিন্তু তোমরা তো কোনো কষ্টবোধ কর না; লোকে দেখিয়া অবাক হইয়া যায়। কেন তোদের কষ্টবোধ হয় না—তাহা কি বুঝিতে পারিস? সজ্জনেতার শুভদৃষ্টি ও শুভ আশীর্বাদ তোদের উপর রহিয়াছে—তাই।”

“গুরুর চিন্তায় সর্বদা ডুবিয়া থাকিতে হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে প্রকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ তদপেক্ষাও ঘনিষ্ঠতর। সত্য সত্য যেমন সংসারের যাবতীয় কাজ করিতেছে, কিন্তু মনে প্রাণে নিয়ত স্বামীর চিন্তা ও প্রসন্নতা কামনা করিতেছে; শিষ্যও ঠিক তেমনি ভাবে গুরুর আদর্শ ও অভিপ্রেত যাবতীয় কার্য সম্পাদন করিতে করিতে সর্বনিয়ন্তা পরম গুরুর চিন্তায় নিমগ্ন থাকে।”

✓ | “সজ্জের সম্ভান কে? নিয়ত ২৪ ঘণ্টা সজ্জনেতার ভাব, স্মৃতি, চিন্তা, ভাবনা নিয়া চলে যে—সেই যথার্থ সজ্জের সম্ভান। এমন সম্ভানের প্রাণে বিবেক-বৈরাগ্য জ্বলন্তরূপে ফুটিয়া উঠে। তাহাকে দেখিয়া শত সহস্র লোকের মনোবৃত্তি পরিবর্তিত হইবে। সে যে স্থান দিয়া হাঁটিয়া যাইবে, সে স্থান পবিত্র, সে স্থানের আবহাওয়া শুদ্ধ হইয়া যাইবে।”

গুরুসেবা কাকে বলে? ২৪ ঘণ্টা গুরুর নির্ণীত ও নির্দ্ধারিত পথে চলিয়া তাঁর অভীষ্ট কর্ম করাকেই গুরুসেবা বলে।”

## সজ্জবাণী

১৯২৪ হইতে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত আচার্য্যদেব বহুসংখ্যক ত্যাগী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীর জীবন গঠন করেন ; তন্মিহ বহুসংখ্যক স্থায়ী কর্ম্মীও প্রস্তুত করিয়াছিলেন । এই সমস্ত ত্যাগী সন্তান ও কর্ম্মিগণের মধ্যে সজ্জবদ্ধতার ভাব ( Spirit of organisation ) সঞ্চার করিবার জন্ত নানাভাবে শিক্ষা, সাধনা ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া আচার্য্যদেব এই সময়ে “সজ্জ-জীবনের রহস্য কি ?” “সজ্জ-জীবনের স্বরূপ কি ?” “সজ্জকে অথও ও অটুট করিবার সূত্র কি ?”— এই সকল প্রশ্নের সমাধানগুলি প্রকাশ করেন । সেগুলি পরে “সজ্জগীতা” রূপে প্রকাশিত হয় । মূল কথা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে ।

( ১ ) বিশ্ব-কল্যাণকে উপলক্ষ্য করে যখন সর্ব্বনিয়ন্তা আচার্য্যরূপে জগতে অবতরণ করেন, তখন সেই বিরাট ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে এক প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তির মহান আবর্ত উদ্ভূত হয় এবং চতুর্দিকে প্রসারিত হতে থাকে ।

( ২ ) কতকগুলি স্বতঃ শুদ্ধ, পবিত্র মানবাত্মায় ঐ মহতী ভাগবতী শক্তি ও বিরাট আধ্যাত্মিক মহাভাব প্রতিফলিত ও সংরক্ষিত হয় । তাহাবাই সজ্জের প্রাণ ; প্রধানতঃ তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই সজ্জ গড়িয়া উঠে ।

( ৩ ) সৌর জগতে যেমন সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়াই গ্রহ উপগ্রহাদি স্থায়ী স্থায়ী কক্ষে ভ্রাম্যমান ; তেমনি উক্ত ত্যাগী



সন্ন্যাসীগণ আচার্য্যকে কেন্দ্র করিয়া বিরাজমান। সূর্য্যাই যেমন সৌর জগতের প্রাণ ও অবলম্বন, তেমনি আচার্য্য স্বয়ং সজ্জের এই ত্যাগী সন্ন্যাসিগণের প্রাণ ও একমাত্র আশ্রয়।

( ৪ ) এই ত্যাগী সন্ন্যাসীগণ আচার্য্যের মহাভাবে অনুপ্রাণিত এবং তাহার সহিত নিবিড়তর ভাবে যুক্ত হয়ে, তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের মধ্যে যতই আপনাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বকে সর্ব্বতোভাবে ডুবাইয়া দিতে থাকে, ততই তাহারা একদিকে যেমন ঐ আধ্যাত্মিক শক্তির লীলার যন্ত্রে পরিণত হন, তেমনি নিজেরাও পরস্পর যুক্ত সম্মিলিত হন। সমগ্র সজ্জটী একটী বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তির যন্ত্র। আচার্য্য স্বয়ং সেই যন্ত্রের প্রাণ ও পরিচালক; সজ্জের ত্যাগী সন্তানগণ উক্ত যন্ত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

( ৫ ) এক ব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত জলাশয়ে যেমন লক্ষ লক্ষ লোক জলপান করিয়া পরিতৃপ্ত হয়; তেমনি সজ্জকে আশ্রয় করিয়া যে বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তি জগতে প্রকটিত হইয়াছে,—মানবমাত্রেই—সজ্জের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই, সেই মহাশক্তির সাহায্য প্রাপ্ত হয়।

( ৬ ) সজ্জ-সন্তানগণকে প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে স্মরণ রাখিতে হইবে—সজ্জের উন্নতিই আমার উন্নতি, সজ্জের কল্যাণই আমার কল্যাণ; সজ্জের মুক্তিতে আমার মুক্তি; সজ্জের উদ্দেশ্য ও আদর্শ আমার সাধ্য ও উপাস্য; সজ্জের চিন্তাই আমার ধ্যান, সজ্জের হিত সাধনে

তন্ময়তাই—আগার মহাসমাধি। সজ্জই ভক্তের ভগবান ; সজ্জই জ্ঞানীর ব্রহ্ম, সজ্জই যোগীর পরমাত্মা, সজ্জই জাতির মহাশক্তি-স্বরূপা কুলকুণ্ডলিনী।

(৭) সজ্জ, সজ্জশক্তি ও সজ্জনেতা—এই তিনে এক এবং একে তিন। সজ্জশক্তি—সজ্জ-নেতারই শক্তি ; আর সজ্জ-নেতারই বিরাট স্বরূপ এই সজ্জ। সম্মিলিত সজ্জের আদেশ সজ্জনেতারই আদেশ।

(৮) সজ্জ-সাধনাই—যুগের সাধনা। সংহতিই উন্নতি ও অভ্যুদয়ের উপায় ও মহাশক্তির আবির্ভাবের যন্ত্র।

(৯) ত্যাগ ও তপস্শ্রা, সংযম ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহই—সজ্জের জীবনীশক্তি ; বিলাসিতা ও ব্যসনই—সজ্জের মৃত্যুবাণ।

(১০) আত্মবিস্তার ও আত্মপ্রসারই সজ্জের—জীবন ; আত্মনিষ্কৃতি ও আত্মসঙ্কোচই—মৃত্যু।

(১১) এই সজ্জই সজ্জনেতার দিব্য-দৃষ্টি-প্রত্যক্ষ ভারতীয় অার্য্য সভ্যতার বীজ-স্বরূপ।

(১২) সজ্জ-সন্তানগণের সাধনা—সজ্জনেতার বিরাট ব্যক্তিত্বের মধ্যে স্থায়ী স্থায়ী ব্যক্তিত্ব, স্বাভাব্য ও ইচ্ছাকে নিঃশেষে ডুবাওয়া দেওয়া ;

(১৩) সজ্জনেতার অভীষ্ট ধর্ম্ম-সাধনার বীজ-মন্ত্র :—

লক্ষ্য কি ?—আত্মোপলব্ধি,—মহামুক্তি।

ধর্ম্ম কি ?—ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য।

মহামৃত্যু কি—আত্মবিস্মৃতি।

প্রকৃত জীবন কি ?—আত্মবোধ, আত্মস্মৃতি, আত্মানু-  
ভূতি ।

মহাপুণ্য কি ?—বীরত্ব, পুরুষত্ব, মনুষ্যত্ব, মুমুক্শুত্ব ।

মহাপাপ কি ?—দুর্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা,  
সন্ধীর্ণতা, স্বার্থপরতা ।

মহাশক্তি কি ?—ধৈর্য্য, সৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ।

মহাসম্বল কি ?—আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা, আত্ম-  
মর্যাদা ।

মহাশত্রু কি ?—আলস্য, নিদ্রা, তন্দ্রা, জড়তা,  
রিপু ও ইন্দ্রিয়গণ ।

পরম মিত্র কি ?—উদ্যম, উৎসাহ, অধ্যবসায় ।

সজ্জনেতার অভীষ্ট ধর্ম্ম-ভিত্তিতে ভবিষ্য ভারতীয় জাতি-  
গঠনের আদর্শগুলি তদীয় প্রেরণায় “ধ্রুব ভারত” নামে  
প্রকাশিত হয় । উহাতে সজ্জনেতা আশ্বাস-বাণী ঘোষণা করেন—

“ভারত আর সুদার্ষকাল প্রসুপ্ত অবস্থায় অবস্থান  
করিবে না ; ভারত আবার জাগিবে, আবার উঠিবে ;  
আবার ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া জগদ্গুরুর আসনে উপবেশন  
করিবে ।”

উক্ত পুস্তকে আচার্য্যদেব আত্মবিস্মৃত ভারতীয় জাতির  
আত্মস্মৃতি জাগাইয়া দিয়াছেন :—

“ভারত ভুলিওনা—তুমি ঋষির বংশধর । তোমার  
ধর্ম্ম, সমাজ, জাতীয়তা ঋষির হস্তে রচিত, ঋষির সনাতন অনু-

শাসনে অনুশাসিত, পরিচালিত ; তোমার জাতীয় জীবনের প্রত্যেকটী কর্তব্য ঋষি-নির্দিষ্ট । ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্য্য তোমার জাতীয় জীবনের আদর্শ ; ঐ আদর্শকে প্রাণপণে আকড়াইয়া ধর ; পড়িয়া গেলেও তোমার বিনাশ নাই । ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর ; তোমার জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে ব্রহ্মচর্য্যের অমোঘ বীৰ্য্য ও অক্ষয় ওজঃ বিদ্যুৎ-গতিতে সঞ্চারণ করিতে দাও ; ভারত আবার সোণার ভারতে পরিণত হইবে ।”



# নৈতিক আদর্শের আন্দোলন

ও

## ব্রহ্মচর্য সাধন-প্রদান

সংযম ও ব্রহ্মচর্যহীন ভারতের জাতীয় জীবনের গোপন অন্তরালে অকাল বীৰ্য্যক্ষয় ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা অন্তঃসলিলা ফস্কুর ছায় তরতর বেগে প্রবাহিতা ; সে তীব্র স্রোতবেগে ভারতের স্বথ-সম্পদ, আশা-ভরসা, তেজোবীৰ্য্য, বীরত্ব-মহুৰ্ঘ্যত্ব ধুইয়া মুছিয়া নিঃশেষ হইতেছে। কেহ দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও অজ্ঞের ভাণ করে বিয়াও উপেক্ষা করে। দেশের দুঃখে আমরা নয়নজলে ঝুরিয়া মরি ; কাগজপত্রে, সভা-সমিতিতে, আলাপে বক্তৃতায় আগ্নেয়গিরির 'লাভা' প্রবাহ ছুটাইয়া দেশ-প্রেমের বন্যা বহাইয়া দিই ; কিন্তু আমারই ঘরের কোণে আমারই কচি কচি সন্তানগুলি যে কুসঙ্গে, কদালাপে, কুকার্য্যে, কুচিন্তায়—না জানিয়া, না বুঝিয়া—অহরহঃ ডুবিয়া মজিয়া, স্বাস্থ্য-শক্তি-মেধা-হীন হইয়া ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইতেছে—তাহা কি আমরা দেখি ? না, দেখিয়াও বুঝি ? না, বুঝিয়াও তার প্রতিকারের জন্ত মাথা ঘামাই ? ভারতের আশাভরসার মুকুলগুলি যে এমনি করে বুক-চাপা তুষানলে জলিয়া পুড়িয়া জাতির শ্মশান-চিতায় ভস্মমুষ্টিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। তাহা নিরুপায়—সাহায্য পায় না, সহানুভূতি পায় না, উৎসাহ পায় না, উপদেশ পায় না, তাদের প্রাণের ব্যথা বুঝিয়া দরদ করে—এমন লোক পায় না। অভিভাবকের নিকট মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না ; শিক্ষকের নিকট প্রতীকারের আশা নাই।

ব্রহ্মচর্য্য-ঘন-মুক্তি আচার্য্যাদেবের করুণার উৎস প্রথমে ভারতীয় জাতির এই ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার অবলম্বন তরুণমতি বালক ও যুবকগণের প্রতি উৎসারিত হইল। আচার্য্যাদেব অভয় আশ্বাসবাণী নিয়া, প্রাণে মায়ের গ্ৰায় স্নেহদরদ, আদর-আশীর্বাদ নিয়া জাতির তরুণ-সমাজকে আবেগোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আহ্বান করিলেন। তাঁর মধ্যে শঙ্কল্প জাগ্রত হইল—জাতির এই তরুণ প্রাণের সরস ক্ষেত্রে প্রথম তাঁর শক্তিপূত আশীর্বাদের বীজ বপন করিবেন। আচার্য্যের দুর্জয় শঙ্কল্পের বেগে অত্যল্প কালের মধ্যে সমগ্র দেশে এক প্রবল নৈতিক আন্দোলনের প্লাবন উথিত হইল। ভবিষ্য ভারতীয় জাতির গঠন ও অভ্যুদয়ের সূচনায় তিনি সংঘম ও ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শের বীজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমরা এই নব ভূমিকায় আচার্য্যের কর্ম্মলীলার কিঞ্চিৎ আলোচনাপূর্ব্বক তদীয় কার্য্যধারা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

আমরা দেখিয়াছি—১৯১৯ হইতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সজ্বনেতা আচার্য্যাদেবের হৃদয়োথিত ঐশী করুণার প্রবাহ প্রথম জনসেবার পথে আসিয়া আত্মবিস্তার পূর্ব্বক সার্বজনীন ও সার্বভৌমিক সেবার আদর্শ ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। তৎপরে সে সমাজ-সেবার কর্ম্মপ্রবাহ বৎসরের পরে বৎসর ক্রমাগত অগ্রসর ও ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া চলিতে লাগিল।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে মার্চমাসে পুণ্যক্ষেত্র হরিদ্বারে পূর্ব্বকুম্ভমেলায়\* আচার্য্যাদেবের মধ্যে ঐশী নির্দেশে এক নূতন শঙ্কল্পের প্রেরণা জাগ্রত হইল; তাহার ফলে সজ্জ্বর জীবনে আবার নূতন অধ্যায় উদ্ঘাটিত হইল। আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে ক্রমে ক্রমে তাহা লক্ষ্য করিব।

হরিদ্বারে জটামায়ীর মন্দিরে আচার্য্যাদেবের আসন স্থাপিত হয়। তথায় দ্বিবারাত্রি অধিকাংশ সময় তিনি স্বীয় মানব-কল্যাণের সিদ্ধ শঙ্কল্প লইয়া অবস্থান করিতেন; শ্রান্তি ক্লান্তি ছিল না। অধিক

রাত্রিতে জন-সমাগম বন্ধ হইলে ঘরে আসিতেন। বৃক্ষতলে উচ্চ বেদীর উপরেই বসিয়া আছেন। ব্যাঘ্রচর্মাসনে শাস্ত্র, সমাহিত, বিশাল-বপু, মস্তকে রুক্ষ জটাজাল, নয়ন অর্দ্ধনিমীলিত, করদ্বয় বরাভয় দানে সমুত্তত; সাক্ষাৎ আশুতোষ শিব; শ্রীমুখকমল জীব-করণার ভাবাবেগে দ্রব্য রক্তিমভ, স্নেহ-বাৎসল্যের স্নিগ্ধ কোমলতায় সুন্দর মধুর। অবিশ্রান্ত জনশ্রোত আসিতেছে, পাদপদ্মে প্রণামপূর্বক অনিমেঘ নয়নে দর্শন-ক্ষুধা মিটাইতেছে। আচার্য্যের সুধাশ্লিষ্ট দৃষ্টির আশীর্বাদ-ধারায় প্রণত ভক্তদল অভিষিক্ত হইয়া শাস্তি ও তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিতেছে। তাহারা সম্মুখে উপবিষ্ট মহাপুরুষের শ্রীমুখমণ্ডলে কি ভাব দেখিতেছে—কে জানে? অনেকেই প্রশ্ন করিতেছে—“ওঁরং ইয়া মরদানা?”—ইনি পুরুষ না স্ত্রীলোক? ইহার পরেও প্রয়াগধামে ও হরিদ্বারে পরবর্তী কুস্তমেলায় আসনে স্থাপিত আচার্য্যদেবের প্রতিকৃতি দেখিয়া অবাঙালী যাত্রিগণ আলোচনা করিত—“ইয়ে ভারতমাতাকা তসবীর?”—ইহা ভারতমাতার মূর্তি? আচার্য্যদেবের বিরাট বিপুল শক্তিশালী কলেবরে এমনি একটা স্নিগ্ধ মাধুর্য্য বিরাজ করিত! তদীয় শ্রীমুখকমলে এমনি মাতৃস্নলভ কমনীয়তা ছিল! বিশেষতঃ কুস্তমেলার মত কোনো বিশেষ ব্যাপারে জীব-কল্যাণের সঙ্কল্প প্রবলতম হইয়া উঠিলে তাঁহার সমগ্র দেহে বিশেষভাবে মুখমণ্ডলে এমনি স্নেহ-প্রেম-করণার প্রাণারাম জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইত।

সজ্জ-সন্ন্যাসিগণের কণ্ঠে কণ্ঠে গীত—“ওঁ সজ্জং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্যং শরণং গচ্ছামি, হর হর বোম্ বোম্” “ওঁ গুরুকৃপাহি কেবলম্” “ওঁ হরগুরুশঙ্কর শিব শস্তো” ইত্যাদি কীর্তন সমাগত অসংখ্য ষাণ্ডীর প্রাণে লুপ্তপ্রায় বিস্মৃত-প্রায় যুগের মহাভাব, আনন্দ ও পুলকশিহরণ জাগাইয়া দিত। হরিদ্বার কুস্তমেলা হইতে প্রত্যাগমন-

কালে তিনি বলিয়াছিলেন—“আমি যা করবো, এই কুস্তমেলায় মাত্র তার ঢেঁড়া পিটিয়ে গেলাম।”

আচার্য্যদেবের তেজঃপুঞ্জ শ্রীমূর্তি-যুক্ত “ব্রহ্মচর্য্যম্” ও “সম্ভবানী” নামক উপদেশ-পত্র পাঠে অসংখ্য নরনারীর হৃদয়ে আদর্শের অপূর্ব প্রেরণা জাগিল। “সন্ন্যাসী” নামক একখানি পত্রিকায় সন্ন্যাসের অতুল্য আদর্শ পাঠ করিয়া সন্ন্যাসীগণের প্রাণে নূতন ভাবের আন্দোলন হ্রস্ব হইল। অব্যবহিত ভবিষ্যতেই আচার্য্যদেব নবভূমিকায় সঙ্গুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া যে আদর্শের প্রচার পূর্ব্বক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের প্রেরণা দান করিবেন—তাহারই সূচনা তিনি কুস্তমেলায় করিয়াছিলেন !

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের প্রথমই আচার্য্যদেব তদীয় “ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্য্য” এর আদর্শ এবং “ধর্ম্মভিত্তিতে জাতি গঠনের” সার্বজনীন বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে “প্রণব” পত্র প্রকাশের নির্দেশ সহ তদীয় আশীর্বাদ ও প্রেরণা দান করেন।

এই বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে “প্রণব” পত্র নিয়মিত প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রথম কয়েকটি বৎসর ত্রৈমাসিক ছিল; পরে ১৯৪২ সাল হইতে মাসিকে পরিণত হইয়া অদ্যাবধি নিয়মিত চলিতেছে।

এই সময়ে আচার্য্যদেবের অভিপ্রেত ভারতীয় ঋষি-যুগের আদর্শ, চিন্তাধারা ও সাধনাধারা সম্বন্ধীয় বাণী “ঋষ ভারত” নামে প্রকাশিত হইলে, উহা জনসাধারণের নিকট এতটা আদৃত হয় যে তিনটি বৎসরে উহার তিনটি সংস্করণের আবশ্যক হইয়াছিল। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয়—সেই সময়ে আচার্য্যের নির্দেশিত ভাব, আদর্শ ও আশ্বাস-বাণীগুলি জনগণের প্রাণে কিরূপ আগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছিল। “ঋষ



ভারতের” মধ্যে যুগাচার্যের আশ্বাসবাণী—“ভারত আর দীর্ঘকাল প্রস্থত অবস্থায় অবস্থান করিবে না; ভারত আবার জাগিবে, আবার উঠিবে, আবার ধর্মকে ভিত্তি করিয়া জগদ্‌গুরুর আসন গ্রহণ করিবে।” পড়িয়া লোকের মন-প্রাণ উজ্জল ভবিষ্যতের আশায় উল্লসিত হইয়া উঠিত।

“প্রণব” পত্রের মধ্য দিয়া নব যুগের নব জাতীয়তার মস্তদ্রষ্টা ঋষি সম্বনেতা আচার্য্যদেবের পাঞ্চজন্ম-নিবাদ সর্বত্র ছুটিল; সংঘম, ব্রহ্মচর্য্য ও আচার্য্যসেবার ভিত্তিতে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতিকে পুনর্গঠনের অব্যর্থ নির্দেশ প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই অভিনব জাতীয়তার বাণী ও নির্দেশ যে আন্দোলন জাগাইল, তাহা কিরূপ প্রবল ভাবে জনগণ-মন আকর্ষণ-পূর্ব্বক ভারতীয় আদর্শ ও সাধনার মূর্ত্তবিগ্রহ আচার্য্যদেবের শ্রীচরণ-প্রান্তে আবালবৃদ্ধ নরনারীকে হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে আনিয়াছিল তাহা আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে জানিতে পারিব।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা আশ্রমে যে “সঙ্ঘসেবক-সন্মিলনী” গঠিত হইয়াছিল, তাহা ক্রমেই বহুতায়তন হইতে লাগিল। “ব্রহ্মচর্য্য ও নৈতিক চরিত্র গঠনের অভিনব শিক্ষা-সাধনা”—নামক আস্থান-পত্র অজস্র সর্বত্র স্কুলে, কলেজে, হোষ্টেলে, পার্কে, বাড়ীতে, রাস্তায়—বিতরিত হইতে লাগিল :—

“ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী.....কিছুদিন হইল কলিকাতায় একটা কেন্দ্র স্থাপনপূর্ব্বক কলিকাতাবাসী বালক ও যুবকগণকে মনঃসংযম, স্বাস্থ্যোন্নতি এবং মানসিক শক্তি বিকাশের অভিনব সুযোগ প্রদান করিতেছেন; তিনি ব্যক্তিগত প্রয়োজনানুসারে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সাধন বিষয়ে উপদেশ ও ব্রহ্মচর্য্য পালনের শক্তি ও সাহায্য প্রদান করেন।”

উক্ত আহ্বানপত্র পাইয়া কলিকাতার বালক ও যুবক, অধ্যাপক ও ছাত্র মহলে একটা নূতন ভাবের সাড়া পড়িয়া গেল। এই সময়ে আচার্য্যদেবের সংঘম ও ব্রহ্মচর্য্য-বিষয়ক শিক্ষা-সাধনাগুলি “ব্রহ্মচর্য্যম্” নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইল। পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই পুস্তকের অট টী সংস্করণ হইয়াছিল এবং প্রত্যেক সংস্করণে দশ হাজার পুস্তক ছাপান হইয়াছিল। ইহাতেই অহুমান করা যায়—আচার্য্যদেবের ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ক শিক্ষা-সাধনা কিরূপ প্রবল আন্দোলন জাগাইয়াছিল। এই আন্দোলনের প্রথম ভাগে অনেকে বালভেন—“মশায়! আপনারা কি দেশটাকে পাঁচ হাজার বছর পিছিয়ে নিয়ে যেতে চান? যুগের দাবীটাও আপনারা লক্ষ্য করেন না,—স্বীকার করতে চান না?” কিন্তু সেই সব ব্যক্তিই পরিশেষে আচার্য্যের মহান্ সঙ্কল্প-শক্তির সাফল্য দেখিয়া তাঁহার শরণাগত

এই সময়ে জনৈক যুবক আচার্য্যদেবের প্র চূষক-আকৃষ্টের গ্রায় আসিয়া আশ্রয় ও উপদেশ লাভপূর্ব্বক পরিশেষে সংসার ত্যাগ করিয়া সজ্জের অন্তর্ভুক্ত হন। তদানীন্তন ব্যাপারের বিবরণ তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলে বুঝিতে সুবিধা হইবে:—

রবিবার। সজ্জসেবক-সম্মিলনীর অধিবেশন। শত শত স্কুল কলেজের ছেলে,—যুবক, শিক্ষক, অধ্যাপক, সরকারী কর্মচারী প্রভৃতি দলে দলে আশ্রমে ভীষণ ভীড় করিয়া রহিয়াছেন—আচার্য্যের তপঃ-শক্তির প্রেরণা ও অমৃতময় উপদেশে লাভের জন্ত! “ওঁ সজ্জং শরণং গচ্ছামি। ওঁ ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি। ওঁ প্রণবং শরণং গচ্ছামি। ওঁ হর হর বোম্ বোম্” কীর্ত্তনে দর্শনার্থীগণ ভাবে বিভোর। সকলেই এক-লক্ষ্য আচার্য্যদেবের দর্শন ও রূপালাভের জন্ত। তিনি একে একে

ব্যক্তিগত ভাবে উপদেশ দিতেন—ব্যক্তিগত প্রয়োজনানুসারে। আবার প্রয়োজনানুসারে—এক সঙ্গেও উপদেশাদি দিতেন।

আমরা পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের ছাত্র ও অধ্যাপক কয়েকজন এক সঙ্গে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলুম। কী শাস্ত্র সৌম্য মূর্তি; মুখখানি যেন স্নেহ-করণায় ঢলঢল। সৰ্ব্বাঙ্গ দিয়ে তপস্তুজ,—ব্রহ্মচৰ্য্যের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত। সকলকে ইঙ্গিত করলেন—তাঁর গা ঘেঁসে চারিদিকে পদ্মাসন করে বসে ধ্যান করতে। কিসের ধ্যান কিরূপ ভাবে করবো—ভাবতেই তিনি বললেন যে কোনো চিন্তা নাই, ধ্যান আপনা থেকেই হবে। আমরা আদেশ পালন করলাম। তারপর তিনি—ধ্যানে কে কি উপলব্ধি করলো—জিজ্ঞাসা করলেন। ধ্যানে যে যা উপলব্ধি করেছি—সে তো তাঁরই ইচ্ছা ও শক্তিতে; তথাপি তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। আমি ধ্যানে বস্বার অল্প পরেই আসন-ঘরটী একেবারে শুক, নিঝুম। তার মাঝে মাত্র এক মহাশুঁকার ধ্বনি সেই নিস্তব্ধতাকে আরও গাভীৰ্ঘ্যে ভরে তুলছে। আমাদের সংশয়ী মন সেদিন সহজেই আচাৰ্য্যের তপঃশক্তির প্রভাব উপলব্ধি করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে আকৃষ্ট হলো।”

ব্রহ্মচৰ্য্যের মহাশব্দ ব্রহ্মচৰ্য্য-ঘন-মূৰ্ত্তি—আচাৰ্য্যের অভয় কণ্ঠে উদ্গীত হয়ে লক্ষ লক্ষ তরুণ প্রাণে এক অননুভবনীয় আগ্রহ ও উৎসাহের প্লাবন বহাইয়া দিল। আচাৰ্য্যের আশীৰ্বাদ ভারতের তরুণ-সমাজের শিরোপরি বসিত হইল।

এই আশীৰ্বাদ ও আশ্বাস তদানীন্তন তরুণ সমাজে কী অপূৰ্ণ আগ্রহ জাগাইয়াছিল, কী আনন্দে তাহারা এই আশ্বাসে জাগ্রত হইয়া আচাৰ্য্যের আশীৰ্বাদ লাভের জগ্ন দিখিদিখ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিত,

তাহা সজ্জের মৃজাপুর ষ্ট্রীটস্থিত আশ্রম-ভবনে প্রতিদিন,—বিশেষভাবে শনি ও রবিবারে “সজ্জ-সেবক সম্মিলনীর” অধিবেশনের দিন কদাচ উপস্থিত থাকার সুযোগ যাহারা পাইয়াছেন, তাহারাই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

\*

\*

\*

ত্রিতল বাড়ীর সর্বোচ্চ তলে একখানি ঘরে আচার্য্যদেব অবস্থান করিতেন ; সেই প্রকোষ্ঠের বারান্দায় তিল ধারণের স্থানটুকুও থাকিত না ; তৎপরবর্ত্তী ছাদটুকুও ঠাসাঠাসি বোঝাই ; তৎপরবর্ত্তী সিঁড়ির সর্বোচ্চ সোপান হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্রম-বাড়ীতে প্রবেশের গেট পর্য্যন্ত লোকের পর লোক চাপাচাপি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। চৈত্র বৈশাখ মাসের নিদারুণ গ্রীষ্মে ৫৬ ঘণ্টা এক ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আচার্য্যদেবের দর্শন লাভ করিত ; উপদেশ গ্রহণান্তে বাহিরে আসিলে দেখিতাম দর্শনার্থী যেন স্নান করিয়া আসিয়াছেন ; সমস্ত জামা কাপড় ঘস্মাক্ত, তথাপি তাহার মুখে কী উৎসাহের ভাব, আনন্দের হাসি, আত্ম-প্রসাদের তৃপ্তি ! বহু ব্যক্তি ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া পরিশেষে হতাশ হইয়া ফিরিতেন, পর দিনের আশায়। অনেকে এমনি দু’চার পাঁচ দিন চেষ্টার পর দর্শন লাভে সমর্থ হইতেন। আচার্য্য রাত্রি ৩টার সময় হইতে আসনে বসিতেন। দ্বিপ্রহরে কয়েক ঘণ্টা মাত্র আসন ত্যাগ করিতেন। পুনঃ আসনে বসিয়া রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত দর্শন, উপদেশ, আশীর্ব্বাদ ও “ব্রহ্মচর্য সাধন” দান করিতেন।

আমরা অবাক হইয়া ভাবিতাম—এই বিলাসের যুগে, নাস্তিকতা ও অবিশ্বাসের বজ্রায় যখন দেশের তরুণদল, ভাসমান ; ভগবান, ধর্ম্ম, শাস্ত্র, মহাপুরুষ—সমস্তই যখন উপহাসের বিষয় ; থিয়েটার, বায়স্কোপ,

নৃত্য-গীত, আমোদ-প্রমোদে যখন আবালবৃদ্ধ মাতোয়ারা ; সেই নৈতিক আদর্শের অধঃপতনের যুগেও এ কি অপূর্ব ভাব ও দৃশ্য ! দেখিয়া ব্রিটিশ—সিদ্ধসকল আচার্যের অমোঘ ইচ্ছাশক্তির অজ্ঞেয় প্রভাব ।

বাল্যকালের কেন্দ্র কলিকাতায় এই নৈতিক প্রাবনের তরঙ্গ উঠাইয়া তাহা সমগ্র বাল্যকালে তথা ভারতের অগ্রাগ্র প্রদেশে প্রসারিত করিয়া দিবার জন্ত আচার্য যথাযোগ্য আয়োজন করিলেন । স্বীয় পতাকাবাহী সন্ন্যাসী সন্তানগণের মধ্যে স্বীয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মহাভাব প্রচারের সঙ্কল্প সঞ্চার করিলেন ; তাহাদের প্রাণেও অপূর্ব প্রচারোন্মাদনা ফুটিয়া উঠিল । আচার্যদেব এই সময়ে জর্নৈক সন্ন্যাসীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে আছে—

“বৈদিক যুগের আদর্শ ও বৌদ্ধযুগের বিশিষ্ট ভাব লইয়া সঙ্ঘসন্তানদিগকে সমগ্র দেশের সন্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া দেশ-বাসীকে সজ্জের ভাবে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে ।”

আচার্যদেব সজ্জের “আদর্শ, সাধনা ও ধর্মভিত্তিতে জাতিগঠনের বাণী” প্রচারের জন্ত সন্ন্যাসিগণকে দলবদ্ধ করিয়া কয়েকটি “চারণ দল” প্রস্তুত করিলেন । তাহারা সহরে সহরে পল্লীতে পল্লীতে ভজন-কীর্তন, সভা-সমিতি, বৈদিক যজ্ঞ, গুরুপূজা প্রভৃতির মধ্য দিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন । সজ্জের সন্ন্যাসিগণের উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত হইয়া বাল্যকালের সর্বত্র এক নৈতিক ভাবের আবহাওয়া গড়িয়া উঠিল । ক্রমশঃ বাল্যকালে অতিক্রম করিয়া সে নৈতিক ভাব-প্রবাহ বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, বৃহৎপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশে প্রসারিত হইয়াছিল ।

ঢাকায় যখন এই প্রবাহ পৌছিল, তখন দেখিতাম—“করোনেশন

পার্ক” প্রতিদিন তিন চারি হাজার শ্রোতা মন্ত্র-মুগ্ধবৎ সন্ন্যাসীর উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনিতেছে। বক্তৃতা শেষ হইল। জন-সমুদ্র তথাপি অচল। সন্ন্যাসীর কণ্ঠে পুনরায় স্তম্ভুর সঙ্গীত-প্রবাহ বহিল—“আমরা কেন ভোগে ভুলিব, আমরা যে ভাই ত্যাগীর ছেলে; এখন ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে অহুমানি তা গেছি ভুলে”;—সমগ্র জনতা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনিল; কত জনে অশ্রু বিসর্জন করিল। সভা শেষ হইল—সন্ন্যাসি-চারণ-দল “ওঁ সজ্জং শরণং গচ্ছামি” ইত্যাদি ভজন ধরিয়া বাসগৃহের অভিমুখে চলিলেন। সেই সহস্র সহস্র লোক মন্ত্র-মুগ্ধ মত পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রায় দুই মাইল পর্য্যন্ত চলিয়া ক্রমে ক্রমে গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। কতক কতক লোক সন্ন্যাসিগণের সহিত তাহাদের বাসগৃহ পর্য্যন্ত গিয়া আলাপ পরিচয় ও উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিল। দিনের পর দিন একরূপ চলিত। সভাস্থলে প্রতিদিন শত শত “ব্রহ্মচর্য্যম্” পুস্তক ও আচার্য্যদেবের প্রতিকৃতি বিক্রয় হইত। আচার্য্যদেবের শ্রীমুক্তি-সংকলিত ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশপত্র ও সজ্জবাণী উপদেশমালা গৃহে গৃহে জনে জনে প্রতিদিন সহস্র সহস্র বিতরিত হইত। সেই মুক্তি ও উপদেশ যে-ই দেখিত, সে-ই মোহিত হইত; আচার্য্যের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিত! তাঁর দর্শন ও উপদেশ লাভের সময়-সুযোগের জন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিত। বহু লোক বহু দূর পথ ভ্রমণ করিয়া আচার্য্যের শ্রীচরণে উপস্থিত হইয়া প্রাণের আকাজক্ষা পূরণ করিত।

জন-সাধারণের মধ্যে এই বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সংবাদ আচার্য্যদেবের নিকট পৌছিলে আচার্য্যদেব গম্ভীরভাবে বলিতেন—“আমার প্রচার তোরা কি করবি; আমার প্রচার কাকে চিলে পর্য্যন্ত করবে। বৌদ্ধযুগে যেমন লোকে বুদ্ধের নাম করে শয্যাভ্যাগ করতো, বুদ্ধের নাম করে শয্যাগ্রহণ করতো—তেমনি এমন দিন,

আসছে—যখন সজ্জের ও সজ্জনেতার নাম দেশের লোকে জপ করবে।”

আচার্য্যদেবের স্নেহ-বাৎসল্য-আদর-দরদে বালক ও যুবকগণ সতাই বৃদ্ধিত তাঁর মত হিতৈষী আপনার জন, দরদী-মরমী, ব্যথার ব্যথী এমন বন্ধু আর নাই। প্রাণ খুলিয়া তাহারা স্বীয় স্বীয় প্রাণের জালা, অভাব অভিযোগ, তাঁহার চরণে নিবেদন পূর্বক বৃকের বোঝা নামাইত। অহৈতুক রূপাসিন্ধু আচার্য্য আশা, আশ্বাস, উৎসাহ, জীবনের অতীত ভবিষ্যৎ ইত্যাদি বলিয়া—আশীর্বাদ ও শক্তি সঞ্চার পূর্বক “ব্রহ্মচর্য্য-সাধন” দিয়া তাহাদিগের নবজীবন সঞ্চার করিতেন। তাঁর নিকট সহস্র সহস্র লোক আসিত; প্রত্যেকের দৃঢ় ধারণা ছিল যে—আচার্য্যদেবের সর্বাপেক্ষা প্রিয় সে; আচার্য্যদেব তাহাকেই বেশী আশীর্বাদ ও রূপা করিয়াছেন। ফলে পিতামাতার উপর সন্তান যেমন নিঃসঙ্কোচে দাবী, আবদার, অভিমান করে, তাহারা অনেকেই আচার্য্যদেবের সহিত তেমনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়া যাইত।

কলিকাতা হইতে এই নৈতিক আবহাওয়ার আবর্ত সঞ্চে করিয়া আচার্য্যদেব সদলবলে যখন বিভিন্ন প্রদেশের সহরে সহরে অভিযান করিতেন তখন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে কয়েক দিন পূর্বে প্রেরণ পূর্বক বলিয়া দিতেন—“অন্ততঃ একশত “ব্রহ্মচর্য্যম্” পুস্তক যেখানে বিক্রয় হবে, সেখানে আমি যাবো।” অবশ্য প্রত্যেক সহরে বহু শত পুস্তক বিক্রয় হইত। আচার্য্যদেব বলিতেন—“ব্রহ্মচর্য্যম্ পুস্তকখানা যে পড়বে, সে একবার আমার নিকট না এসে পারবে না। “ব্রহ্মচর্য্যম্” বই বিক্রয় হলে, সে সহরের তরুণ দল বুঝবে, চিন্তা করবে,—কে আসছে, কি জন্ম আসছে, তাঁর কাছ থেকে কি পাবার আছে?” সুতরাং সজ্জ-সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ প্রবল উৎসাহে উপদেশ পত্র বিতরণ ও পুস্তক

বিক্রয় করিয়া প্রথমে ক্ষেত্রে প্রস্তুতপূর্বক আচার্য্যদেবকে জনসাধারণের অমুরোধ ক্রমে আমন্ত্রণ করিলে পর আচার্য্যদেব প্রসন্ন চিত্তে আশীর্বাদে ভাণ্ডার লইয়া গমন করিতেন। সে শুভ বিজয়াভিষানের অপূর্ব বিবরণ আমরা যথাস্থানে পাইব।

জৈনক যুবক এই সময়ে আচার্য্যদেবের দর্শনে আসিয়া কি ভাবে জন্মের মত তদীয় পাদপদ্মে বিকাইয়া সংসার ত্যাগ পূর্বক সজ্জের আশ্রয় গ্রহণ করে, তদীয় বিবরণে তাহা জানা যাইবে—“১২২ খৃষ্টাব্দ। কলিকাতায় পড়িতে আসিয়াছি। একদিন মির্জাপুর ষ্ট্রীটে সজ্জের আশ্রমের সম্মুখ দিয়া পঁচিশ জন ছাত্র একত্র খেলার মাঠে যাইতেছি। .....একজন সন্ন্যাসী আহ্বান করিয়া বলিলেন—মহাপুরুষ স্বামী প্রণবানন্দজী এখানে আছেন, তিনি ছাত্রগণকে জীবন গঠনের উপদেশ দেন। আপনারা আসুন, দর্শন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়া যাইবেন। প্রথম বিরক্তি প্রকাশ করিলেও তাহার সবিনয় অমুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। .....এক এক জন করিয়া দর্শন করিতেছিল; আমাদের সময় না থাকায়, দরজা খুলিয়া একটু দেখিয়া আচার্য্যদেব সম্মানস্বরে আসিতে বলিয়া বিদায় দিলেন। .....আমরা নামিয়া আসিয়াছি; এমন সময়ে জৈনক সন্ন্যাসী আমাদেরকে বলিলেন—একটু দাঁড়ান, একখানি বই (ব্রহ্মচর্য্যম্) আপনাকে দিচ্ছি। .....স্বামিজী মহারাজ নীলরঙের কোট গায়ে দেওয়া ছেলেটিকে একখানি বই দিবার আদেশ দিয়াছেন। বই নিয়া চলিতে চলিতে ভাবিলাম—এত ছেলের মধ্যে আমাদেরকে বই দিলেন কেন? .....ফিরিবার পথে তাঁর নিকট গেলাম। আশ্রমে প্রবেশ মাত্রই আচার্য্যদেবের ঘর হইতে একজন লোক আসিয়া আমাদেরকে তাঁহার নিকট লইয়া গেল। ঘরের মধ্যে ঢুকিলেই তিনি বলিলেন—“তোমার সংস্কার খুব ভাল। ঠিক সময়



মত আমার নিকট আসিয়াছ। যার ছেলে ঠিক তার কাছে আসিয়াছ। তোমার সাথে এই আমার প্রথম দেখা নয়। তুমি নিজের ইচ্ছাম্বলিত এখানে আস নাই। ভগবান ঠিক সময় বুঝিয়া তোমাকে এখানে আনিয়াছেন।” বলিয়া তিনি আমাকে আদরপূর্ব্বক কোলে নিলেন এবং উপদেশ দান করিলেন। ইহার পরে আমি সজ্জের আশ্রমস্থ বিদ্যার্থীভবনে আশ্রয় গ্রহণ করি। আচার্য্যদেব আমাকে নিমতলা শ্রমশালায় গিয়া মৃত্যু-চিন্তা করিতে ও সেই বিষয় প্রবন্ধ লিখিতে বলিতেন। তিনি বলিতেন—তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান নিয়া আমি খেলিতেছি; তোমার জীবনের কোনো কিছুই আমার অজ্ঞাত নাই; তোমার কোনো চিন্তা নাই। মা যেমন ছেলের ধলাকাদা ধোয়াইয়া মোছাইয়া কোলে নেয়; আমি তোমাকে তেমনি বিভিন্ন অবস্থা-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া চালাইয়া নিয়া বাঞ্ছিত অবস্থায় পৌছাইয়া দিব। কিন্তু চাই—Self-Confidence, আর জ্যোত্বকের মতো কামড়াইয়া আমার সঙ্গে লাগিয়া থাকার ক্ষমতা।

\* হৃদয় নামক একটি শক্তিশালী স্বাস্থ্যবান্ যুবক এই সময়ে আচার্য্য-

\* সন্ন্যাস নাম—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। যেমন সুন্দর, স্বাস্থ্যবান্, শক্তিমান্, তেমনি সরল, অমায়িক, গুরুভক্ত। সে সজ্জের সকলের প্রিয় ছিল। হৃদয় সন্ন্যাসী ছিল; এজগৎ আচার্য্যদেব মৃত্যুর কথা প্রকারান্তরে স্মরণ করাইয়া উৎসাহ দিয়া বলিতেন—“হৃদয়! সময় সংক্ষেপ; যেদিন চলে চায়, তা’ কিন্তু আর আসে না। স্বাস্থ্যে স্বাস্থ্যে নাম জপ কর, গুরুর স্মৃতি-নিষে চল।” হৃদয়কেও দেখিতাম—বাইরে সজ্জের কাজে সকাল ৬টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত খাটিয়া আসিয়াও স্নানাহারান্তে জুপে বসিয়াছে। মৃত্যুর দিনও রোগ-শয্যায় আসনবদ্ধ হইয়া বসিয়া এক ঘণ্টা সে জপ ধ্যান করিয়াছিল। তাহার মৃত্যুতে সজ্জ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জালুয়ারী মাসে তাহার মহাসমাধি লাভ হয়।



সভ্য-সমাগমিদল ও ভক্তগণ-পরিদৃষ্ট আচার্যদেব ।



বঙ্গদেশ-সংসদ-পাঠ্য-বালক ও যুবকদল পরিবৃত্ত অধ্যাপক (বঙ্গদেশ) ।

দেবের নিকট যাতায়াত করিতে করিতে সংসার ত্যাগ পূর্বক সজ্জের আশ্রয় গ্রহণ করিল। এইরূপে বহু যুবক তাঁর আকর্ষণে আসিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক সংসার ত্যাগ করিয়া সজ্জ যোগদান করে।

এই সময়ে অপর একটি যুবক ( পরে সজ্জের অগ্রতম সন্ন্যাসী ) বাজিতপুর আশ্রমে মাঘী পূর্ণিমা মহোৎসবের সময়ে আচার্য্যদেবের সাক্ষাৎলাভ করে। তাহার নিকট শুনা যায়—“বাজিতপুর আশ্রমে মঃৎসবে আসিয়াছি। দেখি—খাওড়া গাছে ঢাকা নিম্নতল একটি চত্বর। তথায় আচার্য্যদেব একখানি সুন্দর ব্যাজ-চর্মাসনে সমাসীন; একদা সন্ন্যাসী তাঁর সম্মুখে ধ্যানস্থ। আচার্য্যদেবের বিরাট বিপুল তেজঃপুঞ্জ নয়ন-মোহন কলেবর দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিয়াছি।” তিনি ইসারায় ডাকিলেন। আমি কাছে যাইতেই স্নেহমাখা স্বরে আদর করিতে করিতে বলিলেন—“আর ভয় নাই, যেখানক দি ছেলে সেখানেই আসিয়াছ; তুমি তো আমার ঘরের ছেলে” পর দিন পুনরায় দেখা করিলে বলিলেন—বাড়ী হইতে চলিয়া আইস; আমার সঙ্গে যাইবে।”

এই সময়ে আচার্য্যদেবের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা পূর্বক নৈতিক অধঃপতন ও কদাচারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য মরম-বেদনাভরা শত শত চিঠি নানাস্থান হইতে আসিত। কতকগুলি তিনি নিজে শুনিতেন এবং আবশ্যক উপদেশ লিখিয়া দিতে বলিতেন। অধিকাংশই তিনি দেখিবার অবসর পাইতেন না। আদিষ্ট সন্ন্যাসী সেগুলির প্রার্থিত বিষয় জানিয়া আবশ্যক বিধি-বিধান ও উপদেশ দিতেন। বাঙ্গালার সহর ও পল্লীবাসী শত শত তরুণ আচার্য্যদেবের আশ্রাস আশ্রয়ের কথা জানিয়া অকূলে কূল পাইয়াছিল।

দেশের নেতা ও অভিভাবকগণ দেশ ও জাতির উন্নতি ও উদ্ধারের জন্ত পরিকল্পিত নিত্য নব নব প্ল্যান প্রোগ্রাম উদ্ভাবন পূৰ্বক তরুণ-সমাজকে তাহা কার্যে পরিণত করিবার জন্ত আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু তাহারা আদৌ ভাবেন না যে দেশের আশা-ভরসার মুকুলগুলি সমাজের পঙ্কিল আবহাওয়ার মধ্যে কু-চিন্তা কদাচারে মজিয়া পাপ-প্রলোভনে সৰ্ব্বস্বান্ত হইয়া অল্পতাপে অশান্তিতে জলিয়া পুড়িয়া থাকে হইয়া যাইতেছে। ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা ও বীৰ্য্যক্ষয়ের কবলে পড়িয়া দেশের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার স্থল তরুণ-দল শারীরিক ও মানসিক বলবীৰ্য্য, মেধা-প্রতিভা, শক্তি-সামৰ্থ্য, আনন্দ-উৎসাহ হারাইয়া ক্লীব, কাপুরুষ, অকৰ্ম্মণ্য বনিয়া যাইতেছে। এতকাল পরে দরদী মরমী ব্যথার ব্যথী আচাৰ্য্যদেবের সন্ধান পাইয়া তাহারা প্রাণ উজাড় করিয়া দুঃখ-দুর্দশার করুণ কাহিনী নিবেদন পূৰ্বক রক্ষা পাইবার জন্ত কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিল :—

(১) “স্বেচ্ছায় কখনো বীৰ্য্য ক্ষয় করি নাই। কিন্তু বীৰ্য্য রক্ষিত কিছুতেই হচ্ছে না। জানি—বীৰ্য্যক্ষয় মহাপাপ। এ ভাবে বীৰ্য্যক্ষয় হইতে থাকিলে শরীর-মন শীঘ্রই ভাঙিয়া পড়িবে। শীঘ্র আমার রক্ষার ব্যবস্থা করুন।”

(২) “বীৰ্য্যরক্ষা দুঃসাধ্য। কত ভাবে ইচ্ছা ও চেষ্টা করিতেছি। কিছুতেই পারিতেছি না; কারো নিকট মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি না। হয়তো আমাকে বদমাইস্ মনে করিবে। আপনি আমায় রক্ষা করুন।”

(৩) “মহারাজ! এই দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে আমি কুচিন্তার হাত হইতে কিছুতেই আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছি না। এজন্ত আমার জীবন ও সংসার কিছুই ভাল লাগে না।”

(৪) “বাবা! কুপুত্র অনেক সময়ে পিতাকে ভুলিতে পারে, কিন্তু পিতা কদাচ কুপুত্রকে ভুলেন না। বাবা! আমি তো তোমার পুত্র। আমাকে বীর্ষ ধারণের ক্ষমতা দান করিয়া আমাকে মানুষ করিয়া তোল।”

(৫) “আপনার শ্রীপাদপদ্মে কি একটু আশ্রয় পাইব? আজকাল ব্রহ্মচর্য হাঙ্গাম্পদ। দয়া করিয়া একটু স্থান আপনার শ্রীপাদপদ্মে দিন, তবেই হয়তো সুখ-শান্তিতে জীবন কাটাইতে পারিব।”

(৬) “হে পিতঃ! বর্তমানে আমার বয়স ১৬ বৎসর। আমি ১২ বৎসর বয়স হইতে বীর্ষক্ষয় আরম্ভ করি। যখন ১৫ বৎসর তখন আমার জ্ঞান হইল—কি কুর্কর্ম, কি সর্বনাশ করিতেছি! এখন আমি কঙ্কালসার জীবন ত। আমার বাঁচিবার আশা নাই।”

আচার্যদেবের সঙ্কলিত এই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শমূলক আন্দোলন চলিতেছিল ১৯২৬-২৭-২৮-২৯ খৃষ্টাব্দে। আজ প্রায় এক যুগ পরে হিসাব করিলে দেখা যায় দেশের ও সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আবহাওয়া ও মনোবৃত্তি তখনকার চাইতেও বহুল পরিমাণে—কলুষিত ও অবনমিত হইয়াছে। বিলাস ও বাসনপ্রবৃত্তি আজ চরমে উঠিয়াছে; ফলে উদরে অন্ন, পরিধানের বস্ত্র না জুটিলেও ধার করিয়া বা গৃহের তৈজসপত্র বিক্রয় করিয়াও সিনেমা না দেখিলে চলে না। দেশের কল্যাণকর কোনো কর্মে একটু ক্লেণ স্বীকার করিতে যাহারা প্রস্তুত নয়, এমন যুবক—সিনেমা Counterএর টিকেট করিবার চেষ্টায় চাপা পড়িয়া মরিতে পশ্চাৎপদ হয় না। চা, চুরুট, পান, বিড়ি, কিমাম, জর্দা, সাবান, এসেন্স, গন্ধতৈল, স্নো, পাউডার, লিপষ্টিক, রং বেরংএর জামা কাপড়, সাড়ি—প্রভৃতি বিলাস দ্রব্যে জলের ত্রায়-অর্থ-ব্যয়িত হইতেছে; কিন্তু দুর্ভিক্ষ, বন্যা, দাঙ্গা রিলিফের

জ্ঞ কৃষ্ণিং সাহায্য চাহিলেই লোকে বলিবে—“মশায়! আমরাইতো খেতে পাইনে; Charity begins at Home. আপনাদের জ্বালায় তো দেশে থাকা দায় ইত্যাদি।” আর অনাচার, কদাচার, ব্যভিচার ভদ্র সমাজের মধ্যেও এখন লজ্জার কারণ বলিয়া গণ্য হয় না; মাতৃ-আশ্রম, শিশু-মঙ্গল প্রভৃতি স্থাপনপূর্বক সেই পাপরাশিকে ‘ধামাচাপা’ দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে। অপর দিকে এই দুর্নীতি-কলুষিত উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের ফলে আজ তরুণ তরুণীর জীবনেও ক্ষয়রোগ বাসা বাঁধিয়াছে। দেখিতে দেখিতে দেশে কত যক্ষ্মা হাসপাতাল গড়িয়া উঠিতেছে; তথাপি সেখানে স্থান সঙ্কলান হইতেছে না।

উপরোক্ত প্রকার বিচার করিলে পাঠক পাঠিকাগণের মনে প্রশ্ন জাগিবে—তবে সজ্ঞানেতা আচার্য্যদেবের নৈতিক আদর্শ—সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের এত বড় আন্দোলনের ফল কি হইল? এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে আমরাদিককে চিন্তা-বিচার করিতে হইবে :—

(১) ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটিলে ভগবৎশক্তি অবতার বা আচার্য্যগণের মধ্য দিয়ে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম-নংস্থাপন করে। সজ্ঞানেতা আচার্য্যের মধ্যে এমনি ঐশী শক্তি ও নির্দেশ ছিল। যখন তিনি নৈতিক আদর্শের আন্দোলন সৃষ্টি করেন, তখনও তিনি জানিতেন যে দেশের ও সমাজের আরও গুরুতর অধঃপতনের দিন সম্মুখে। এখনি যদি প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া কতকগুলি উর্কর সরস হৃদয়ে এই আদর্শের বীজ বপন করিয়া দিতে পারি তবে সেই বীজ কালক্রমে বিশাল মহীকূহে পরিণত হইবে। অশ্বখের বীজ পক্ষী-পুরীষের সহিত অট্টালিকার উপর পড়িয়াও অঙ্কুরিত ও পরিবদ্ধিত হইয়া কালক্রমে বিশাল আকার ধারণপূর্বক অট্টালিকাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে। আচার্য্যের ভাগবত সঙ্কল্পের অব্যর্থ বীজ সহস্র সহস্র প্রাণে

নিহিত থাকিয়া কালক্রমে সন্তানসন্ততিক্রমে দেশের নৈতিক পটভূমিকা ( back ground ) রচনা করিবে। একদিকে দেশের নৈতিক আবহাওয়া অত্যন্ত কলুষিত—সত্য ; কিন্তু প্রতিক্রিয়ায় অপর-দিকে নৈতিক জীবনের আকাজক্ষা লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রাণে জাগিতেছে ;—তাও আমরা দেশের সর্বত্র সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণপূর্বক লক্ষ্য করিতেছি। আচার্য্যদেব বলিতেন—“দেশ ও জাতি জাগিবে—আমার সঙ্কল্প-বলে, ইচ্ছা-শক্তিতে ; তবে ধৈর্য্য ধরিয়া সময়ের অপেক্ষা করিতে হইবে ; কাল পরিপক্ক না হইলে কিছু হয় না।”

(২) সজ্বনেতা আচার্য্যদেব আসিয়াছিলেন—দেশ ও জাতির আত্মগঠনের জ্ঞাত আবশ্যক সোপান-পরম্পরা রচনা করিয়া দিতে। তিনি তাঁর স্বল্প-পরিসর জীবনে সমস্ত সোপানগুলি পরপর দেখাইয়া গিয়াছেন। আদর্শ, নীতি ও কর্মপদ্ধতি তিনি নিজে কার্য্যকরী করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। এখন দেশবাসী সেই নির্দেশ ও পন্থায় চলিয়া অভীষ্ট উন্নতি অভ্যাদয় রচনা করিয়া নিতে পারিবে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে বুদ্ধদেব তাঁহার সজ্ঞ গঠনপূর্বক ধর্মপ্রচারের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন—শিশুনাগ বংশের রাজত্বকালে। প্রায় ত্রিশত বৎসর পরে মৌর্য্যবংশীয় ধর্ম-মাত্রাটী অশোকের রাজত্বকালে সেই বৌদ্ধধর্ম সমগ্র জগতে বিস্তারিত হইয়া মানব-সমাজকে শান্তি ও মুক্তির পথ দেখাইয়াছিল। সুতরাং বিচার করিলে বোঝা যায়—সিদ্ধ-সঙ্কল্প আচার্য্যের ইচ্ছাশক্তি অব্যর্থ, অপ্রতিহত। যথাসময়ে তাহা অঙ্কুরিত ও পরিবদ্ধিত হইয়া সফল প্রসব করিবেই।



# গার্হস্থ্য-জীবনের আদর্শ প্রচার

ও

## শিক্ষা-সাধনা প্রদান

তরুণ সমাজের পরিব্রাজনের পন্থা প্রদর্শন ও আশ্রয়দানের ব্যবস্থা করিয়া আচার্য্যদেব দেশের গার্হস্থ্য্যশ্রমের দিকে সাক্ষর দৃষ্টিপাত করিলেন। তথায় প্রাচীন ভারতের গরিমাদীপ্ত গার্হস্থ্য্যশ্রমের কোনো আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় না। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সে স্নেহ, প্রেম, দয়া, সমবেদনা, সহানুভূতি, শ্রদ্ধা-ভক্তি, বিশ্বাস-কৃতজ্ঞতা, সংযম, সতীত্ব-পাতিব্রতা বিলুপ্ত প্রায়। নরনারী আত্মসুখ-সন্তোষ ও স্বার্থের পক্ষিল পক্ষলে বিলুপ্ত। যে ভারতের গৃহস্থ ছিল—জনক-যুগিষ্ঠির-রামচন্দ্র, শিব-দধিচী-দৌলিপ, কৃষ্ণ-ভীষ্ম-ধনঞ্জয়; যে ভারতের নারী ছিল—সতী-সীতা-দময়ন্তী, শৈব্যা-চিন্তা-সাবিত্রী, গান্ধারী-কুন্তী-দ্রৌপদী, গান্ধী-মৈত্রেয়ী-মদালসা; যে ভারতের গার্হস্থ্য্য জীবন ছিল—শ্রীভগবানের মন্দির, আনন্দের নিকেতন; স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-মিলনের নন্দন-কানন ছিল—ভারতের যে পরিবার সমাজ; ভারতের যে গার্হস্থ্য্যশ্রম ছিল—আর্ন্তের আশ্রয়, সন্তপ্তের সুশীতল ছায়া, সর্ব্বস্বান্তের অবলম্বন, দুঃস্থ দরিদ্রের শান্তিসদন; ভারতের যে গার্হস্থ্য্যশ্রমে ব্রত-নিয়ম-উপবাস-দেব-পূজা-অতিথি-সেবা আনন্দের প্লাবন নিয়ত বহাইয়া দিত; ভারতের সেই গার্হস্থ্য্যশ্রম আজ যেন দাবদগ্ধ মরু;—সেথায় শান্তি নেই, আনন্দ নেই, মিলন নেই, প্রেম-প্রীতি নেই, শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস নেই; নাই—সেথায় গুরুপূজা,

শুষ্কজন-ভক্তি ; নাই—দেব-সেবা, অতিথি-সেবা ; নাই—সংযম-উপবাস-ব্রত-নিয়ম। তথায় আছে ভোগের আয়োজন, বিলাসের সমারোহ, বাসনের নিত্য নব নব উপাদান।

অনন্ত করুণা-ঘন-বিগ্রহ আঁচাখোর কোমল হৃদয় বিগলিত হইল ; তদীয় হৃদয়-গোমুখী-নির্ঝরিত সে মন্দাকিনী-প্রবাহ ভারতের গার্হস্থ্যাশ্রমের মরুভূমিতে শক্তি ও প্রেমের প্রাবল্য সৃষ্টি করিতে ছুটিল। **জগদ্বনেতা আচার্য—সদগুরুবেশে শিষ্যবৎসল, ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরুরূপে** “নয়নে অমৃত দৃষ্টি, কণ্ঠে মধুবাহী, হৃদয়ে স্নেহের উৎস, ক্রোড় শান্তিময়” নিয়ে পুনঃ নূতন ভূমিকায় অভিনব আন্দোলন প্রবর্তন করিলেন। আমরা তাহার কথঞ্চিং আভাস দিতে চেষ্টা করিব ;

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, সহস্র সহস্র বালক ও যুবক, ছাত্র ও অধ্যাপক—সমগ্র তরুণ সমাজের জ্ঞান অবিশ্রান্ত অনবসর পরিশ্রম করিতে করিতে তাঁহার শরীর ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। দৈনিক গড়ে তাহাকে ১৬ হইতে ১৮ ঘণ্টা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিয়া এক এক করিয়া অন্ততঃ পাঁচশত দর্শনপ্রার্থীর সহিত কথাবার্তা, প্রশ্নোত্তর এবং সাধন-ক্রিয়াদি প্রদান করিতে হইত। আহা করিতেন যেন আনুমান্যভাবে, অভ্যাসবশে। বিশ্রামের সময়টুকুতেও সজ্জের নানাবিধ কর্ম ছিল। বিভিন্ন স্থানে কর্মীদের প্রতি চিঠিপত্রে নির্দেশ দান, বিভিন্ন আশ্রমে চিঠিপত্র ও অর্থাদি প্রেরণ, আবশ্যক মত বিভিন্ন স্থানে কর্মী প্রেরণ, তজ্জ্ঞ কর্মী সংগ্রহের ব্যবস্থা ; প্রত্যহ কতজন লোক খাবে, কি কি পাক করিতে হইবে ;—যাবতীয় ব্যাপার তাঁহাকেই চিন্তা ও তত্ত্বাবধান করিতে হইত। আচার্যদেব বলিতেন—“সন্ন্যাসীর আবার বিশ্রাম কিসের ? কার্য্য হতে

কার্য্যান্তরই—কন্মার বিশ্রাম। কন্মার বিশ্রাম সেইদিন, যেদিন সে চিতার পরে ওঠে।”

তাঁর বজ্রদৃঢ় শরীরও কিন্তু এই সঙ্কল্পের দুর্জয় বেগ সহ্য করিতে পারিল না। আগষ্ট মাসের ( ১৯২৭ খৃঃ ) শেষ সপ্তাহে তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন। পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পাইতে পরিশেষে (Typhoid) সান্নিপাতিক জ্বর বিকারে পরিণত হইল। পীড়ার প্রথম ভাগেও তিনি বেশী বিশ্রাম নিতেন না। অবশেষে পীড়া গুরুতর আকার ধারণ পূর্বক তাঁকে যখন শয্যাশায়ী করিল, তখন বাধ্য হইয়া বিশ্রাম নিতে হইল। মাসাধিক কাল পীড়ায় শয্যাগত ; জীবন-সংশয় ; কিন্তু সে অবস্থায়ও শেষ পর্য্যন্ত তাঁর চৈতন্য অবিকৃত ছিল। তিনি সজ্জসন্তানগণকে সজ্জ সম্বন্ধে এবং নিজের সম্বন্ধে যথাযথ কর্তব্য নির্দেশ করিতেছিলেন। ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেন, ডাঃ নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ডাঃ সখানাথ বসু, ডাঃ দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি নিঃস্বার্থভাবে তাঁহাকে চিকিৎসা ও তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র আসিয়া শয্যাপার্শ্বে বসিয়া শরীরের প্রতি ওদাসীন্তের জ্ঞাত তাঁকে সম্বন্ধে অমুখোক্ত করিতে লাগিলেন। আবাল্য স্নহং স্নহেচ্ছনাথ বিশ্বাস দাবী জানাইলেন—“আপনি যে সংসার ( সজ্জ ) পাতাইয়াছেন, এসব স্নহৃৎসল ও স্নহসম্পন্ন না করিয়া আপনি যাইতে পারেন না।” সজ্জ-সন্ধ্যাসিগণ ও সেবকবৃন্দ দিবারাত্র শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সেবাশুশ্রূষা এবং কাতরভাবে জীবকল্যাণের সঙ্কল্পবলে শরীরকে নিরাময় করিয়া তুলিবার জ্ঞাত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হইয়া এক রাত্রিতে শরীর অসাড়, তাপহীন হইয়া পড়িল। উদ্বেগ ও নৈরাশ্রে সজ্জসন্তানগণের হৃদয় অবসন্ন, কণ্ঠ বাষ্পকঙ্ক, নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

কিন্তু সকলের দাবী, আবদার, প্রার্থনায় আচার্য্যের অন্তরে

লোককল্যাণের সঙ্কল্প পুনরায় বিগুণ বেগে জাগ্রত হইল ; দেহের প্রতি তাঁর লক্ষ্য আসিল। অমনি ব্যাধির মোড় ঘুরিয়া গেল। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি নিরাময় হইলেন। নবেম্বরের প্রথমে তাঁর শরীর কতকটা কার্যক্ষম হইয়া উঠিল।

এই ব্যাধির মধ্যে আচার্য্যদেবের আকার ইঙ্গিত, আলাপের মধ্য দিয়া আমরা বুঝিয়াছিলাম—আচার্য্যদেব তদীয় গুরু গম্ভীরনাথজীর স্মরণ করেন। একদিন হঠাৎ বলিলেন—“সেই বুড়োর ছবিখানা কোথায়? সামনে আনিয়া রাখ।” ইহাতে আমাদের মনে হয় নাথজী আচার্য্যদেবের আহ্বানে আসিয়া স্বীয় অলৌকিক যোগশক্তিবলে শরীর ধারণের সঙ্কল্প সঞ্চারপূর্ব্বক আচার্য্যের শরীরকে নিরাময় করেন। ইহার পরও পরবর্ত্তী জীবনে আচার্য্যের আরও কয়েকবার গুরুতর ব্যাধিতে শরীর ত্যাগের সঙ্কল্প আসিয়াছিল ; তখনও—আমাদের ধারণা—বাবা গম্ভীরনাথের স্মরণ করিয়াছিলেন এবং তদীয় যোগশক্তি বলে নিরাময় হন। যথাস্থানে তাহা আলোচিত হইবে।

আচার্য্যের এই মারাত্মক ব্যাধি কেন হইল? গুরুতর শারীরিক পরিশ্রমে তাঁর বজ্র-দৃঢ় শরীর শ্রান্ত ক্লান্ত হইলেও ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইবেই—এমন কোন কথা নাই। তবে কেন ব্যাধি হইল? এ বিষয় পরে যথাস্থানে আলোচিত হইবে। \*

---

\* বাজিতপুর নিবাসী শ্রীযুত প্রিয়নাথ দাসের শিশুপুত্র টাইফয়েডে মুম্বু ; তখন তাহার পতি পত্নী উভয়ে একদিন আশ্রমে আসিয়া আচার্য্যদেবের ঘরের দ্বার বন্ধপূর্ব্বক কাতরভাবে তাঁহার নিকট প্রার্থনা ও আবদার করেন—তাদের পুত্রকে আরোগ্য করিয়া দিতে হইবে। ফলে আচার্য্যদেব সেই মারাত্মক ব্যাধি স্বীয় শরীরে গ্রহণ করেন। ছেলেটা বাঁচিয়া গেল ;—এই ব্যাপারটি আচার্য্যদেব স্বয়ং বলিয়াছিলেন।

জগৎকল্যাণের সঙ্কল্পেই আচাৰ্য্যগণের শরীর ধারণ। সেই সঙ্কল্পের তীব্রতা অক্ষুণ্ণ থাকিলে শরীর সুস্থ ও কৰ্ম্মক্ষম থাকে। সঙ্কল্প শিথিল হইয়া আসিলে শরীর-মন বিকল হইয়া আসে। তাই আচাৰ্য্যগণের জীবন-বহন্থ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তাঁহারা ক্রমাগত সঙ্কল্পের পর সঙ্কল্পের বান্ধন দিয়া লোক-কল্যাণের জন্ত শরীর ধারণ করেন।

আচাৰ্য্যদেবের জীবনের প্রারম্ভ হইতে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়— দেশের নৈতিক অধঃপতনে ব্যথিত হইয়া তার প্রতীকারের জন্ত তিনি আবুল-ব্যাবুল। তজ্জন্ত নৈতিক আন্দোলনের তরঙ্গ জাগাইবার জন্ত তিনি কতকগুলি গুরুপবিত্র তরুণ জীবনকে স্থায় আদর্শে গঠিত ও সঙ্কল্পে অন্তঃপ্রাণিত করিয়া তুলিবার জন্ত সন্ন্যাসি-সংঘ গঠন করিতেছেন এবং তাহাদের জীবন গঠনের জন্ত—আশ্রম স্থাপন, কৰ্ম্মোন্মাদনা স্থপ্তি ও জনসেবার আদর্শ ও সমাজ-সেবার প্রেরণা বিস্তার করিতে প্রবল উত্তম করিতেছেন। যখন উহা বেশ প্রবল বেগে চলিতে লাগিল, তখন শরীর-মনকে আরও কিছুকাল বাঁচাইয়া রাখিবার জন্ত নূতন কৰ্ম্মের সঙ্কল্প গ্রহণ আবশ্যক হইয়াছিল।

ব্যাধিতে শয্যাগত থাকাকালীন একদা জনৈক শিষ্যসন্তানকে তিনি দেবীর ( শ্রীশ্রীদুৰ্গা ) নিম্নাল্য আনয়ন করিতে আদেশ করেন। উহা আনিত হইলে পর আচাৰ্য্যদেব উহা মস্তকে গ্রহণ করিলেন। তখন দুইটি সঙ্কল্প তাঁর অন্তরে জাগ্রত হইল—(১) **সদগুরুরূপে গৃহস্থ সমাজে তিনি তাঁহার তপঃশক্তি সঞ্চার করিবেন ; (২) সমাজে “শান্ত-সাধনা” প্রবর্তন করিবেন।** এই সঙ্কল্পের উদয় হওয়ার মুহূর্ত্ত হইতে তিনি ক্রমেই আরোগ্যপথে অগ্রসর হইলেন। পরবর্ত্তীকালেও এমনিতির দুৰাৰোগ্য ব্যাধির কবল হইতে শরীরকে রক্ষা করিবার জন্ত

আচার্য্যকে নব নব সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। জীবনী-প্রসঙ্গে যথাস্থানে তাহা দেখাইব।

ইং ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি নূতন ভূমিকায় সদৃশরূপে অবতীর্ণ হইয়া শতসহস্র গৃহস্থকে সাধন-দীক্ষা প্রদান পূর্বক শক্তি সঞ্চায় করিতে আরম্ভ করেন। ৮শিৱরাত্রির পূর্বদিন হঠাৎ কতকটা স্বগত ভাবে বলিলেন—‘যা! এতকাল যা’ করিনি তাই করবো, এখন থেকে গৃহস্থকে দিতে আরম্ভ করলাম।’ পরদিন শিৱরাত্রি; উৎসবের বিষয় পূর্বেই প্রচারিত হইয়াছিল। অপরায় ৩টা হইতেই আশ্রমে লোকারণ্য। কলেজস্কেয়ারে সভা ও বক্তৃতা; আশ্রমে কীৰ্ত্তন \* অবিরাম চলিতেছে। সভান্তে শ্রোতৃবৃন্দ দলে দলে আসিয়া আশ্রম পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। আশ্রমের সম্মুখস্থ রাস্তায় উভয় ফুটপাথে ৭৮ জন সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া পথচারী প্রত্যেককে সাধন আহ্বান এবং আচার্য্য-দেবের সাধন-দান ও শক্তি-সঞ্চায়ের বিষয় জ্ঞাপন করিতেছেন। বহু লোক দর্শন ও প্রণাম পূর্বক আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া যাইতেছে; কেহ কেহ বা উপদেশ গ্রহণ করিতেছে। কাহাকেও তিনি সাধন দান করিতেছেন।

যাহাদিগকে সাধন দানের উপযুক্ত দেখিয়াছেন, তাহাদিগকে পূর্ব দিনেই কিছু ফুল-বিষপত্র, ফল ও পাঁচটা করিয়া হরিতকী আনিতে নির্দেশ দিয়াছেন। আবশ্যক উপদেশ প্রদান পূর্বক মন্ত্র সহ শক্তি-সঞ্চায়

\* “ওঁ গুরুকৃপাহি কেবলম্”—আচার্য্যদেব কর্তৃক আদিষ্ট এই নাম ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে সজ্জসন্তান কর্তৃক গীত হইয়া আসিতেছে। উহা সজ্জ-সাধনার মূলমন্ত্র। “ওঁ হর গুরো শঙ্কর শিব শঙ্কো”—এই নাম আচার্য্যের সিদ্ধপীঠে প্রাপ্ত—যুগের তারকব্রহ্ম নাম।

করিলেন। প্রত্যেকের বাহুতে শক্তিপূত তিনটি করিয়া রুদ্রাক্ষ বাঁধিয়া আবশ্যক নির্দেশ দিলেন। প্রত্যেককে পুষ্প-বিল্বপত্রাদি দ্বারা আচার্য্য-চরণে অঞ্জলি নিবেদন পূর্ব্বক পাঁচটি হরিতকী গুরুদক্ষিণা দিতে আদেশ দিলেন। এইরূপে উক্ত পুণ্যময়ী শিবরাত্রি তিথিতে আচার্য্যদেব গৃহস্থ-সমাজে শক্তি-সঞ্চার আরম্ভ করিলেন।

ইহার পর হইতে এই সাধনদানের পর্ব্ব চলিল—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর; আর এই সাধন লাভের জন্ত জন-সাধারণের কী বিপুল আগ্রহ। আচার্য্যদেব ইহার পর হইতে যখনি যেখানে গিয়াছেন—মধুলুঙ্গ ভ্রমরের গায় সহস্র সহস্র নরনারী তাঁর নিকট ছুটিয়া আসিয়াছে। সেখানে কোনো কিছুই বিচার ছিল না; যিনি যে মতের, যে পথের, যে গুরুর আশ্রিত হউন না কেন—আচার্য্যের নিকট সকলের সমান অধিকার ছিল। পাত্র ও আগ্রহ-আকুলতার তারতম্য অনুযায়ী তিনি সকলের মধ্যেই শক্তি-সঞ্চার করিতেন। তিনি দর্শন ও সাধন-প্রার্থীগণকে পূর্ব্বেই জানাইয়া দিতে বলিতেন যেন তাহারা তাঁহার নিকট গিয়া নানা প্রশ্ন বা কথাবার্তা বলিয়া প্রগলভতা প্রকাশ না করে। “সকলের ভিতর বাহির ভূত-ভবিষ্যৎ আমার নখদর্পণে। নীরবে প্রণাম করে বসবে; যার যতটুকু যা’ প্রয়োজন তা’ আমিই বুঝে দেব। Soil test করে কার কি উপযোগী তা’ আমিই ঠিক করবো।”

শত শত লোক দর্শনপ্রার্থী; তথায় এক এক জনের সহিত দু’মিনিট, তিন মিনিট বড় জোর পাঁচ মিনিটের অধিক কথা বলিবার সময় ছিল না। কাজেই সেই সামান্য সময়টুকু যদি কেহ কথা বলিয়া নষ্ট করে তবে দর্শনাধীকে শূন্যপাত্রেই ফিরিতে হইবে। এজন্ত তিনি উপরোক্ত নির্দেশ সকলকে জানাইয়া দিতে বলিতেন। সাধারণতঃ ভোর রাত্রি

৩টা হইতে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত তিনি সাধন দীক্ষা প্রদান করিতেন এবং অপরাহ্ন ৩টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত দর্শনোপদেশ দান এবং সাধন-প্রার্থীগণকে নির্বাচন করিয়া প্রত্যুষে স্নানাদিপূর্ব্বক আবশ্যিক দ্রব্যাদি ( পুষ্প-বিষপত্র, ফল ও হরিতকী ৫টা ) লইয়া আসিতে আদেশ দিতেন।

বহু নরনারী দর্শন করিতে আসিত। সকলেই যে শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসের ভাবে অমুপ্রাণিত হইয়া আসিত—তাহা নহে। কেহ আসিত অর্থার্থী হইয়া—সাধুর আশীর্ব্বাদে যদি সাংসারিক কিছু সুবিধা ও স্বচ্ছলতা ঘটে; কেহ আসিত জিজ্ঞাসু হইয়া সংশয়ের সমাধানের জন্ত; আবার কেহ আসিত—কেমন সাধু মহাপুরুষ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে; কেহ আসিত নিছক প্রশ্নোত্তর ও তর্ক বিতর্ক করিতে।

অন্তর্যামী আচার্য্যদেবের নিকট কিছুই অজ্ঞাত থাকিত না। আচার্য্যদেবের প্রকোষ্ঠের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ; ঘরে মিটি মিটি প্রদীপের আলো যেন গৃহ-মধ্যস্থ অন্ধকারকে আরও গাভীর্ঘ্যপূর্ণ ও সম্বন্ধ-সূচক করিয়া তুলিয়াছে। আচার্য্যদেব ব্যাঘ্রচক্ষ্যাসনে বসিয়া রহিয়াছেন—বিশাল, উন্নত, স্থির কলেবর যেন সাক্ষাৎ শিব। সেই নিস্তব্ধ, গাভীর্ঘ্যময় অন্ধকার-প্রায় বন্ধ প্রকোষ্ঠে সেই বিরাট পুরুষের সম্মুখে কেহ কেহ না যাইয়া দ্বারদেশ হইতে দর্শন নমস্কার করিয়াই ফিরিত, অগ্রসর হইতে সাহসী হইত না; সরলপ্রাণ ভক্তগণ আচার্য্যকে সাক্ষাৎ শিবজ্ঞানে পদপ্রান্তে মস্তক বিলুপ্তন পূর্ব্বক আত্মনিবেদন করিয়া আশীর্ব্বাদ লাভ করিত; জিজ্ঞাসু—নিকটস্থ হইয়া প্রণত হওয়া মাত্র হয়তো শুনিত আচার্য্যদেব তাহার মনের প্রশ্নটির উত্তর প্রকাশ করিলেন! সংশয়ী সম্মুখে উপস্থিত হওয়া মাত্র অনুভব করিল যেন তার সব সংশয়ের সমাধান হইয়াছে—



সে নীরবে প্রশ্নমপূর্বক আশীর্বাদ নিয়াই ফিরিল। অন্ততপ্ত-প্রাণ তাঁর চরণকমলে মস্তক রাখিয়া অশ্রুজলে ভাসিয়া আত্মনিবেদনপূর্বক আশ্বাস ও সাহুনা প্রাপ্ত হইত। কেহ অনাবশ্যক প্রশ্ন বা তর্ক উত্থাপন করিলে তিনি নির্ঝাক হইয়া থাকিতেন; কোনো প্রকার সাড়া শব্দ না পাইয়া প্রশ্নকারী তাকিক ভীত হইয়া বাহির হইয়া আসিত। আচার্য্য-দেব বলিতেন—“পাগলের মনে কত কথা ওঠে! তার কি কোনো মূল্য আছে? সব প্রশ্নেরই কি জবাব দিতে হয়? প্রশ্নের মত প্রশ্ন কয়টা? যথার্থ প্রশ্ন যেটা তারই শুধু জবাব দেওয়া উচিত। আমার নিকট প্রশ্ন কিসের? সাধারণ লোকে সাধারণ লোকের নিকট প্রশ্ন করিতে পারে। আমার নিকটে প্রশ্নের কোনো সার্থকতা আছে কি? আমি কার ভিতর বাহির না দেখতে পাই? স্মরণ্য আমার নিকট লোকে আসবে—নীরবে ব্যাকুলতা ও প্রার্থনায় হৃদয় পরিপূর্ণ করে নিয়ে।”

কোনো কোনো যথার্থ জিজ্ঞাসুর—প্রশ্নের জবাব দিবার সময় না থাকিলে তিনি বলিতেন—“যাও! গুরুপূজার আসনের সামনে গিয়ে বসে প্রার্থনা করো, সব আমি শুনতে পাবো।” অনেকে একরূপ প্রার্থনার দ্বারা অন্তরে অন্তরেই সমাধান পাইয়াছে; কেহ কেহ স্বপ্নযোগেও আচার্য্যের সাক্ষাৎলাভ পূর্বক আদেশ, উপদেশ পাইত; সাধন-দীক্ষাও কেহ কেহ স্বপ্নযোগে লাভ করিয়াছে। একরূপে অসংখ্য ঘটনা অহরহঃ ঘটিত। শত শত ব্যক্তি—অনেকে সপরিবারবর্গে আসিয়া—কলিকাতা আশ্রমে এই সময়ে সাধন-দীক্ষা গ্রহণ করিতেন।

জৈনিক যুবক কর্ম্মী ( পরে সজ্জের অগ্রতম সন্ন্যাসী ) উক্ত শিব-রাত্রির দিবস সাধন গ্রহণ করে। তাহার নিকট শুনিয়াছি—“আচার্য্য দেবের আদেশে সমস্ত স্কুলে কলেজে নিমন্ত্রণ জানাইয়া এবং আচার্য্য-

দেবের শক্তি-সাধনা-দানের সকল প্রচার করিয়া আসিলাম। বহু ছাত্র ও গৃহস্থ আসিল। বহুলোক সাধন পাইল। আশ্রমস্থ কতিপয় ত্যাগী কষ্টেও সাধনলাভ করিল। সর্বশেষে আমার ডাক পড়িল।... রাত্রিতে আচার্য্যদেব আরাম-কেদারায় বিশ্রাম করিতেছেন, আমি পাদ-সম্বাহন করিতেছি। এমন সময়ে আচার্য্যদেব ৩শিবরাত্রিতে সাক্ষাৎ ভোলানাথ বরদাতা শিব হইয়া বসিলেন। পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন—  
**“আজ তুই যা’ চাইবি সেই বর দেবো, বর প্রার্থনা কর।”**  
 আমি তখন আত্মহারা, দিশাহারা; কী বর চাইব? আমার যেন সব পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রার্থনার কিছুই নাই। অন্তরে কেবল প্রার্থনা উঠিতেছে—ঠাকুর তোমার এই শ্রীপাদপদ্মেই যেন আমি চিরকাল স্থান পাই। আমার কি প্রয়োজন—আমি কি জানি? সে সব তুমি জান। আমি চাই—শ্রীচরণশ্রদ্ধ অক্ষয় হোক। যতবার তিনি বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন—ততবারই এই এক প্রার্থনা হৃদয়ে উথিত হইল।

“একটু পরে আচার্য্যদেব আমার দুই উরুর উপর তাঁর চরণদ্বয় স্থাপন পূর্বক শয্যা শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন। খানিক পরে আমার উরুদ্বয়ে যন্ত্রণা হইতে লাগিল; কিন্তু আচার্য্যদেবের নিদ্রাভঙ্গ হইবে ভয়ে নড়িতে পারিলাম না। ভাবিলাম—যত যন্ত্রণাই হউক, নিদ্রাভঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত এইভাবেই বসিয়া থাকিব। রাত্রি ভোর হইয়া আসিল; আচার্য্যদেব হঠাৎ উঠিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া আদর ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন—“আর তোর কোনো ভয় নাই। সর্ব্বদা নির্ভয়ে সজ্জের সেবা করিয়া যাইতে পারিবি।”

শ্রীযুত ললিত মোহন সরকার এই সময়ে আচার্য্যদেবের আশ্রয় লাভ করেন। তাহার প্রদত্ত বিবরণ—“আজ রবিবার দর্শন-গৃহের

সম্মুখে বহু লোকের সমাগম। বালক, বৃদ্ধ, যুবক—সকলেই সোৎসুক নয়নে দ্বার পানে বন্ধ-দৃষ্টি। বাক্যালাপ নাই, চঞ্চলতা নাই, সকলেই—দর্শন লাভের জ্ঞাত উদ্গ্রীব। এত ভীড়ে কি করিয়া দর্শন করিব—ভাবিয়া ম্রিয়মাণ; এমন সময়ে একজন সন্ন্যাসী আহ্বান করিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—দিব্যকাস্তি, সহাস্যবদন, স্থিরনেত্র, দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশকলাপ, গৈরিক বসন-পরিহিত একজন বিরাট পুরুষ! প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন “ওরে! তোর কোন ভয় নাই। তুই কি চাস্ তা’ আমি জানি; বহু সং-সংস্কার নিয়ে জন্মেছিস্! আজ হতে তুই নির্ভয় হ।” বলিয়া তিনি আমাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইলেন! সেই স্নেহ-আদরে গলিয়া আমি অশ্রুসিক্ত হইলাম। “তুই কি চাস্—আমি জানি” ও “তুই নির্ভয় হ”—এই দুইটা কথা চিন্তা করিয়া করিয়া বিন্দ্র রজনী অতিবাহিত করিয়া ভোর ৪টায় স্নান সমাপনান্তে কিছু ফুল ও ৫টা হরীতকী নিয়া আশ্রমে গেলাম। শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া মনে মনে নিবেদন করিলাম ‘হে ঠাকুর! আমার সংশয় ছিন্ন কর। বলো—আমি কি চাই! বলো—তুমি আমার কে, আর আমি তোমার কে?’ তিনি বলিলেন—“আজ হতে তুই আমার সন্তান; তোর সমস্ত দায়িত্ব আমাতে অর্পণ কর! তোর জন্মজন্মান্তরের পাপ পুণ্য আমি গ্রহণ করিলাম। তুই নির্ভয় হ!” মন্ত্র দিয়া নিরন্তর জপ করিতে বলিলেন। আশ্বাস দিলেন—“এতে চিন্ত—নির্ম্মল, পবিত্র, দোষমুক্ত হবে; শাস্তি লাভে সমর্থ হবি। হিমালয় পর্ব্বতের গুহায় তপস্যা করলেও তা’ পাবে না।” উপদেশ দিলেন—“এ সংসার বাসভূমি নহে; এখানে তুই একজন পথিক মাত্র। স্ত্রী পুত্রগণকে অতিথিজ্ঞানে আহ্বার্য্যাদি দান করিবে। অথচ কোনো সম্বন্ধ না থাকে

যেন।” স্বরণ হইতে লাগিল—বাল্যকালে স্বপ্ন-যোগে এই মহাপুরুষকেই দর্শন করিয়াছিলাম—তিনি যেন ত্রিশূল হস্তে আমাকে ব্যাঘ্রের কবল হইতে রক্ষা করিতেছিলেন।”

সজ্জনেতার অন্ততম প্রিয় গৃহী সন্তান চিরকুমার শ্রীযুত হরি বিলাস মুখোপাধ্যায় \* আচার্য্যাদেবের সহিত সাক্ষাৎ ও আশ্রয় লাভের কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—১৯২৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মির্জাপুর ষ্ট্রীটের আশ্রমে গেলাম—আচার্য্যাদেবের দর্শন মিলিল। কথাবার্তার পর একটি মন্ত্র দিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসে জপ করিতে বলিলেন। বিশ্বাস হইল না। বলিয়া ফেলিলাম—এরূপ তো আমি রাত্রে বহু ঘণ্টা করিয়া থাকি। ২০-২৫ হাজার জপও হয়। তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—**ব্রহ্মচর্য্য স্মরক্ষিত না হলে কিছুই ধারণা করা যায় না**” আরও বলিলেন—**“আচার্য্যের নিকট হতে (মন্ত্র) মিলে এরূপ বলতে না।”** তারপর পরম করিয়া দেখিতে বলিলেন—**“সপ্তাহের ভিতর যদি কথাগুরুপ কাব্য না হয়, তবে তুমি আর আসিও না। মন্ত্রটি বেলপাতায় লিখে গঙ্গায় ফেলে দিও।”** আমি নিদ্রিষ্ট সময়ের মধ্যে ফল পাইয়াছিলাম। আমার অবিশ্বাস দূর হইল। বুঝিলাম ইনি যথার্থ—আচার্য্য। শিবরাত্রির দিনে তাঁর আদেশে আশ্রমে শিবপূজা করিলাম। তিনি বলিলেন—**“আর একদিন আসিও—তোমাকে ব্রহ্মচর্য্য সাধন ও শক্তি-সাধনা দুইটাই**

\* ইনি সজ্জের সাধারণ সমিতির সভ্য-শ্রেণীভুক্ত; সজ্জের পুরোহিত। সজ্জের বিভিন্ন আশ্রমে সজ্জনেতার আদেশে অহুষ্ঠিত দুর্গোৎসব, কালীপূজা, দোলোৎসব প্রভৃতি যাবতীয় পূজাপার্বণে তিনি বিগত বহুবর্ষ যাবৎ পৌরহিত্য করিয়া আসিতেছেন।

দিব।” নির্দিষ্ট দিনে ফুল বিলপত্র ও ৫টা হরীতকী নিয়া উপস্থিত হইলে তিনি সাধন দান পূর্বক—আত্মাস ও অভয়বাণী শুনাইলেন—  
**“তোমার জন্মজন্মান্তরের যাবতীয় পাপ-তাপ আধি-ব্যাধি আজ সব আমি নিলাম।”** পরে একদিন তাঁর অসুস্থ অবস্থায় শয্যা পার্শ্বে বসিয়া ভাবিতেছি—“মহাপুরুষদের এসব ব্যাধি-পীড়া হয় কেন?” তিনি বলিলেন—“তোমাদের জন্মই।” বুঝিলাম—এ জন্মই সেদিন বলেছিলেন—“তোমার পাপ-তাপ-ব্যাধি নিলাম।”

আচার্যদেবের নিকট যাহারা দর্শনার্থী হইয়া আসিত তাহাদের সকলকেই যে তিনি মন্ত্র বা সাধন দান করিতেন—তাহা নয়। তিনি গার্হস্থ্যশ্রমের মধ্যে আদর্শের প্রেরণা সঞ্চার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং সমাগত গৃহস্থগণের মধ্যে যাহারা আশ্রয়-প্রার্থী এবং যাহাদিগকে তিনি উপযুক্ত মনে করিতেন—তাহাদিগকে সাধনাদি দান পূর্বক তাহাদের জন্মজন্মান্তরের পাপতাপ, আধিব্যাধি প্রভৃতি যাবতীয় দুর্ভোগ তিনি গ্রহণ করিতেন। সাধারণ দর্শন ও উপদেশ-প্রার্থীগণকে গার্হস্থ্যশ্রমের আদর্শ ও কর্তব্য এবং সমস্তা সম্বন্ধে উপদেশ, আত্মাস ও সমাধান দান করিতেন এবং তাহাদের মধ্যে স্বীয় সঙ্কল্প-শক্তি সঞ্চার করিয়া দিতেন। ফলে তাহারা আনন্দ ও শান্তির অধিকারী হইত।

দেশের ও সমাজের সর্বত্র ও সর্বস্তরে গার্হস্থ্য জীবনে এই আদর্শ ও সাধনার প্রেরণা সঞ্চার করিবার জন্ম তিনি ব্যাপক আন্দোলনের সৃষ্টি করিলেন। স্বীয় সঙ্কল্পের বাহক সজ্জের সন্ন্যাসিগণকে আদেশ করিলেন :—

“কঠোর তপঃ-সাধনায় এই শরীরে—এই জীবনে যে মহাশক্তির স্ফুরণ ঘটেছে, সে মহাশক্তি সমগ্র জাতির মহামুক্তি

আনয়নে সমর্থ ; যাও, তোমরা সমগ্র ভারতের নরনারী—  
আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে এই মহাশক্তির সংস্পর্শে আনয়ন কর ।”

তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া কহিলেন—“মানুষ তর্ক চায় না, যুক্তি চায় না, শাস্ত্র চায় না। তারা অনেক শাস্ত্র পড়েছে, অনেক বক্তৃতা শুনেছে, অনেক তর্ক আলোচনা করেছে ; তাতে তো তাদের প্রাণে শাস্তি আসেনি। মানুষ চায়—একটি জীবন্ত আদর্শ, একটা জ্বলন্ত চরিত্র, একটা নিখুঁত মানুষ—একটি প্রজ্বলিত শক্তির স্পর্শ ;—যাঁর দর্শনে তাদের প্রাণে আত্মস্মৃতির উদ্রেক হবে ; যার আশ্বাসবাণীতে তাদের হৃৎক-কণ্ঠ-যন্ত্রণায় শতধা বিচ্ছিন্ন নিরাশ, অবসন্ন হৃদয়—নববল, নবীন উত্তম, নবীন উৎসাহে উদীপ্ত হয়ে উঠবে। যার উপদেশ, যার চিন্তাভাবনাতে তাদের উন্মার্গগামী উচ্ছৃঙ্খল জীবন আপনা আপনি সুসংযত হবে ; যার পবিত্র স্পর্শে ও আশীর্ব্বাদে তাদের অন্তর্নিহিত সুপ্ত সিংহবোধ্য ভীম বিক্রমে গর্জিয়া উঠিবে।”

সঙ্ঘের সম্মানসৌ প্রচারকবৃন্দ গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে আচাধ্যের এই অভয় আশ্বাস, আদেশ, নির্দেশ লইয়া ছুটিলেন। আচাধ্যের আদর্শে তদীয় গাইহ্যাপ্রম-সম্পর্কিত শিক্ষা-সাধনা-সমূহ “গাইহ্যম্” নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইল। সর্বত্র সহস্র সহস্র পুস্তক বিক্রীত হইতে লাগিল। চারি বৎসরের মধ্যে পাঁচটা সংস্করণের প্রয়োজন হইয়াছিল। প্রতি সংস্করণে দশ হাজার করিয়া মুদ্রিত হইয়াছিল। “ব্রহ্মচর্য্যম্” ও “গাইহ্যম্” পুস্তকদ্বয়ের শিক্ষা সাধনাগুলি হিন্দী, ইংরেজী,

তেলগু, তামিল, গুজরাটীতে অনূদিত হইয়া ভারতের সর্বত্র প্রচারিত হইল। বাগ্মী সন্ন্যাসিগণ দেশের সহরে সহরে এবং প্রধান প্রধান স্থানে উচ্চাবেগে অবিরাম অবিশ্রাম ঘুরিয়া অসংখ্য জনসভায় গাহ'স্থ্যাত্রমের আদর্শ, শিক্ষা, সাধনা এবং সজ্জনেতা আচার্য্যদেবের প্রদত্ত “শক্তি-সাধনার” বিষয় প্রচার করিতে লাগিলেন। “সজ্জবাণী”, “গাহ'স্থ্যনীতি” এবং “আশীর্বাদ”—প্রভৃতি আচার্য্যদেবের শ্রীমুষ্টি-সম্বলিত উপদেশ-পত্র লক্ষ লক্ষ বিতরিত হইতে লাগিল। উহা পাঠ করিয়া গৃহী নরনারীর মধ্যে এক অপূর্ব আশা ও উৎসাহের সৃষ্টি হইল। আচার্য্যদেবের দর্শনের জন্ত সহস্র সহস্র নরনারী আকুল ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

তখন—দর্শনের সময় স্নযোগ প্রচার করা হইতে লাগিল—“পিতৃপক্ষে গয়া সেবাশ্রমে, দুর্গোৎসবের সময়ে কাশীতীর্থ সেবাশ্রমে, রথযাত্রার সময়ে পুরী সেবাশ্রমে, কলিকাতা আশ্রমে সর্বদা—বিশেষ ভাবে শিবরাত্রি ও জন্মাষ্টমী তিথিতে, খুলনা সেবাশ্রমে—রাসপূর্ণিমায়, মাদারিপুর্ সেবাশ্রমে—বৈশাখী পূর্ণিমায়, আশান্তনি সেবাশ্রমে—দোল পূর্ণিমায়, বাজিতপুর সেবাশ্রমে—মাঘীপূর্ণিমায়, রাজসাহী আশ্রমে—সরস্বতীপূজার সময়ে, নওগাঁ উত্তরবঙ্গ সেবাশ্রমে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায়, কুস্তমেলায়—হরিদ্বার ও প্রয়াগে—আচার্য্যের দর্শন, উপদেশ আশীর্বাদ ও সাধন,দীক্ষা পাওয়ার স্নযোগ।”

চারণদলগুলি যেখানে যেখানে বাইতেছিল তথায় আচার্য্যের এই বাণী ও প্রেরণা একটা ভাব ও আদর্শের আবর্ত সৃষ্টি করিতেছিল। পূর্বোক্ত ১২২৮ সালের শিবরাত্রির সময় হইতে প্রতিদিন দুইটি চারণ দল কলিকাতার পথে পথে বাড়ীতে বাড়ীতে সজ্জের বাণী ও আদর্শ প্রচার করিতে লাগিল। প্রত্যেক দিন কলিকাতার এক এক পল্লীতে, এক এক পার্কে জনসভা ও বক্তৃতা হইতে লাগিল। তরুণ সন্ন্যাসিগণের

প্রাণময় ভাবোচ্ছ্বাস ও অন্তরের আবেদন বক্তৃতা ও সঙ্গীতের মধ্যে শ্রবণ করিয়া জনগণের ভিতর এক অপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি হইল। দলে দলে হাজারে হাজারে স্ত্রীপুরুষ দর্শন, উপদেশ ও সাধন-প্রার্থী হইয়া দিবারাত্র আশ্রমে ভীড় করিয়া রহিল। কলিকাতার বিশিষ্ট ও অবিশিষ্ট নাগরিক—রাজা, জমিদার, ব্যবসায়ী, অধ্যাপক, ছাত্র, চাকুরিয়া আচার্য্যাদেবের নিকট দর্শনার্থী হইয়া যায় নাই—এরূপ লোক কমই ছিল।

চারিদিকে একটা ভাবের প্লাবন বহিল; ১৯২৮ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত যাহারা তদনীন্তন সজ্জের মির্জাপুর ষ্টীটস্থ আশ্রমে গিয়াছেন তাহারা সবাই একবাক্যে উহার প্রমাণ দিতে পারিবেন। সজ্জের সন্ন্যাসিগণকে ট্রামে দেখিলে ট্রামের কন্ডাক্টরগণ—গান করিত “ওঁ হর হর বোম্ বোম্”; বালকগণ রাস্তায় সন্ন্যাসিগণকে দেখিলেই বলিত “ওঁ গুরুসাহি কেবলম্।”

সজ্জের প্রচারক সন্ন্যাসীদের নিকট গৃহস্থগণকে প্রায়ই হুঃখপ্রকাশ করিতে শুনিয়াছি—“স্বামীজি! ধর্ম্ টর্ম্ কি আর আমরা করতে পারি? আমরা থাকি স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে; কত মিথ্যা, জুয়াচুরি, ষষ্ঠতা, প্রবঞ্চনা, পাপ করি। আমাদের কোনো আশা নেই। ওসব আপনারা যারা সংসার ছেড়ে ভগবান্কে সঞ্চল করে বেরিয়েছেন—তাদেরই জ্ঞান।”

কিন্তু তাহারাই আচার্য্যের অভয়বাণী শুনিয়া আশ্বস্ত ও উৎসাহিত হইত—“গৃহস্থ তুমি, গৃহস্থই থাক; ধর্ম্মলাভ করবার জ্ঞান তোমাকে সংসার ছেড়ে অরণ্যে গিয়ে নির্জনে যোগধ্যান-তপস্তা করতে হবে না। যে ব্যক্তি যেখানে যে জীবিকাবৃত্তি,



যে কর্তব্য অবলম্বন করে আছে—সেখানেই থাকো ; ধর্মলাভের জন্ত তোমাকে সেস্থান থেকে একপাও নড়তে হবে না । ভারতের ঋষি, ভারতের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে স্বধর্ম পালন করতে বলেছেন ।”

প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল, পুনঃ সায়ংকাল হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত—যা’ কিছু তুমি কর—চিন্তা, বাক্য, কার্য—সমস্তই জগজ্জননীর সেবাপূজা, বিশ্বমাতার তৃপ্তি ও তুষ্টির জন্ত ; —জ্ঞান কর । অনাসক্তভাবে ভগবানের চরণে ফলাফল নির্ভর করিয়া বীর-বিক্রমে জীবনের পথে চলো ;—ইহাই গাহ’স্থ্য জীবনের সাধনা ।”

“ধর্ম ও কর্ম তা’হলে এক হয়ে যাবে । তখন দেখবে শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে যা’ কিছু করা যায়—চিন্তা, বাক্য, কার্য—তাহাতেই ধর্ম ; তাহাতেই প্রাণমন শুদ্ধ, পবিত্র, আনন্দপূর্ণ হয় । আর ভগবানকে বিস্মৃত হয়ে, বাদ দিয়ে যা’ কিছু করি—সমস্তই পাপ, অধর্ম ; তাতে বন্ধন আনে, অশান্তির সৃষ্টি করে ।”

“চাই—ভোগে সংঘম, সঙ্কল্পে দৃঢ়তা, কর্তব্যে নিষ্ঠা, কর্মে উৎসাহ, ভোগ্যবস্তু ও ঐহিক সম্পদে অনিত্যতা-বোধ, আচার্য ও গুরুতে অবিচলিত শ্রদ্ধা, শাস্ত্র ও সদাচারে দৃঢ়বিশ্বাস ; মন-প্রাণ—সরল ও অকপট ।”

—“গাহ’স্থ্যম্”

সম্ভব-সম্মানসিগ্গ ম্যাজিক ল্যাঠার্ণ যোগে প্রাচীন ভারতের গৌরবময় কীর্তিকাহিনী,—ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, জনক, যুধিষ্ঠির, রামচন্দ্র, শিব, দধিচী, হরিশ্চন্দ্র, সতী, সীতা, সাবিত্রী, শৈব্যা, দময়ন্তী, চিন্তা প্রভৃতির কথা রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের অবদানগুলি সর্বত্র প্রচার পূর্বক নরনারীর মধ্যে অভিনব প্রেরণা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র নরনারী ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া এই বাণী, এই কাহিনী, এই চিত্রগুলি দেখিতে দেখিতে ভারতের সেই অতীত গৌরবময় যুগে গিয়া উপস্থিত হইত। এক অপূর্ণ আনন্দ, গাভীর্থ্য ও গৌরববোধে সকলে উদ্দীপ্ত অমুপ্রাণিত হইয়া উঠিত।

এইরূপে নৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি যুগপৎ গার্হস্থ্য-জীবন গঠনের আন্দোলনের প্রবাহ প্রবল ভাবে চলিল সমাজের সকল স্তরে। সর্ব শ্রেণীর নরনারী আবালবৃদ্ধ এই যুগ্ম-আন্দোলনের তরঙ্গে ভাসিতে লাগিল। অবশ্য এই আন্দোলনের প্রবাহ—সমাজের—অবজ্ঞাত, অস্পৃশ্য, অনাচরণীয় বা পঞ্চমদের স্তরে পৌছিতে পারিল না। সেই অবস্থায় এই আন্দোলনকে লইয়া যাইবার জ্ঞাত আচার্য্যদেব কয়েক বৎসর পরে “হিন্দু সমাজ-সমন্বয় আন্দোলন” প্রবর্তন করিয়াছিলেন—সে কথা যথাস্থানে আন্দিবে।

ধীরভাবে লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাইব—ধর্মভিত্তিতে ভারতীয় জাতির পুনর্গঠনের পন্থা এবং সাধন-সোপানগুলি তিনি—পর পর বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়া প্রদর্শন ও প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। ভারতের ও ভারতীয় আর্ধ্য হিন্দুজাতির বর্তমান অবস্থা দেখিয়া কে কল্পনা করিতে পারে যে এই সেই বৈদিক সমাজ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডীর যুগের সমাজ? ছায়ামাত্র আছে—আদর্শ নাই, প্রাণ নাই,

সাধনা নাই, সঙ্কল্প নাই, ছিল—ক্ষীণ স্মৃতি ;—তাহাও পাশ্চাত্যের জড় সভ্যতা ও ভোগাদর্শের প্রাবনে বৃদ্ধি ভাসিয়া যায়।

আচার্য্যদেব তাই—তাঁর “কর্মচক্রের ও ধর্মচক্রের” গতি-পদ্ধতির যখন যতটুকু আবশ্যক এবং জন-সাধারণ হজম করিতে পারিবে, মাত্র ততটুকু প্রকাশ করিয়া স্তরে স্তরে এক একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করিতেছিলেন। আমরা তাহা আলোচনা ক্রমে লক্ষ্য করিতে থাকিব।

সংশয় আসা স্বাভাবিক—আচার্য্যদেব এই যে গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ-মূলক আন্দোলন উঠাইয়া লক্ষ লক্ষ গৃহস্থের মধ্যে তপঃশক্তির সঞ্চার করিলেন—তার ফল কি হইয়াছে? গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ আরও মলিন হইয়াছে; পারিবারিক ও সামাজিক ভগ্নাবশিষ্ট কঙ্কালখানি বহুপরিমাণে চূর্ণিত হইয়াছে। স্নেহ-ভক্তি-শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-প্রেম-প्रीতি-রুতজ্ঞতা-সহানুভূতি প্রভৃতি মানুষোচিত সম্বন্ধি—যাহার উপর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সম্বন্ধ ও গ্রন্থি সমূহের ভিত্তি—তাহা বিলুপ্তপ্রায়! ঘোঁষ পরিবার নাই বলিলে চলে। আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থকেন্দ্রিক হইয়া আমরা পশুত্বের স্তরে নামিয়া গিয়াছি! আত্মমর্য্যাদা-বোধ সম্পূর্ণ বিদায় নিয়াছে; সতীত্ব-পাতিব্রত্য বিপণীর পণ্যের হ্রাস ব্যবহৃত হইতেছে। ভোগ-সর্বস্বতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা উলঙ্গরূপে সমাজের বৃকে আফালন করিয়া বেড়াইতেছে! আমরা কোথায় চলিছি? কোন পথে?—উন্নতি-প্রগতি? না, ধ্বংস?

পাশ্চাত্য ভোগ-সর্বস্ব জড় সভ্যতার আদর্শ ঐন্দ্রজালিক প্রভাব প্রসারিত করিয়া আমাদের কাছে আচ্ছন্ন করিয়াছে—স্বীকার্য্য এবং অধঃপতনের চরম সোপানে আমরা অবতীর্ণ—তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে—ব্যক্তি তথা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে প্রতিক্রিয়া আসিতেছে। পৃথক পৃথক ভাবে

মহাপুরুষের শক্তি ও আশীর্বাদে ব্যক্তি, পরিবার আদর্শরূপে বহু বহু গড়িয়া উঠিতেছে ; সামাজিক ও জাতীয় জীবনেও একটা সমষ্টি-চেতনা, আত্মমর্যাদাবোধ, আত্মপ্রতিষ্ঠার আগ্রহ লক্ষিত হইতেছে। আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস—যুগাচার্যের সঙ্কল্প অব্যর্থ। অগ্নি-ফুলিঙ্গ বিরাট ইন্ধন-স্তূপের মধ্যে স্থাপিত হইয়া যেমন ধীরে ধীরে উহাকে পোড়াইয়া পোড়াইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে ; তেমনি আচার্যের শক্তি ও আশীর্বাদের ফুলিঙ্গ বহুযুগ-সঞ্চিত পাপ ও কুসংস্কারের জ্বলন্ত লোকচক্ষুর অন্তরালে ক্ষয় করিতে করিতে আত্মপ্রসার করিতেছে ! কালে ফল প্রসব করিবেই।

---

# সঙ্ঘ-কৰ্মচাক্ৰের শৃঙ্খলা-বিধান

৩

## সঙ্ঘের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা

“ধৰ্ম্ম-সংস্থাপন ও জাতি-গঠনের” প্রেরণা ও দায়িত্ব লইয়া সৰ্ব্বনিয়ন্তার সঙ্ঘ-বিগ্রহ-রূপে সঙ্ঘনেতা যুগাচার্যের আবির্ভাব। তিনি যে “ধৰ্ম্মচক্র ও কৰ্মচক্র” প্রবর্তন করিবেন, তাহা তদীয় ঐশ লীলার অবসানেও শত সহস্র বৎসর ধরিয়া চলিবে—যত কালে তাঁর সঙ্ঘলিত আদর্শ পরিপূর্ণাবয়ব হইয়া না উঠে। **সঙ্ঘই তদীয় “ধৰ্ম্মচক্র ও কৰ্মচক্রের” পরিচালক শক্তিব্যূহ।** সঙ্ঘনেতার দেহ-বিগ্রহের অবসানে সঙ্ঘই তাঁর বিরাট কলেবর; এই বিরাট সঙ্ঘ-কলেবরে মহা-সঙ্ঘ-শক্তিরূপে বিরাজিত থাকিয়া তিনি তাঁর অভীষ্ট কৰ্ম সম্পাদন করিতে থাকিবেন।

সুতরাং সঙ্ঘ-শরীরকে সুগঠিত, সুদৃঢ় এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী করা আবশ্যক। একদিকে যেমন তিনি “নৈতিক আন্দোলন ও ব্রহ্মচর্য সাধন” এবং “গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ বিস্তার ও শক্তি সাধনার” ভিত্তিতে ধৰ্ম্ম-সংস্থাপন কার্যের পত্তন করিলেন; অপরদিকে জাতি-গঠনমূলক কৰ্মচক্রের বিভিন্ন দিকগুলি ফুটাইয়া তুলিতেছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘদেহকে সুগঠিত ও সুদৃঢ় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি—সঙ্ঘের কৰ্মবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে ত্যাগী-কৰ্মী আসিয়া জুটিতেছে এবং কৰ্মীসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘের

কর্মের বিস্তার ও বৈচিত্র্য ঘটতেছে। এই সমস্ত কর্মীদের অধিকাংশই “ব্রহ্মচার্য্য সংস্কার” ও “সন্ন্যাস” গ্রহণ করিয়াছিল। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর সংখ্যা অন্যান্য ৬০ জন; তৎপর ইহাদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধিত হইতেছিল।

✓সম্মকে স্বদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে ২৩জন প্রবীণ সন্ন্যাসীকে লইয়া একটি “ট্রাস্ট” গঠনপূর্ব্বক, সম্মের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী প্রণয়ন করিলেন এবং আইনানুসারে (under act XXI of 1860) বিধিবদ্ধ (Registered) করিলেন। ট্রাস্টিগণকে লইয়াই সম্মের পরিচালক সমিতি (Governing body) এবং সন্ন্যাসী ও গৃহী সভ্যগণকে লইয়া—“সাধারণ সমিতি” (General Committee) গঠিত হইল।

সম্মের জাতিগঠন-মূলক কার্যাবলী পাঁচটা প্রধানভাগে বিভক্ত হইল—

(১) ধর্ম প্রচার (২) শিক্ষাপ্রচার (৩) তীর্থসংস্কার (৪) জনসেবা (৫) সমাজ-সংগঠন। সম্মের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ত্যাগী কর্মীগণকে তাহাদের বুদ্ধি, প্রতিভা, কৃতি, সংস্কার, শক্তি ও সামর্থ্যানুযায়ী বিভিন্ন উপায়ে স্বীয় অভীষ্টভাবে গঠনপূর্ব্বক উপরোক্ত বিভিন্ন কর্মে নিয়োগ করিতে লাগিলেন। এক এক জন সন্ন্যাসী সম্মানকে এক এক কর্ম-বিভাগের বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। শ্রুত-দায়িত্ব সম্মসম্মানগণ আচার্য্যের নির্দেশে স্বীয় স্বীয় কার্য করিতে লাগিলেন।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে গয়া-সেবাশ্রমের স্থায়ী প্রতিষ্ঠার জন্য জমি ক্রয়ের নিমিত্ত ৬আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ৬ডাঃ জে, এন, মৈত্র, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ৬হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৬সত্যানন্দ বসু, শ্রীযুক্ত

মদনমোহন বর্মাণ, শ্রীযুক্ত প্রভু দয়াল হিন্মং সিংকা সজ্জের পক্ষ হইতে একটি আবেদন প্রকাশ করিলেন। সজ্জ-হিতৈষিগণের চেষ্টায় সংগৃহীত ও দানবীর ৬মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রদত্ত অর্থ গয়া সেবাশ্রমের জ্ঞাত জমি ক্রীত হইলে পর ৬শেষ্ট জহরমল গৌরিদাস দত্ত নামক মাড়োয়ারী ভক্তের দানে যাত্রিনিবাস নির্মাণ শুরু হয়।

সজ্জ-হিতৈষী বন্ধুবর্গের সহায়তায় এক্ষেপ বৎসর পরে ক্রমে ক্রমে **পুরী-সেবাশ্রম, কাশীতীর্থ সেবাশ্রম ও প্রয়াগ সেবাশ্রমের** নিজস্ব জমি ক্রীত ও ক্রমে ক্রমে যাত্রি-নিবাস নিশ্চিত হইয়াছে। প্রধান চারিটি তীর্থে স্থাপিত আশ্রমে সহস্র সহস্র যাত্রীর আশ্রয় দান এবং পাণ্ডা ও তীর্থগুরু মোহন্তদের অত্যাচার অনাচার নিবারণের সংবাদ ভারতের সর্বত্র সজ্জের “চারণ দল” ও প্রচারকগণের দ্বারা নানাভাবে প্রচারিত হওয়ায় তীর্থ-সংস্কারের একটা আবহাওয়া গড়িয়া উঠিল। **রথযাত্রা, অন্নকূট, পিতৃপক্ষ, হরিহরছত্র, কুম্ভ প্রভৃতি ধর্ম-মহামেলায়** লক্ষ লক্ষ যাত্রী সমাগমে যাত্রীদের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণ কার্যের ব্যবস্থা দেখিয়া জনসাধারণ তীর্থ-সংস্কার কার্যের প্রয়োজনীয়তা ও সাফল্য যেমন উপলব্ধি করিয়াছে, পাণ্ডা ও মোহন্ত-গণও তেমনি সাবধান হইয়াছে ও হইতেছে। তাহারা দেখিতেছে—জাগ্রত দেশবাসীর চোখে ধুলা দিয়া আর অনাচার, কদাচার, প্রতারণা জুলুম করিলে নিকৃতির উপায় নাই। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রধান প্রধান তীর্থস্থানে মেলার অধিবেশনে, **হিন্দু-সম্মেলনের** অধিবেশনে, হিন্দু-ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় বিষয়ে সম্মিলিত শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ যে সব বক্তৃতা, আলোচনা ও প্রস্তাবাদি গ্রহণ করিতেছিলেন, তাহাতে **তীর্থ-সংস্কার আন্দোলন** আরও ব্যাপক ও ফলপ্রসূ হইয়াছে।

তীর্থ ই আবহমান কাল হইতে ভারতের **ধর্ম-কেন্দ্র, মিলন-কেন্দ্র,**

**শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র, শক্তি-কেন্দ্র।** হিন্দু-ধর্ম, হিন্দু-জাতির এই কেন্দ্রগুলির সহিত জনসাধারণের যোগসূত্র ছিন্ন হওয়ায় একদিকে জাতি-স্বীয় আদর্শ-শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাধনা ভুলিয়াছে; অপরদিকে বিজাতীয় ভাব-মোহে আগ্রহারা হইয়া ডুবিতেছে, ফলে তীর্থক্ষেত্রগুলিও তাহাদের বৈশিষ্ট্য ও পবিত্র আবহাওয়া হারাইয়া পাপ-তাপ-কলুষ-কালিমার আকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধর্ম-সংস্থাপক ও জাতি-সংগঠক আচার্য্য তাই তীর্থ-সংস্কার কার্য্যকে অত্যন্ত প্রথম ও প্রধান কাহ্য নির্দেশ করিলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে আচার্য্যদেব পূর্বে একবার পিতৃকাহ্য উপলক্ষ্যে গয়াধামে গিয়া পাণ্ডাদের ভূব্যবহারে অতি মাত্র বিরক্ত ও গয়াযাত্রিগণের লাঞ্ছনার বিষয় চিন্তা করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া সঙ্কল্প করেন যে হিন্দুজাতির ধর্মকেন্দ্র—তীর্থস্থান গুলিকে সংস্কার করিতে হইবে! যাবতীয় তীর্থের মধ্যে গয়াই সর্বশ্রেষ্ঠ; কারণ হিন্দুমাঝেই পিতৃকাহ্যাদির জন্ম গয়াধামে আসিতে হইবেই। অত্যাগ্র তীর্থগুলিতে গমন করা না করা যাত্রীর ইচ্ছা বা আগ্রহের উপর নির্ভর করে; কিন্তু গয়াতীর্থে পিতৃ-শ্রাদ্ধাদির জন্ম প্রত্যেক হিন্দু বাইতে বাধ্য। এই বাধ্যতাই পাণ্ডাদের জুলুম, অত্যাচার উৎপীড়নের সুযোগ দিয়াছিল। আচার্য্যদেব দিব্য দৃষ্টিতে দেখিলেন গয়াধামে যদি তীর্থ-সংস্কার আন্দোলনের কেন্দ্র স্থাপন পূর্বক কার্য্য আরম্ভ করি, তাহা হইলে অতি সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র হিন্দু-তীর্থগুলিতে তথা সমগ্র হিন্দু-জনগণের মধ্যে সংস্কার-মূলক কার্য্যের তরঙ্গ বিস্তারিত হইবে; হইয়াছেও তাই। গয়া সেবাশ্রমের কার্য্যাবলী সমগ্র ভারতে সুপরিচিত হইয়া সমগ্র হিন্দু-অধিবাসিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। গয়ালী পাণ্ডাগণ সংবত ও সংশোধিত হওয়ায় অত্যাগ্র তীর্থের পাণ্ডাগণের টনক নড়িয়াছে; তাহারা আপনা হইতে সাবধান হইয়া গিয়াছে।



জাতীয় আদর্শে নৈতিক চরিত্র গঠন এবং ধার্মিক আবহাওয়ার মধ্যে রাখিয়া জীবন গঠনের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করিবার জন্ত আবাসিক ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়, বিদ্যাধিবন, অবৈতনিক প্রাথমিক ও নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন কার্য্য চলিল। ছুভিক্ষ, মহামারী, প্লাবন, দাঙ্গা, ভূমিকম্প ইত্যাদি যে কোনো প্রকারের দৈব দুর্ঘটনাতে সজ্জ সেবার অর্থা জাতির মুমূর্ষু, বৃদ্ধ, পীড়িতের সেবায় নিবেদন করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই।

সজ্জের জনসেবা ক্রমে ব্যাপক হইয়া “সমাজ-সেবার” আকার ধারণ করিলে তাহা দেখিয়া দেশের মনীষিগণ অজস্র প্রশংসা ও উৎসাহবাণী দিয়াছেন। স্বনামখ্যাত দেশভক্ত ৮পণ্ডিত শ্রীমসুন্দর চক্রবর্তী তদীয় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে “Good Samaritans” বলিয়া শ্রদ্ধাপ্রীতির অর্থা দিয়াছিলেন।\* ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে সজ্জের সমাজসেবামূলক কার্য্য সমগ্র দেশব্যাপী কার্য্য পরিকল্পনা লইয়া “হিন্দু-সমাজ-সমন্বয়-আন্দোলন”এর রূপ ধারণ করিয়াছিল। আচার্য্যের সে অভূত সংগঠন-নৈপুণ্যের কথা যথাস্থানে বলিব।

\* “The young Swamijees are known everywhere by the high and low alike and their gentle footsteps and unobstrusive presence shed a gleam of hope even on them who have known little sunshine in life. It is they who know Real India, who care for Real India, who think of Real India, and who have the requisite equipment of character to serve Real India.”

They are an indomitable lot who know their business and who are determined to play the Good forsaken Samaritans to the seemingly God forsaken countrymen of theirs.

Basumati, 30th June, 1928

আচার্য্যদেব বলিতেন—‘যতদিন অবিরাম, অবিভ্রাম প্রচারকার্য চলিবে, ততদিন সজ্জ জীবিত ; প্রচারকার্যের শিথিলতায় সজ্জের জীবনীশক্তি ক্ষীণ এবং প্রচার বন্ধ হইলে সজ্জের জীবনাবসান ।’ এজন্য সজ্জের প্রচারকার্য প্রবল এবং অব্যাহত রাখিবার জন্য আচার্য্যদেব প্রথম ৫টি পরে ৭টি ক্রমে ১০টি পর্য্যন্ত ‘চারণদল’ গঠন পূৰ্ব্বক ভারতের ও বহির্ভারতের সৰ্ব্বত্র—পাঞ্জাব হইতে রামেশ্বর এবং সিঙ্গাপুর হইতে করাচী পর্য্যন্ত বৎসরের পর বৎসর অবিরাম সেই প্রচারকার্য্য সেই ভাবেই চালাইতে থাকেন ।

যুগাচার্য্য সজ্জকে অগ্রাগ্র মঠ, মিশন প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে গঠন করিলেন । জর্নৈক সজ্জ-সন্তানের নিকট লিখিত চিঠির মধ্যে তিনি এই ভাবের ইঙ্গিত করিয়াছেন—

“এ সজ্জ কোনো মঠ, মিশন, আশ্রম, সমিতি বা Relief Centre বা Congress office নয় । ঠিক ঠিক বিবেক বৈরাগ্যবান্ মোক্ষার্থী ভিন্ন এখানে কেহ থাকিতে পারিবে না ।” —সজ্জগীতা ।

যুগাচার্য্য যে বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে সজ্জ গঠন করিলেন তাহা আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব । ধৰ্ম্মভিত্তিতে জাতি-গঠনের উদ্দেশ্যে তিনি সজ্জ গঠন করিয়াছিলেন ; স্বতরাং সমগ্র জাতিকে তিনি যে ভাব, আদর্শ ও পদ্ধতিতে সম্মিলিত ও অখণ্ড করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, সেই ভাব, সেই আদর্শ ও সেই পদ্ধতিসমূহ তিনি সজ্জের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেন ;—কোনো স্থাপত্য-বিদ্যা-বিশারদ যেমন একটি বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করিবার পূৰ্বে ক্ষুদ্রাকারে একটি আদর্শ ( Plan ) অঙ্কন করেন ।

(১) ভারতীয় জাতি—ভারতীয় আৰ্য্য ঋষির বংশধর ; ঋষির হাতে গড়া এই ভারতের সমাজ-রাষ্ট্র-শিল্প-বাণিজ্য-শিক্ষা-সভ্যতা । ধৰ্ম্ম-

ভিত্তিতে ভারতের ঋষি ভারতীয় জাতীয়তাকে গঠন করিয়াছিলেন। বিগত বহু বহু সহস্রাব্দ যাবৎ সেই ধর্ম ও আধ্যাত্মিক-প্রবাহ-পথ বহিয়া জাতীয় জীবনধারা চলিয়া আসিয়াছে। সেই আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও ধর্ম-সাধন-ব্যবস্থার উপরই নব যুগের উদীয়মান ভারতীয় জাতির প্রতিষ্ঠা চাই।

**ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার মূলমন্ত্র—ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ;**  
এই আদর্শের পথেই ভারতীয় ঋষি হিন্দুর ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবন গঠিত ও পরিচালিত করিয়াছিলেন। বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত গুরুগৃহ বাস, যৌবনে শাস্ত্র ও সদাচারের অনুশাসনে গাহিত্যশ্রমের কর্তব্য পালন, পরিণত বয়সে সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভগবৎ-সাধনা ও সমাজ-হিতকর কার্য্য এবং বান্ধক্যে সম্মাস ;—ইহাই ছিল—ঋষিনির্দিষ্ট জীবনের ক্রম-বিভাগ। এইভাবে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ ও তপস্যার দ্বারা আদ্যোপান্ত পরিশুদ্ধ ছিল ভারতীয়ের জীবন। ভারতীয় জাতির পুনরুত্থানও এই ভাবেই করিতে হইবে।

সজ্জনেতা তাই সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ ও তপস্যার কঠোর বন্ধনে সজ্জকে বাঁধিলেন। “শরীর রক্ষার্থ নিতান্ত অপরিহার্য্য আহাৰ্য্য, পরিধেয় ও বিশ্রাম ভিন্ন ত্যাগীর পক্ষে যাবতীয় বস্তুই অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসিতা এবং সজ্জের অভিপ্রেত ভাব ও দায়িত্ব-চিন্তা ছাড়া সব কিছুই ব্যসনের অন্তর্ভুক্ত। ক্ষুধারূপ ব্যাধির চিকিৎসার জন্ত ঔষধ স্বরূপ আহাৰ্য্য নির্লোভ চিন্তে গ্রহণ এবং দেহরূপ দূষিত ক্ষতের আবরণ (bandage) স্বরূপ সামান্য পরিধেয় বিলাসহীন চিন্তে ধারণ ; ইহাই সন্ন্যাসীর আদর্শ ও সজ্জের ব্রত।”

—সজ্জগীতা



শিখ-সংস্কারক আচার্যদেব ।



ভাত, বৎসামান্য ডাল ও সব্জী (Vegetables) সজ্জের আশ্রমে, কৰ্মকেন্দ্রে ও “চারণ দলে” সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও কৰ্ম্মিগণের আহাৰ্য্য এবং কোপীন, বহিৰ্বাস ও উত্তরীয়—সাধারণ পরিধেয় নিৰ্দিষ্ট রহিল। প্রত্যেককে দৈনিক গড়ে ১২ ঘণ্টা বাইরের কাৰ্য্য এবং অন্ততঃ ৩ ঘণ্টা জপ ধ্যান প্রার্থনা করিতে হইবে।

(২) মস্তিষ্কের সহিত স্নায়ুতন্ত্ৰের দ্বারা শরীরের সমগ্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গ্রথিত; শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যাবতীয় প্রচেষ্টাই মস্তিষ্কের নিৰ্দেশে নিয়ন্ত্ৰিত। তেমনি সজ্জনেতা আচার্য্যই সজ্জের মস্তিষ্ক-স্বরূপ। সজ্জের সমস্ত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, কৰ্ম্মিগণ আচার্য্যদেবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায় তাঁহার সহিত ঠিক তেমনিভাবে নিত্যযুক্ত থাকিবে;—সৰ্বদা, সৰ্বত্র, সৰ্ব বিষয়ে তাঁর ইঞ্জিত, আদেশ, উপদেশ, নিৰ্দেশ মত চলিবে। কাহারও কোনো স্বতন্ত্র ইচ্ছা বা পছন্দ (Choice) থাকিবে না। সজ্জনেতা আচার্য্য সকলের শুভাশুভ চিন্তা ও বিধান করিবেন।

“তোমাদিগকে যে স্থানে রাখিয়া, যে কৰ্ম্মের ভিতর দিয়া পরিচালন করিলে তোমাদের আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ ও আত্ম-তত্ত্ব উপলব্ধি হইবে, তোমাদিগকে ঠিক সেইরূপ স্থানে রাখিয়া সেইরূপ কৰ্ম্মের ভিতর দিয়া পরিচালন করা হইতেছে ও হইয়া থাকে।”

“তোমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইলে যেরূপ সুরক্ষিত স্থান প্রয়োজন, অন্তৰ্দৃষ্টি-সম্পন্ন আচার্য্য তোমাদিগকে ঠিক সেইরূপ স্থানে স্থায়ী স্থায়ী প্রকৃতি অনুযায়ী আদেশ উপদেশ দিতেছেন।”

✓ “সজ্জনেতার বিরাট ব্যক্তিত্বের মধ্যে স্থায়ী ব্যক্তিত্ব ও

ইচ্ছাকে নিঃশেষে ডুবাইয়া দিয়া সকলে এক মন, এক প্রাণ, এক চিন্তা, এক সঙ্কল্প হওয়াই সজ্জ-সন্তানগণের সাধনা।”

—সজ্জগীতা

(৩) সজ্জের যাবতীয় অর্থ, কর্ম্মী ও কর্ম্মধারা প্রভৃতি মূল কেন্দ্র (Central office) হইতে নিয়ন্ত্রিত হইবে। আবশ্যক বোধ করিলে মূল কেন্দ্রের নির্দেশে যাবতীয় অর্থ ও কর্ম্মীকে যে কোনো কার্যে, যে কোনো স্থানে একত্র সম্মিলিত করা যাইতে পারিবে।

(৪) বৎসরে অন্ততঃ দুইবার সজ্জের যাবতীয় সন্মানী, ব্রহ্মচারী কর্ম্মিগণকে একত্র সম্মিলিত হইয়া সজ্জের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপদ্ধতি আলোচনা করিতে হইবে।

(৫) সজ্জের উপর বাহিরের কোন লোকের কোনো প্রকার—মতই তুচ্ছ হউক—প্রভাব পড়িতে পারে;—এরূপ কোন দান বা সহায়তা গ্রহণ নিষিদ্ধ। সমগ্র ভারতের সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে টাকা-পয়সা-চাউল প্রভৃতি ভিক্ষার দ্বারা সজ্জের ব্যয় নির্বাহিত হইবে। ইহা দ্বারা—

(ক) সজ্জ-সন্তানগণকে প্রত্যহ ভিক্ষায় ( ভিক্ষাই সন্মানসৌর জীবিকা, বিশেষতঃ এ ভিক্ষা তো নিজের জ্ঞান নয়, সমগ্র সমাজের জ্ঞান ) বহির্গত হইতে হইবে এবং দেশবাসীর নিকট কাজের সংবাদ ও কৈফিয়ৎ দিয়া অর্থাদি সংগ্রহ করিতে হইবে; স্মরণ্য কর্ম্মহীনতা সজ্জ-কর্ম্মিবৃন্দের মধ্যে আসিবে না; আসিলেও জনসাধারণের দ্বারা তাহার প্রতীকার হইবে। কোনো প্রকার অসংযম বা বিলাসিতা বা বাসন-বৃত্তি কর্ম্মিগণের মধ্যে আসিলে জনসাধারণ উহার প্রতীকার দাবী করিবে।

(খ) জন সাধারণের সহিত সজ্জের যোগ অক্ষুর এবং সজ্জের প্রচার-কাধ্য অপ্রতিহত থাকিবে।

(৬) কোন সম্প্রদায়, আশ্রম, মঠ বা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির প্রতি সজ্জের কোন প্রকার বিদ্বেষ বা বিরোধিতা থাকিবে না। বরং যেখানে যতটুকু সম্ভব সহযোগিতা থাকিবে।

(৭) সজ্জ-সন্তানগণ সৰ্বদা, সৰ্বত্র, সৰ্ববিধ কার্য সমবেত ভাবে করিবে, বিশেষ নির্দেশ ও ব্যবস্থা ভিন্ন একাকী কোথাও যাইবে না ; কোনো কাজ করিবে না।

এইরূপে আচার্য্যাদেব সজ্জের অধ্যাত্ম ও কন্ম-জীবনকে সম্পূর্ণ মিলাইয়া মিশাইয়া সজ্জ-সন্তানগণের পৃথক অস্তিত্বের পন্থা রুদ্ধ করিয়া সজ্জকে এক ও অখণ্ড করিয়া গঠন করিলেন। অখণ্ড স্বীয় স্বীয় কৰ্ম-ক্ষেত্রে, স্বীয় দায়িত্ব লইয়া প্রত্যেক সন্তানই স্বাধীনভাবে কাজ করিতে লাগিলেন। আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস-অনুরক্তি ও তৎপরতা দ্বারা যুক্ত থাকায় সকলের মধ্যে একতানতা ও একপ্রাণতা বজায় রহিল।

“সজ্জ” সম্বন্ধে রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া আচার্য্যাদেব বুঝাইতেন—  
“বৌদ্ধ সজ্জের পরে এই আড়াই হাজার বছরের মধ্যে সজ্জ কি জিনিষ—তাহা ভারতবর্ষ জানে না। বৌদ্ধ সজ্জের পরে অনেক সম্প্রদায়, মঠ, আশ্রম প্রভৃতির উদ্ভব হয়েছে কিন্তু সেগুলিকে সজ্জ (organisation) বলা চলে না ; সেগুলি সব প্রতিষ্ঠান ( institution )। সজ্জ—একটা গোটা মানুষের মত জীবন্ত বস্তু (living organism) ; ভিতরে এক যেন জীবাত্মা (spirit) বর্তমান থেকে মনোবুদ্ধি ও যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গসহ শরীরটাকে পরিচালিত করছেন। বুদ্ধ ছিলেন—বৌদ্ধ সজ্জের আত্মা ( spirit ), তাঁর সঙ্কল্পে, তাঁর প্রেরণায়, তাঁরই নীতি-নির্দেশে তাঁরই দিকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া সমগ্র সজ্জ এক তান, এক লয়,



এক ছন্দে চলতো। “বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি”—ছিল মূলমন্ত্র। আমার সজ্জ হইবে—দ্বিতীয় বুদ্ধের সজ্জ। এখানে এক আচার্য্যেরই প্রচার-প্রতিষ্ঠা; আচার্য্যের মাঝে আত্মসমর্পণ করে সমগ্র সজ্জ হবে যেন একটা গোটা মানুষ। অন্তরে বাহিরে সকলেই আচার্য্যাভিমুখীন, আচার্য্যগত-প্রাণ। সজ্জের সমস্ত শক্তি ও সম্পদ (strength and Resources) আচার্য্যের নির্দেশে তদীয় অভিপ্রেত ভাবে প্রযুক্ত হবে। তাঁর বিনা ইচ্ছা, বা ইঙ্গিতে কিছুই হইতে পারিবে না।”

পরবর্ত্তীকালে যখন সমগ্র দেশে সজ্জের প্রতিষ্ঠা অটুট হইয়া দাঁড়াইল, তখন তিনি কথা-প্রসঙ্গে সজ্জের প্রচার-প্রতিষ্ঠার কারণ নির্দেশ পূর্বক বলিতেন :—

“ভারত সেবাশ্রম সজ্জের কয় জন সন্ন্যাসী, কয় জনই বা কর্ম্মী আর কয়টাই বা টাকা! ভারতবর্ষে এমন অনেক মঠ মিশন আছে, যাহাদের একটা শাখা-প্রতিষ্ঠানের (branch centre) বার্ষিক আয়-ব্যয়—সমগ্র ভারত সেবাশ্রম সজ্জের আয়ব্যয়ের সমান। কিন্তু তথাপি দেশবাসী দেখে অবাক হয় যে—যেখানে যে কোনো ব্যাপার ঘটুক, ভারত সেবাশ্রম সজ্জ সর্ব্ব কার্য্যে অগ্রণী এবং কৃতী; অনেকের ধারণা—ভারত সেবাশ্রম সজ্জের কোটী কোটী টাকা এবং সহস্র সহস্র কর্ম্মী। এর কারণ কি? কারণ হচ্ছে এই যে আমরা সজ্জবদ্ধ। আমাদের যে কয়জন কর্ম্মী ও যে কয়েকটা টাকা তাহা একজনেরই ইঙ্গিতে ও পরিচালনায় চলে; আমার সজ্জের

সবাই একভাবে, একই আদর্শে, একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত। সজ্জের প্রত্যেক সন্তান অনুভব করে যে সমগ্র সজ্জের শক্তির পশ্চাতে আছে, এজন্য প্রত্যেকে নিজকে অসীম শক্তিমান মনে করে সিংহ-বিক্রমে কাজ করে যায়। প্রয়োজন হলে যে কোন মুহূর্তে, যে কোনো স্থানে, যে কোনো ব্যাপারে সমগ্র সজ্জের সমস্ত কর্মী ও অর্থ আমরা কেন্দ্রীভূত করতে পারি। সজ্জের (Organisation) রহস্য ও অনন্তসাধারণ কার্যকারিতা এখানে।”

আচার্যদেব নব্য জার্মানীর নেতা হিটলারের বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে বলিতেন যে হিটলার এই সজ্ব-সাধনার রহস্য বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছে; তাই সমগ্র জার্মানীকে সজ্ববদ্ধ করিয়াছে। হিটলারের বিশ্ব-বিজয়ী শক্তির মূল উৎস সেখানে। রাষ্ট্রক্ষেত্রে হিটলারকেই যথার্থ সজ্বনেতা বলা যায়। হিটলারের উদ্দেশ্য নিম্নিত হইতে পারে; কিন্তু হিটলারের শক্তি-বাহ রচনার প্রতিভা ও পন্থার প্রশংসা কে না করিবে?

সজ্জের যে কর্মীকে আচার্যদেব যে বিষয়ে নিয়োজিত করিয়াছেন, তাহার চিন্তা-ভাবনা, শক্তি-সামর্থ্য শুধু সেই বিষয়েই কেন্দ্রীভূত ও একাগ্র করিয়া রাখিতে প্রেরণা দিতেন। এজন্য নানা বিষয় পড়াশুনা, নানা বিষয় আলোচনা তিনি কদাচ পছন্দ করিতেন না, প্রশংসা দিতেন না।

আচার্য বলিতেন—“কাজ হবে আমার সঙ্কল্পের দ্বারা; কাজ হবে কি—তোদের ইচ্ছায় ও চেষ্টায়? বেশী পড়াশুনা, আলোচনা করলে মন বহিস্থুখী ও বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়; এরূপ লোকের দ্বারা কোন কাজ হয় না। বাঙ্গালী জাতির সব চেয়ে বড় গলদ ( defect ) এখানে।”

শু পল্লবগ্রাহিতা ও বকামি শিখে কর্মশক্তি একেবারেই লোপ পেয়েছে। জ্ঞান কি বাইরে? জ্ঞান মানুষের ভিতরে; আত্মাই অনন্ত জ্ঞানময়। মনকে প্রতিনিয়ত আচার্য্যের অনুগত, গুরুমুখী করে রাখতে পারলে আমার ইচ্ছাই কাজের প্রেরণা ও বৃদ্ধি জোগাবে; আমার জ্ঞানেই হৃদয় আলোকিত হবে।”

আচার্য্যদেব সজ্জ-সন্তানগণকে আদৌ বিশ্রাম দিতে চাহিতেন না, বলিতেন—“পরিশ্রমই আমাদের বিশ্রাম, বিশ্রামই পরিশ্রম।” নিজে যেমন অনবসর অভিনীতভাবে কর্মপরায়ণ ছিলেন সন্তানগণকেও তেমনি অবিরাম কর্মভরজে ভাসাইয়া রাখিতেন। আলস্য, নিদ্রা, তন্দ্রা, জড়তা, দীর্ঘসূত্রতা,—হুকার তামসিকতা—দেশ ও জাতিকে গ্রাস করিতেছে। জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে প্রচণ্ড কর্মের তাণ্ডব উদ্দীপনা সৃষ্টি করিতে হইবে। ভাব-বিলাস, কল্পনা-বিলাস, বাক্য-বিলাস জাতির অস্থি-মজ্জায় ঘৃণ ধরাইয়া দিয়াছে। উদ্যম, উৎসাহ, অধ্যবসায়ের প্রবল প্রবাহ জাতির শিরায় শিরায় বহাইয়া দিতে হইবে। এজন্য আচার্য্যদেব অসংখ্য প্রকার কাজের সৃষ্টি করিয়া সকল সন্তানকে অবিশ্রান্ত কর্ম-সাগরে ডুবাইয়া রাখিতেন।

বস্ত্রের জন্ত অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত “চারণ দল” প্রেরণ করিয়াছেন—সারা দিন ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া রাত্রিতে আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিবে। স্বয়ং ডেগ্‌ কড়াই চাউল ডাইল লইয়া নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া আহাৰ্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কন্মিগণ আসিলে সম্মুখে বসাইয়া সকলকে মাতৃস্নেহে আহাৰ্য্য করাইতেছেন। এই কার্য্যটি তিনি সর্বদা সর্বত্র সমানভাবে করিতেন। আহাৰ্য্যের পরে অত্যন্ত বিশ্রামের পরই আবার দেশসেবা-ব্রতী ত্যাগী দৈনিকগণ পুনরাহুত

নিৰ্দিষ্ট কৰ্ত্তব্য সাধনে অগ্ৰসৰ হইল। দেহ-ত্যাগেৰ পূৰ্বদিন পৰ্য্যন্ত তিনি সম্মুখে বসাইয়া সম্মাসী ও কৰ্ম্মিগণকে পৰিবেশন কৰাইয়া আহাৰ কৰাইয়াছেন। আচাৰ্য্যদেবেৰ এই অসীম অতুলনীয় স্নেহ-প্ৰেম-আদৰ-দৰদে কৰ্ম্মিগণেৰ প্ৰাণেৰ দুঃখ-জ্বালা-মালা দেহেৰ ক্লান্তি অবসাদ নিমেৰে অন্তৰ্হিত হইত এবং হৃদয়ে অনন্ত কৰ্ম্ম-প্ৰেৰণা জাগিত। আচাৰ্য্যেৰ অভীষ্ট কৰ্ম্ম সম্পাদন পূৰ্বক কে কতখানি প্ৰসন্নতা ও আশীৰ্বাদ লাভ কৰিতে পাৰে ;—ইহা লইয়া প্ৰতিযোগিতা দেখা যাইত।

আচাৰ্য্যদেবেৰ অমোঘ সৰুৰেৰ আকৰ্ষণে নানাস্থান হইতে তাঁহাৰ চিহ্নিত সম্ভানগণ আসিয়া বোগদান কৰিতে লাগিল। তিনি যে ভাব, যে আদৰ্শ, যেকুপ অনুষ্ঠানেৰ মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চাহিতেন, তাহা সাক্ষাৎ ভাবে আদেশ উপদেশ দ্বাৰা কৰাইতেন না। তিনি আশীৰ্বাদেৰ মধ্য দিয়া যে শক্তি সঞ্চাৰ কৰিতেন, তাহাৰ প্ৰভাবে বিভিন্ন সম্ভানেৰ মধ্য দিয়া তাঁহাৰ অভীষ্ট সম্ভেৰ প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন প্ৰকাৰ ভাব, আদৰ্শ, অনুষ্ঠান বিকশিত ও সম্পাদিত হইত ;—ইহা দেখিয়া আচাৰ্য্যদেবেৰ ভক্ত পৰলোকগত অবসৰপ্ৰাপ্ত ম্যাজিষ্ট্ৰেট ৮যোগেন্দ্ৰনাথ সিংহ \* বিস্মিত হইয়া বলিতেন “গুরোন্ত মৌন ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্ত ছিন্নসংশয়াঃ।”

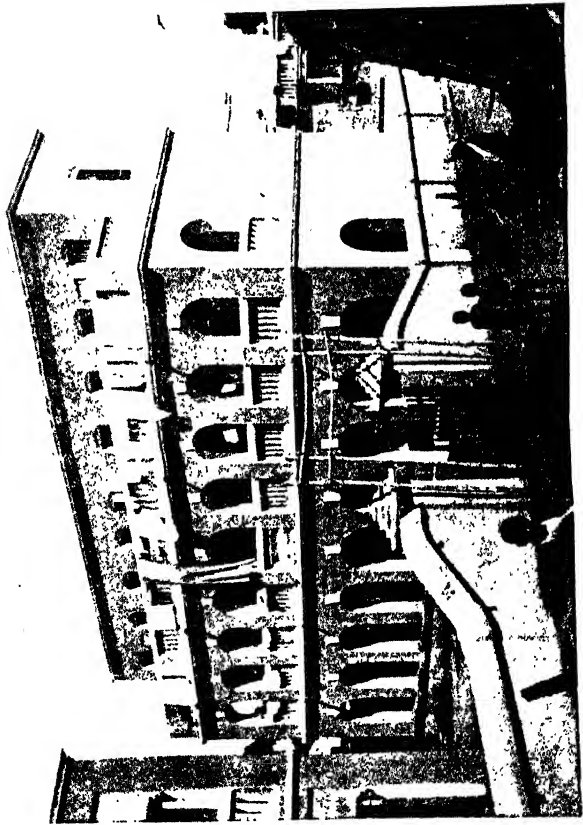
---

\* নিবাস আইসগাতি গ্ৰামে ; খুলনা সেবাশ্ৰমেৰ অতি নিকটে বাড়ী। ইনি সম্ভেৰ অকৃত্ৰিম হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। ইনি খুলনা সেবাশ্ৰমে ইহাৰ পিতাৰ নামে “দীননাথ দাতব্য ঔষধালয়” স্থাপন কৰিয়াছেন। মায়ের ও শান্তুড়ীৰ নামে “শ্যামা স্কন্দরী ও মানদা ভাণ্ডাৰ”

—আচার্য্য মৌনভাবে অবস্থান করেন: অথচ শিষ্যগণের সকল সমস্যার সমাধান হইতেছে—এই শাস্ত্রোক্ত বাণী আপনার মধ্যে মূর্ত দেখিতেছি। আপনার উপদেশ শ্রবণ অপেক্ষা মৌন সমাহিত ভাবে আপনাকে অবস্থিত দেখিয়া আমার হৃদয়ে বহু ভাবের তরঙ্গ খেলিতে থাকে।” তিনি আচার্য্যদেবকে অনুবোধ করিয়াছিলেন একবার দয়া করিয়া তাহাদের গ্রাম খানিতে শুভপদার্পণ ও শুভদৃষ্টি দান পূর্বক গ্রামের আঁধার বিদূরিত করিতে। যোগেন্দ্রবাবুর এরূপ উচ্চ দারণা ও অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতেন যে আলৌকিক তপঃ-শক্তি-সম্পন্ন আচার্য্যের ইচ্ছামাত্রে বহু যুগের ভ্রান্তি, পাপ-তাপ ও কুসংস্কার-জাল নিমেষে বিনষ্ট হইতে পারে। যখনকার কথা বলা হইতেছে, তখন দেশে আচার্য্যদেবের খ্যাতি তেমন বিস্তৃত হয় নাই। যোগেন্দ্রবাবুর স্বধর্মনিষ্ঠা, আত্মবিশ্বাস ও গভীর শাস্ত্র-জ্ঞান তাঁহার মধ্যে দিব্য বুদ্ধি ফুটাইয়াছিল, যদ্বারা তিনি আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাদে তদীয় আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব কথঞ্চিৎ অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন।

আচার্য্যদেব সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও কস্মিণকে নিয়ত তাঁহার চিন্তায় ও ভাবে এমনি অনুপ্রাণিত হইয়া থাকিতে শিক্ষা দিতেন যাহাতে তাঁহার মনে কোন একটা ভাব বা চিন্তার তরঙ্গ জাগিলেই যেন তাহা সজ্জ-সন্তানগণের প্রাণে তখনি প্রতিকলিত হয়। কলিকাতা আশ্রমে বহুবার এমনি হইয়াছে যে তিনি আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ উপস্থিত

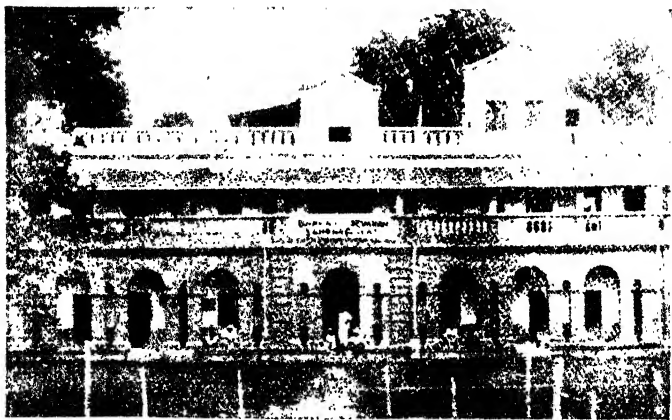
স্থাপন পূর্বক দরিদ্রগণের ঔষধ পথ্য ও কাপড় চোপড় দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। খুলনা সেবাশ্রমের তুর্গোৎসবের বার্ষিক বায়ও ইনি নির্বাহ করিতেন। ইনি শাস্ত্রজ্ঞ চিন্তাশীল ছিলেন।



ପୁରୀ ସେବା ଶ୍ରମ ଯାତ୍ରୀନିବାସ ( ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ) ।



গঙ্গা সেবাশ্রম মন্দির



হইয়াছেন ; তাঁহার ভ্রাতৃ আহাৰ্যাদি কিছুই প্রস্তুত হয় নাই। আমরা সমস্কোচে নিবেদন করিলাম—চিঠিপত্র সংবাদাদিতো পাই নাই। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—

“আমি কবে কখন আসবো তা কি আবার চিঠি পত্র লিখে জানাতে হবে? আমার মধ্যে যে চিন্তা জাগে তখন তা’ তোমাদের মধ্যে জাগবে না কেন? ভাবের ব্যবধান থাকলে এমনিই হয়! গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ—ভাবের সম্বন্ধ। ভাবের অভাব হলে অমনি ভুল-ভ্রান্তিতে গ্রাস করে।”

এইরূপে আচার্য্যদেব যেমন বাহিরে আইন কাছন করিয়া সম্বকে সুরক্ষিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুপরিচালিত করিলেন, তেমনি সম্ব-সন্তানগণকে অন্তরে অন্তরে তাঁহার সহিত সর্বতোভাবে যুক্ত করিয়া নিতে লাগিলেন। একদিকে অনন্ত স্নেহ, প্রেম, ক্ষমা, আদর, দরদ, স্বাধীনতা ; অপর দিকে শাসন, শৃঙ্খলা, অবিশ্রান্ত কর্ম-পরায়ণতা, আদর্শের তীব্র প্রেরণা দান পূর্বক সম্ব-জীবনকে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ করিলেন। আত্মপ্রতিষ্ঠার পর আত্মপ্রসার। সম্বকে দৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি সম্বের আদর্শ ও ভাবধারাকে দিগ্বিদিকে বিকীর্ণ করিয়া জাতি ও সমাজের স্তরে স্তরে প্রবিষ্ট করাইবার আয়োজন করিলেন ; পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা তাহা লক্ষ্য করিব।



## সজ্ঞানতা আচার্য্যের প্রচারাভিযান

সজ্ঞানকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় এবং সজ্ঞের বিভিন্ন কর্মবিভাগের ক্রমশঃ বিধান পূর্বক আচার্য্যদেব তদীয় আধ্যাত্মিক শক্তি-তরঙ্গ ও প্রেরণা-প্রবাহ দিগ্বিদিকে দেশের সর্বত্র সমাজের স্তরে স্তরে ছড়াইয়া দিবার সঙ্কল্প করিলেন। অদূর ভবিষ্যতে আচার্য্যদেব ভারতে মহাশক্তি-শালী অথও আৰ্য্য হিন্দুজাতির পুনর্গঠনের জন্ত যে ব্যাপক জাতিগঠন-মূলক কর্ম ও সাধন-ধারা প্রবর্তন করিবেন, তারই সোপানপরম্পরা প্রস্তুত ও জাতিকে ধীরে ধীরে সেই সোপানানুক্রমে পরিচালনের আয়োজন হইল।

তাই প্রথমে তিনি আৰ্য্য হিন্দুজাতির জীবন-ভিত্তি—তার ধর্ম-শিক্ষা-সাধনা-সংস্কৃতির ভিত্তি—“ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্য্য” এর বাণী জাতিকে শিক্ষাদান ও প্রচারের ব্যবস্থা করিলেন এবং সেই আদর্শের পথে চলিবার পাথ্রে স্বরূপ তরুণ-সমাজে “ব্রহ্মচর্য্য-সাধন” এবং গৃহস্থ সমাজে “শক্তি-সাধনা” বিস্তার করিবার ব্যাপক আয়োজন করিলেন। প্রথমে চাই—লক্ষ্য, আদর্শ ও উদ্দেশ্য সর্বক্ষে অত্রান্ত সিদ্ধান্ত স্বীকার; তৎপরে চাই—সেই লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে, সেই আদর্শকে লাভ ও উদ্দেশ্যকে সফল করিতে হইলে—শুরুবরণ ও সাধনা-পদ্ধতি। আচার্য্যদেব তাই প্রথমে জাতিগঠনের ক্ষেত্রে আদর্শের বীজ—ব্রহ্মচর্য্য ও গাহ’স্থ্য জীবনের আদর্শ ও সাধন-পদ্ধতি শিক্ষা দিবার বিরাট ব্যবস্থা করিলেন। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা সেই বিষয়টা লক্ষ্য করিব।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে ৮পুণ্যময়ী শিবরাত্রি দিবস হইতে আচার্য্যদেবের করুণার উৎস সমগ্র সমাজের গৃহস্থ নরনারীর জগৎ উন্মুক্ত হইয়াছিল তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। উক্ত দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন তিনি মহাসঙ্কল্পের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া সহস্র সহস্র নর নারীকে উপদেশ, আশীর্বাদ, সাধন দান ও শক্তিসংকার করিতে লাগিলেন। “চারণ দল” কলিকাতা সহরের অলিতে গলিতে, গৃহে গৃহে এই অমৃতের সমাচার বিতরণ করিতে লাগিল; বহু সন্ন্যাসী ও কন্মী আচার্য্যদেবের উপদেশপূর্ণ পুস্তকসমূহ এবং তদীয় শ্রীমুণ্ডিত সম্বলিত উপদেশ-পত্র বিক্রয় ও বিতরণ করিতে লাগিল। প্রত্যহ পার্কে পার্কে সভায় বক্তৃতা দ্বারা বাগ্মী সন্ন্যাসিগণ শ্রোতৃবর্গকে অমুপ্রাণিত করিয়া আচার্য্যদেবের দর্শন, উপদেশ ও সাধন গ্রহণের জগৎ আহ্বান জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন; স্কুলে, কলেজে, স্টেশনে, দোকানে, বাজারে, যেখানে লোক সমাগম, সেখানেই আচার্য্যদেবের এই সমাচার ও আহ্বানপত্র বিতরিত হইতেছিল। ফলে প্রতিদিন অসংখ্য নরনারী—বালক-যুবক-বৃদ্ধ—সজ্জের আশ্রমে মৌমাছির ঝাঁকের হায়ে ভীড় করিতেছিল। আচার্য্যদেবের মুখে অল্প কোনো কথা নাই; অল্পদিকে খেয়াল নাই; আহার নিদ্রাতেও উদাসীনতা; বিশ্রামও অনভিপ্রেত; সর্বদা এক কথা—লোক ডেকে আনো; আশ্রমের সম্মুখে মির্জাপুর স্ট্রীটের মোড়ে মোড়ে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে নিযুক্ত করা হইত—যত লোক রাস্তা দিয়া যাইবে—যথাসম্ভব সকলকে আশ্রমে আনিতে হইবে;—আদেশ ছিল।

শেষ রাত্রি ৩টার সময়ে তিনি পূজা আরতি গ্রহণ পূর্বক সঙ্কল্প লইয়া আসনে বসিতেন; তখন হইতে বেলা ১১টা এবং পুনঃ অপরাহ্ন ৩টা হইতে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত দর্শন, সাধন, উপদেশ দান চলিত। যতক্ষণ তিনি আসনে থাকিতেন অবিশ্রান্ত “সজ্জনেতা”

শরণঃ গচ্ছামি ইত্যাদি” অথবা “গুরুরূপাহি কেবলম্” কীর্তন অথবা নানা প্রকার ভজন গান চলিত। দর্শন, উপদেশ ও সাধন-প্রার্থীগণ সেই কীর্তনে ও ভজনের ভাবে তন্ময় হইতেন ; তাহাদের হৃদয়ে স্বাভাবিক ভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধার আবেগ উদ্বেল হইয়া উঠিত। সেই উদ্বেলিত হৃদয় লইয়া আচার্য্যের চরণে উপস্থিত হইয়া তাহারা সেই বিরাট পুরুষের নিকট সৰ্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিত। **আচার্য্যদেব পাত্র ও ক্ষেত্র বুঝিয়া প্রত্যেককে উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ দান করিতেন এবং উপযুক্ত পাত্র সাধন ও শক্তি সঞ্চার করিতেন।** আচার্য্য কাহাকেও বিমূখ করিতেন না। যে—যে ভাব, যে আকাজ্জা নিয়া আসিত আচার্য্যদেব সেই ভাবেই তাকে রূপা করিতেন। অবশ্য সবাই—শ্রদ্ধা ও ভক্তি বা জিজ্ঞাসু-ভাব নিয়া আসিত না ;—একথা পূর্বেই বলিয়াছি।

জৈনক সন্ন্যাসী যিনি এই সময়ে সৰ্ব্বদা কলিকাতা আশ্রমে অবস্থান করিতেন—বলিয়াছেন “আচার্য্যদেব এই সময়ে সৰ্ব্বদা একই ভাবে মত্ত ; কোনো দিকে খেয়াল বা হস্ নাই ; শুধু এক কথা—জিজ্ঞাসু লোকদের ডাকিয়া আনিয়া দাও। আশ্রমস্থ সন্ন্যাসিগণের সহিতও অল্প কোনো কথা বলেন না ; বলার অবসরও ছিল না। দর্শন-প্রার্থীগণ রাত্রি ২টার সময় হইতে আসিয়া বসিয়া থাকিত এবং রাত্রি ১২ ঘটিকার পূর্বে বাড়ী খালি হইত না। আচার্য্যদেবের এমনি একভাবে মত্ত, আনন্মনা, উদাসীন ভাব দেখিয়া আমার মনে কেমন ভয় হইত ; ভাবিতাম আচার্য্যদেব বুঝি এমনিভাবে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। গোপনে গোপনে বহুদিন পর্য্যন্ত এই আশঙ্কায় আমি কান্দিতাম”।

আচার্য্যদেব যেন জগতের পতিত, তাপিত, তৃষিত নরনারীর জন্ত শ্রান্তি ও মুক্তির অমৃত ভাণ্ডার লুটাইয়া দিতে বসিয়াছেন ; আর অবিশ্রান্ত

শতকণ্ঠে—উহা নিবার জগু সকলকে সাদর আহ্বান জানাইতেছেন। বিলম্ব হইলে হয়তো এই করুণার ভাণ্ডার রুদ্ধ হইয়া যাইবে। তখন হা-হুতাশ অশ্রুজলে কোন ফল হইবে না।

এই ভাবে ক্রেত্বেয়ারী মাসে এবং মার্চের মধ্যভাগ পর্যন্ত চলিলে পর আচার্য্যদেবের দেহের নিম্নাঙ্গ অবশ হইয়া গেল। ডাক্তার বলিলেন—“সায়েন্টীকা”! চিকিৎসা—বায়ু-পরিবর্তন—অর্থাৎ শুষ্ক আবহাওয়ার মধ্যে বাস। অমুরোধ প্রার্থনা চলিল; তিনি কিছুতেই রাজী নন; অন্য কোনো কথায় কাণ দিবার তাঁর ইচ্ছা ও অবসর নাই। অথচ ডাক্তারগণ ভয় দেখাইলেন—অবিলম্বে এখান হইতে না সরাইলে, তিনি সম্পূর্ণ পঙ্গু হইয়া পড়িবেন। সজ্জ-সন্তানগণ নিদারুণ উদ্বেগের মধ্যে পড়িলেন।

## রাঁচি

কয়েকজন সন্ন্যাসী ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করিয়া আচার্য্যদেবের অজ্ঞাতসারে রাঁচিতে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া সমস্ত আয়োজন স্থির পূর্বক তাঁহাকে জানাইলেন; তিনি কোনো আপত্তি করিলেন না। আমরা ভাবিলাম—তিনি প্রসন্ন হইয়া আমাদের ইচ্ছা পূরণ করিতে ও শরীরের প্রতি একটু যত্ন নিতে রাজী হইলেন। কিন্তু ভাগবত আচার্য্যের লীলার কোশল কে বুঝিবে? আমরা আচার্য্যদেবের স্বাস্থ্যবাসের ব্যবস্থা করিয়া আনন্দে মজগল; তিনি বোধহয় মনে মনে আমাদের বুদ্ধির ক্ষুদ্রতা লক্ষ্য করিয়া হাসিতেছিলেন।

শুভদিনে শুভক্ষণে কয়েকজন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীকে লইয়া রাঁচী যাত্রা করিলেন; সকলে ভাবিলেন—তিনি হাওয়া বদলাইতে (change) যাইতেছেন। কিন্তু রাঁচিতে পৌছিয়াই তিনি যে রূপ ধারণ করিলেন তাহাতে সজ্জসন্তানগণ বুঝিলেন—“উল্টা সমঝলি রাম”। কলিকাতায়

যে কার্য্য চলিতেছিল—রাঁচিতে সেই লীলার পুনরভিনয় চলিল ! সেখানেও কীর্ত্তন, ভজন, সভা, বক্তৃতা, দর্শন-উপদেশ-সাধন প্রদান শুরু করিলেন । মাত্র সাতদিন তিনি রাঁচিতে ছিলেন ।

আচার্য্যদেব যাহা চাহিতেছিলেন—সজ্জ-সন্তানগণের উদ্বোধনপূর্ণ সাগ্রহ ব্যবস্থার মধ্য দিয়া তাহাই পূর্ণ হইল । যে মহাভাবের তরঙ্গ তিনি কলিকাতায় উঠাইয়াছিলেন, তাহা দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া দিতে তিনি ইচ্ছা করিতেছিলেন । বায়ু পরিবর্তনের সূত্র ধরিয়া তাঁর সেই সঙ্কল্পই কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল ।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের মধ্যভাগে তিনি রাঁচী যাত্রা করেন । ইহাই সজ্জনেতার প্রথম প্রচারাভিযান । সঙ্গে যাহারা ছিলেন—তাহারা মনে ভাবিলেন—আচার্য্যদেব হাওয়া পরিবর্তন করিতেই যাইতেছেন । তথায় তিনি যে কৌ লীলা করিবেন—তাহা তাহারা কল্পনাও করিতে পারেন নাই । কিন্তু রাঁচিতে পৌঁছিয়াই—সন্ন্যাসি ব্রহ্মচারীগণ আদেশ পাইলেন—রাঁচী সহরের ঘরে ঘরে অলৌকিক তপঃ-শক্তি-সম্পন্ন আচার্য্যের আগমনবার্তা প্রচারপূর্ব্বক নরনারী সকলকে আহ্বান করিতে হইবে ; স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে উদ্যোগী করিয়া জনসভার অয়োজন করিতে হইবে ; আচার্য্যদেবের উপদেশপূর্ণ পত্রিকা ও পুস্তক গৃহে গৃহে পৌছাইয়া দিতে হইবে । তিনি নিজে লোক ডাকিয়া ডাকিয়া বিজ্ঞাপন বিতরণ করিতে লাগিলেন । জনৈক সন্ন্যাসী ইহাতে আপত্তি করিলে আচার্য্যদেব বলিলেন—“এতে দোষ কি ? এখানে কে কাকে চেনে ?” তাঁর এই প্রচারোদ্যম দেখিয়া কোনো কোনো সন্তান আপত্তি জানাইয়া বলেন—“গুরুতর পরিশ্রমে ক্লান্ত শরীরকে একটু স্নহ করে নেওয়ার জন্য এখানে আসা হলো । কিছুদিন একটু বিশ্রাম হলে ভালো হতো না কি ?” তিনি উত্তরে বলিলেন—

“ডাক্তার কবিরাজেরা কি বুঝবে—এ শরীরের অবস্থা ? পরিশ্রমের ভিতর দিয়েই--এ শরীর গড়ে উঠেছে ; পরিশ্রমের মধ্য দিয়েই তা’ সুস্থ হয়ে উঠবে । কাজকর্ম বন্ধ করে বসে থাকারটাই কি বিশ্রাম, বিরাম ? আমি তো আজীবন—তাকে পাপ বলেই মনে করি ।”

রাঁচীর জমিদার ৮আশুতোষ রায়ের একখানি বাংলো ভাড়া নেওয়া হইয়াছিল । বাড়ীটা রাস্তার পাশেই ; বারান্দায় বসিলে রাঁচির পার্শ্বত্যা সৌন্দর্য্যের আভাস কথঞ্চিৎ পাওয়া যাইত । প্রত্যুষে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীগণকে অত্যাবশ্যক আদেশ নির্দেশ দিয়া প্রচারে পাঠাইতেন । তাহারা মধ্যাহ্নে আসিয়া কিছু সময় বিশ্রাম করিত । পুনঃ অপরাহ্ন তিনটার সময়ে বাহির হইয়া অনেক রাত্রিতে বাসায় প্রত্যাবর্তন করিত । কয়েকদিন ধরিয়া বেশ প্রচার চলিল । জন-সভার আয়োজন হইল । স্থানীয় ক্লাবে বক্তৃতা হইল । শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হইল । অধুনা পরলোকগত শ্রীযুক্ত পি. এন. বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ।

আচার্য্যদেব কিন্তু তাহাতে খুসী নন । তিনি চাহেন সহরের বাবতীয় লোক তাঁর নিকট আসুক ; সকলকে দিবার জন্ত আশীর্বাদ ও শক্তির ভাণ্ডার তিনি খুলিয়া বসিয়াছেন । কিন্তু প্রার্থী তো তেমন আসিল না । তাই আচার্য্যদেব বক্তা ও গায়ক স্বামীজীদিগকে লক্ষ্য করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন “একজন গান করেন—নিজের স্বরের কসরৎ দেখাবার জন্ত, আর একজন বক্তৃতা করেন—নিজের মান বশঃ পাওয়ার জন্ত । আমি যে এখানে এত কষ্ট করে এসে বসে রয়েছি—কিসের জন্ত—তা’ কোন্ বেটা ভাবে, বোঝে ?” এই কথা শুনিয়া স্বামীজীদের হাসি ও আনন্দ মিলাইয়া গেল ।

বক্তা স্বামীজী সঙ্কল্প করিয়া বসিলেন সহরের সমস্ত নরনারীকে তাঁর শ্রীচরণে যদি না আনতে পারি—জলগ্রহণ করিব না—বলিয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। পরদিবস হিষ্ণুতে বক্তৃত্য হইল। বক্তৃত্যর প্রভাবে এমনি আবহাওয়া তৈয়ারী হইল যে রাত্রি দশটার পরেও হিষ্ণু হইতে দলে দলে লোক থরপাকনা পর্য্যন্ত আসিয়া আচার্য্যাদেবের দুয়ারে ভীড় জমাইয়া বসিল। আচার্য্যাদেব প্রসন্ন হান্তে সন্ন্যাসিগণকে আশীর্বাদ করিলেন। বলিলেন—“সঙ্কল্প না হইলে কি কোনো কাজ হয় ? সঙ্কল্পই জীবন, সঙ্কল্পই সিদ্ধি। শুদ্ধ মনে যে সঙ্কল্প করা যায় তা সিদ্ধ হতে বাধ্য।”

পরদিবস রাঁচী সহরের লোক ভাঙিয়া পড়িল আচার্য্যাদেবের দর্শনের জন্য। দিবারাত্র অবিশ্রান্ত দর্শন, উপদেশ, আশীর্বাদ ও সাধন গ্রহণের ধুম পড়িয়া গেল। রাঁচী সহরে যেন একটা ভাবের প্লাবন বহিল। সহরের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ লোক দর্শন ও আশীর্বাদ এবং অনেকে সাধন গ্রহণ করিলেন।

স্থানীয় ব্রাহ্ম সমাজের জনৈক পাণ্ডিত্যভিমানী আচার্য্যকে দর্শনের জন্য আসিয়াছেন। বাহিরের হলঘরে অনেকগুলি ভদ্র লোক ও সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য সম্মুখে সুসজ্জিত “গুরুপূজার” আসন দেখিয়াই বলিতে লাগিলেন—“যেখানে ঘাই সেখানেই সম্প্রদায়, সর্ব্বত্রই কুসংস্কার। এই পৌত্তলিকতার মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের কি আছে ? এর জন্যই হিন্দুর সর্ব্বনাশ ঘটেছে ; আপনারা সর্ব্বত্যাগী, শিক্ষিত সন্ন্যাসী হয়েও এ সব কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেন কেন ?”

আচার্য্যাদেবের প্রকোষ্ঠ দ্বার উন্মুক্ত হইলে অমনি সেই ভদ্রলোক “আচ্ছা আলোচনাটা ঠুঁর সঙ্গেই হবে” বলিতে বলিতে সেই দ্বারে প্রবেশ করিলেন।

আচার্যদেবের সম্মুখে গিয়া ভদ্রলোকটি প্রশ্ন করিতেছেন—“আচ্ছা মূর্তিপূজার সার্থকতা কি? মূর্তিপূজা নিয়ে হৈ চৈ করে আমাদের ক্ষতি ছাড়া কিছু লাভ হচ্ছে কি? মূর্তিপূজাটা হিন্দুধর্মের একটা বড় কলঙ্ক।” আচার্যদেব তাহার কথাগুলি শুনিতেছেন এবং মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। কোনো কথাই বলিতেছেন না। কয়েক মিনিট চুপ থাকিয়া ভদ্রলোকটি পুনরায় আরম্ভ করিলেন “তবে একথাও তো অস্বীকার করা যায় না—আচার্য শঙ্কর—যিনি ‘নেতি নেতি’ বিচারে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তিনিও তো দেখিতে পাই—ভক্তির উচ্ছ্বাসে ষাবতীয় দেবদেবীর আরাধনা, স্তবস্তুতি করছেন; বিশ্বনাথের মন্দিরে পূজা নতি নিবেদন করছেন। নিরাকার মানছেন; আবার সাকারেরও উপাসনা করছেন।”

ভদ্রলোক এই কথা বলিতেই—আচার্যদেব অমনি বলিয়া উঠিলেন—

‘হাঁ! এই কথাই ঠিক। নিরাকার নিগুণ যেমন সত্য, সাকার সগুণও তেমনি সত্য। তিনি সর্বশক্তিমান! সব ভাবই তাতে বর্তমান।’

ভদ্রলোকের আর বলিবার বা জানিবার—কিছু রহিল না। তিনি ভক্তিযুক্ত চিন্তে প্রণাম পূর্বক বাহিরে আসিয়া বলিলেন—“আশ্চর্য্য প্রভাব! এমনটী তো কখনও দেখিনি! যে প্রশ্ন আমাকে এতকাল দুঃখ দিচ্ছে; কিছুতেই সমাধান করতে পারিনি; আজ এই মহাপুরুষের নিকট বসে আপনা থেকে আমার ভিতরে সেই সমাধান সহজ ভাবে এসে গেল। তাঁর দর্শন, স্পর্শন ও হাসির মধ্য দিয়া আশ্চর্য্যভাবে এমন শক্তি ও জ্ঞান সঞ্চার করতে পারেন। এইজন্তই বোধ হয় শাস্ত্রে বলেছেন “গুরোস্তু মৌন ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ।”



### মুন্ডের

রাঁচী সহরে প্রাবন বহাইয়া আচার্য্যদেব তথায় থাকিতে রাজী নহেন। অল্পত ছুটিবার জগ্ৰ অধীর হইয়া পড়িলেন। তখন মুন্ডেরে একটি প্রচারকদল কাজ করিতেছিল। আচার্য্যদেব সঙ্কল্প করিলেন—মুন্ডেরে যাইবেন। সংবাদ প্রেরিত হইল। তথায় আচার্য্যদেবের শুভাগমন বার্তা—সহরের বাঙালী ও বিহারী—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আবেদন সহ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। আচার্য্যদেবের শ্রীমুষ্টি-সম্বলিত উপদেশপত্র বাঙ্গলা ও হিন্দীতে বিতরিত হইল। অলৌকিক তপঃশক্তিশালী মহাষোগীর আগমন আশায় নরনারী উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিল। গোয়েন্ধা ধর্মশালাটি রিজার্ভ করিয়া নিয়া উৎসব-সাজে সজ্জিত করা হইল। ২৭শে মার্চ রায় বাহাদুর হেমচন্দ্র বসুর গাড়ীতে আচার্য্যদেবকে শোভাযাত্রা সহকারে অভ্যর্থনা করিয়া আনা হইল। ধর্মশালা লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। মহাপুরুষের দর্শন, উপদেশ, আশীর্বাদ ও সাধন গ্রহণের জগ্ৰ নরনারী যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

হেমবাবুর সভাপতিত্বে জন-সভার অধিবেশনে বক্তৃতা হইল বাঙ্গলায় ; —উকীল শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ( পরে বিহারের মন্ত্রী ) উহার হিন্দী অনুবাদ করিলেন। সহরের বহু শ্রেষ্ঠ বাঙালী ও বিহারী স্বীয় স্বীয় গৃহে আচার্য্যদেবের পদধূলি দানের অহুমতি পাওয়ার আশা করিতেছিলেন ; হেমবাবুও প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু আচার্য্যদেব সম্মত হন নাই। কারণ :—

(১) তাঁর সময় ছিল না। সহস্র সহস্র লোক তাঁর আশীর্বাদ-প্রার্থী ; তিনি নির্দিষ্ট ছু'চারজনের গৃহে গিয়া এই বিরাট জনতাকে বঞ্চিত করিতে পারেন না। মুন্ডেরে তিনি পুরো ছ'টী দিনও ছিলেন না।

(২) সাধারণ গুরুত্ব ত্রায় শিষ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি ও সম্প্রদায় সৃষ্টি তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তিনি चाहিতেন—লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর মধ্যে আশীর্বাদ সহ তপঃশক্তি ও প্রেরণা সঞ্চার।

প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের ত্রায় অলৌকিক আচর্য্য রূপে এক আবর্ত সৃষ্টি করিয়া মুন্সেরে ছুটিলেন; তথায় সেই ঘূর্ণিঝড় প্রবলতর আকার ধারণ করিল, তথা হইতে জামালপুরে আলোড়ন ঘটাইয়া হাজারিবাগে উপস্থিত হইলেন। হাজারিবাগ হইতে সেই ঘূর্ণিঝড় পুন্ড্রিয়ায় তোলপাড় বাধাইল। এক এক সহরে দুই দিনের কম ছাড়া বেশী থাকেন নাই। যতটুকু সময় রহিয়াছেন—হাজারে হাজারে নরনারী—আবাল-বৃদ্ধ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; আচার্য্যদেব এক মুহূর্ত্ত অবসর পান নাই। রাত্রি দু'একটা ঘণ্টা বাদে সর্বদাই লোকে মোমাছির ঝাঁকের মত তাঁকে ঘিরিয়া থাকিত। পাঁচ সাত ঘণ্টাও একভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া লোকে দর্শনের প্রতীক্ষা করিতে ক্লান্ত, অবসন্ন বা বিরক্ত হইত না। কী অলৌকিক আকর্ষণে তাহারা আচার্য্যের প্রতি আকৃষ্ট হইত !

### জামালপুর

২২শে মার্চ আচার্য্যদেব মুন্সের হইতে জামালপুরে আসিলেন। এখানে মুন্সেরের মত অবস্থা দেখা গেল। বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হইল। বালক, যুবক, গৃহস্থ নরনারী দলে-দলে আসিয়া আচার্য্যদেবের চরণে উপস্থিত। প্রত্যেকে মনে করিত—আচার্য্যদেব তার একান্ত আপনার জন—দরদী, মরমী, ব্যথার ব্যথী। প্রত্যেকে প্রাণ খুলিয়া হৃদয়ের আবেগ নিবেদন করিত এবং আচার্য্যদেবের মধুর বাক্যে, স্মৃষ্টি হাসিতে, অপূর্ণ আশ্বাস-অভয়বাণীতে, অমৃতময় স্পর্শনে তাহাদের তাপিত হৃদয় শীতল হইত; পাপতাপের

জ্বালামালা নিভিয়া যাইত। সকলের প্রাণে এক অমৃতরাজ্যের স্মৃতি জাগিয়া উঠিত। সকলে বলিত—প্রাণ যার জন্ম ছট্ ফট্ করিত ঠিক তেমন বস্তু ও ব্যক্তি পাইয়া গিয়াছি। আচার্যদেব বলিতেন—  
**“একবার যে আমার কাছে আসিয়াছে, তাকে আবাবও আসিতে হইবে, আসিবার জন্ম সে ব্যাকুল হবেই।”** অসংখ্য লোকের জীবনে উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

কতলোকে দর্শন পাইল না; আশীর্বাদ পাইল না। কেউ দর্শন পাইল, কিন্তু উপদেশ পাইল না; কেউ—উপদেশ পাইল কিন্তু সাধন নিতে পারিল না; কেউ সাধন পাইল, কিন্তু প্রাণ ভরিয়া গুরুদেবের সেবা করিবার সুযোগ পাইল না। তাঁর মহত্ত্ব যখন সবেমাত্র লোকে জানিতে পারিল, তখনি তিনি চলিয়া গেলেন—কত লোককে নিরাশ করিয়া, কত লোককে কাঁদাইয়া। লোকের পিপাসা মিটে না, আশা পূরে না। সকলেই বলে—আচার্যদেব এত অল্প সময়ের জন্ম আসেন কেন? হু’ দশ দিন না থাকিলে কি এত লোকের আকাজক্ষা পূরে?

আমরাও জনসাধারণের এই কাতর আবেদন আচার্যদেবের শ্রীচরণে নিবেদন করিলে—তিনি বলিতেন—

**“সময় কোথায়? আর সময় থাকিলেই কি থাকা উচিত?** আগ্রহ, আকাজক্ষা, উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করিবার জন্মই তো এই আশ্বাদ দান; এখন যার ঠিক ঠিক পিপাসা আছে, সে খুঁজিয়া নিবে। একটা ভাবের, আদর্শের ঢেউ তুলে দেওয়া গেলো। এর মধ্যে পড়েই ধীরে ধীরে সব ঠিক হবে। আগ্রহ, আকাজক্ষা, আকুলতা থাকলে যে যেখানে থাকুক না কেন, আমার শক্তি ও সাহায্য তো সে পাবেই।”

অন্য সময় বলিয়াছিলেন—

“আমি কি গুরুগিরি ব্যবসা করতে বসেছি? ধর্ম কে চায়? কয়জনে ধর্ম বোঝে? দেশের পক্ষে যা’ দরকার আমি তাই করছি। একটা নীতি ও ধর্মভাবের আবহাওয়া সৃষ্টি করে দেওয়ার জন্য আমার এই চেষ্টা। আমার তপঃপ্রভাব সঞ্চার করে এই আবহাওয়া সৃষ্টি করছি।”

আচার্যদেব বালক ও যুবকগণকে বীৰ্য্যধারণ ও নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপনের উপদেশ ও সাধন দিতেন; গৃহস্থগণকে ইন্দ্রিয়-সংযম ও সদাচার বিষয়ে উপদেশ ও শক্তি-সাধনা দিতেন; পুত্রকল্যাণগণকে পিতৃমাতৃভক্তি ও সেবার প্রেরণা, স্ত্রীগণকে পাতিব্রতের ধর্ম শিক্ষা দিতেন। মুমুক্শুকে মন্ত্র ও দীক্ষা দিতেন; দেশপ্রেমিক নেতাকে দেশ ও জাতির কল্যাণকর পন্থার ইঙ্গিত দিতেন। এজন্য সর্বশ্রেণীর ও সকল মতবাদের নরনারী আচার্যদেবের শ্রীচরণে আকৃষ্ট হইত। তিনি সকলেরই প্রিয়, আরাধ্য, হিতৈষী, অভিভাবক, উপদেষ্টা, গুরু ছিলেন।

### হাজারিবাগ

জামালপুর হইতে আচার্যদেব সদলবলে আসিলেন—হাজারিবাগ ১লা এপ্রিল। পূর্বেই সম্মানী প্রচারকগণকে প্রেরণ করেন। তাহার আশিয়া প্রথমে উপযুক্ত বাড়ী পান না, স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তেমন উৎসাহ প্রকাশ করেন না; বরং অনেকে নানাবিধ বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে লাগিলেন। সুতরাং অল্পসংখ্যক অমুদ্রিত লোক লইয়া শোভাযাত্রা হইল। সভা ও বক্তৃতা হইল—বক্তৃতায় সহরবাসীর মধ্যে বেশ সাড়া পড়িল; প্রচারকগণ—সম্মানেতা আচার্যের শুভাগমন বার্তা গৃহে

গৃহে প্রচার ও সকলকে দর্শন ও উপদেশ গ্রহণের জন্য সাদর আহ্বান করিলেন। দলে দলে নরনারী আচার্যদেবের শ্রীচরণ দর্শনলাভের আশায় ভীষণ জনতার সৃষ্টি করিল। যাবতীয় বিশিষ্ট লোক দর্শন ও উপদেশ গ্রহণ করিল। অনেকেই সাধন পাইল !

হাজারিবাগের উকীল রাখাল বাবুর সঙ্কল্প ছিল—সদগুরু যদি স্বয়ং আসিয়া দীক্ষাদান করেন তবেই দীক্ষা নিব, নতুবা নয়। তার গৃহের সম্মুখস্থ ভবনেই আচার্যদেব অবস্থান করিতেছিলেন। সন্ন্যাসীরা তাহাকে কয়েকবার আহ্বান জানাইল ; তিনি আসিলেন না। অবজ্ঞা ভরে ফিরাইয়া দিলেন। পরে পুনরায় আহ্বান করিতে তিনি দ্বিধা-জড়িত পদে দর্শন করিতে আসেন। দর্শনমাত্রেই তিনি বুঝিলেন তার বহুজন্মের আকাজক্ষিত দেবতা সম্মুখে। তিনি আচার্যের আদরে আশ্বাসে অভয়-বাণীতে অভিভূত হইয়া সজ্বীক দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষাকালীন আচার্যদেব তাহাকে বলেন—“তোমার অনন্ত জন্মের পাপরাশি আমি গ্রহণ করিলাম ; আজ হতে তুমি নিষ্পাপ।”

শত শত নরনারী দর্শন করিতে আসিত। কতজনে কত প্রকার কামনা, বাসনা, প্রার্থনা লইয়া আসিত ; কত জনে আসিত—অশ্রদ্ধা ভরে সংশয়-সন্দেহ লইয়া, কতজনে আসিত—বিদ্যার অভিমানে ক্ষীণ হইয়া ; যথার্থ শ্রদ্ধাবান্ কল্যাণ-প্রার্থীর সংখ্যা ছিল কম। অবশ্য আচার্যদেবের নিকট সকলেরই অব্যাহত দ্বার। সকলকেই তিনি সম্মুখে ও স্মৃতিষ্ট বাক্যে ও উপদেশে পরিতৃপ্ত করিতেন। বাইরে যতই আশ্ফালন যে করুক না কেন, সেই তপশ্চোদীপ্ত বিরাট পুরুষের সামনে গেলেই সকলের মনোবৃত্তি যেন সাময়িক স্তব্ধ, শাস্ত নিঃসংশয় হইয়া যাইত। এরূপ বহু ঘটনা প্রায়ই ঘটিত।

হাজারিবাগে জৈনিক অধ্যাপক সজ্জের একজন প্রচারক সন্ন্যাসীর সহিত নানাপ্রকার তর্কবিতর্ক, নিন্দামন্দ করিয়া তাহাকে জব্দ করিল। পরে দল বাঁধিয়া আসিল—আচার্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে। আচার্যদেবের নিয়ম এক এক জন করিয়া তাঁহার দর্শন করিবে। অধ্যাপক মহাশয় কিন্তু সদলবলে দর্শনের জন্ত জিদ্দ করিলেন। সন্ন্যাসীরা বলিলেন নিয়মভঙ্গ কিছুতেই করা যাইবে না। অধ্যাপক মহাশয় বিরক্ত হইয়া সদলবলে ফিরিয়া চলিলেন। কিয়ৎদূর গিয়া পুনশ্চ কি মনে করিয়া ফিরিলেন এবং একাকী দর্শন করিবার জন্ত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া আচার্যদেবের দর্শনেই তিনি দরজার পাশেই বিস্ময়াবিষ্টের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। আচার্যদেব হস্ত-সঙ্কেতে ডাকিলেও তিনি নিকটে যাইতে পারিলেন না। জৈনিক সন্ন্যাসী দরজার ফাঁক দিয়া দেখিল—অধ্যাপক ‘নযথৌ ন তস্থৌ’—গোছের দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। খানিক পরে ভাবে অভিভূত হইয়া অশ্রুধ্বজ কণ্ঠে আচার্যদেবের পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। কোন প্রশ্ন মনে জাগিল না। আচার্যদেব তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন ও উপদেশ দিলেন। বাহিরে আসিয়া অধ্যাপক মহাশয়—সোৎসুক হৃদয়ে প্রতীক্ষমান বক্সগণের সহিত একটী কথাও না বলিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। পরে তিনি সঙ্গীক আসিয়া আচার্যদেবের নিকট দীক্ষা লইয়া যান। কবি Gold Smith এর কথায় বলিতে হয় “Those who came to Scoff, remained to pray.

হাজারিবাগের উকীল **শ্রীযুত রামপ্রকাশ লাল**ও এই সময়ে আচার্যদেবের কৃপালাভ করেন। হাজারিবাগের সহরবাসীগণ প্রথম যেমন বিরোধী ভাবাপন্ন ছিল, পরে তেমনি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত

হইল। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আচার্য্যদেবের রূপাপ্রাপ্ত হন। হাজারীবাগে প্রায় দুটি দিন অবস্থান করিয়া আচার্য্যদেব রাঁচী হইয়া পুরুলিয়া গমন করেন।

### পুরুলিয়া

হাজারীবাগ হইতে রাঁচী প্রত্যাবর্তন করিয়াই তিনি কয়েকজন সন্ন্যাসীকে প্রেরণ করিলেন—পুরুলিয়ায় তাঁর শুভাগমনবার্তা প্রচার এবং জনসভার আয়োজন করিতে। পুরুলিয়ায় অত্যশ্চর্য্য সাড়া পাওয়া গেল। অল্প সময়ের মধ্যেই বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আগ্রহে আচার্য্যদেবের অবস্থানের জগ্ন গৃহ, সভার জগ্ন কাগজ পত্র ছাপান ও বিতরণ, শোভাযাত্রার জগ্ন বাগ্‌ভাণ্ড ও স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ, আচার্য্যদেবের শুভাগমন বার্তা গৃহে গৃহে জনে জনে জ্ঞাপন ইত্যাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

চৈত্র মাস, পার্বত্য প্রদেশ; চারিদিক তাতিয়া যেন অগ্নি-বৃষ্টি হইতেছে। ৬ই এপ্রিল দ্বিপ্রহরে আচার্য্যদেব পুরুলিয়া যাত্রা করিলেন। দারুণ গরমে তাঁর অত্যন্ত ক্লেশ হইতে লাগিল; অতিরিক্ত পিপাসায় জল খাইতে খাইতে কুঁজার জল নিঃশেষ হইল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে গাড়ী পুরুলিয়া পৌছিল।

ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য। বাহিরে সাঁওতালী ঢাকের কড়কড় নিনাদের তালে তালে সজ্জ-সন্তানগণের “ওঁ সজ্জ শরণং গচ্ছামি ইত্যাদি” কীৰ্ত্তন। দর্শনার্থীর ছড়াছড়ী, কোলাহল, স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দের মুহূর্মূহ বিপুল জয়ধ্বনি! বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রত্যেকে এক একটি ফুলের মালা হস্তে উপস্থিত! ফুলের মালায় আচার্য্যদেবের সর্বাঙ্গ ছাইয়া গেল। আচার্য্যদেব অত্যন্ত প্রসন্ন ভাবে সকলকে শিরস্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন; বিরাট শোভাযাত্রা চলিল;

বিপুল সমারোহে। রাস্তায়, রোয়াকে, বারান্দায়, ছাদে, গাছে—  
দুই ধারে অসংখ্য নরনারীর কোতুহল-দৃষ্টি ও ভক্তিপূর্ণ কৃতান্তলি-  
নমস্কার।

শোভাযাত্রা নির্দিষ্ট স্থানে পৌছিল। আচার্যদেব সভাক্ষেত্রে  
ঘাইবেন না। স্তব্রাং সেই বিরাট জন-সমুদ্রকে ঘুরাইয়া সভা-ক্ষেত্রে  
লওয়া হইল। কতক কতক লোক আচার্যদেবের দর্শন ও উপদেশ  
লাভের জন্য তথায় রহিয়া গেল। বক্তৃতা আরম্ভ হইল—জাতিগঠনে—  
গুরুশক্তির প্রয়োজনীয়তা—ব্যক্তিগত তথা জাতিগত জীবনে—  
প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে উদ্দীপনাময়ী ভাষায় বিবৃত হইল। শ্রোতৃ-  
গণের হৃদয়ে অপূৰ্ণ ভাবের সঞ্চার হইল। আচার্যদেবের দ্বারা দর্শনার্থীর  
শ্রোত অবিরাম বহিতে লাগিল। পুরুলিয়া সহরের উপর দিয়া দুই দিন  
ধরিয়া যেন একটা শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস-অন্তরাগের বজা বহিয়া গেল।  
শত শত গৃহস্থ পরিবার, বালক ও যুবক আচার্যদেবের আশ্রিত ও  
রূপাপ্রাপ্ত হইল। দর্শনার্থী সকলেই স্বীয় স্বীয় আকাঙ্ক্ষামত উপদেশ  
ও আশীর্বাদ পাইল।

আচার্যদেব কোনো সহরেই দুইদিনের অধিক অবস্থান করিতেন  
না। স্তব্রাং এই অভ্যন্তর সময়ের মধ্যে যাহাতে সমস্ত নাগরিকগণ  
তাঁহার নিকট আসিয়া দর্শন ও আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে পারে  
তজ্জন্ম নানাভাবে সহরবাসী নরনারীর মনোবৃত্তি গঠন করা  
হইত :—

(১) বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নাম স্বাক্ষরযুক্ত আচার্যদেবের শুভাগমন-  
বার্তা-জ্ঞাপক বিজ্ঞাপন বিভিন্ন ভাষায় বিতরণ।

(২) আচার্যদেবের উপদেশ-পুস্তক—“ব্রহ্মসংহাস্তা”, “গাহন্যাস্তা”,  
“সদগুরু” প্রভৃতি পুস্তক ও সঙ্ঘের মুদ্রিত পত্রিকা “প্রণব”এর—প্রচার।



(৩) জন-সভায় আচার্য্যদেবের আগমনের উদ্দেশ্য এবং তাঁহার অলৌকিক তপঃ-শক্তি ও আশীর্বাদ গ্রহণের সুযোগ—আলোচনা পূর্বক সকলকে দর্শনের জগু আহ্বান।

(৪) সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে গৃহে গৃহে পাঠাইয়া আচার্য্যদেবের শুভাগমন বার্তা জ্ঞাপন পূর্বক দর্শন, উপদেশ ও আশীর্বাদ গ্রহণের সুযোগের সদ্যবহার করিতে অনুরোধ।

(৫) বিরাট শোভাযাত্রার আয়োজন।

(৬) দর্শনার্থীর আসরে অবিরাম “ওঁ গুরুকৃপাহি কেবলম্” কীর্ত্তন এবং ভক্তি ও আত্মসমর্পণ-মূলক ভজন গান।

(৭) প্রত্যেক ব্যক্তিকে একাকী দর্শন ও স্বীয় প্রাণের ভাব প্রকাশের সুযোগ দান।

উপরোক্ত নানা উপায়ে প্রত্যেক সহরের অধিবাসীগণের মনোবৃত্তি এমনি ভাবাবেগপূর্ণ ও শ্রদ্ধালু হইয়া উঠিত যে সকলেই আচার্য্যদেবের জগু উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিত। যাহারা তাঁর আশীর্বাদ ও কৃপাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের নিকট জানিয়াও বহু নরনারীর প্রাণে আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষা উদ্বেল হইয়া উঠিত। পুরুলিয়া হইতে পুনঃ রাঁচী হইয়া আচার্য্যদেব বৈশাখের প্রথমে (এপ্রিলের মধ্যভাগে ১৯২৮ খৃঃ) কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেই কলিকাতার শত শত উৎকণ্ঠিত ভক্তবৃন্দ শোভাযাত্রা করিয়া তাহাদের প্রাণারাম ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়া দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

### বর্ধমান

একটি প্রচারক দল বর্ধমানে পৌছিলে আচার্য্যদেব বর্ধমানে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আবশ্যক বন্দোবস্ত করিবার জগু সন্ন্যাসী প্রচারক প্রেরিত হইল। ১৭ই এপ্রিল সন্ধ্যায় আচার্য্যদেব

বর্ধমান পৌছিলে বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে “বংশ গোপাল” হলে সভার অধিবেশন হইল। তৎপরে বর্ধমান টাউনের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল—আচার্যদেবের দর্শন, উপদেশ, আশীর্বাদ, সাধন নিবার জ্ঞান। স্থল ও কলেজের ছাত্রগণের উৎসাহ অদম্য। জল-স্রোতের মত জনস্রোত আসিতে লাগিল; তন্মধ্যে বহু নরনারী সাধন প্রাপ্ত হইল। সম্মানের অকৃত্রিম বন্ধু ও সম্মানেতার বিশেষ অঙ্গুষ্ঠীত ভক্ত শ্রীযুত নিশাকর চৌধুরী এই সময়ে আচার্যদেবের আশ্রয় লাভ করেন। অপর একটি প্রচারক দল এই সময়ে ভাগলপুরে প্রচারকার্যে নিযুক্ত ছিল। আচার্যদেব তথায় বাইবার জ্ঞান আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আবশ্যক বন্দোবস্ত হইতে লাগিল।

### ভাগলপুর

২৩শে এপ্রিল তারিখে আচার্যদেব ভাগলপুরে পৌছিলে বিরাট শোভাযাত্রা তাঁহাকে লইয়া লক্ষ্মীপ্রসাদ চন্দ্রনিয়ার বাগান বাড়ীর অভিমুখে চলিল। অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকায় উক্ত বাড়ীর প্রাঙ্গণেই বিরাট সভার অধিবেশন হইল। তৎপরে দর্শনের পালা। প্রকাণ্ড সহর; অসংখ্য নরনারীর ভীড় জমিয়া গেল। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে হইল। দুইটি দিন অবিভ্রান্ত দর্শন, উপদেশ, আশীর্বাদ ও সাধন দান কার্য করিয়া আচার্যদেব কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

### যশোহর

কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের কয়েকটি দিন পরেই তিনি কয়েকজন প্রচারক সন্ন্যাসীকে শুভাগমন বার্তা প্রচার ও আবশ্যক আয়োজন

করিবার জন্ত যশোহরে প্রেরণ করিলেন। তাহার পুস্তক, উপদেশপত্র, শুভাগমন-বিজ্ঞাপন প্রচার, জন-সভার ব্যবস্থা, স্বেচ্ছাসেবক-সংগ্রহ প্রভৃতি কার্য করিতে লাগিলেন। ২২শে এপ্রিল অপরাহ্নে আচার্যদেব যশোহরে পৌঁছিলেন। শোভাযাত্রা সহকারে তাঁহাকে নির্দিষ্ট বাসস্থানে লইয়া যাওয়া হইল। যশোহর সহরটি যেন শ্মশান-সদৃশ নীরব, নিষ্কর্ম, ঘুমন্ত; অকস্মাৎ যেন সেই নিরুন্ম সহর সোণার কাটীর স্পর্শে কলকোলাহলময় হইয়া উঠিল; উৎসাহের বজা বাজিল। সভা ও বক্তৃতায় লোক মাতোয়ারা হইয়া উঠিল। আচার্যদেবের মহান্ সঙ্কল্প-শক্তি যেন যশোহরের “মরা গাঙে জোয়ার” আনিয়া ফেলিল। দলে দলে নরনারী ছুটিল দর্শনের জন্ত। যে দর্শন করিল সেই মুগ্ধ হইল; যে তাঁহার শ্রীমুখের বাণী শুনিল, সে ভাবিল এমন মধুমাধা কথা তো আর শুনিল নাই; যে তাঁহার আদর-দরদ-ভরা স্পর্শ ও আশ্বাস লাভ করিল, সে চিরদিনের তরে মজিল; যে সাধন ও আশীর্বাদ লাভ করিল, সে শক্তি ও মুক্তির পথের সন্ধান পাইয়া জীবন-জনম কৃতার্থ করিল।

জটনৈক কংগ্রেস কর্মী প্রথমে আচার্যদেবের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা কথা রটনা করিতেছিল এবং লোকজন বাহাতে তাঁহার নিকট না যায় তজ্জন্ত বাড়া বাড়ী গিয়া নিষেধ করিতেছিল। পরে কৌতূহল বশতঃ হউক অথবা সাধুকে ভজ্ঞ করিবার অভিপ্রায়েই হউক—সেই লোকটি আচার্যদেবের নিকট আসিল। ফলে কর্মীটির আমূল পরিবর্তন ঘটিল; সে আচার্যদেবের নিকট সাধন গ্রহণ করিয়াছিল এবং স্বীয় দলবল লইয়া বাড়ীতে বাড়ীতে প্রচার করিয়াছিল যে আমি পূর্বে :যাহা বলিয়াছি—তাহা মিথ্যা। এত বড় মহাপুরুষ যশোহরে কদাচ আসেন নাই। সকলে গিয়া দর্শন কর।

যশোহরে আর একটি মজার ঘটনা ঘটে। জনৈক ব্রহ্মচারী মোক্তার লাইব্রেরীতে মোক্তারগণকে আহ্বান করিবার জন্ত গমন করিলে জনৈক মোক্তার বলিলেন—আমি আধ্যাত্মিক শক্তি বিশ্বাস করিনে। শারীরিক শক্তি—বুঝি। ব্রহ্মচারী তাহাকে বলিল—যে শক্তি বুঝেন, সেই শক্তিই আমাদের কাছে আছে। মোক্তার বাবুটির একটু শারীরিক শক্তির অহঙ্কার ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ হাত বাড়াইয়া বলিলেন—আমুন পাঞ্জা লড়া যাক্; যদি হারাতে পারেন তবে আপনাদের গুরুদেবের কাছে যাবো। মোক্তার বাবুটি বুঝিতে পারেন নাই যে তিনি সিংহের মুখে হাত দিয়াছেন। ব্রহ্মচারী (৮শ্রামী বীরেশ্বরানন্দ—অসাধারণ শক্তিশালী) অমনি পাঞ্জা ধরিলেন এবং একটা চাপে মোক্তার বাবুকে ‘কূপোকাৎ’ করিলেন। অতঃপর মোক্তার বাবুটি আচার্যদেবের নিকট আসিয়া উপদেশ ও সাধন গ্রহণ করেন। যশোহরের পর আচার্যদেব বনগ্রাম সহরে শুভপদার্পণ করেন।

### পূর্ণিয়া

একটি প্রচারক দল পূর্ণিয়া পৌছিলে পূর্ণিয়াবাসীগণের সাগ্রহ আবেদন তাহাদের মারফত আচার্যদেবের ত্রিচরণে পৌছিল। আচার্যদেবের প্রচারাভিযানের বিবরণ—সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় সর্বত্র একটা নূতন চিন্তাশ্রোত বহিল। পূর্ণিয়াবাসী সম্মতিভৈরবী বঙ্গুগণের বিশেষ আহ্বানে আচার্যদেব পূর্ণিয়া যাওয়ার সঙ্কল্প করিলেন। পূর্ণিয়ার স্বনামখ্যাত ৮রায় বাহাদুর নিশিকান্ত সেন, ৮রায় বাহাদুর জ্যোতিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্যোগে আয়োজন হইতে লাগিল। রায়বাহাদুর নিশিকান্ত সেনের বাড়ীতে আচার্যদেবের অবস্থানের জায়গা করা হইল। রায় বাহাদুর জ্যোতিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে জনসভা আহত হইল।

পূর্ণিয়ারবাসীর পক্ষ হইতে “Advent of a great saint” নামে বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া সর্বত্র বিতরিত হইল। ৩১শে মে দ্বিপ্রহরে আচার্য্য-দেব পূর্ণিয়া পৌছিলা। সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ মহাসমারোহে অভ্যর্থনা পূর্বক শোভাযাত্রা-সহকারে স্টেশন হইতে সহরে নিশিবাবুর বাংলোতে লইয়া আসিলেন। অপরাহ্নে নিশিবাবুর স্নবিস্তীর্ণ গৃহপ্রাঙ্গণে বিরাট সভার অধিবেশন হইল। জ্যোতিষবাবু স্বাভাবিক বার্মিতাসহকারে আলৌকিক তপঃ-শক্তি-সম্পন্ন আচার্য্যকে সাক্ষাৎ শিবাবতার বলিয়া পরিচয় দিলেন। পূর্ণিয়া সহর মহাভাবের প্রবাহে আন্দোলিত হইতে লাগিল। রায় বাহাদুর নিশিবাবু, রায় বাহাদুর জ্যোতিষ বাবু, শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র দাশ গুপ্ত, রায় বাহাদুর দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ, প্রভৃতি বহু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আচার্য্যদেবের রূপাপ্রাপ্ত হইলেন।

সজ্জের ও সজ্জনেতার অমুরক্ত ভক্ত উকীল শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র দাশ গুপ্ত ব্যক্তিগত কথাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন “স্বামীজী মহারাজের পূর্ণিয়া আগমনে পূর্ণিয়ার বহু গণ্যমান্য লোক তাঁহার সংশ্রবে আসিয়া ধর্মোপদেশ ও সাধনলাভ করিয়াছিলেন। আমিও এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাঁহার পাদপদ্মস্পর্শে ধন্য হইয়াছিলাম। এই সময়ে পূর্ণিয়ার তাঁর অবস্থিতি মাত্র একদিন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বহু লোককে সাধন ও উপদেশ দিয়াছিলেন।……কয়েক মাস পরেই সজ্জের নওগাঁ আশ্রমে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তাঁহার অমূল্য উপদেশ এবং আলৌকিক তপঃশক্তির প্রভাব আমার জীবনে তুমুল পরিবর্তন সাধন এবং শরীরে নব বল ও চেতনা সঞ্চার করিয়াছিল। ………নওগাঁ আশ্রমে অহোরাত্র হরিনাম কীর্ত্তন শুনিয়া দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত সেই নাম অহরহঃ আমার কাণে বাজিত ; পূর্ণিয়ায় ফিরিয়া আসিবার পরও আমি বহুদিন যাবৎ সেই নাম শুনিতাম।……ইহার পর যখন

কলিকাতায় গিয়াছি প্রায়ই তাঁর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন, স্পর্শন ও ধর্মোপদেশ লাভের সুযোগ পাইয়াছি। .....একদিন কলিকাতা আশ্রমে তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছি, বসিয়া তাঁহার উপদেশ শুনিতেছি ; তখন অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হইয়া ভাবিতেছি—একগ্রাস ঠাণ্ডা পানীয় পাইলে পিপাসার শাস্তি হয়। অন্তর্যামী স্বামীজী মহারাজ তখনি জনৈক সন্ন্যাসীকে এক গ্রাস ঠাণ্ডা সরবৎ আনিতে আদেশ দিলেন। আমি উহা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। ভাবিলাম—আশ্চর্য্য ! আমার মনে কথাটির উদয় হইতে না হইতেই তিনি কেমন করিয়া আমার মনের ভাবটি বুঝিয়া নিলেন।

স্বামীজী মহারাজ দ্বিতীয় বার যখন পূর্ণিয়ার শুভপদার্পণ করেন, তখন আমার কুটীরে তাঁহার আসন স্থাপিত হয়। এবারও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহার নিকট সাধন ও উপদেশ লাভে ধৃত হন। রাজা পৃথ্বীচাঁদ লাল চৌধুরী, তদানীন্তন জজ মিঃ এ, মুখার্জি, আই, সি, এস, বাবু পূর্ণচন্দ্র রায়, ডি, বিঃ হেড্‌ক্লার্ক ইত্যাদি এবং আমাকে সম্ভ্রান্তিক সাধন মন্ত্রদান করিয়া ধৃত করিয়াছিলেন। সাধন-মন্ত্র দেওয়ার পর যখন তিনি বলিলেন—“তোমাদের জন্মজন্মান্তরের যাবতীয় পাপতাপ আমি গ্রহণ করিলাম” তখন আমি স্তম্ভিত হইলাম—ভাবিলাম—আমাদের মত নিঃসহায় জীবের দুঃখকষ্ট দূর করার জন্ত এবং আমাদের মঙ্গলের জন্ত তিনি কতদূর চিন্তিত। আমাদের জন্ত কী তাঁর স্নেহ, কত তাঁর দরদ। আমাদের জন্ত কী ভীষণ দায়িত্ব তিনি স্বীকার করিলেন—ভাবিয়া বিশ্বম্বে অভিভূত হইলাম। মনে হইতে লাগিল—পাপীতাপীর উদ্ধারের জন্তই তার দেহধারণ।”

প্রচারাভিযানে আচার্য্যদেব বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশের বহুস্থানে শুভ-পদার্পণ করিয়াছেন ; কিন্তু পূর্ণিমা সহরে তাঁর—কৃপাবারি

অধিক পরিমাণে বসিত হইয়াছিল। তিনি দুইবার পূর্ণিয়াতে শুভ-পদার্পণ করেন। ৬রায়বাহাদুর জ্যোতিষচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অননুসাধারণ প্রতিভাশালী বিদ্বান্ অথচ দান্তিক খেয়ালী ব্যক্তিত্বের জন্মান্তরের এত অধিক স্মৃতি ছিল যে আচার্য্যদেবকে দর্শনমাত্র তাঁহাকে তাঁহার আরাধ্য ইষ্টদেবতা শিব বলিয়া জানিয়া সপরিবারে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণপূর্বক নূতন মাহুস হইয়া গেলেন। তৎপরে তার পরিবারস্থ স্ত্রী পুরুষ এবং বহু আত্মীয়-আত্মীয়া ক্রমে ক্রমে আচার্য্যদেবের আশ্রয় ও রূপা লাভ করিয়াছেন। আচার্য্যদেবের বিশেষ অমুগ্রহপ্রাপ্তা তদীয়া সহধর্ম্মিণী লিখিয়াছেন—

“ঠাকুর পুণ্যায় আসিয়া রায় বাহাদুর নিশিকান্ত সেনের বাড়ীতে ছিলেন। বক্তৃতা শুনিতে গিয়া চিকের আড়ালে বসিয়া তাঁহাকে প্রথম দেখিলাম। কিন্তু তাঁর শ্রীচরণে মাথা লুটাতে না পেরে প্রাণটা আকুলি বিকুলি করিতে লাগিল। বাড়ী আসিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমার স্বামী সংবাদ পাঠিয়েছেন—শীঘ্র প্রস্তুত হও—স্বামীজী মহারাজ আসিতেছেন।...উপরের ঘরে তাঁর বসিবার আসন করা হইল। ঠাকুর ফুলের মালায় স্নশোভিত হয়ে, দণ্ড হস্তে সন্ন্যাসিবৃন্দ-পরিবৃত হয়ে আসিয়া বসিলেন।.....সকলে প্রণাম করিতে লাগিল। তিনিও প্রসন্নভাবে সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।...আমার আনন্দে বাহু জ্ঞান নাই। কেবল ঠাকুরকে দেখিতেছি। ঘরের এক কোণে বসিয়া “পশুনাং পতিং পাপনাশং পরেশং”—বেদসার শিবস্তোত্র পাঠ করিতেছিলাম।.....কেমন করিয়া আবার তাঁর দর্শন পাইব—এই চিন্তায় চট্‌কট করিয়া রাত্রি কাটিল।.....পরদিন স্বামীকে বলিলাম—আমি আবার সেই সন্ন্যাসীকে দেখিব। তিনি বলিলেন—কি রূপে

দেখবে? তিনি একপার এসেছেন, সেইই মহাভাগ্য! আজই তিনি চলিয়া যাইবেন। আমি বলিলাম—তিনি তো নিশি বাবুর বাড়ীতে আছেন, আমি সেখানে গিয়া তাঁহাকে দেখিব।……আমি ঘরে যেঘে ফুল বেল পাতা দিয়ে প্রণাম করিলাম। ঠাকুর হাসিয়া আদর করিয়া বসিতে বলিলেন।

তখন আমার হাতে কুড়ি বছরের একজিমার ঘা ছিল; কত ঔষধপত্র দিয়াছি, কত সাধু-সন্ন্যাসীকে দেখাইয়াছি; কিছুতে সারে নাই। হাত ব্যাণ্ডেজ করা ছিল। ঠাকুর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার হাতে ওটা কি? আমি একজিমার কথা বলিলাম……তিনি বলিলেন—তোমার হাতটা খোলো তো! আমি অতি কষ্টে খুলিলাম। আমাকে বলিলেন—হাত দুটা জোড় কর; তিনি আমার হাতে একটু গঙ্গাজল ও একটা হরীতকী দিলেন। তিনি তাঁর হাঁটুর উপর হাত দুটা রেখে মাথা নীচু করে চোখ বুজিয়া কি যেন বলিতে লাগিলেন। প্রায় ১: মিনিট থাকার পর হঠাৎ চম্কে উঠে নিশ্বাস টানিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—“**আচ্ছা! তোমার অনন্ত জন্মের পাপ-তাপ আজ আমাকে দিয়ে দাও; আজ সব আমি নিলাম**” এই বলিয়া তাঁর দক্ষিণ চরণ বাড়াইয়া দিয়া আমাকে আদেশ করিলেন—হাতের জল ও হরীতকী চরণে অঞ্জলি দাও। আদেশ পালন করিলাম। তখন আমার দুই কাঁধে হাত দিয়া বলিলেন—আজ হতে তুই নিষ্পাপ; তুই আমার বহু জন্মের সন্তান। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—বাবা! এ কি সেরে যাবে? তিনি বলিলেন—হা! সেরে যাবে। বলা বাহুল্য, সেই থেকে বিশ বৎসরের একজিমা চিরদিনের তরে সেরে গেল।

পুনরায় দুই কাঁধে হাত দিয়া কর্ণে মস্ত্র দিলেন। ভালো করিয়া বুঝিতে না পারায় লিখিয়া দিলেন।……আমি চরণে হাত দিয়ে



বসে আছি। তিনি গম্ভীর ভাবে স্থির দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে রহিলেন। আমি নির্ঝাক হয়ে রইলাম।.....পরে তিনি শিবপূজা করিবার আদেশ দিয়া কাঁধের উপর দু' হাত রেখে বললেন—“মা! আমি তোদের দু'জনের বহু জন্মের গুরু। আজ তোমাদের দীক্ষা দান (শক্তি সঞ্চার) করিলাম। আজ তোমরা মহামন্ত্র পেলো।”...আমি প্রণাম করে ওঠে দাঁড়ালাম। বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতেছে, নেশাখোরের মত শরীর টলিতেছে। কিছু ভাবিবার, বলিবার শক্তি ছিল না। কোনো প্রকারে মোটরে চাপিয়া চলিয়া আসিলাম! তারপর সমস্ত দিনরাতই আমার শরীর অমনিতর টলিতেছিল।

### কলিকাতা

আচার্যদেব প্রচারাবিধানে বাঙ্গালা ও বিহারের বিভিন্ন সহরে যাইতেছিলেন। মাঝে মাঝে অবসর সময়ে কলিকাতা আশ্রমে অবস্থান করিতেন। সেখানে তখনও প্রত্যহ শত শত নরনারী তাঁহার দর্শন, উপদেশ ও সাধন গ্রহণ করিত। জৈনক কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুত যোগেশবাবু (জলপাইগুড়ি) এই সময়ে কলিকাতায় আচার্যদেবের নিকট আসিয়া যে অযাচিত রূপালাভ করিয়াছিলেন তৎপ্রসঙ্গে বলেন—“একদিন দুই বন্ধু মির্জাপুর ছিট দিয়া যাইতেছি; এমন সময়ে জৈনক সন্ন্যাসী আসিয়া বলিলেন—মহাপুরুষকে দর্শনপূর্বক আশীর্বাদ নিয়ে যান। আমি বলিলাম—না মহাশয়! ও সব ঢের বৃদ্ধরূপী দেখা আছে। খানিকদূর চলিয়া গিয়াছি হঠাৎ কেমন যেন দর্শনের কৌতূহল হইল। ফিরিয়া আসিয়া বন্ধুকে বাহিরে রাখিয়া আশ্রমবাড়ীর ভিতরে প্রবেশপূর্বক আচার্যের নিকটে গেলাম! ভাবিয়া ছিলাম—প্রণাম করিব না; কিন্তু নিকট গিয়া প্রণাম না করিয়া পারিলাম না; মাথা আপনা আপনাই অবনত হইল। তিনি বলিলেন—আগামীকলা কিছু ফুল বেলপাতা

নিয়া ভোরবাত্তিতে ৩ টার সময়ে আসিও। আমি বলিলাম আমি কোনো মন্ততন্ত্র বা দীক্ষা চাই না। তিনি বলিলেন—না, কোনো দীক্ষা নিতে হবে না; তোমার অণ্ড গুরু আছে।

বন্ধুর সঙ্গে আসিয়া সাধুর বুজরুকীর বিষয় খুব আলোচনা করিলাম। বুজরুকীর শেষ দেখিবার জন্ত পরদিন নির্দেশমত ফুল বেলপাতা নিয়ে যথাসময়ে আশ্রমে পৌছিলাম। তিনি একটা মন্ত্র ‘দিয়া বলিলেন এই মন্ত্রটা জপ করিও। এবং আজকার দিনটা সাত্ত্বিক ভাবে থাকিও, কোনো অনাচার না হয়। আমার জিদ্ চাপিয়া গেল—রেষ্টোঁরাতে গিয়ে ‘ফাউল’ ভোজন করিলাম। সেই মন্ত্র জপ করিলাম না। কিন্তু সেইদিন থেকে আমার ‘কাসি’র রোগে ধরিল। তারপর ছয়মাস যাবৎ বহু চিকিৎসা, বহু প্রকরণ করিলাম, কিছুতেই সেই কাসি বিন্দুমাত্র উপশম হইল না। আমার শরীর ভাঙিয়া পড়িল। মনে হইতে লাগিল—মহাপুরুষের আদেশ অমান্য করিয়াছি; সেই অপরাধে এই রোগ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার নিকট পুনরায় যাইতেও সাহস হইল না। কারণ তাঁর আদেশ পালন করি নাই, অধিকন্তু নিষেধ লঙ্ঘন করিয়াছি; তিনি হয়তো আমাকে অভিশাপ দিবেন। অগত্যা তার প্রদত্ত মন্ত্রটা জপ করিতে লাগিলাম। কিছুদিন জপ করিতে করিতে আমার কাসির ব্যারাম কমিতে লাগিল; ক্রমে সম্পূর্ণ সারিয়া গেল। কিছুকাল পরে আমি আমার কুলগুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করি। আশ্চর্যের বিষয় দীক্ষাগ্রহণের দিন হইতে আমি আচার্য্য-প্রদত্ত পূর্ব মন্ত্রটা ভুলিয়া গেলাম। কিছুতেই আর তাহা স্মরণ করিতে পারি নাই।”

বাজিতপুর নিবাসী অশ্বিনীকুমার দাস বয়োবৃদ্ধ ও রুগ্ন। আচার্য্য-দেবের নিকট উপদেশ ও সাধনগ্রহণ করিবার পর আদিষ্ট নিয়মমত

চলায় অত্যন্ত কালের মধ্যে তাহার শরীর সুস্থ বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল। আচার্য্যদেব আমাদিগকে কথাপ্রসঙ্গে বলিতেন—“দেখ, একটা বুড়ো, অচল, পঙ্গু লোক যুবকের ন্যায় সুস্থ সবল হয়ে গেছে! নিয়ম-নীতি মেনে চললে কি হয়—অশ্বিনীদাস তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ!”

রাজেন্দ্রকুমার সিংহ নামক ঢাকা নিবাসী জনৈক ব্যবসায়ী এই সময়ে আচার্য্যদেবের নিকট উপদেশ ও সাধনপ্রাপ্ত হন। বয়স পঞ্চাশোর্ধ্বে; শরীর রুগ্ন, জীর্ণশীর্ণ। কিন্তু সাধনগ্রহণের পর হইতে শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ, সবল ও কান্তিমান্ হইয়া উঠে; ইহাতে আচার্য্যের প্রতি তাহার ভক্তি-বিশ্বাস বদ্ধিত হয়। আচার্য্যদেবও তাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। গুরুপূজা-প্রসঙ্গে ইহার কথা আলোচিত হইবে।

জনৈক ভদ্রলোক দারিদ্র্যগ্রস্ত হইয়া তদীয় পরিবারবর্গকে সঙ্গতিশালী স্থালকের আশ্রয়ে রাখিয়া নিজে একাকী বাস করিতেন। নিজে বাহা আশ্রয় করিতেন, তদ্বারা নিজের ব্যয় নির্বাহ করিতেন। সেই ব্যক্তি রোগে ভুগিয়া জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় একদা আচার্য্যদেবের নিকট শরণাগত হইল। আচার্য্যদেব তাহার অবস্থার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে সে সমস্ত নিবেদন করিল। আচার্য্যদেব বলিলেন—তুমি তোমার পরিবারবর্গকে তোমার স্থালকের গৃহে রাখিয়াছ কেন? তাহাদিগকে তোমার নিকট আনিয়া রাখ; তোমার ব্যারাম সারিয়া যাইবে। সেই ভদ্রলোকটী তাঁহার আদেশ পালন করিল। তাহার শরীর ভাল হইয়া গেল। পরে সে ব্যক্তি আচার্য্যদেবের নিকট সাধন গ্রহণ করে; এই ব্যক্তিটির সম্বন্ধে আচার্য্যদেব আমাদিগকে বলেন “লোকটী পরিবারবর্গকে স্থালকের আশ্রয়ে রেখেছে; বাহা কিছু নিজে যোজ্ঞার করে, সবই যা’ তা খেয়ে খরচ করে। স্বীপুত্র পরিবারের

চিন্তা ঘাড়ের উপর থাকলে—স্বচ্ছামত যা' তা' খেতে পারে না। এখন জ্ঞাপুত্রগণকে নিজের কাছে এনেছে, তাদের চিন্তা ঘাড়ে চেপেছে ; কাজেই আপনা থেকে সবদিকে সংযত হয়েছে। শরীরও ভাল হয়ে গেছে। **না খেয়ে কয়জন মরে ? খেয়েই মরে বেশী ; অসংযম অনাচার করেই তো সব অধঃপাতে যাচ্ছে।"**

আচার্যদেবের মধ্যে যে ভগবৎকরণা ও আশীর্ষাদের জাহ্নবীধারা উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার উদ্ধাম গতিপ্রবাহ কিছুতেই বন্ধ হইবার নয় ; শ্রাবণের বারিধারা মাথায় করিয়া, গ্রীষ্মের অগ্নিদাহ সহিয়া তিনি ক্রমাগত মেদিনীপুর, কটক, পুরী, বালেশ্বর, কুষ্টিয়া, পাটনা, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, মৈমনসিংহ, বহরমপুর, গয়া, কাশী, খুলনা, এলাহাবাদ, রাজসাহী, মজঃফরপুর, গাজিপুর, ছাপরা প্রভৃতি বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং যুক্তপ্রদেশে ; কুদ্র বৃহৎ সহরগুলিতে আশীর্ষাদ ও তপঃশক্তির বন্যা লইয়া শুভপদার্পণ করিতে লাগিলেন। সর্বত্রই শোভাযাত্রা, সভা, ভজনকীর্তনাদির ধুম পড়িল। আচার্যদেবের অলৌকিক তপঃপ্রভাবে মধুলুকু মৌমাছির গায় হাজারে হাজারে, কাতারে কাতারে নরনারী ছুটিত দর্শন, উপদেশ, আশীর্ষাদ ও সাধনলাভের জ্ঞা। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের মে হইতে ১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত তিনি উপরোক্ত বহুসংখ্যক স্থানে তাঁহার অদ্ভুত ভাগবত ব্যক্তিত্বের প্রভাব ও মহিমা বিস্তার করিয়া এক ধার্মিক ও নৈতিক বাতাবরণ গড়িয়া তুলিলেন। সর্বশ্রেণীর নরনারী সমভাবে তাঁহার প্রতি আকুল আবেগে আকৃষ্ট হইয়া আসিত। অটল ধৈর্য, অসীম সহিষ্ণুতা, অনন্ত করুণা এবং অসামান্য পরিশ্রম সহকারে তিনি দিবারাত্র একে একে অসংখ্য নরনারীকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণকর আদেশ, উপদেশ, নির্দেশ ও সাধন প্রদান ও শক্তিসঞ্চার করিতেন।

কত তাকিক আসিয়া মস্তমুগ্ধ ভূজঙ্গের মত নির্ঝাক হইয়া রহিত ; কত সংসারীর হৃদয় সমাধানের আলোকে আলোকিত হইত ; কত উদ্ধতের শির অশ্রুজলে শ্রীচরণে লুটাইয়া পড়িত ; কত বিদ্বানের বিদ্বস্তার গৰ্জ চূর্ণিত হওয়ায় বিনীত ভক্ত হইয়া যাইত ;—যে সব ঘটনার বিবরণ দিতে গেলে গ্রন্থের কলেবর বাড়িয়া যাইবে ; যাহারা স্বচক্ষে অলৌকিক তপশক্তি সম্পন্ন আচার্য্যের সেই জীব-করণা ও ভক্তবৎসলতার লীলা দেখেন নাই, তাহাদের পক্ষে উহা ধারণা করা দুষ্কর ।

এ পর্য্যন্ত আলোচনা পরম্পরায় আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে ১৯২৭ সালের প্রথম ভাগ হইতেই সজ্বনেতা আচার্য্যদেব “ধর্ম্মভিত্তিতে জাতিগঠন আন্দোলন” রীতিমত ভাবে আরম্ভ করিয়াছেন । “নৈতিক আদর্শ বিস্তার ও ব্রহ্মচর্য্য সাধন প্রদান”—সে আন্দোলনের প্রথম তরঙ্গ ; ১৯২৭ সালের জুলাই হইতে কলিকাতায় এই প্রবল তরঙ্গ উঠিয়া একটি বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল । “গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ বিস্তার ও শক্তি-সাধনা প্রদান”—দ্বিতীয় তরঙ্গ । ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতায় এই তরঙ্গ উত্থাপিত হয় ।

মার্চ মাস হইতে প্রচারক দলসহ আচার্য্যদেব কেন্দ্রস্থ থাকিয়া জাতিগঠন আন্দোলনের উক্ত দুইটা তরঙ্গ—বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও যুক্তপ্রদেশে বিদ্যুৎগতিতে স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক লক্ষ লক্ষ নর-নারীর মধ্যে ছড়াইয়া দিলেন । ১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যে মাত্র একটি বৎসরে দেশের সর্বত্র এক অভিনব ভাব ও আদর্শের প্রাবল্য বহিতে লাগিল । আচার্য্য-প্রবর্তিত ধর্ম্মভিত্তিতে জাতি-গঠন আন্দোলনের প্রথম তরঙ্গের পর যখন দ্বিতীয় তরঙ্গ আসিল তখন উভয়ের সম্মিলিত বেগ তীব্রতর হইয়া উঠিল ; ইহার পরবর্তী তৃতীয় তরঙ্গ

উদ্ভিত হইলে এই আন্দোলন প্রচণ্ড আকার ধারণ করিল। এইরূপে আলোচনাক্রমে আমরা লক্ষ্য করিব—তাহার জাতিগঠন আন্দোলনকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য তিনি আদর্শ ও ভাবের তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠাইয়াছেন। এইভাবে সমাজের উচ্চতম হইতে নিম্নতম ব্যক্তিটিকে পর্যন্ত বিভিন্ন ভাবের মধ্য দিয়া লইয়া অভীষ্ট পন্থায় টানিয়া তুলিয়া এক মহামিলন ও মহাসমন্বয়ের বিশাল উদার মহাজাতীয়তার ক্ষেত্র রচনা করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলিতেন—“আমি কি ভাবে কি করিতেছি, তা আমি ছাড়া কে বুঝবে? যে যতটুকু বোঝে বোঝার শক্তি রাখে, তাকে ততটুকুই বলতে হয়। আমার আদ্য উদ্দেশ্য যদি এখন বলি—দেশের লোক ধাঁধায় পড়বে, কিছুই বুঝবে না। আমি নানা ভাব, অবস্থাচক্র ও কার্যের মধ্যদিয়া দেশবাসীকে ধীরে ধীরে বুঝাবো।”

বাস্তবিক তিনি এক একটা বৎসরে এক একটা ভাবের ও আদর্শের তরঙ্গ উঠাইয়া কিরূপ বিদ্যুৎগতিতে তাহা সর্বত্র প্রসারিত করিয়া দিয়া দেশবাসীর মনোবৃত্তিকে কিরূপ দ্রুত মোড় ফিরাইয়া অভীষ্ট পথে নিয়া আসিয়াছেন, তাহা সাধারণ লোকের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। চিন্তাশীল ধীর ব্যক্তিগণ উহা ভাবিয়া অবাক হইয়া যায়।

“ব্রহ্মচর্য্য সাধন ও শক্তি-সাধনা”—এই দুইটা ভাব-তরঙ্গের মধ্য দিয়া তিনি যে সব কার্য সাধন করিলেন তন্মধ্যে আমরা কয়েকটি বিশেষ কার্য লক্ষ্য করিতে পারি :—

(১) তরুণ-সমাজের মধ্যে ইন্দ্রিয়-সংযম, বীৰ্য্যধারণ এবং শক্তি চর্চার প্রেরণা সঞ্চার।

(২) গৃহস্থ-জীবনে সংযম-সাধনা, সদাচার-নিষ্ঠা, পরস্পর মেহ-প্রেম-শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্ৰীতি-কৃতজ্ঞতার সম্বন্ধেৰ পুনঃপ্ৰতিষ্ঠা এবং সতীত্ব ও পাতিব্ৰত্বেৰ আদৰ্শ প্ৰচাৰ ও প্ৰেৰণা দান।

(৩) বহুজন্মেৰ আশ্ৰিত সম্ভানগণেৰ যাবতীয় পাপতাপ গ্ৰহণ পূৰ্বক দীক্ষাদান বা মহামুক্তিৰ পথে তুলিয়া দেওয়া।

(৪) পাত্ৰানুযায়ী সাধন প্ৰদানেৰ মধ্যদিয়া যথাযোগ্য শক্তি সঞ্চাৰ পূৰ্বক জন্মান্তরীন দুষ্কৃতি-হরণ।

(৫) সাধাৰণ ভাবে দেশে শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসেৰ আব-হাওয়া সৃষ্টি।

“সাধন” ও “দীক্ষা”—এই দুইটিৰ মধ্যে পাৰ্থক্য কি—এই প্ৰশ্ন আনিতে পারে। সাধাৰণ ভাবে শক্তি-সঞ্চাৰ—সাধন-দানেৰ উদ্দেশ্য। বহু জন্মেৰ আশ্ৰিত সাধক সম্ভানকে সৰ্ব্বতোভাবে আত্মসাৎ কৰিয়া নেওয়া—দীক্ষাৰ উদ্দেশ্য। একটি তুলনা দিলে বুঝিতে হয় তো স্থবিধা হইতে পারে। কৃষক প্ৰথমে ক্ষেত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিয়া বীজ বপন কৰে; বীজ অঙ্কুৰিত হইয়া চাৰা গাছগুলি উপযুক্ত হইলে সেগুলিকে উঠাইয়া ক্ষেত্ৰান্তৰে রোপন কৰে; ফসল পাকিলে সেগুলি কাটিয়া তুলিয়া ঝাড়িয়া গোলাজাত কৰে। প্ৰাথমিক কাৰ্য্যগুলিৰ সহিত “সাধনদানেৰ” তুলনা কৰা যাইতে পারে। আৰ শেষ কাৰ্য্য অৰ্থাৎ ফসল কাটিয়া তুলিয়া গোলাজাত কৰাকে দীক্ষা বলা যায়। এক একটা সোপান পাৰ কৰিয়া দেওয়াৰ জন্ত “সাধন দান”; আৰ শেষ সোপান পাৰ কৰিয়া দেওয়া “দীক্ষাদান”।

আচাৰ্য্যদেব বলিতেন—“দীক্ষাৰ অধিকাৰী তো সকলে নয়! সাধন—অবস্থানুযায়ী সকলকেই দেওয়া যায়। কিন্তু

দীক্ষা যাকে দেবো বুঝতে হবে—তার সমস্ত ভার আমি গ্রহণ করেছি ; তার কাজ (Progress) হবেই। সে মুক্তির ছায়ায় এসে পৌছেচে।”

উপরোক্ত প্রচারাভিযানে বহির্গত হইয়া আচার্য্যদেব সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে যথাযোগ্য সাধন প্রদান ও শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন ; কিন্তু দীক্ষা অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই পাইয়াছিল। অবশ্য যাহারা প্রথম সাধন প্রাপ্ত হন, তাহাদের মধ্যেও আবার অনেকেই পরে দীক্ষা লাভ করিয়াছেন।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা আচার্য্যদেবের জাতিগঠন আন্দোলনের তৃতীয় তরঙ্গ লক্ষ্য করিব। পূর্বোক্ত তরঙ্গদ্বয় অপেক্ষা তৃতীয়া অধিকতর উত্তাল ও দুর্বার হইয়াছিল।

---



# জাতীয় জীবনে গুরু-শক্তির সঞ্চার ও গুরু-পূজার প্রতিষ্ঠা

সজ্জনেতা আচার্যদেব যে ধর্ম-সাধনা ও বৈদিক আদর্শের ভিত্তিতে ভারতীয় জাতির পুনর্গঠন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা চাহিতেছিলেন এবং যে জাতি-গঠন আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বে “জন-সেবা” ও “সমাজ-সেবার” আদর্শ বিস্তার দ্বারা ক্ষেত্র প্রস্তুত পূর্বক উক্ত আন্দোলনের প্রথম যে দুইটি তরঙ্গ “ব্রহ্মচর্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠা” ও “গার্হস্থ্য-জীবনের আদর্শ বিস্তার”—রূপে উত্থাপিত করিলেন ;—তাহার কেন্দ্রস্থলে ছিলেন—আচার্য স্বয়ং—আদর্শ ও গুরুরূপে,—তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি।

পূর্বে দেখাইয়াছি সজ্জনেতা ছিলেন—জন্মসিদ্ধ আচার্য ; সর্বনিয়ন্ত্রার বিশেষ ইচ্ছা ও বিধানে তিনি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়া আচার্য্যরূপেই জন্মিয়াছিলেন। আচার্য্য কে ? যাঁর আচরণ শুদ্ধ, নিখুঁত। আচার্য্যদেব নিখুঁত জীবন নিয়াই জন্মিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁর চিন্তা, বাক্য ও কার্যের মধ্য দিয়া ভারতীয় জাতির শিক্ষা-সাধনা-আদর্শ-উদ্দেশ্য-কর্তব্য-আচরণ সমস্ত কিছুই পূজ্যপূজ্যরূপে নির্দোষ ভাবেই তিনি আচরণ করিয়া ও নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। পূর্বেই দেখিয়াছি ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি স্বয়ং ‘আচার্য্য’ পদবীটি গ্রহণপূর্বক আচার্য্যরূপেই সজ্জ-সন্তানগণের নিকট আত্মপ্রকাশপূর্বক দেশ ও জাতির নিকট আচার্য্যরূপে ধরা দিয়াছেন।

## আচার্য্যই বেদমূর্তি

ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যই ভারতীয় আদর্শ-শিক্ষা-সাধনা-সংস্কৃতির ঘনীভূত মূর্তি ;—তাঁর বাক্যই বেদবাক্য ; তাঁর প্রদর্শিত ও

অনুষ্ঠিত পছাই--অভ্রান্ত সত্যপথ ; তাঁর আচরণই—  
সদাচার ; তাঁর অনুশাসনই—শাস্ত্র ; তাঁর জীবন ও  
লালাই--শাস্ত্রের প্রমাণ ও ধর্মের ভিত্তি । আচার্য্য  
ব্রহ্মবিৎ ; সুতরাং তিনি 'ব্রহ্মৈব'—ব্রহ্ম-স্বরূপ । তিনিই  
নরদেহধারী সাকার ব্রহ্ম বা ভগবান । তাঁর পূজাৰ্চনা,  
ধ্যান-ধারণা, অনুসরণ-অনুকরণ, সেবা-শুশ্রূষার দ্বারাই তাঁর  
আধ্যাত্মিক ভাব, তপঃশক্তি ও চরিত্রমহিমা পদানত অনুরক্ত  
সেবক-শিষ্যের জীবনে পরিস্ফুট হইয়া উঠে ;—ইহাই বৈদিক  
আদর্শ ও সাধনা সংস্কৃতির মূলতত্ত্ব ।

বস্তুতঃ বিচার করিলে দেখিব ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যকে কেন্দ্র করিয়া  
ভারতীয় জাতির ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, সভ্যতা,  
সংস্কৃতি সমস্ত কিছুই গড়িয়া উঠিয়াছিল ; আচার্য্যই ছিলেন  
ভারতীয় জাতির ব্যাপ্তি ও সমাপ্তি জীবনের যাবতীয় শক্তি ও  
প্রেরণার মূল উৎস । অবৈদিক সংস্কৃতি হইতে বৈদিক সংস্কৃতির  
মৌলিক পার্থক্য এখানে । এইটী বুঝিতে চাহি না, স্মরণ রাখি  
না—বলিয়াই আমাদের যাবতীয় জাতি-সমাজ-রাষ্ট্র-গঠনমূলক  
পরিকল্পনা ও কর্মপ্রচেষ্টা বিষবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে ও  
হইতেছে ।

### ভারতীয় জাতির জন্ম গুরুগৃহে

গুরু-গৃহই ভারতীয় জাতির স্মৃতিকাগার ; ভারতীয় জাতি ও সমাজের  
শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্ম ঋষি-গুরুর আশ্রমে । ভারতের বেদবেদান্ত-স্মৃতি-

পুরাণ ঋষি-রচিত। ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্য বা ঋষিই ভারতীয় জাতির জন্মদাতা, শিক্ষাদাতা, পরিভ্রাতা, প্রতিপালক, রক্ষক।

ভারতের সনাতন প্রথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও উপযুক্ত শূদ্র—পঞ্চম হইতে অষ্টম বর্ষ বয়সে গুরুগৃহে প্রেরিত হইত। তথায় সর্বতোভাবে গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, গুরুকে মাতা, পিতা, সখা, স্বহৃৎ, বন্ধুরূপে অবলম্বন করিয়া তদীয় আদেশ ও অভিপ্রায়ানুযায়ী জীবন গঠন করিতে হইত। তথায় রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র—সকলের জ্ঞ ছিল—একই ব্যবস্থা।

গুরু-গৃহের শিক্ষা সমাপনান্তে গুরুর আদেশে স্বগৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক যুবককে বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইতে হইত। কিন্তু তখনো তাহাকে গুরুর আদেশ, উপদেশ, নির্দেশ অনুযায়ী চলিয়া শাস্ত্র-নির্দিষ্ট কর্তব্যাদি প্রতিপালন করিতে হইত। গার্হস্থ্যশ্রমেও গুরুই তাহার রক্ষক ও পথ-প্রদর্শক। বর্তমান অধঃপতনের যুগেও এই প্রথাটি প্রকারান্তরে কুলগুরু-গ্রহণের রীতি-পদ্ধতির মধ্যে এখনো অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে।

গার্হস্থ্য জীবনে প্রাণপণে গুরুর আদেশ ও শাস্ত্র-নির্দিষ্ট কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পাদন পূর্ব্বক জীবন-সায়াকে ভারতীয় নর-নারীকে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক পুনরায় সেই গুরু-পাদপদ্মই আশ্রয় করিতে হইত এবং তথায় ভগবৎ-ধ্যানে ও সমাজ-কল্যাণকর কার্য্যে পবন শান্তিতে জীবনের উপসংহার ঘটত।

জীবন-উষায় ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যের আশ্রয়ে ভারতীয় বালকের হৃদয়ে যে শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিনয়-সেবার ভাব অঙ্কুরিত হইত, তাহাই পরবর্ত্তী গার্হস্থ্য জীবনে আর্ধ্য যুবকের হৃদয়ে পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি, দেবদ্বিজ-ভক্তি, গুরুজন-সেবা, অতিথিসেবা প্রভৃতিরূপে পারিবারিক ও সামাজিক সম্বন্ধ ও দায়িত্ব-বোধকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ও সফলপ্রদ করিয়া সংসারসমাজকে শান্তিনিকেতনরূপে গড়িয়া তুলিত।

গুরু-গৃহে আচার্য্যের নিকট আর্ধ্য বালক যে ত্যাগ-সংযম-ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শে কঠোর তপস্তার জীবনে অভ্যস্ত হইত, গার্হস্থ্য জীবনেও সেই আদর্শ তাহার জীবনের যাবতীয় কর্তব্য ও দায়িত্বের মধ্যে হৃদয়ে উজ্জল রূপে বিরাজিত থাকিয়া তাহাকে পরিচালিত করিত। সে বিবাহ করিত—ইন্দ্রিয়ভোগের জগ্গ নয়, পরস্তু কুলোজ্জলকারী পুত্রলাভের জগ্গ ; সে অর্থার্জন করিত—বিলাসভোগের জগ্গ নয় পরস্তু পরিবার, সমাজ, জাতিকে প্রতিপালনের জগ্গ ; সে বিষয় সম্পত্তিকে বা রাজ-ঐশ্বর্য্যকে গৃহ-দেবতার নামে দেবোত্তর বা গুরুর নামে ব্রহ্মোত্তর করিয়া দিয়া নিজে সেবাইত হইয়া যৎকিঞ্চিৎ গ্রাসাচ্ছাদন লইয়া সন্তুষ্ট থাকিত। রাজা বা সম্রাটগণেরও জীবন-রথের সারথি ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞ—আচার্য্যগণ। মহর্ষি বশিষ্ঠ—সূর্য্যবংশের, মহর্ষি ব্যাসদেব—চন্দ্রবংশের, ভিক্ষু উপগুপ্ত অশোকের, গুরু রামদাস—শিবাজীর অভিভাবক ও পরিচালক ছিলেন।

সুতরাং বিচার করিলে দেখা যায় গুরুবাদই ভারতীয় জাতির চরমবাদ। ব্রহ্মজ্ঞ গুরুকে কেন্দ্র করিয়াই ভারতীয় ব্যক্তি ও জাতির জীবনের—আদি-মধ্য-অন্ত গঠিত ও পরিচালিত। বৈদিক সংস্কৃতির মূল রহস্য তাই—আচার্য্য-পূজা ও আচার্য্য-সেবা—আচার্য্যদেব চাহিলেন—

### ভারতীয় জাতির আমূল সংস্কার ও সংগঠন

সজ্জনেতা আচার্য্যদেব ভারতীয় জাতির আমূল সংস্কার চাহিলেন। সহস্রাধিক বর্ষ ধরিয়া সময়োপযোগী জোড়াতালি দিয়া জাতি ও সমাজের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে ; ফলে সমগ্র জাতি ও সমাজটাই একটা জোড়াতালির সমষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দও

অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন—“I want root and branch reform—আমূল সংস্কার চাই। তিনিও বুঝিয়াছিলেন—আর জোড়া-তালির জায়গা নাই; এখন আগাগোড়া পরিবর্তন (overhauling) আবশ্যক।

সজ্জনেতা আচার্য্যদেব তাই জাতিকে নূতনভাবে বৈদিক আদর্শের ছাঁচে ঢালাই করিবার আয়োজন করিলেন। বৈদিক আদর্শের ভিত্তি—আচার্য্যবরণ, গুরুপূজা, গুরুশক্তির আশ্রয় গ্রহণপূর্বক জীবন গঠন ও জীবন যাপন।

জাতি গঠনের পূর্বোল্লিখিত প্রাথমিক তরঙ্গ দুইটির মধ্য দিয়া তিনি বিলপ্ত ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শকে সমুজ্জ্বল করিয়া জাতি ও সমাজের সম্মুখে ধরিলেন। কিন্তু অধঃপতিত, সাধন-পথভ্রষ্ট, আদর্শচ্যুত নরনারী সেই আদর্শের পথে চলিবে কোন্ ভরসায়? কাহার আশ্বাস ও সাহসনায়? কাহার শক্তির আশ্রয়ে? তজ্জন্তু চাই আলৌকিক তপশ্শক্তি ও আদর্শের ঘনীভূত মূর্তি আচার্য্যের শ্রীচরণে “শাধিমাং ত্বাং প্রপন্নম্” বলিয়া আশ্বনিবেদন ও আত্ম-সমর্পণ। এই ভারতীয় বৈদিক সাধনার,—গুরুপূজা ও গুরুসেবার—ব্যাপক প্রচার প্রতিষ্ঠা এবং গুরুশক্তির সঞ্চার ও বিস্তারের ব্যবস্থা আচার্য্যদেব আদেশ-উপদেশ-নির্দেশ দিয়া করাইলেন।

### গুরুপূজা প্রচলন

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রাস-পূর্ণিমা তিথিতে তিনি সজ্জ-সন্তানগণের নিকট আচার্য্যরূপে প্রকাশিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রীতিমত পূজা, আরতি ও মর্যাদা-দানের শিক্ষা তিনি দিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম অনভ্যস্ত সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ ঠিক তাঁর অভিপ্রেত ভাব না বুঝিতে পারিয়া অনেক ক্রটি করিয়া বসিত। ক্রমে

ক্রমে সন্তানগণের মধ্যে গুরু-সেবার ও গুরুর প্রতি আনুগত্য ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ১২২৬ খৃষ্টাব্দে মাঘীপূর্ণিমায় তিনি সজ্জ-সন্তানগণকে ক্রমে ক্রমে দীক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। ১২২৫ খৃষ্টাব্দে আচার্য্যদেব সিদ্ধপীঠ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বর্তমানযুগের তারক-ব্রহ্ম নাম— “ওঁ হর গুরো শঙ্কর শিব শান্তো”—সজ্জ-সন্তানগণকে কীর্তনের জন্ত শিক্ষা দিয়া তাহাদের হৃদয়ে “**গুরুই শিব, এবং শিবই গুরু—সজ্জনেতাই স্বয়ং শিব**”—এই ভাব দৃঢ় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিলেন। তৎপর ১২২৬ খৃষ্টাব্দে “**ওঁ গুরুকৃপাহি কেবলম্**”—এ যুগে একমাত্র গুরু-কৃপাই আশ্রয় ও মঞ্চ—এই ভাবে কীর্তন প্রচলন করিয়া সজ্জ-সন্তানগণের হৃদয়ে গুরুভক্তির উৎস খুলিয়া দিলেন।\*

\* ৮শ্রামী চিদম্বনানন্দকে আচার্য্যদেব প্রথম এই কীর্তন শিক্ষা দেন; পরে উহা সর্বত্র সকলে কীর্তন করিতে আরম্ভ করেন। শ্রামী চিদম্বনানন্দের পূর্বাশ্রম বাজিতপুরে। শিশুকাল হইতে আচার্য্যদেবের স্নেহ ও কৃপাপ্রাপ্ত পূর্ণ (পূর্বাশ্রমের নাম) কৈশোর কালেই সংসার ত্যাগ করিয়া সজ্জের আশ্রয় গ্রহণ করে। সে শিশুর ছায়া সরল ও নিঃসঙ্কোচ ভাবে আচার্য্যদেবের প্রতি আকৃষ্ট ছিল এবং মধুর ভাবে ভাবিত হইয়া আচার্য্যদেবের সেবা করিত। আচার্য্যদেব তাহাকে আদর করিয়া বলিতেন—“তুই ভাবের ফোয়ারা।” বাস্তবিকই তাহার হৃদয়ের গুরু-সেবার মধুর ভাব, তাহার স্ননিপুণ হস্তের কারুশিল্পকলার মধ্য দিয়া গুরু-পূজাকে সর্বাঙ্গ-সৌষ্ঠব-সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার স্বহস্তে রচিত বিচিত্র ও বিবিধ আসন, পাদুকা, ছত্র, চামর, বাজানী, চান্দোয়া, যবনিকা, ঔষধী প্রভৃতি গুরু-পূজা, মহোৎসবে লক্ষ লক্ষ ভক্ত-নরনারীর প্রাণে অপূর্ণ ভাবের উন্মাদনা সঞ্চার করিত।

চিদম্বনানন্দ সঙ্গীত-কলাকুশল না হইলেও তার গলার স্বর এমন

১২২ খৃষ্টাব্দে মাদারিপুর সেবাশ্রম ভবনে আচার্যদেবের কুটীর হইতে তদীয় আসন নব-নির্মিত ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় প্রাঙ্গণস্থ আচার্য্য-নিবাস-ভবনে স্থানান্তরিত করিয়াছিল বলিয়া তিনি কঠোর আদেশ দ্বারা সন্ন্যাসিগণের হৃদয়ে চিরদিনের জন্য মুদ্রিত করিয়া দিলেন—

“সিদ্ধ-সমাহিত-ব্যক্তির ঘুম কি (সাধারণ ব্যক্তির) ঘুম ? তাহার আহার কি (সাধারণ ব্যক্তির) আহার ? তাঁর বিশ্রাম কি (সাধারণ মানুষের) বিশ্রাম ? তিনি যেখানে বসেন, বিশ্রাম করেন, তার চৌদ্দ হাত নীচে পর্য্যন্ত মাটি পবিত্র হয়ে যায়। তিনি যে স্থানে অবস্থান করেন, তার চতুর্দিকের বায়ু-মণ্ডল পবিত্র হয়ে যায়। তাঁর পদ-সংস্পর্শে প্রত্যেকটা ধূলিকণা পর্য্যন্ত দিব্য ভাব ও রূপ ধারণ করে। তাঁর আসন, তাঁর ব্যবহৃত যে কিছু জিনিষ—সে কি সাধারণ দ্রব্য ? একি ছেলেখেলা ? এর উপযুক্ত মর্যাদা-বোধ চাই ; সাধারণ ভাবে দেখা ও ব্যবহার করা মহা অপরাধ ও অকল্যাণ !” ইত্যাদি।

আচার্য্যদেব যখন যে আশ্রমে উপস্থিত থাকিতেন, তখন সেই আশ্রমেই তাঁর সাক্ষাৎ পূজা-আরতি করা হইত। অগ্ন্যাগ্ন আশ্রমে এবং চারণ দলে “গুরু-পূজার” সুসজ্জিত আসনে তদীয় প্রতিকৃতি ও পাতুকা স্থাপন পূর্বক পূজা, আরতি, স্তব পাঠ ও কীর্তন ইত্যাদি হইত।

বালমূলভ স্মৃষ্টি ছিল যে উহা সকলের প্রাণেই আনন্দ ও ভাবের সঞ্চার করিত। ব্রহ্মচারী বিজয় তাহার সহোদর ছিল। বিজয়ের গ্রাম সেও ঘোবনের প্রান্তরেই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করে। তাহাদের উভয় ভ্রাতার স্মৃতিরক্ষার জন্য বাজিতপুর আশ্রমে আচার্য্যদেবের বাল্যকালের সাধন-ভূমিতে শ্মশান-ক্ষেত্রে একটি ক্ষুদ্র স্মৃতি-মন্দির নির্মিত হইয়াছে।



পূজা-আরতির আসনে অধিষ্ঠিত আচার্যদেব ।





বিভিন্ন আশ্রমের বার্ষিক মহোৎসবোপলক্ষ্যে সহস্র সহস্র নরনারীর সমাগম ক্ষেত্রে একটা পৃথক মণ্ডপ রচিত হইত। উক্ত মণ্ডপের মধ্যে গুরু-পূজার আসন সুন্দররূপে সজ্জিত থাকিত। আচার্য্যদেব প্রত্যুষে, দ্বিপ্রহরে ও সন্ধ্যায় স্বয়ং উক্ত আসনে অধিষ্ঠিত হইলে সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারি-সেবকগণ এবং ভক্ত নরনারিগণ সমবেত ভাবে তাঁর পূজারতি, স্তব পাঠ, ভজন-কীর্তন-প্রণাম এবং আশীর্বাদ গ্রহণ করিতেন।

১২২৭ খৃষ্টাব্দে যখন কলিকাতা আশ্রম মির্জাপুর ষ্ট্রীটে, যখন আচার্য্যদেব সদগুরু রূপে জন-সমাজে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রতিদিন দিবারাত্র শত শত লোক তদীয় দর্শন, উপদেশ-আশীর্বাদ ও সাধন লাভ করিতেছে; তখন হইতে গুরু-পূজা ব্যাপক ভাবে প্রকাশিত হইতে লাগিল। প্রতিদিন সন্ধ্যারতিতে শত শত লোক যোগদান করিতে আরম্ভ করিল। তৎপরে ১২২৮ খৃষ্টাব্দে যখন আচার্য্যদেব সদগুরু-রূপে গার্হস্থ্য-জীবনের আদর্শ শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইয়া সহস্র সহস্র নরনারীকে আশ্রয় দান করিতে লাগিলেন; তখন গুরু-পূজার আকার আরও বিরাট ও ব্যাপক হইয়া উঠিল। চারিদিকে এক অভিনব ভাব ও আন্দোলন জন-গণ-মনকে আলোড়িত করিতে লাগিল। সরল, বিশ্বাসী, ধর্মপ্রবণ, আশ্রিত, ভক্তগণ গুরু-পূজায় মাতোয়ারা হইয়া নূতন ভাব-জগতের সন্ধান পাইল। কিন্তু সংশয়ী, কপট, নাস্তিক, অবিশ্বাসীর প্রাণে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইল। ফলে পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে বিপ্লব-যুগের অন্ততম নায়ক শ্রীযুত অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় লোকমুখে নানা কথা শুনিয়া বিকৃত কল্পনা লইয়া আচার্য্যদেবের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি অমরেন্দ্র বাবুর সংশয় ঘুচাইয়া স্বীয় উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন।

প্রায় সার্ক সহস্র বর্ষ পূর্বে আচার্য্য শঙ্করের সময়েও গুরু-পূজার

কথঞ্চিৎ সমারোহ প্রচলিত হইয়াছিল। আচার্য্য শঙ্করের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে দেখিতে পাই আচার্য্য ধর্ম-প্রচার ব্যপদেশে বিরাট বাহিনী সমভিব্যাহারে দেশ হইতে দেশান্তরে যাইতেছেন। সর্বত্র সহস্র সহস্র লোক ঢকা নিনাদের তালে তালে নৃত্য পূর্বক আচার্য্যের আরাত্রিক সম্পাদন করিতেছে। তারপরে এক হাজার বছর ধরিয়া অসংখ্য অহিন্দু-জাতির উপপ্লাবনে,—মুসলমান ও ইংরেজ জাতির শাসনাধীনে—শাসন, শোষণ, পেঘণের হিংস্রতায় আর্ধ্য হিন্দু-জাতির শিক্ষা-আদর্শ-সাধনা-সংস্কৃতির চিহ্ন প্রায় বিলুপ্ত। দেড় হাজার বছর পূর্বে ভারতীয় জাতির কী ভাব, কী আচারানুষ্ঠান, কী রীতি-পদ্ধতি, কী মনোবৃত্তি ছিল—আজকার ভারতীয় নরনারী তাহা কল্পনা করিবে কিরূপে ? বৈদিক আর্ধ্য-আদর্শ ও অনুষ্ঠান যেদিন হইতে বিস্মৃত ও বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ করিল, গুরু-পূজা ও গুরু-সেবার মহাভাব ও সাধনা সেদিন হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। বর্তমানে উহা দেশ হইতে সম্পূর্ণই বিলুপ্ত হইয়াছে—বলিলে অত্যাঘ হইবে না।

চৈতন্য চরিতামৃত-প্রমুখ বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাই—“মহাপ্রভু—শ্রীচৈতন্য মধ্যে মধ্যে ভাবাবেশে বিষ্ণু খট্টায় ( শালগ্রামশিলার পূজার আসনে ) বসিয়া ভক্তগণের পূজা আরতি গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু উহা তেমন প্রকাশ্যে অধিক লোকের সমাগমে নয় ; নিতান্ত ভক্ত-গোষ্ঠীর মধ্যে। একবার মহাপ্রভুর মধ্যে মহাপ্রকাশ ঘটয়াছিল—তিনি সাত প্রহর কাল বিষ্ণু খট্টায় বসিয়া বহু নরনারীর পূজা আরতি গ্রহণ পূর্বক অজস্র আশীর্বাদ বর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের পর আর তেমন কোন প্রকাশ পূজার্চনার বিবরণ পাওয়া যায় না। ভক্তগণ পূজা আরতি করিলেও প্রকাশ্যে করিত বলিয়া বোধ হয় না।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বে সমসাময়িক কালে এবং পরবর্ত্তী

কালে অসংখ্য গুরু, মহাপুরুষ, সিদ্ধ-পুরুষের আবির্ভাব দেশে হইয়াছে, কিন্তু প্রকাশ্যে সহস্র সহস্র নরনারীর সম্মেলনে পূজার আসনে বসিয়া আরতি ও পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ ও আশীর্বাদ প্রদান কেহ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। অবশ্য মহাপুরুষের প্রতিকৃতির পূজার্কনা-আরতি-শোভা-যাত্রা ইত্যাদি সর্বত্র হইয়া থাকে ; কিন্তু রক্ত-মাংসের দেহধারী মানুষের পূজা দেখা যায় না। বিশেষতঃ বিংশ শতকের সংশয়ী ধর্ম-ভাবধীন নরনারীর অহংমত্ত দান্তিক মনোবৃত্তির নিকট ইহা এফাস্তই দুস্পাচ্য।

### গুরুপূজার প্রচার ব্যবস্থা।

সজ্জনেতা অলৌকিক আচার্য্য কিন্তু দেখিলেন—“শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্”—শ্রদ্ধার জাগরণ না ঘটিলে কোনো উপদেশ, কোনো আদর্শ, কোনো সাধনা ফলপ্রসূ হইবে না। জাতির জীবনে এই শ্রদ্ধার প্রাবল্য সৃষ্টি চাই; এজ্ঞা চাই—গুরুপূজার বিরাট সমারোহ ও ব্যাপক প্রতিষ্ঠা। ভারতীয় আদর্শব্রষ্ট অধঃপতিত জাতিকে বৈদিক আদর্শের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করিতে হইলে গুরুগৃহের সাধনাতেই জাতির ‘হাতে-খড়ি’ দিতে হইবে। বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাইতে হইলে যেমন বৈদ্যুতিক শক্তির ভাণ্ডারের (Power house) সহিত সংযোগ স্থাপন আবশ্যক ; তেমনি সমগ্রজাতির মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিতে হইলে জাতির ও সমাজের কোটা কোটা জনসাধারণের সহিত আলৌকিক তপঃশক্তির আধার—এই আচার্য্যের যোগসূত্র স্থাপন চাই। এই যোগসূত্র স্থাপনের কৌশল ও অবলম্বন—এই গুরুপূজা। তাই আচার্য্যদেব প্রথমে স্বীয় সজ্জের ত্যাগী সন্তানগণের মধ্যে গুরুপূজার ভাব, আদর্শ ও অহুষ্ঠান পরিপূর্ণভাবে ফুটাইয়া তুলিয়া তৎপরে তাহাদের দ্বারা দেশের সর্বত্র সহস্র সহস্র নরনারীর মধ্যে সেই ভাব, আদর্শ ও অহুষ্ঠানের সঞ্চার-প্রচার ব্যবস্থা করিলেন।

আচার্য্যদেবের আদেশে জৈনক সম্যাসী তদীয় “গুরুপূজা ও গুরুসেবা” বিষয়ক আদর্শ ও সাধন-পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া “**শ্রীশ্রীগদগুরু**” নামক পুস্তকে প্রকাশ করিলেন; সম্বন্ধেতা আচার্য্যদেবের পূজার্টনা পদ্ধতি “**শ্রীশ্রীজগদগুরু**” নামক পুস্তিকায় প্রকাশিত হইল। জাতিগঠনে গুরুবরণ ও গুরুপূজার আবশ্যকতা প্রদর্শনপূর্বক “**ভারতে গুরুবাদ**” ও “**ভারতে গুরুপূজা**” নামক পুস্তিকা প্রকাশিত হইল। সম্বন্ধেতা আচার্য্যদেবের অলৌকিক ব্যক্তিত্বের রহস্য ও সাধনপদ্ধতি সম্বন্ধীয় তাঁহার নিজস্ব আদেশ, উপদেশ ও নির্দেশগুলি “**সজ্জগীতা**” নামে প্রকাশিত হইল। বাগ্মী সন্ন্যাসিগণ ভারতের সকল প্রদেশের প্রধান প্রধান সহরে ও গ্রামে অবিরত পরিভ্রমণপূর্বক “জাতিগঠনে গুরুবাদ”, “যুগধর্ম”, “গুরুপূজা ও জাতীয় জীবনে শক্তিসঞ্চার” প্রভৃতি বক্তৃতার মধ্যদিয়া ভারতীয় জাতির সনাতন সাধনার রহস্য উদ্ঘাটনপূর্বক জাতিগঠনকল্পে গুরুশক্তির অত্যাবশ্যকতা প্রচার করিতে লাগিলেন।

### গুরুপূজার সমালোচনা

কলে একদিকে যেমন বহুলোকে গুরুপূজার মধ্যে শান্তি ও আনন্দ পাইল; অপরদিকে আপত্তি ও প্রতিবাদের স্বরও কতক লোকের মধ্যে লক্ষিত এবং পরস্পর আলাপ-আলোচনায় উহা প্রকাশিত হইতে লাগিল; কিন্তু যুক্তিতর্ক দিতে গিয়া কেহ কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। এই অধঃপতনের যুগে এই বঙ্গদেশে (যেখানকার অধিবাসিগণ সবচেয়ে বেশী যুক্তিবাদী বলিয়া গরু করে) এখনো কুলগুরুগ্রহণ এবং কুলগুরুপূজা প্রত্যেক হিন্দু পরিবারে প্রচলিত। হিন্দুর ষাণ্ডীয় পূজা-পার্বণাদির প্রথমে গুরুপূজার বিধান। হিন্দুর তন্ত্রশাস্ত্র (বর্তমানে দীক্ষা, সাধনা, পূজার্চনা, উপাসনা—সবই তাত্ত্বিক মতেই চলিতেছে) নিঃসংশয়রূপে

নির্দেশ দিয়াছেন—“গুরুব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ”—গুরুই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব—গুরুই পরমাত্মা ব্রহ্ম। সুতরাং যে দেশে আবহমান কাল গুরুপূজা ও গুরুসেবা প্রচলিত, গুরুগৃহে যে জাতির জন্ম এবং গুরুর আদেশ ও নির্দেশে সমগ্র জীবন যাপনের বিধি, সেইদেশে গুরুপূজার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার কী থাকিতে পারে ?

যদি ভগবানকে স্বীকার করিতে হয়, ধর্মকে মানিতে হয় ; মানুষ শুধু দেহ নয়, মানুষ—আত্মা ;—ইহা যদি স্বীকার কর, তবে গুরুকে না মানিয়া উপায় কি ? যদি নাস্তিক হও, ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার কর, ধর্মের আবশ্যকতা না মান, দেহ ছাড়া মানুষের কোন অস্তিত্ব নাই, দেহের ধ্বংসের সহিত মানুষের বিনাশ, বিলোপ ;—ইহাই যদি সিদ্ধান্ত বলিয়া কেহ ধরে এবং আহা-নিদ্রা-বংশবৃদ্ধিই জীবনের একমাত্র কাম্য ও করণীয় বোধে “হেসে নাও দু’দিন বৈত নয়, কি জানি কার কখন সন্ধ্যা হয়” চার্লসকের মতে “যাবজ্জীবন সুখং জীবনং শ্লগ্নং কৃত্বা মৃতং পিবেৎ” ভাবিয়া তাহাতেই মত্ত হইয়া থাকিতে চায় ;—তবে গুরুর প্রয়োজনীয়তা তার না থাকিতে পারে। কিন্তু ভারতীয় জাতির ধাতুতে নাস্তিকতা নাই, থাকিতে পারে না।

সজ্জ্বর বহু পরিচিত, হিতৈষী, সাহায্যকারী বন্ধুর মনেও সংশয়ের কীট প্রবেশ করিল ; তাহারা সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে বলিতে লাগিলেন—“দেখুন, আপনারা এ আবার কী আরম্ভ করিয়াছেন ? মানুষ-পূজা কেন করেন ? আপনারা দেশের ও জাতির সেবার জন্ত বহু প্রকার কাজ করিতেছেন—সকলেই সেজন্ত আপনাদের প্রশংসা করে ; কিন্তু এই গুরুপূজা আরম্ভ করেই আপনাদের প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইতেছে। আপনাদের গুরুকে আপনারা অকৃতজ্ঞতা করুন, নিজেরা পূজা করুন—সে তো ভালো কথা ; কিন্তু প্রকাশ্যভাবে এত হৈ চৈ করে একটা মানুষকে

এমনিভাবে পূজা করার কি প্রয়োজন? এই দেখুন—শত শত গুরু অবতার দেশের মাথা খেয়েছে। গুরুদেব সব করবেন, অবতারের আশ্রয় নিলে আর কোনো ভাবনা নেই, কোনো কিছু করতে হবে না;—এই করে করে জাতটা একেবারে ক্লীব কাপুরুষ অকর্মণ্য বনে গেছে; আপনারা হচ্ছেন কর্মী—নিষ্কাম কর্মযোগী; আপনারাও শেষকালে এই বৈরাগী বাবাজীর চং স্কর করলেন?”

সজ্জের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীরা বহু লোকের মুখে এই ধরনের বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনিয়া শুনিয়া ক্রমে একটু দমিয়া গেল—“তাইতো! গুরু-পূজার প্রচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় তো সজ্জের লোকপ্রিয়তা নষ্ট হইতে চলিল! বন্ধুবান্ধব বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া সংশ্রব এড়াইয়া থাকিতে চাহিতেছে। দেশবাসী যখন বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, তখন একটু ধীরে স্বস্থে অল্পে অল্পে প্রচার করিলে হয়।” এই ধরনের চিন্তা-ভাবনা আসিয়া সজ্জ-সন্তানগণের সঙ্কল্প শিথিল করিয়া দিতেছিল।

### ব্যাপক গুরু পূজার আদর্শ

আচার্যদেব দেখিলেন—যাহারা তাঁর অভীষ্ট “গুরু-পূজার” প্রচার প্রতিষ্ঠা দ্বারা সমগ্র দেশবাসী জনসাধারণকে তাঁর সহিত যুক্ত করিয়া দিবে, তাহারাই যদি এমনিভাবে শিথিল-সঙ্কল্প হইয়া পড়ে, তবে তাঁর জাতিগঠনের সঙ্কল্প সম্পূর্ণ হইবে কিরূপে? একদা তিনি আশ্রমের খোলা ছাদে চেয়ারে বসিয়া আছেন; কয়েক জন প্রধান প্রধান সন্ন্যাসী চারিপার্শ্বে দণ্ডায়মান। তন্মধ্যে একজন গুরুপূজা বিষয়ক বিরুদ্ধ সমালোচনার কথা উত্থাপন পূর্বক মন্তব্য করিতে লাগিলেন—যতটা সময়, সেরূপ ভাবেই ধীরে ধীরে করিলে হয়; দেশের লোক ক্ষেপাইয়া, বন্ধুকে শত্রু করিয়া সজ্জের কাজ কি অগ্রসর হইবে?

আচার্য্যদেব দীর, স্থির, গভীর, নীরব। হঠাৎ জনৈক সন্ন্যাসীর মধ্যে তাঁহার অভীষ্টভাব প্রবেশ পূর্বক উদ্ভেজনার সঞ্চার করিয়া বলাইতে লাগিল—

“সকল যুগেই তোমাদের এই একরূপ ভাব দেখি ; যতক্ষণ কোনো মহাপুরুষ জীবিত থাকেন, যতক্ষণ লোকে তাঁর সংস্পর্শে এসে, তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে শক্তি, শাস্তি ও মুক্তি পেতে পারে ততদিন তাঁর কাছে কাউকে আসতে দেবে না। তারপর যখন তিনি অক্লান্ত পাবেন, তখন চৌদ্দ মাদল বাজিয়ে, ‘হা গৌরাজ্জ’ ‘হা গৌরাজ্জ’ করে, চোখের জলে মাটি কাদা করে মহোৎসব মাতিয়ে তুলবে ; ছাপান্ন পদে ভোগ নিবেদন করে খুব করে চব্য-চুষা-লেখ-পেয়—প্রসাদে উদর পূরণ করবে ; আর বিমানভেদী বিশালমন্দির নির্মাণ করে জগদ্বাসীর তাক লাগিয়ে দেবে। আমি কিন্তু সে দলে নই ; আমার সঙ্কল্প—যতদিন সম্ভবনেতা আচার্য্যদেব দেহে বর্তমান আছেন, ততদিন যত বেশী সম্ভব লোককে যত ভাবে পারি তাঁর কাছে নিয়ে আসবো।”

হঠাৎ আত্মহারা অবস্থায় ভীষণ উদ্ভেজিত কণ্ঠে সন্ন্যাসীটি এই কথা বলার পর আলোচনা শেষ হইল। সকলের মনে আচার্য্যদেবের অভীষ্ট সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ও নিঃসংশয়তা ফিরিয়া আসিল। আচার্য্যদেব একটা কথাও বলিলেন না। নীরবে ছাদ হইতে উঠিয়া স্বীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্বক সমবেত পূজা-আরতি গ্রহণ করিয়া আশীর্বাদ দান করিলেন।



### গুরুপূজার অনুষ্ঠান

ভূত-ভবিষ্যৎবেত্তা আচার্য্যাদেবের নির্দিষ্ট সময় ; নির্দিষ্ট সময়ের জ্ঞাতার এই জগৎ-কল্যাণ-সঙ্কল্পময় শরীর ধারণ ; কাল পূর্ণ হইলেই এই শরীর তিনি ত্যাগ করিবেন। সুতরাং এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বীয় সঙ্কল্পিত কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইবে। একজ্ঞাতিনি চাহিতেছিলেন এমন অনুষ্ঠান এমন কৌশল বাহাতে অত্যন্ত কালের মধ্যে কোটি কোটি লোকের হৃদয়ে তাহার মহাভাব ও মহাশক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে।

এই উদ্দেশ্যে সজ্জ-প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন আশ্রমের বার্ষিক মহোৎসব ও দুর্গোৎসব, দোলোৎসব, বাসন্তী-পূজা, চড়ক পূজা, শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী, কালীপূজা প্রভৃতি পূজা পার্বণ এবং রথযাত্রা, পিতৃপক্ষ, অন্নকূট, হরিহর ছত্র, কুস্ত প্রভৃতি বিরাট বিরাট মেলা উপলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ নরনারীর সমাগমে বিপুল সমারোহে গুরুপূজার অনুষ্ঠান ও জাতি গঠনে গুরুপূজার প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন পূর্বক বক্তৃতা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিলেন।

সেই সকল সময়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, প্রহরের পর প্রহর ব্যাপিয়া আচার্য্যাদেব পূজার আসনে বসিয়া সহস্র সহস্র নরনারীর ভক্তি-অর্ঘ্য গ্রহণ পূর্বক অবিশ্রান্ত প্রণত জনগণের মন্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ ও শক্তি-সঞ্চার করিতেন, তখন উপস্থিত নরনারী তাঁহাকে সাক্ষাৎ বরাভয়-দাতা শিবরূপে দর্শন মনন প্রার্থনা করিয়া অপূর্ব্ব ভাবরাজ্যে বিচরণ করিত। ব্যাজ-চর্ম্মাসনে ত্রিশূল হস্তে রুদ্রাক্ষমণ্ডিত নীলকণ্ঠ বেশে উপবিষ্ট

বিশাল-কুলেবর বিরাট পুরুষকে দেখিয়া সাক্ষাৎ কৈলাসাম্বিপতি বলিয়া ধারণা না করিয়া কেহ পারিত না।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ঢাকা নিবাসী জনৈক ব্যবসায়ী রাজেন্দ্রকুমার সিংহ আচার্য্যদেবের নিকট সাধন লাভ করেন। সাধন লাভের পরেই তাঁর শারীরিক ও মানসিক দ্রুত পরিবর্তন ও উন্নতি দেখা যায় ; সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্যদেবের প্রতি তাঁর আনুরক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে বাজিতপুরে সিদ্ধপীঠে মাঘী-পূর্ণিমা তিথিতে মহোৎসব কালীন প্রহরে প্রহরে যে গুরুপূজা ও ভোগ ইত্যাদি হইবে তাহার ব্যয়ভার তিনি বহন করিবেন প্রস্তাব করিলেন। আচার্য্যদেব অল্পমতি দিলে রাজেন্দ্রবাবু ভোগের আবশ্যক দ্রব্যাদি সমস্ত সংগ্রহ-পূর্বক যথা সময়ে বাজিতপুরে উপস্থিত হন।

আচার্য্যদেবের সিদ্ধপীঠের উপর একখানি টিনের চালা-ঘর ছিল। সেই ঘরের মধ্যে কৃষ্ণপৃষ্ঠাকৃতি একটি মাটির বেদী রচিত হয় ; ঐ বেদীর পার্শ্বে একখানি এক বিঘত উঁচু তক্তার উপরে আচার্য্যদেবের আসন ছিল। পূর্ব পূর্ব বৎসরে ত্রিসঙ্খ্যা উক্ত সিদ্ধপীঠেই পূজা আরতি হইত ; আচার্য্যদেব স্বীয় সিদ্ধাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। উৎসবরক্তের তারিখ প্রত্যবে আচার্য্যদেব বৃক্ষকুঞ্জ-পরিবেষ্টিত একটি নিম্নতল চত্বরে আসিয়া আসনে বসিলে সজ্জসন্তানগণ সমবেত ভাবে পূজারতি করিতেন ; আচার্য্যদেব সকলকে আশীর্বাদ দান করিতেন।

এবার পূর্বোক্ত নিম্নতল চত্বরে উক্ত আসন সুসজ্জিত করা হইল। শিরোপরি সুদৃশ্য গৈরিক চন্দ্রাতপ ; পশ্চাতে সুন্দর যবনিকা ; তিনটি তাকিয়ার মধ্যস্থলে মনোরম আসনোপরি ব্যাসচর্ম। চত্বরটির চারিপার্শ্বে বেড়া দিয়া গোল করিয়া ঘেরা। দুই দিকে প্রবেশ ও নির্গমের দ্বার। আট প্রহরে আটবার আরতি ও ভোগ। সিদ্ধপীঠ

হইতে গৈরিক বস্ত্র আরতির আসন পর্যন্ত বিস্তৃত হইল ; ঢাক, ঢোল, নানাই, কামর, শঙ্খ, খোল, করতাল তুমুলনাদে বাজিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী ও ভক্ত নরনারীর কণ্ঠে “জয়গুরু ওঁকার, জয় শিব ওঁকার” গান হইতে লাগিল। আচার্যদেব সুদীর্ঘ ত্রিশূল হস্তে সিদ্ধপীঠ গৃহ হইতে ধীর পদ-বিক্ষেপে আরতির আসনে আসিয়া বসিলেন। শিরোপরি ছত্র শোভিত হইল ; চামর ও ব্যজনী ছলিতে লাগিল ; উজ্জল আলোকে ত্রিশূলের রক্তবর্ণ ঝলসিয়া উঠিল। চতুষ্পার্শ্বে যুক্তকরে দণ্ডায়মান সহস্র সহস্র নরনারীর সমগ্র দৃষ্টি আচার্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির আবেগে একাগ্র। অভিষেকের পর আরতি আরম্ভ হইল। আরতিকান্তে স্তব পাঠ ও অঞ্জলি প্রদান। আচার্যদেব ততক্ষণ দেবপ্রতিমাবৎ নিনিম্নে, নিশ্চল। প্রণত ভক্তগণকে শিরঃস্পর্শ পূর্বক আশীর্বাদ দিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া এইরূপ চলিল। পরে পুনঃ গৈরিক বস্ত্রোপরি পাদপদ্ম বিদ্যাস করিতে করিতে যত্নমন্ড গতিতে সিদ্ধপীঠ গৃহে প্রবেশ করিলেন। ভক্ত কণ্ঠে “ওঁ গুরুপাদি কেবলম্” কীর্তন চলিল। দিনে রাত্রিতে প্রতি প্রহরে প্রহরে এইরূপ চলিতে লাগিল। ইহার পর হইতে সর্বত্র মহাসমারোহে গুরুপূজা চলিতে লাগিল। যেখানে যখন আচার্যদেব উপস্থিত থাকিতেন তথায় শত সহস্র নরনারী সমবেত ভাবে এই পূজা আরতিতে যোগদান পূর্বক অপূর্ব আনন্দ-সাগরে অবগাহন করিয়া অপাধিব শাস্তির আশ্বাদ লাভ করিত।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে ক্যাশীধামে সজ্জের প্রথম দুর্গোৎসব হয়। দ্বিতলের হলে দুর্গাপূজা হইত ; একতলের হলে গুরুপূজা হইত ; একতলের হলে গুরুপূজার আসন। ত্রিতলে আচার্যদেবের অবস্থান-প্রকোষ্ঠ। ত্রিতল হইতে গৈরিক বস্ত্র একতলে আরতির আসন পর্যন্ত বিস্তৃত হইত। উহার উভয় পার্শ্বে বাদ্য যন্ত্রাদিসহ বাদ্যরত সেবকগণ,

ত্রিশূল, চামর, ব্যজনী, ছত্র, ধূপদানি করে সন্ন্যাসিব্রহ্মচারিগণ নৃত্যসহকারে “হর গুরো শঙ্কর শিব শঙ্কো” কীর্ত্তনে মাতোয়ারা। ঢাকের কড়কড় নিনাদে হৃৎপিণ্ড কম্পিত হইতেছে। আশ্রমে সমবেত ষাবতীয় নর-নারীর প্রাণ-মন বাহুবোধ লুপ্তপ্রায় হইয়া আচার্য্যের প্রতি ভক্তি-ভাবে একাগ্র। এমনি ভাবে হয়তো অর্দ্ধ ঘণ্টা, কখনো এক ঘণ্টা কাটিয়া যাইত। আচার্য্যদেব নিমীলিত নয়নে আত্মসমাহিত হইয়া আরতির বেশে সজ্জিত হইয়া উপবিষ্ট। তিনি বাস্তব জগৎ ছাড়িয়া তুরীয় রাজ্যে আরোহণ করিয়াছেন। অকস্মাৎ অর্দ্ধবাহু অবস্থায় নামিবার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া মুহু পদবিক্ষেপে অবতরণ করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তে সকলের মধ্যে অপূর্ব উন্মাদনা দেখা গেল। তুমুল নৃত্য-কীর্ত্তন চলিল। আচার্য্যদেব আরতির আসনে বসিলেন।

৮কাশীধাম—দেবাদিদেব মহাদেবের প্রিয়ধাম। সম্মুখে ত্রিশূল হস্তে-  
রুদ্রাক্ষমণ্ডিত কলেবরে ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে জটাজুটধারী মহাদেবেরই শ্রায়  
বিরাট পুরুষ! চারিদিকে কীর্ত্তন-বন্দনা-পূজা-আরতি-নৃত্য-পরায়ণ  
সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিবৃন্দ। উপস্থিত নরনারী স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া যেন  
প্রত্যক্ষ দেখিত—সুউচ্চ কৈলাশ-শিখর হইতে দেবাদিদেব মহাদেব  
দেবগণ পরিবৃত্ত হইয়া মর্ত্ত্যধামে অবতরণ করিয়াছেন; দেবগণ চতুর্দিকে  
পূজাবন্দনা-নিরত; মর্ত্ত্য নরনারী দর্শন ও বরাভয় লাভের ব্যাকুলতায়  
সমবেত। আরতি চলিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। প্রত্যেক সন্ন্যাসী ত্রিশূল  
ধূপতি ইত্যাদি করে লইয়া নৃত্য করিতে আদিষ্ট হইলেন। সে তাণ্ডব  
নৃত্যারতি চলিল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। যে নৃত্য করিল না, সে আশীর্বাদ-  
পাইল না। যেদিন ষাবতীয় সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্ত শিষ্যগণের  
আরতি হইত, সেদিন আরতি চারি পাঁচ ঘণ্টা চলিত। সন্ধ্যেন্তার

জনৈক গৃহী শিষ্য উকীল জ্ঞানেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী একবার কাশীতে দুর্যোগে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, “ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে আরতির নৃত্যতালে যেন সমস্ত বাড়ীঘর সব নৃত্য করিতেছে। সেই নৃত্যের ছন্দে ছন্দে, বাজের তালে তালে যেন সমস্ত লোক চলিতেছে, কাজকর্মগুলি হইয়া যাইতেছে।”

প্রয়াগধামে কুম্ভমেলা। চল্লিশ লক্ষ নরনারীর সমাগম। ত্রিবেণীর স্ববিস্তীর্ণ চড়ায় নূতন সহর গড়িয়া উঠিয়াছে। শত শত সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রম, বহু সেবা সমিতির ক্যাম্প, পুলিশ কোতোয়ালী, শত শত দোকান পসার। সঙ্গের সঙ্গিতে সজ্জের আশ্রম। একদিকে সহস্র স্বেচ্ছাসেবক—পরিচালক সন্ন্যাসিগণের তত্ত্বাবধানে সঙ্গমে স্নানের ঘাটে জনতা নিয়ন্ত্রণ করিতেছে; শত শত হারানো লোক খুঁজিয়া বাহির করিতেছে; ঋত্নিগণের যাবতীয় ফাইফরমাইজ খাটিতেছে; দুইটা দ্রাব্য ঔষধালয় হইতে অবিশ্রান্ত শত শত রোগীকে ঔষধপথ্য দেওয়া হইতেছে; আহত লোকের চিকিৎসা করা হইতেছে; অপরদিকে সহস্র সহস্র দর্শনার্থী আচার্যদেবের দর্শন ও আশীর্বাদ লাভের জন্ত অবিশ্রাম জলশ্রোতের মত জনশ্রোত বিভিন্ন প্রদেশের নরনারী আসিতেছে। আচার্যদেব অচল স্তম্ভরূপে সিংহাসনে বসিয়া দু’হাত দিয়া অক্লান্তভাবে আশীর্বাদ দান ও শক্তি সঞ্চার করিতেছেন। আহার-নিদ্রা-বিশ্রামের দিকে হুঁস আদৌ নাই।

পূজা-আরতির আসনে আসিয়া বসিলেন, চারিদিকে অসংখ্য নরনারী ঘেরিয়া দাঁড়াইল। অভিষেক আরতি হইতে লাগিল, নরনারী ভাবোন্মত্ত হইয়া উঠিল। আচার্যদেব অর্দ্ধবাহু অবস্থায় স্বীয় মহাভাব ও মহাপ্রেমে মত্ত হইয়া শিরঃস্পর্শপূর্বক মহাশক্তির কণিকা সমাগত

ভক্ত নরনারীকে বিতরণ করিতে লাগিলেন। কত লোকে তাঁক আশ্রয়, আশ্বাস, সাধন দীক্ষা পাইল তার সংখ্যা রহিল না।

এইরূপ আচার্য্যদেব যখনি যে আশ্রমে, যে তীর্থস্থানে, যে মেলায়, যে মহোৎসবে উপস্থিত থাকিতেন, যে স্থানে শুভাগমন করিতেন, সর্বত্র পূর্ব হইতেই গৃহে গৃহে, জনে জনে তাঁর শুভাগমন বার্তা বিজ্ঞাপিত হইত। তারপর শোভাযাত্রা ও আরতিতে সহস্র সহস্র লোক যোগদান করিত; সহস্র সহস্র নরনারী দর্শন, উপদেশ, আশীর্বাদ ও সাধন লাভ করিত। সকলকে তিনি মাতার হ্রায় সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া সম্বোধন করিতেন। ভক্ত ও আশ্রিত নর-নারীগণ কর্তৃক গুরুপূজার সময়ে ত্রিসন্ধ্যা যে স্তুতিগান হয়—

“হ্রমেব মাতা চ পিতা হ্রমেব

হ্রমেব বন্ধুশ্চ সখা হ্রমেব।

হ্রমেব বিত্তা জ্বিগং হ্রমেব

হ্রমেব সর্বং যম দেবদেব ॥”

তাহা যেন আচার্য্যদেবের কার্য্য বাক্য আচরণের মধ্যে প্রত্যহ বাস্তব রূপ ধরিয়া প্রকাশিত হইত।

### অন্যসমর্পণ যোগ

আচার্য্যদেব পুনঃ পুনঃ বলিতেন—

এক এক যুগে এক একজন আচার্য্য আসেন, তিনি সেই যুগের জ্ঞান অলৌকিক কঠোর তপঃসাধন পূর্বক মানবের মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন। পিপাসু নর-নারীর আর তখন কঠোর যোগ-যাগ-তপঃক্লান্ততা করিবার আবশ্যকতা থাকে না। সেই আচার্য্যের শরণাগত হইয়া—মাতার প্রতি হৃদ্যপোষ্য শিশুর হ্রায়

একান্ত নির্ভরশীল হইয়া থাকিলে আচার্য্যের অহৈতুকী কৃপা ও শক্তি তার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া তার অনন্ত জন্মের দুষ্কৃতিরাশি অতি অল্প সময়ের মধ্যে ক্ষয় করিয়া ফেলে।

শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, তথাগত বুদ্ধ, আচার্য্য শঙ্কর, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ইত্যাদি আচার্য্যগণ এক এক যুগে আসিয়া পিপাসু ভক্ত নর-নারীকে এই আত্মসমর্পণের সাধনা উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ গীতার শেষ কথা বলিলেন—“সৰ্ব্ব ধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ”—সৰ্ব্বতোভাবে আমাতে আত্মসমর্পণ কর। বুদ্ধদেব শিখাইলেন—“বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি”—এই সঙ্কল্প-মন্ত্র।

সজ্জনেতা আচার্য্যদেব বলিলেন—“এ যুগের তপস্বী আমিহ করে রেখেছি। একজনে জলাশয় খনন করে, লক্ষ লক্ষ লোকে জলপান করে। আমার আশ্রয় গ্রহণ করলে, শরণাপন্ন হলে, কায়মনোবাক্যে আমার প্রতি নির্ভরশীল হলে, আমার শক্তি আশ্রিত সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হবে।” আচার্য্যদেব নানাভাবে সজ্জের ত্যাগী সন্তানগণকে তথা আশ্রিত ভক্ত গৃহী সন্তানকে এই আত্মসমর্পণের সাধনা শিক্ষা দিতেন :—

(১) সাক্ষাৎ আচার্য্যের বা প্রতিকৃতি ও পাদুকার নিত্য পূজা, জয় গুরু ওঁকার জয় শিব ওঁকার কীর্ত্তন সহ আরতি, গুরু স্তোত্র ও গুরু-প্রণাম-মন্ত্র পাঠ ; “ওঁ গুরুপাদুকাহি কেবলম” কীর্ত্তন এবং “গুরু নারায়ণ ইত্যাদি” বা “পরব্রহ্ম রূপ গুরু ইত্যাদি” আত্ম-নিবেদন-মূলক ভজন গান।

(২) সাক্ষাৎ আচার্য্যদেবকে, অথবা প্রতিকৃতি ও পাদুকা-সম্বিত

আসনে দিনের মধ্যে ষতবার সম্ভব স্রযোগ স্রবিধা মত পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও প্রার্থনা।

- (৩) সর্বদা গুরুদত্ত নাম জপ ও গুরু-মূর্তির দ্যান।
- (৪) সর্বদা সকল কর্মের মধ্যে মনপ্রাণকে গুরুমুখী করিয়া রাখা।
- (৫) যখন যেখানে অবস্থান করিতেন উপস্থিত যাবতীয় সম্মানসি-  
ব্রহ্মচারি-ষাত্রি ভক্ত-নরনারী সকলকে সম্মুখে বসাইয়া আহার করান।
- (৬) সময়ে সময়ে স্বহস্তে সকলকে অঞ্জলি ভরিয়া প্রসাদ বিতরণ।
- (৭) সর্বদা ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কাজে তাঁর অনুমতি সাপেক্ষ হইয়া থাকা।

এইরূপে নানা ভাবে আশ্রিত সন্তানগণের চিন্তা চেষ্টা বাক্য নিজের প্রতি আকর্ষণ করিয়া নিয়া তাহাদের প্রাণে আত্মসমর্পণের ভাব জাগাইয়া তুলিতেন। কেহ ভুল-চুক-দোষ ত্রুটি করিয়া সঙ্কুচিত বা অনুতপ্ত হইলে তাহাকে স্নেহ-যত্ন-আদর-দরদে ডুবাইয়া যাবতীয় গ্লানি মুছাইয়া কোলে নিতেন। কেহ তাঁহাকে ছাড়িয়া দূরে চলিয়া যাইতে চাহিলে কত ব্যাকুলতা সহকারে তাহাকে টানিয়া রাখিতেন। কেহ নিন্দা তিরস্কার-সমালোচনা করিলেও তাহাকে বেশী করিয়া স্নেহ ও আশীর্বাদ দান করিতেন। এই ভাবে ভক্ত-অভক্ত, পাপী-পুণ্যবান, মুর্থ-বিদ্বান, ধনী-নিধন, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য, শত্রু-মিত্র—সকলকেই তিনি আকর্ষণ করিতেন ; সকলের মনের মধ্যে তাঁর আসন অটল থাকিত।

আচার্য্যদেব শিখাইতেন—“সদগুরুর আদেশে, গুরুমুখীন ও গুরুগতপ্রাণ হয়ে যে কাজ করা যায়, তা জপ-ধ্যান-পূজা-শাস্ত্র-পাঠ হউক, অথবা পায়খানার ময়লা সাফ্ করাই হোক—



তাহাতেই গুরুর শক্তি ও আশীর্বাদের সমান অধিকারী হওয়া যায়।”

তদীয় উপদেশপূর্ণ ‘সদগুরু’ গ্রন্থে আছে—“সদগুরু-চরণাশ্রিত শিষ্যের পক্ষে কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি ইত্যাদি সমস্ত যোগ এক আত্মসমর্পণ যোগে কেন্দ্রীভূত হয়, যথা :—

(১) সদগুরুর আশ্রিত শিষ্যকে বিচারপূর্বক কর্মের ফলাকাজ্ঞা ত্যাগ করিয়া কর্ম করিবার প্রয়াস করিতে হয় না। সদগুরু-নির্দেশে তাঁর অভীষিত কর্ম-সম্পাদন পূর্বক তাঁহার প্রসন্নতা-বিধান ;—ইহাই শিষ্যের কর্মযোগ।

(২) সদগুরুর পূজার্তনা, ধ্যান-ধারণা, সেবা-শুশ্রূষা ইত্যাদির মধ্য দিয়া ভাবে, প্রেমে, অহুরাগে, তন্ময় হইয়া থাকাই শিষ্যের ভক্তিযোগ।

(৩) সদগুরুর প্রতি ঐকান্তিকী নিষ্ঠাবশে সমগ্র চিন্তাবৃত্তি নিরুদ্ধ নিশ্চল হইয়া তদীয় স্মৃতি, ধ্যান ও ভাবে সমাহিত হওয়াই শিষ্যের রাজযোগ সাধনা।

(৪) সদগুরু-গতপ্রাণ হইয়া সদগুরু ছাড়া আমার পৃথক অস্তিত্ব নাই; আমার আমিত্ব, অস্তিত্ব, অহং জ্ঞান—সদগুরুর বিরাট সত্তায় ডুবিয়া মিশিয়া এক হইয়া যাউক—তিনিই একমাত্র সত্য, আর সব অনিত্য, মিথ্যা ;—এই ভাবনা ও ধ্যানই শিষ্যের জ্ঞানযোগ সাধনা।

(৫) ঐকান্তিকী নিষ্ঠা, অবাভিচারিণী ভক্তি, প্রবল অহুরাগ প্রভাবে সদগুরুর মহাভাবে অহুক্ষণ আত্মহার্য হইয়া থাকাই শিষ্যের সমাধি।

### অত্মসমর্পণ যোগের সাধনা

“মহুধ্যাণাং সহশ্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥”

সহস্র সহস্র নর-নারীর মধ্যে কদাচিত্বে কেহ সদগুরুরূপী আচার্য্যকে চিনিতে, বুঝিতে, আশ্রয় করিতে পারে। এরূপ সহস্র সহস্র নরনারীর মধ্যে কদাচিত্বে কেউ কেউ আমাকে বুঝিয়া ঠিক ঠিক আমাতে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারে। আচার্য্যদেব তাই আশ্রিত সন্তানগণকে শাস্ত্রোক্ত আত্মসমর্পণ যোগের নয়টি সাধনা শিক্ষা দিলেন :—

শ্রবণং কীৰ্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং ।

অৰ্চনং বন্দনং দাস্ত্রং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

(১) **শ্রবণ**—সদগুরুর বিষয় শুনিতে শুনিতে তাঁহার প্রতি অহুবাগ জন্মে ।

(২) **কীৰ্ত্তন**—সদগুরুর অশেষ কল্যাণগুণরাশি ও তাঁর অনন্ত অহৈতুকী রূপার বিষয় আলোচনা করিতে করিতে চিন্তের সংশয় ও মালিন্য বিদূরিত হয় ।

(৩) **স্মরণ**—সদগুরুর নানাবিধ লীলা ও অহৈতুক স্নেহ-প্রেমের কথা স্মরণ করিতে করিতে চিত্ত সরস হয় এবং অন্তর তাঁহার সহিত প্রেম-ভক্তিতে যুক্ত হয় ।

(৪) **পাদসেবা**—সদগুরুর শ্রীপাদপদ্ম-সেবা দ্বারা শিষ্যের অন্তরের কোটীল্য, দ্বিধা, সঙ্কোচ কাটিয়া যাওয়ায় সঙ্কল্পের নিবিড়তা অল্পভূত হইতে থাকে ।

(৫) **অৰ্চন**—সদগুরুর পূজার্কনাদি দ্বারা তদীয় আশীর্বাদ লাভে শিষ্যের বহু জন্মের দুষ্কৃতি কাটিয়া যায় ।

(৬) **বন্দন**—অহরহ সদগুরুর চরণ-বন্দন দ্বারা শিষ্যের অহংজ্ঞান হ্রাস হইতে থাকে ।

(৭) **দাস্ত্র**—সদগুরুর ভূত্যস্বরূপ তাঁর আদেশ পালনে সতত চেষ্টা দ্বারা শিষ্যের ভাব ও ভক্তির দৃঢ়তা ঘটে ।

(৮) **সখ্য**—সদগুরুর প্রতি সখ্য-ভাবাপন্ন শিষ্যের অন্তরের বহু জন্মের বিধা, সঙ্কোচ, সংশয়, কপটতা, কুটিলতা, নিঃশেষে চলিয়া যায়।

(৯) **আত্মনিবেদন**—সদগুরু চরণে অহরহঃ আপনাকে নিঃশেষে নিবেদন করিয়া ডুবাইয়া, মিলাইয়া, মিশাইয়া দেওয়ার জন্ত ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা শিষ্যকে সদগুরুর মহাভাবে আত্মাহারা করিয়া তার স্বাতন্ত্র্য, আমিত্ব, অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করিতে থাকে।

এই আত্মসমর্পণের ভাব আশ্রিত সন্তানগণের হৃদয়ে মূর্জিত করিয়া দিবার জন্ত আচার্যদেব প্রধানতঃ দুইটি গান প্রায়ই গাহিতে বলিতেন। আচার্যদেব বিজ্ঞাম করিতেছেন; সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারি-সেবকগণ কেহ কেহ হাওয়া করিতেছে, কেহ কেহ হস্তপাদ স্বেচ্ছা করিতেছে; কেহ কেহ কেশরাশির মধ্যে করাঙ্গুলি সঞ্চালন করিতেছে; কেহ কেহ তদীয় উৎসঙ্গে মস্তক স্থাপন পূর্বক শিশুরমত তাঁহার অঙ্গে লাগিয়া রহিয়াছে;—সকলে চারিদিকে ঘেরিয়া বিরাজিত। আচার্যদেব আদেশ করিলেন—জ্ঞানৈক গায়ক সন্ন্যাসী প্রাণের আকৃতি ঢালিতে লাগিল।—

“পরব্রহ্মরূপ গুরু করুণা-নিদান।

চিরপূজ্য হে উজ্জল মুক্ত মহান।

দুর্গম পথ অতি ঘন তমসায় চলিব সংসার-পথে কোন ভরসায় ?

আমায় নিয়ে চল সাথে সাথে তব পরিচিত পথে

কলুষ বিনাশী প্রভো দাওহে কল্যাণ।

কুটিল কুয়াসা-ঘেরা পথ সীমানা, আধারে চলিব কোথা নাহি ঠিকানা !

আমার কেমনে ঘুচিবে আঁধি তুমি না দেখাবে যদি

চির উদ্ধার উন্নত চরণ-নিশান !

ভব-সংসার মাঝে তুমি আলোকরেখা, পথহারা তরণীরে দিবে কি দেখা

আমায় দাও পথ পরিচয়, হে চিরমঙ্গলময় !

রাখ হে গৌরব তব ওহে গরীয়ান ॥”

আচার্য্যদেব স্নানজ্জিত আরতির সিংহাসনে সমাসীন প্রস্তুতিত  
স্ববৃহৎ রক্ত কোকনদ মধ্যে ত্রীপাদপদ্ম ; করে উত্তত ত্রিশূল ; দক্ষিণ  
করে বরাভয় ; মস্তকে রাজছত্র ; চতুর্দিকে সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারীর  
ব্যাকুল আবেগ আকৃতি ; তুমুল বাদ্যোদ্যম সহকারে “ওঁ হর গুরু  
শঙ্কর শিব শস্তো” কীর্তন ; আচার্য্যদেব শান্ত, স্নিগ্ধ, করুণাঘন-মুষ্টিতে  
স্থির নিম্পলক । অকস্মাৎ বাণ সমারোহ স্তব ; বিপুল জনসঙ্ঘ নীরব,  
নিম্পন্দ, ভাব-বিহ্বল । ভক্ত সন্ন্যাসীর কণ্ঠে আত্মনিবেদনের ও আত্ম-  
সমর্পণের সঙ্কল্প ও প্রার্থনা-গীতি ঝঙ্কারিত হইয়া অগণিত নরনারীর  
অহুরাগ-বিহ্বল হৃদয়কে অমৃত-নিষেকে আত্মহার্য্য করিয়া তুলিতে  
লাগিল :—

“গুরু নারায়ণ আশীষ বর্ষণ কর তব দীন দুর্বল সন্তানে ।

মোদের তুমি বিনে কে আছে ভুবনে নাশিতে অজ্ঞানে

যোগ-জ্ঞান দানে ॥

পাপের কুমন্ত্রণা যেন নাহি জাগে এই ভিক্ষা প্রভু মাগিহে ত্রীপদে ।

থেকে মোদের হৃদে রেখ নিরাপদে, সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে ॥

নিত্য নির্বিকার নিগুণ অক্ষয়, অশঙ্কম্পর্শমরূপমব্যয় ।

করে দেহাশ্রয় জন্মমৃত্যু ক্ষয় করিতেছ নাথ তত্ত্বজ্ঞান দানে ॥

ভবারাধ্য ধন ও রাঙা চরণ মোহে মগ্ন হয়ে চিনি নাই কখন ।

করি নিবেদন যেন মোদের মন সদা সর্বক্ষণ রহে ও চরণে ॥

তোমাঝি আদেশ সদা শিরে ধরি, সাধন-পথেতে সদা বিচরণ করি ।

দিতে যেন পারি ভবনদী পাড়ি ডুবি নাহি যেন এ মোহ-জীবনে ॥

(কত) জনম ব্যাপিয়ে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে সকলে মিলেছি চরণে আসিয়ে—

তোমাঝে হেরিয়ে জুড়াইব হিয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজিব চরণে ॥”

# জাতীয় জীবনে শক্তির সাধনা

## প্রবর্তন

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে—১৯২৭ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে মারাত্মক ব্যাধিতে শয্যাশায়ী থাকা কালীন আচার্য্যদেবের ভিতর প্রেরণা জাগে—জাতীয় জীবনে শক্তির সাধনা প্রবর্তন করিতে হইবে। এই সঙ্কল্পকে কার্য্যকরী রূপ দানের পূর্বে পারিপার্শ্বিক অবস্থাচক্র এবং জনগণ-মনোবৃত্তিকে অমূল্য করিয়া তুলিবার জন্ত তিনি প্রথমে শক্তি-সাধনার প্রতীক স্বরূপ ৬দুর্গোৎসবের অমূল্য সিদ্ধান্ত করিলেন। ৬দুর্গাপ্রতিমা ও ৬দুর্গোৎসবের মধ্যেই আচার্য্যদেবের জাতি-গঠন-পরিকল্পনার আদর্শ বিদ্যমান; শুধু তাই নয় সজ্জনতা আচার্য্যদেব—যে বিরাট সজ্জনশক্তি গঠনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন, দেবীর লীলা-মহিমার মধ্যেই তার ইঙ্গিত ও উপায় রহিয়াছে। তাই আচার্য্যদেব স্বীয় সঙ্কল্পিত কার্য্য—“জাতীয় জীবনে শক্তির সাধনা প্রবর্তন”—এর জন্ত প্রথমে ৬দুর্গোৎসবের অমূল্য নির্বাচন করিলেন। গভীর চিন্তা ও বিবেচনার পর কাশীধামেই উপযুক্ত স্থান নির্ণীত হইল। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে কাশীধামেই সজ্জার ৬দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হইল।

### শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব

শ্রীরামচন্দ্র “পরিজাগ্রাণ সাধনাং বিনাশায় চ হৃদ্ধতাং ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায়”—ভক্ত শরণাগত সাধুগণকে পরিজাগ্রাণ, হৃষ্ট হৃদ্বৃত্ত অত্যাচারীর বিনাশ এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্ত অবতীর্ণ! জিভুবনাদিপতি লঙ্কেশ্বর রাবণকে ক্রুদ্ধ করিয়া জগতের ষাণ্ডীক

রাক্ষণী ও আত্মরী শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া সমগ্র জগতকে অত্যাচার-অনাচার-কদাচার-ব্যভিচারের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইয়াছে। সেই রাক্ষণী ও আত্মরী—তামসিক ও রাজসিক—সভ্যতা ও শক্তির সহিত ত্রিরামচন্দ্রের দৈবী শক্তি ও সভ্যতার সজ্জ্ব। ভীষণ সংগ্রামে ত্রিরামচন্দ্রের বানর-হনুমান-ঋক্ষ-বাহিনী কাতর ও অবসন্ন। তখন ত্রিরামচন্দ্র স্বীয় আশ্রিত ভক্ত-বাহিনীর হৃদয়ে মহাসঙ্কল্প-শক্তির উদ্বোধন ও প্রেরণা সঞ্চারের জন্য মহামায়া মহাশক্তি শ্রীশ্রীভূগার অকাল বোধন করিয়াছিলেন, সবংশে রাবণকে ধ্বংস করা সুসাধ্য হইয়াছিল। ত্রিরামচন্দ্রের অকাল বোধন ও দেবীর পূজা বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ব্যাধির আক্রমণে জীর্ণ শীর্ণ দেহ পুনরায় নীরোগ, স্বাস্থ্য-সম্পন্ন ও কর্মক্ষম হউক ;—এরূপ সঙ্কল্পই যখন আচার্য্যদেব আনিতে পারিতে-ছিলেন না ; তখন শরীর রক্ষা কিরূপে সম্ভব হইবে—ইহা গুরুতর চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। পরিশেষে সর্বনিয়ন্তার প্রেরণায় আচার্য্যদেবের সমাহিত মনে “জাতীয় জীবনে শক্তি-সঞ্চার ও শক্তি-সাধনার পুনঃ প্রবর্তন”—এর সঙ্কল্প উদ্ভিত হয় ; সুতরাং আচার্য্যের শরীরের প্রতি একটু প্রয়োজন-বোধ ফিরিয়া আসিল ; শরীরও দ্রুত নীরোগ হইয়া উঠিল। আচার্য্যের অন্তরের এই সঙ্কল্প জাতি-গঠন-ক্ষেত্রে দুইটি ধারায় প্রকাশিত হইয়াছিল—(১) সদগুরুরূপে পিপাসু, জিজ্ঞাসু, মুমুকু লক্ষ লক্ষ নরনারীকে উপদেশ, আশীর্বাদ, আশ্রয় ও শক্তিসাধন প্রদান ; (২) জাতীয় জীবনে বৌদ্ধের অনুশীলন, তথা সঙ্ঘ-শক্তির সাধনা পুনঃ প্রবর্তন। প্রথম ধারাটির বিষয় পূর্বে কয়েকটি অধ্যায়ে কথঞ্চিৎ আভাস দিতে চেষ্টা করিয়াছি। দ্বিতীয় ধারাটি অর্থাৎ “জাতীয় জীবনে শক্তি সাধনার প্রবর্তন” বিষয়টির আভাস কিছু কিছু এই অধ্যায়ে থাকিবে।

### মহাশক্তি শ্রীশ্রীদুর্গার পূজায়োজন

ভারতীয় সনাতন বৈদিক আদর্শ ও আর্য শিক্ষা-সাধনা-সংস্কৃতির বিজয়-বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণপূর্বক আচার্য্যদেব আনুসঙ্গিক ভোগাদর্শ এবং অনার্য্য শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যে সমরায়োজন করিতেছিলেন, সেই ধর্ম্মযুদ্ধে বিজয় লাভ করিতে হইলে স্থায়ী ধর্ম্ম-সেনা-বাহিনীর মধ্যে মহাশক্তির প্রেরণা সঞ্চার ও সাধনা প্রবর্তন আবশ্যক। জাতীয় জীবনে এই মহাশক্তির লীলা প্রকট করিয়া তুলিতে হইলে—উপায় কি ? আচার্য্যদেব তদীয় প্রজ্ঞা-দৃষ্টিতে দেখিলেন—মহাশক্তি শ্রীশ্রীদুর্গার পূজারাদনার মধ্য দিয়াই এই মহা সঙ্কল্পের বীজ জাতীয় জীবনে বপন করিতে হইবে।

কি্রূপে কি উপায়ে তিনি তাহা করিয়াছিলেন তাহাই এই অধ্যায়ে বক্তব্য। সেই মহাশক্তির বীজ কি ভাবে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত ও পরিবদ্ধিত হইয়া শাখাপ্রশাখাক্রমে সমগ্র হিন্দুজাতি ও সমাজের সর্ব্ব স্তরে মূলরাশি প্রসারিত করিয়া দিয়াছে ও দিতেছে ;—তাহার আভাস পরবর্ত্তী “হিন্দুজাতি গঠন”—বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে দিতে চেষ্টা করিব।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ৮কাশীধামে প্রথমে সঙ্ঘনেতার সঙ্কল্পিত এই দুর্গোৎসব সম্পন্ন হয়। কাশীধামের অন্তর্গত বাঙ্গালী-টোলায় সোণারপুরা রাস্তার উপরে কুচবিহার রাজ কালীবাড়ীর একাংশ ভাড়া লইয়া দুর্গোৎসবের আয়োজন করা হয়। সন্ন্যাসীর কাম্যকর্ম্ম শাস্ত্রানুমোদিত নয়। সুতরাং সঙ্ঘের সন্ন্যাসিগণের নামে সঙ্কল্প হইতে পারে না। এজন্য সঙ্ঘনেতা আচার্য্যের নির্দেশে তদীয় আশ্রিত গৃহী

সন্তানগণের ঘনিষ্ঠ কতক জনের নামে সঙ্কল্প পূর্বক তাহাদের নামে বহু সহস্র নিমন্ত্রণ পত্র ও প্রচারপত্রাদি মুদ্রিত করিয়া দেশের সর্বত্র বিশেষ করিয়া কাশীধামের গৃহে গৃহে জনে জনে বিতরণ করা হইল। দেশ বিদেশ হইতে বহু ভক্ত, অনুরক্ত, শিষ্য নরনারী এই মহাশক্তির পূজোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

সঙ্ঘনেতার আশ্রিত অগ্রতম সন্তান চিরকুমার শ্রীযুত হরিবিলাস মুখোপাধ্যায়কে আচার্য্যদেব পুরোহিত নির্দেশ করিলেন। তিনি আচার্য্যদেবের আদেশ পালনের জগ্ন পূজার পুঁথি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন পূর্বক যাবতীয় অনুষ্ঠানগুলি নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন করিবার জগ্ন প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

### সঙ্কল্প

সন্ন্যাসীটী চিন্তা করিতে লাগিলেন—“আচার্য্যদেবের অভিপ্রেত সঙ্কল্পটি কি? আচার্য্যদেব তো চাহেন—জাতীয় জীবনে মহাশক্তির সঞ্চার। আচার্য্য স্বয়ংই সেই মহাশক্তির ও মহাসঙ্কল্পের ঘনীভূত মুক্তি। সুতরাং আচার্য্যের মহাসঙ্কল্প-শক্তিময় দেহ-বিগ্রহ যতকাল অটুট থাকিবে, ততকাল তাহা হইতে ভাগবতী মহাশক্তির স্রোত প্রবাহিত হইয়া জাতি ও সমাজের সর্বত্র সঞ্চারিত হইতে থাকিবে। অতএব যুগাচার্য্যের ভাগবত দেহ-বিগ্রহের স্বাস্থ্য, আরোগ্য ও দীর্ঘায়ুর সঙ্কল্পেই মহাশক্তির বোধন ও অর্চনা হওয়া উচিত।” এই প্রকার চিন্তা করিয়া উক্ত সন্ন্যাসীটী সঙ্কল্প-মন্ত্র রচনা করিয়া দিলেন। সঙ্কল্পটি পুরোহিতেরও মনোমত হইল।

### কাশীধামে প্রচারকার্য

যথাসময়ে আচার্য্যদেব সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারি-সেবকগণসহ কাশীধামে পৌঁছিলেন। বিভিন্ন প্রদেশে প্রচার-কার্য্যে রত সঙ্ঘের চারণদলগুলিও



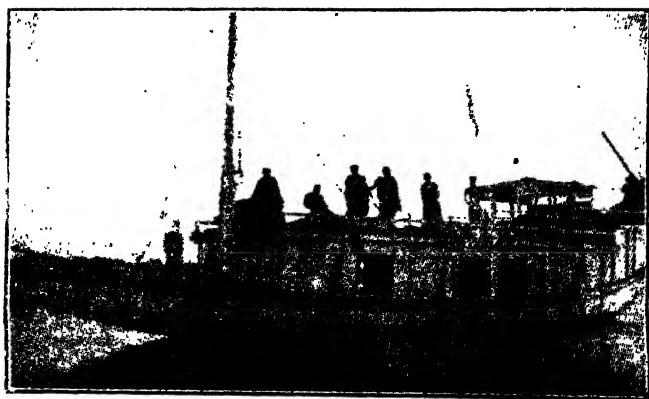
আচার্য্যের নির্দেশে কাশীধামে আসিয়া মিলিত হইল। নব যুগের নবীন আদর্শের প্রতীক কর্মযোগের ভৈরব বিষণ বাজাইয়া সজ্জের তরুণ সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ দলে দলে গৈরিকের সমুজ্জল দীপ্তিতে কাশীর পথ ঘাট রাঙাইয়া দিল। জাতির অতীত মহিমাগীতির প্রাণস্পর্শী স্বাকার ও অতীত আদর্শে জাতি ও সমাজের পুনর্গঠনের বাণী ও আবেদন লইয়া সজ্জ-বাহিনী গৃহে গৃহে হানা দিতে লাগিল। সজ্জ-গৈরিক-বাহিনীর অধ্যাত্ম যুদ্ধ-ঘোষণায় বৈদেশিক ভোগ-বিলাস-ব্যসনমূলক বিজাতীয় আদর্শের দুর্গমূল আশঙ্কায় কম্পিত হইয়া উঠিল। পাঁচটা চারণ-বাহিনীতে শতাধিক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী সপ্তাহকাল ধরিয়া কাশীধামের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত মন্বন করিয়া চলিল। সজ্জের বাণী ও উপদেশ পত্র সহ সজ্জনেতা আচার্য্যের শ্রীমূর্তি ও তদীয় শুভাগমন বার্তা এবং সজ্জের জাতি-গঠন-মূলক দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণ-পত্র প্রতি গৃহে গৃহে জনে জনে বিতরিত হইতে লাগিল। দশাশ্বমেধ ঘাটে বহু জনসমাগমে প্রত্যহ অপরাহ্নে ছায়াচিত্রে বক্তৃতা ও ভজন কীর্তন চলিল। কাশীবাসী নরনারী এবং সমাগত যাত্রিগণের প্রাণমনে এক অভিনব ভাবের উচ্ছ্বাস বহিল। সজ্জের পূজা উৎসব দেখিবার জগ্ন তথা অলৌকিক তপঃশক্তি-সম্পন্ন আচার্য্যের দর্শন, উপদেশ, আশীর্ব্বাদ, শক্তি-সাধনা গ্রহণের জগ্ন অজস্র জনশ্রোত পূজার বাড়ীখানিকে নিয়ত জমজমাট করিয়া রাখিল।

### দেবীর বোখন ও সজ্জ সন্তানগণের সমস্তার সমাধান

ষষ্ঠী দিন অপরাহ্নে বিরাট সমারোহ সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া— শতাধিক সন্ন্যাসী ত্রিশূলহস্তে “ওঁ সজ্জঃ শরণং গচ্ছামি, ওঁ হর হর বোম্ বোম্”—ধ্বনিতে গগন পবন মথিত ও জনগণমনকে বিম্বিত চমকিত করিয়া দেবী-প্রতিমাকে আনয়ন করিলেন। সকলের প্রাণে



কালিদাসে সজ্জের তর্পণেংসব শোভাবাহার একাংশ



সজ্জ প্রচার-তরঙ্গী ( কাণ্ডারী ) ।



নাটমন্দিরের প্রবেশদ্বারে স্থাপিত আচাধ্যাদেবের ব্যবহৃত পাঙ্কী



শ্রীশ্রীপ্রণব-মঠের তোরণ ।

যেন ভাবের আভাস জাগিল, স্বয়ং বিশ্বনাথ বুঝি সপরিবারে প্রত্যক্ষ হইলেন; ভারতের অতীত ঋষিযুগ বুঝি আবার পূর্ক্স গৌরবে প্রত্যাবর্তন করিল।

আচার্য্যাদেবের অহুমতি ও ইঞ্জিতে পুরোহিত বোধনে প্রবৃত্ত হইলেন। আচার্য্যাদেব ত্যাগী ও গৃহী সকল সন্তানকে পূজামণ্ডপে ধ্যানে বসিতে আদেশ দিলেন। তাঁর আদেশক্রমে জনৈক সন্ন্যাসী উপস্থিত সন্তানগণকে আচার্য্যের অভিপ্রেত ভাবগুলি বিবৃত করিলেন; উহার সারমর্ম—(১) সজ্বনেতার বিশ্বকল্যাণময়ী ভাগবতী মহাসকল-শক্তিই দেবীপ্রতিমায় আরাধ্যা; (২) সজ্বনেতার জাতি-গঠন-পরিকল্পনার ইঞ্জিত দেবী-প্রতিমার মধ্যে।

সজ্জের আশ্রিত যাবতীয় ত্যাগী গৃহী সন্তানগণ সজ্বনেতা আচার্য্যাদেবকে ভগবৎ-প্রতীক—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের সমষ্টি—সদগুরু রূপে পূজার্চনা, ধ্যানধারণা করিয়া থাকেন। তাহাদের অনেকেরই মনে সংশয় আসিয়াছিল—সদগুরু আচার্য্যাদেবই তো ভগবৎ-প্রতিমা! পুনঃ দেবী-প্রতিমার কি প্রয়োজন? তবে কি আচার্য্যাদেব ও দেবী পৃথক? যদি পার্থক্য না থাকে তবে আচার্য্যাদেব দেবী-পূজার এই সকল ও আয়োজন কেন করিলেন? এই সব সংশয়ের সমাধান প্রয়োজন ছিল।

### চক্ষুর্দান ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা

সপ্তমীর প্রভাতে পূজা আরতি গ্রহণ পূর্ক্সক সন্তানগণকে আশীর্বাদ ও শক্তি-সঞ্চার করিলেন। ঢাকের ব্রহ্মরুদ্র তালে উৎসব-আনন্দের তরঙ্গ বহিল। সংযমোপবাস-শুদ্ধ পুরোহিতের পূজানুষ্ঠান ও মন্ত্রধ্বনি, ত্যাগী ও গৃহী ভক্তগণের স্তব ও চণ্ডীপাঠ, গুরুভক্ত সন্ন্যাসিবৃন্দের অবিরাম—“ও গুরুপাহিকেলম্”—কীর্তনে ও ভজনে সমগ্র আশ্রম-বাড়ী ও সমাগত নরনারীর দেহমন ছন্দোময় হইয়া উঠিল। দলে দলে

নরনারী আচার্য্যদেবের দর্শন-গৃহের দ্বারে জনতা সৃষ্টি করিতেছিল। সকলেরই প্রাণ এক অনির্বচনীয় আনন্দহিল্লোলে স্পন্দিত, পুলকিত হইতেছিল। মনে হইতেছিল আনন্দ ঘনীভূত হইয়া যেন স্পর্শাত্মবের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দেবী-প্রতিমায় চক্ষুর্দান ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠার সময় হইলে আচার্য্যদেব দেবী-পূজার মণ্ডপে আসিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। মণ্ডপে আচার্য্যদেবের আসন রচিত হইল। আচার্য্যদেবের দর্শন-গৃহ হইতে মণ্ডপ পর্য্যন্ত গৈরিক বস্ত্র বিস্তৃত হইল। সম্রাসী ও গৃহী ভক্তবৃন্দ ছত্র, চামর, ত্রিশূল, ব্যাজনী, ধূপদানি হস্তে উভয় পার্শ্বে নৃত্য করিতে লাগিলেন। “ওঁ হর গুরো শঙ্কর শিব শম্ভো” কীৰ্ত্তন চলিল। ঢাংয়ের গৰ্জন, গোল করতাল, কাসর, ঘণ্টা, শঙ্খের তুমুল নিনাদে এবং “ভৃগুমায়ী কী জয়!” “জগদগুরু আচার্য্যদেব কী জয়!” প্রভৃতি ধ্বনিতে উপস্থিত জনগণের বাহ্যচেতনা বিলুপ্তপ্রায় হইয়া এই দৃশ্য ও অমুষ্ঠানে সমাহিত হইল। আচার্য্যদেব ধীর পদসঙ্কারে ভক্তবৃন্দের প্রাণে আনন্দ-শিহরণ জাগাইতে জাগাইতে দেবী প্রতিমার সম্মুখস্থ আসনে দণ্ডায়মান হইলেন। সমস্তা—“কাকে ছেড়ে কাকে দেখি কে বেশী সুন্দর!” একদিকে “সৌম্যসৌম্যতরশেষ সৌম্যোভ্যস্তিসুন্দরী”—লক্ষ্মী, সরস্বতী, কান্তিক, গণেশাদি সমষ্টিত সিংহবাহিনী, দশকরে দশপ্রহরণ-ধারিণী ত্রিলোকেশ্বরী মহামায়ার সংগ্রামোন্মত্তা রাজরাজেশ্বরী মূর্তি; অত্রদিকে জটাজুটধারী, রুদ্রাক্ষ-মণ্ডিত, ত্রিশূলহস্ত, গৈরিক-ভূষিত, জ্যোতির্বিভূতি, স্মিতপ্রসন্নবদন, প্রশান্ত, গম্ভীর, বরাভয়দানকারী, বিপুল তেজঃপুঞ্জকলেবর আচার্য্যদেব। বিস্মিত হইয়া অনেকেই অমুভব ও প্রকাশ করিল—সাক্ষাৎ শিব-শক্তি;—যেন কৈলাসেশ্বর আসিয়া কৈলাসেশ্বরীর সহিত সম্মিলিত হইলেন।

শত শত ভক্তের কণ্ঠে কীর্তন “ওঁ হর দুর্গা শঙ্কর শিব শম্ভো” ও বাহুবলি সহিত নারীকণ্ঠের হলুধনি ঝাঁকে ঝাঁকে মিলিতে লাগিল। কীর্তন থামিল। আচার্য্যদেব অপলক দৃষ্টিতে দেবী প্রতিমার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। পুরোহিত যথারীতি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক দেবী-প্রতিমার চক্ষুর্দান ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সমাপনান্তে এক সঙ্গেই আচার্য্যদেবের ও দেবী-প্রতিমার আরতি করিলেন। আশীর্বাদান্তে আচার্য্যদেব স্বীয় প্রকোষ্ঠে প্রত্যাগমন করিলেন। উপস্থিত নরনারী সকলেরই প্রাণে বিশ্বাস ও অমুভূতি জাগিল—মুগ্ধ দেবী প্রতিমায় চিন্ময়ী মহামায়া সত্যই আবিস্কৃতা হইয়াছেন। সাধক ভক্তগণ অমুভব করিতে লাগিলেন—আচার্য্যদেবই স্বয়ং—শিব ও শক্তির—নিরাকার নিগুণ ও সাকার-সগুণ ব্রহ্মের সমন্বয়-মূর্ত্তি।

### শক্তি-সাধনা প্রদান ও গুরুপূজা

প্রাতে ৭ ঘটিকা হইতে আচার্য্যদেবের দর্শন আরম্ভ হইল। জিজ্ঞাসু, ধর্ম্মপিপাসু, নরনারী ব্যাকুল প্রাণে আচার্য্যের গৃহ-দ্বারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া একে একে প্রাণের আকাজক্ষা নিবেদন পূর্ব্বক অভীষ্ট শক্তি-সাধনা ও আশীর্বাদ লাভ করিতে লাগিল। কাশী সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং নানা প্রদেশ হইতে সমাগত বহু নরনারী দর্শনোপদেশ প্রার্থী ছিলেন। আচার্য্যদেব আজ অতীব প্রসন্ন ও করুণাময়; কোনো প্রার্থীকেই বিমুখ হইতে হইল না। পূজার তিনটা দিন প্রাতে ৭টা হইতে ১১টা এবং অপরাহ্ন ৩টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত এক্রপ চলিয়াছিল।

একদিকে যেমন ৮দুর্গাপূজার সমারোহ অপর দিকে তেমনি গুরুপূজার বিরাট উৎসব চলিল। প্রাতে, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যায় ভজনকীর্তন, অভিষেক, পূজা, নৃত্যারতি মহাউল্লাসে চলিল। শতাধিক সন্ন্যাসী ও

অগণিত ভক্তবৃন্দের সমবেত আরতি আচার্যদেব ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া গ্রহণ পূর্বক আশীর্বাদ ও শক্তি-সঞ্চার করিতে লাগিলেন। দিবাবাত্র অবিরাম অমুষ্ঠানের পর অমুষ্ঠান চলিতে থাকায় এমনি ভাবের আবহাওয়ার সৃষ্টি হইল যে এক কয়েকটি দিন যাহারা আশ্রম-বাড়ীতে ছিলেন ও আসিয়াছিলেন, তাহারা সকলে অমুভব করিয়াছিলেন—কী অদ্ভুত শক্তিবলে তাহাদের বিষয়াসক্ত মনও বাহ্যজগতের সকল সংশ্রব ও স্মৃতি পরিত্যাগ করিয়া এক দিব্য ভাববাজ্যে নিয়ত অবস্থিত ছিল; কাহারো অন্তরে কোনো ক্ষুদ্র হীন ভাবের বৃদ্ধি উদ্ভিত হয় নাই।

### চামুণ্ডার পূজা

সন্ধিপূজার সময়ে আচার্যদেব তেমনি ভাবেই দেবীমণ্ডপে আসনে অধিষ্ঠিত হইলেন—তেমনি শত শত নরনারীর আগ্রহ-আকৃতি-ভরা প্রার্থনার মাঝে শত শত ভক্ত সন্ন্যাসী ও গৃহীর প্রেমাঙ্কুর কীৰ্ত্তনের সঙ্গে। পুরোহিত আচার্যদেবের পূজা আরতি সমাপণপূর্বক আশীর্বাদ-গ্রহণান্তে চামুণ্ডার ধ্যানমন্ত্র উদ্গান করিলেন—

“কালীকরালবদনা বিনিস্রাস্তাসি পাশিনী।

বিচিত্র খট্টাঙ্গধরা নরমালা বিভূষণা।

দ্বীপিচন্দ্রপরিধানা শুক মাংসাতি ভৈরবা।

নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিত দিঅুখা ॥”

সঙ্গে সঙ্গে সমবেত ভক্ত নরনারীর হৃদয় মুহুমুহু কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছিল; সকলে অমুভব করিতে লাগিল—আচার্যদেবের মধ্যে যেন চামুণ্ডা-শক্তি আবির্ভূতা—জাতির গুণীভূত অনন্ত পাপ-তাপ, মানি-মানি, ক্লেশ-দৌর্বল্যের রক্ত-বীজগুলি গ্রাস করিবার জন্ত। আচার্যদেব স্থির, গম্ভীর, নিশ্চলক; উপস্থিত সন্ন্যাসী গৃহী ভক্ত-নরনারী নীরব, নিশ্চল, গম্ভীর। সে শাস্ত অতসম্পর্শ গাম্ভীর্যে সকলের

অন্তরের অন্তস্থল পর্য্যন্ত স্পন্দিত হইতে লাগিল। কতজনের হৃদয়-বিগলিত, নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল।

সঙ্গে সঙ্গে অষ্টোত্তর শত দীপমালা উৎসগিত হইল। মনে হইতে লাগিল—সহস্র বর্ষের গ্লানি-গ্লানি-অবসাদ-দোক্সেলোর তিমিররাশির অবসানে জাতির হৃদয়ে আবার দিব্য চৈতন্যের বলক উঠিল। ভক্ত সন্ন্যাসীর প্রাণের একাগ্র প্রার্থনার আকুল উচ্ছ্বাস আচার্য্যের ত্রিপাদশব্দে নিবেদিত হইল—“হে আচার্য্য! হে নিখিল প্রাণারাম! জগত ও-জাতির কল্যাণ বিধানার্থে ভাগবত সঙ্কল্পের দেহ-বিগ্রহে বিশ্বনিয়ন্ত্রী শক্তির প্রেরণা লইয়া তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ; যুগে যুগে তোমার আশ্রিত এই দেশ, এই জাতিকে তুমিই তো আশ্বাস দিয়াছ—

“ইথং যদা যদা বাধা দানবোথা ভবিষ্যতি।

তদা তদাবতীৰ্ঘ্যাহং করিষ্যাম্যরি-সংক্ষয়ম্॥”

তুমি তো আজ আসিয়াছ; মহাশক্তি চামুণ্ডার হ্রায় আজ তুমি জাতির অশুভ, অকল্যাণ রাশিকে ধ্বংস কর, গ্রাস কর।” প্রার্থনার আবেগে ত্রীচরণে প্রণত হইতেই করুণাময় আচার্য্যের স্নেহ-প্রসারিত-বরাভয় কর সন্ন্যাসীর শিরঃস্পর্শ করিয়া আশ্বাস দান করিল।

### গুরুপূজা আরতি

দেবীপূজার মণ্ডপ হইতে নিম্নতলে গুরুপূজার আসন পর্য্যন্ত গৈরিক-বসন বিস্তৃত হইল। ভক্ত নরনারী ব্যাকুল আবেগে আসিয়া গুরুপূজার মন্দিরে সমবেত হইল। ত্রিশূলধারী সন্ন্যাসীগণ “ও হর গুরো শঙ্কর শিব! শঙ্কো!” কীৰ্ত্তনে মাতোয়ারা হইল। ছত্র শোভিল, চামর তুলিল, ব্যঞ্জনী বহিল, ত্রিশূল ঝলকিল; সমবেত নৃত্যগীতের মধ্যে আচার্য্যদেব! অর্দ্ধবাহু অর্দ্ধ সমাহিত ভাবে আসিয়া পূজার আসনে বিরাজিত।



হইলেন। অভিষেকান্তে আরতি আরম্ভ হইল। “জয় গুরু ওঁকার, জয় শিব ওঁকার” গানের সঙ্গে ত্রিশূল ও ধূপদানী হস্তে ঢাকের বাস্ত-তালে সন্ন্যাসীগণ নৃত্য সহকারে আরতি আরম্ভ করিলেন। প্রহরকাল ধরিয়া আরতি চলিল। আচার্য্যদেব মহাভাবে সমাহিত। বিরাটদেহ আজ মহাভাবাবেশে বিরাটতর হইয়াছে। মস্তকের লম্বিত জটাজাল ফুলিয়া উঠিয়াছে ; শরীরের শ্রামবর্ণ পরিবর্তিত হইয়া শ্রীমুখমণ্ডলে হিরণ্ময় জ্যোতি ভাতিয়া উঠিয়াছে। বদনকমল স্কন্ধে বাৎসল্যের পীযুষ ধারায় ঢলঢল। শাস্ত স্থির স্কন্ধে নয়নদ্বয়ে জীবকল্যাণের মহান্ সঙ্কল্প প্রতিবিম্বিত। ভক্ত নরনারীর প্রাণে আবেগ স্ততিরূপে আচার্য্যের শ্রীচরণ-কমলে গলিয়া ঝরিল।—

“তুমি মাতা চ পিতা তুমি।

তুমি বন্ধু সখা তুমি।

তুমি বিত্তা দ্রবিশং তুমি।

তুমি সর্বং মম দেবদেব।”

সমবেত শত শত ত্যাগী গৃহী নরনারীর শির একে একে আচার্য্যের শ্রীপাদপদ্মে লুটিয়া পড়িয়া অঞ্জলি নিবেদন করিতে লাগিল। আচার্য্যের স্নেহাশীষ-পূর্ণ অভয় দক্ষিণ করকমল প্রত্যেকের শির স্পর্শ পূর্বক শক্তি সঞ্চার ও তাহাদের জন্মজন্মান্তরের পাপতাপের গ্লানি মুছিয়া রূপার অমৃতে শাশ্বতী ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। ভক্তকণ্ঠে আকুল শরণাগতির আবেদন অবিরাম ঝঙ্কত হইতে লাগিল।—“ও গুরুপাদপাতি কেবলম্।”

### দেবীর আরতি ও অঞ্জলি নিবেদন

সন্ধ্যায় দেবীর বিশেষ আরতি—সে কী বিরাট সমারোহ! শত-সহস্র নরনারীর হুর্ভেজ জনতা। ঢাক-ঢোল, কাসর-ঘণ্টা, খোল-কর-

তাল এক সাথে ভীম নিনাদ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীগণ সমবেত ভাবে রুদ্রমূর্তিতে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও ধূপদানী লইয়া তাণ্ডব নৃত্যে দানবদলনী, মহিষাসুরমর্দিনী, শুভ-নিশুভ-ঘাতিনী রুদ্রাণীর প্রীতি সম্পাদন করিতে লাগিলেন। “ও হর দুর্গাশঙ্কর শিবশম্ভো” কীৰ্ত্তনরোলে ও মুহূৰ্হু হলধ্বনিতে চিত্তবৃত্তি অনন্তগতি হইয়া দেবীর লীলায় একাগ্র হইল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আরতি চলিল; নিম্পন্দ নিথর ভক্ত নরনারী সে দৃশ্যে, সে ভাবে মজিয়া মহাশক্তির উদ্দীপনায় ভরপুর হইল।

এমনি ভাবে তিনটা দিন ধরিয়া মহাপূজায় মহাভাবের অপূৰ্ণ মহোৎসব চলিল। বাস্তব জগতের বহুউর্দ্ধে যেন এক অপরূপ ভাবজগৎ রচিত হইল। সেখানে হতাশা-নৈরাশ্য, ক্রৈব্য-দৌৰ্ভাগ্য, অশান্তি-অবসাদ নাই, আছে—অনন্ত উত্তম, অফুরন্ত উৎসাহ, অনাবিল শান্তি, অসীম শক্তির স্পর্শ! শত সন্ন্যাসী গৃহী নরনারী সমন্বয়ে সমতানলয়ে চণ্ডী ও পুরাণ হইতে দেবীর স্তুতি—

“দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ।

প্রসীদ মাতর্জগতোহ খিলন্ত।

প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং।

ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরন্ত ॥” ইত্যাদি

“বাদেবী সৰ্বভূতেষু শান্তি রূপেণ সংস্থিতা।

নমস্তুস্তৈ নমস্তুস্তৈ নমস্তুস্তৈ নমো নমঃ ॥” ইত্যাদি

“সৰ্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সৰ্বার্থসাধিকে।

শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ততে ॥” ইত্যাদি

আবৃত্তি করিতে করিতে ভক্তি-গদগদ চিত্তে প্রণাম নিবেদন করিয়া “সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতা সনাতনী” বিশ্বজননীর

বক্ষঃস্থ স্তনুপায়ী শিশুর মত নির্ভরতার আবেশে স্তব্ধ হইয়া  
রহিল।

### আচার্য্যদেবের মাতৃভাব

দেবীপক্ষে মাতৃপূজার আবেদন জাতির হৃদয়ে ঘনায়িত। শারদ-  
প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে মাতৃরূপের জ্যোতিঃ,—স্নেহ-স্বকোমল বাৎসল্য-  
ধারা উচ্ছলিত। বিশ্বকল্যাণ আচার্য্যদেব আজ জগজ্জীবের প্রতি  
মাতৃভাবে মাতোয়ারা। আচার্য্যের মধ্যে আজ বিশ্বজননীর অনন্ত  
স্নেহ-বাৎসল্য উথলিয়া উঠিয়াছে। আচার্য্যের অঙ্গে অঙ্গে বিশেষতঃ  
শ্রীমুখমণ্ডলে মাতৃভাবের স্নেহ-মমতা-ক্ষেমময়ী আভা প্রদীপ্ত।

প্রার্থী নরনারীকে স্নেহ-মধুর কণ্ঠে আশ্বাস ও উপদেশ দিতেছেন ;  
স্নেহভরে আদর ও আশীর্বাদ করিতেছেন ; যে যতবার প্রণাম  
করিতেছে, তাহাকে ততবারই স্নেহে মস্তকে হস্তার্ণগপূর্বক আশীর্বাদ  
দান ও শক্তি সঞ্চার করিতেছেন। পূজা-আরতির আসনে উপবিষ্ট  
তাঁকে সকলে রাজরাজেশ্বরী বিশ্বজননীরূপে অনুভব করিতেছে ; তিনি  
অন্নপূর্ণা হইয়া নানাবিধ প্রসাদের ভাণ্ডার লইয়া বসিয়াছেন ;  
চারিদিকে উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান শত শত সন্তান তাঁহাকে ভক্তবৎসলা,  
সন্তান-স্নেহ-বিস্মলা জগদ্ধাত্রী জননীরূপে অনুভব করিয়া তদীয় স্বহস্ত-  
প্রদত্ত অঞ্জলিপূর্ণ প্রসাদ অমৃত-বোধে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে ;  
যাহারা নিকটে ছিল না, সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র তাহারা চঞ্চল চরণে ছুটিয়া  
আসিতেছে ; শিশুর গ্রায় সাগ্রহে সানন্দে হস্তপ্রসারণ করিয়া প্রসাদ  
গ্রহণ করিতেছে। বিশ্বজননীর এই অপরূপ বাৎসল্য-লীলার মন্দাকিনী-  
ধারায় স্নাত হইয়া সন্তান-সন্ততিগণ প্রত্যক্ষ দেখিতেছে—তাহারা  
একান্ত মাতৃ-স্নেহার্ভ মাতৃ-নির্ভরশীল বিশ্বজননীর ক্রোড়স্থ শিশু।

কী আনন্দ, কী নিশ্চিন্ত নির্ভরতার শান্তি, কী শিশু-হৃদয় সারল্য ;—  
না দেখিলে, না অনুভব করিলে—বলিয়া বোঝানো অসম্ভব।

শারদীয়া সপ্তমী নিশা ; চোখে নিদ্রা নাই ; কী এক অপূর্ণ  
অনুভূতিতে অন্তর ভরিয়া গিয়াছে। আকাশ-ভুবন ব্যাপী দর্শন—  
দেখিতেছি—আচার্য্যদেব জ্যোতির্ময়রূপে চতুর্দিকে আলো করিয়া বসিয়া  
আছেন—জগজ্জননী মহামায়া শ্রীশ্রীহর্গারূপে। এদৃশ্য ও অনুভূতিতে  
ভুবিয়া শিশুর ত্রায় অবিরাম ‘মা’ ‘মা’ বলিয়া অশ্রুজলে ভাসিতেছি আর  
পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করিতেছি—“সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবৈ সর্বার্থসাধিকে  
ইত্যাদি।” এই ভাবে ও দর্শনে রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রত্যুষে এইভাবে  
মাতোয়ারা হইয়া “সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে ইত্যাদি” জপ করিতে করিতে গিয়া  
আচার্য্যদেবের শ্রীচরণে প্রণাম করিলাম—দেখিলাম—সমস্ত রাত্রি যে  
দর্শনে ভুবিয়াছিলাম—সেই জগজ্জননী মূর্তি ; শ্রীহস্ত প্রসারণপূর্বক  
আশীর্বাদ করিয়া আরতি করিবার আদেশ দিলেন। সে অলৌকিক  
স্পর্শে প্রাণমন বাস্তবজগৎ হইতে এক ভাবরাজ্যে উঠিয়া গেল—  
যেখানে বিশ্বজননীরূপে আচার্য্যদেব বিরাজিত, আর আমরা অগণিত  
শিশু সন্তানসমষ্টি—তঁারই বৃকে, ক্রোড়ে, পদতলে অজস্র স্নেহামৃত-  
ধারায় অভিনিষিক্ত হইতেছি। আচার্য্যদেব পূজার আসনে অধিষ্ঠিত  
হইলেন। প্রাণের আবেগে পূজা আরতি করিয়া শিশুর ত্রায়  
নির্ভরতার ভাবে গলিয়া শ্রীপদতলে লুটিয়া পড়িলাম। আচার্য্যদেব  
সন্তানগণকে স্নেহাপ্লুত ভাবাবেশে আশীর্বাদ করিলেন। অনির্বচনীয়  
ভাবে সকলে মাতোয়ারা।

নিশীথ রাত্রি। স্মৃতিমগ্ন বিশ্বচরাচর। আচার্য্যদেব সন্তানগণসহ  
ত্রিতলের উন্মুক্ত ছাদে বিশ্রাম করিতেছেন। কেহ কেহ শ্রীমঙ্গ  
সেবা করিতেছে ; কেহ কেহ হস্তপদ স্নাহন করিতেছে ; কেহ কেহ

হাওয়া করিতেছে ; কেহ বা আচার্য্যের বৃকে মাথা রাখিয়া অঙ্গের সঙ্গে লাগিয়া রহিয়াছে । আচার্য্যদেব মাতৃভাবে সন্তান-বাৎসল্যে বিগলিত হইয়া স্নেহ-বাক্যে স্নেহমাথা স্পর্শ দ্বারা সকলকে আনন্দে ডুবাইয়া দিতেছেন । আদেশ পাইয়া গায়ক সন্ন্যাসী ভাব-বিগলিত কণ্ঠে গাহিলেন :—

“এত স্নেহ স্খাভরা অন্তর তোমার !  
তুলনা কোথায় তার সীমা কোথা তার ?  
ভাকিনি কঁাদিনি কভু, তবুতো এসেছ প্রভু  
ঘুচাতে মরম-ব্যথা নয়নেরি ধার !

ভুলে যাই বারবার,                      অপরাধী শতবার  
তবু অবিরাম ঝরে করুণা তোমার ॥  
তব স্নেহ পাশরিয়া,                      তব বাণী বিস্মরিয়া  
তব কৃপা উপেক্ষিয়া ছুটি অনিবার ।

অভিमानে দূরে রই,                      মরমে মরিয়া যাই,  
অনিমিষ স্নেহ-আঁখি কৃপা-পারাবার ॥

ও কোমল হৃদে নাথ !                      করি শত শেলাঘাত ;  
পায়ে দলে বার বার আশীষ তোমার !

এত স্নেহ-ভালোবাসা                      এত ক্ষমা এত আশা  
এত প্রেমে না গলিল এ পাষণ অন্তর ॥”

নিশীথ রাজ্যের স্নিগ্ধ নীরবতা মথিত করিয়া সেই সঙ্গীত-লহরী এক অভিনব ভাব-জগৎ সৃষ্টি করিল—যেখানে অনন্ত স্নেহ-করুণা-ঘন বিশ্বজননীরূপে আচার্য্যদেব ; আর তাঁকে ঘিরিয়া মাতৃস্নেহ-পিণাসু ব্যাকুল সন্তানবৃন্দ । শুধু প্রেম, শুধু স্নেহ, কেবল ক্ষমা ; আর প্রাণ-

ঢালা ভক্তি, তীব্র ব্যাকুলতা, নিশ্চিন্ত নির্ভরতা, একান্ত শরণাগতি।

এই অমূল্যত্বিতে বিগলিত-হৃদয় সজ্জ-কবি গাহিয়াছিলেন—

“মাতা তুমি স্নেহময়ী মূর্তি করুণার !

আশ্রিত অবোধ আমি তনয় তোমার !

তাই যুগ যুগ ধরি                      তব বক্ষ-কক্ষোপরি

তব স্নেহ-বাছ-যুগ ঘেরিয়া আমায় !

অনিবার অবিরাম                      তব বাণী অভিরাম

মনপ্রাণ পুলকিছে উল্লাসে আশায় !

স্নেহ-পক্ষপুটে তব                      আবরি পক্ষিণী সম

অতল আগ্রহভরে পালিছ আমায় !

অমৃত-নিবার সম                      তব স্নেহ-বক্ষ কম

পিয়াইয়া জিয়াইছ নিত্য শতবার ॥

চঞ্চল চরণে ছুটি                      অপথে কুপথে ছুটি

ছায়া সম পিছে পিছে তুমি অনিবার ।

কত ছলে স্নেহবলে                      টানিয়া আনিছ কোলে

ধরিব্রীরে অতিক্রমি ধীরতা তোমার !

তব স্নেহ-প্রেমধারা                      বিমল জাহ্নবী পারা

অনিমিষে পাখালিছে জীবন আমার ।

পাপ নাই তাপ নাই,                      দোষ নাই রোষ নাই,

ভুল ক্রটি—তব স্নেহে সব একাকার !

স্নেহ-সার ক্ষমা-সার                      প্রেম-প্রীতি-সার ।

তুমি মা আমার ॥”

বিভিন্ন স্থানে ছুর্গোৎসব

কাশীধামে ছুর্গোৎসব পর পর তিন বৎসর ( ১৯২৮, ১৯৩০ ) উক্ত

সোণার পুরার বাড়ীতে সম্পন্ন হয়। প্রতি বৎসর উত্তরোত্তর অধিকতর সমারোহ, প্রচুরতর জন-সমাগম, বৃহত্তর মহাভাবের বিকাশ ঘটিত। ১৯৩১ সালে ভেলপুরাঙ্কিত ‘অন্নদা ভবন’ ভাড়া নিয়া ৬দুর্গোৎসবের অহুষ্ঠান করা হয়। তৎপরে ১৯৩২ এবং ১৯৩৩ এই দুই বৎসরে যথাক্রমে আচার্য্যদেবের সঙ্কল্প অনুসারে কলিকাতা আশ্রমে ও বাজিতপুর প্রণবমঠে উক্ত পূজা অহুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৪ সালে পুনরায় “অন্নদাভবনে” ৬দুর্গোৎসব হয়। ১৯৩৫ সালে “রামাপুরা”স্থিত একটা বাড়ীতে এবং ১৯৩৬/৩৭ দুইটা সালে “দেউরিয়া বীর”স্থিত একটা বাড়ীতে ৬দুর্গোৎসব অহুষ্ঠিত হয়। তৎপরে ১৯৩৮ সাল হইতে সঙ্কল্প “কাশীতীর্থ-সেবাশ্রমের” স্থায়ী বাড়ীতে (বিদ্যাপীঠরোড, সিগরা) ৬দুর্গোৎসব অহুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

### আচার্য্যদেবের মহাপ্রকাশ

১৯৩৪ সালে “অন্নদাভবনে” ৬দুর্গোৎসবকালে আচার্য্যদেবের মহাপ্রকাশ লক্ষিত হয়; সেবার ৬দুর্গোৎসব বিরাট আকার ধারণ করিয়াছিল। আচার্য্যদেবের মধ্যে অকস্মাৎ বিরাট ভাবের উচ্ছ্বাস জাগিল। মহাষ্টমীর দিবস—সমস্ত দিন ও রাত্রি ধরিয়া পনের মিনিট, আঘঘণ্টা, একঘণ্টা অন্তর তিনি অর্ধ-সমাহিত অবস্থায় পুনঃ পুনঃ পূজা আরাতির আসনে আসিয়া বিরাজিত হইতেছিলেন। সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ সর্বক্ষণ প্রস্তুত ছিলেন। তিনি ইঙ্গিত করিতেই সকলে সংগ্রামক্ষেত্রে যুদ্ধরত সৈনিকের গ্রাঘ যথাযোগ্য স্থানে গিয়া দাঁড়াইতেন। গৈরিক বস্ত্র বিস্তৃত ও তছুপরি পাদপদ্মাসন পর পর প্রতিপদক্ষেপের স্থলে স্থাপিত হইতেছিল। উভয় পার্শ্বে পাখা, চামর ও ত্রিশূল, কুঠার, ঢাল, সড়কী প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র লইয়া সকলে দাঁড়াইল। বিবিধ দ্রব্যে অর্ঘ্য রচনা করিয়া তাহা হস্তে লইয়া ভক্তবৃন্দ ও সন্ন্যাসিগণ নৃত্যারতি করিতে

করিতে আচার্য্যকে অভ্যর্থনা করিয়া পূজার আসনে আনিতে লাগিল। শত শত ভক্তকণ্ঠে “ওঁ হরগুরো শঙ্কর শিবশঙ্কো” এবং “ওঁ জয় ওঁকার, জয় শিব ওঁকার”—কীৰ্ত্তন চলিতেছিল। ঢাক ঢোল সানাই, খোলকরতাল, শঙ্খ ঘণ্টা ইত্যাদি ভীমবাদ্য-রোলে, মুহুমূহ জয়ধ্বনি ও হুধুধ্বনিতে গগণ-মণ্ডল বিদীর্ণ হইতেছিল। শতেক ত্রিশূল, শতেক ধূপদানি, শতেক প্রদীপ করে লইয়া সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ তাণ্ডবে মাতিতেছিলেন। এইভাবে পুনঃ পুনঃ সমস্ত দিন ও রাত্রিতে অসংখ্যবার পূজারতি চলিল। আহাৰ নিদ্রার কথা ভাবিবারও ফুরত্ব ছিল না। সবাই যেন বাহ্যশূন্য-প্রায়। আচার্য্যদেব অজস্র আশীর্বাদ দিলেন। পরদিবস দিনে রাত্রিতে বহুবার সন্তানগণকে ডাকিয়া ডাকিয়া অঞ্জলি ভরিয়া প্রসাদ দিতে লাগিলেন।

### হিন্দু-সম্মেলন

১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত—জাতীয় জীবনে শক্তি-সাধনার সঙ্কল্প সঞ্চারের জন্ত ৬জুর্গোৎসব অহুষ্ঠিত হইতেছিল। ১৯৩৬ সাল হইতে আচার্য্যদেব জুর্গোৎসবটিকে “জাতিগঠনমূলক” কার্য্যকরীরূপ প্রদান করিলেন। ৬জুর্গোৎসবের তাৎপর্য্য বুঝাইবার জন্ত তিনি সঙ্কে সঙ্কে হিন্দু-সম্মেলনের আয়োজন করিলেন। তদবধি প্রতিবৎসর পূজার তিনটি দিবসে সম্মেলনের তিনটি অধিবেশন হয়। কাশীধাম-নিবাসী এবং বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও হিন্দু নেতৃগণকে উদ্যোগী করিয়া এবং প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মনীষী ব্যক্তিবর্গকে সভাপতি ও বক্তা নির্বাচন পূর্ব্বক সম্মেলন অহুষ্ঠিত হয়। “হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ” “হিন্দু সমাজের আদর্শ” “হিন্দুজাতির পুনরুত্থান” “হিন্দু সজ্জগক্তি গঠন” “হিন্দু মিলন-মন্দির ও রক্ষাদল গঠন” প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন ভাষায় বক্তৃতা, আলোচনা, প্রস্তাবাদি গৃহীত হইয়া থাকে।



হিন্দু-সম্মেলনের প্রচার জন্ত বিপুল প্রচেষ্টা চলিত। বহু সহস্র বিজ্ঞাপন—হিন্দী, বাংলা, ইংরাজীতে মুদ্রিত করিয়া সন্ন্যাসিগণ কাশী সহরে প্রচার করিতেন। প্রধান প্রধান যাবতীয় ব্যক্তিকে গৃহে গৃহে যাইয়া ব্যক্তিগত ভাবে অহরোধ করা হইত। ফলে যাহারা সভার অধিবেশনে যোগদান করিতে পারিতেন না, তাহারাও হিন্দুজাতি ও ধর্মের পুনর্জাগরণ ও পুনরভ্যুদয়ের আশা ও আশ্বাসে উদ্বীপিত হইতেন।

### দেবী প্রতিমা—হিন্দুজাতি-মাতৃকার প্রতীক

৮দুর্গোৎসবের মধ্যে হিন্দুজাতি ও সমাজের পুনর্নির্মাণ ও হিন্দু-সংহতি-শক্তি গঠনের ইঙ্গিত;—আচার্যদেব ইহার ব্যাখ্যা নিমন্ত্ৰণ-পত্রের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। উহা দ্বারা ৮দুর্গোৎসব-রহস্য এবং জাতিগঠনে উহার আবশ্যকতা হিন্দু নরনারীর হৃদয়ে জাগিতেছিল। হিন্দুজাতি মাতৃকা—শ্রীশ্রীদুর্গা; গণেশ—গণদেবতা—জাতির জন-সমষ্টি; লক্ষ্মী=ধনদেবতা—জাতির ধনশক্তি বা বৈশ্যশক্তি; সরস্বতী=জাতির জ্ঞানশক্তি—ব্রাহ্মণ্য শক্তি; কার্তিকেশ্বর—সংঘম ও ব্রহ্মচর্যের প্রতীক=জাতির ক্ষাত্রশক্তি। জ্ঞানশক্তি, রাষ্ট্রশক্তি, ধনশক্তি ও গণশক্তির সমবায়, সমন্বয়, সহযোগিতা, সমপ্রাণতা স্থাপিত হইলেই জাতীয় জীবনে মহাশক্তি মহামায়ার আবির্ভাব ও নীলাবিকাশ সম্ভব। জাতির পুনর্গঠনে উক্ত চারি শক্তির জাগরণ, গঠন, মিলন চাই।

### হিন্দুধর্ম-মহাশক্তির সাধনা

হিন্দু—মহাশক্তির পূজারী, মহাবীর্যের সাধক। হিন্দুর ধর্ম—শক্তির পূজা, বীর্যের সাধনা। যে ধর্ম শক্তিদান করে না, হিন্দুর মতে তা' অধর্ম, তা' পরিত্যজ্য; যে সাধনা সাধককে মহাবীর্যবান করে তোলে

না, হিন্দুর মতে তা ভগামি,—আত্মপ্রতারণা। হিন্দু চায়—শক্তি ও মুক্তি—ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে। হিন্দুর সিদ্ধান্ত—শক্তির বিকাশ প্রকাশ যেখানে, জ্ঞান, বিদ্যা, যশঃ, নীতি, বিজয়—সেখানে; বীৰ্য্যের সাধনা যেখানে, ঐশ্বর্য্য-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের বিকাশ প্রকাশ—সেখানেই;—যেখানে শক্তি, সেখানেই শান্তি ও মুক্তি। হিন্দু স্বীয় ধর্ম্মের এই রহস্য ভুলেছে, বীৰ্য্যের সাধনায় উদাসীন হয়েছে; তাই হিন্দুর ভীকতা-দুর্ব্বলতা, ক্লীবতা-দীনতা, জাড্য-জড়তা।

### দেবী-পূজার-রহস্য

শতবর্ষ যাবৎ স্বর্গচ্যুত, শ্রীভ্রষ্ট, শক্তিহীন দেবগণ পিতামহ ব্রহ্মার নিকট নিবেদন করিলেন—স্বর্গরাজ্যের পুনরুদ্ধারের উপায় কি? পিতামহ বলিলেন—মহাশক্তি মহামায়ার আরাধনা কর। দেবগণ জিজ্ঞাসিলেন—“মহামায়া কে? তাঁর স্বরূপ কি? কিরূপে তাঁর উৎপত্তি?” ব্রহ্মা বলিলেন—“তিনি সর্ব্বস্বরূপা—সর্ব্বভূতে শক্তি-বিভূতি রূপে অবস্থিতা; তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে তেজোবীৰ্য্য, বুদ্ধি-সকল—সেই তো তিনি। তেত্রিশ কোটি দেবতার তেজোবীৰ্য্য, বুদ্ধি-সকল জাগাও, সমন্বিত ও সম্মিলিত কর, তবেই সেই বিশ্বব্যাপিনী—সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতা, সমষ্টি-শক্তি-রূপিনী—মহামায়ার দর্শন পাবে।

দেবগণ রহস্য বুঝিলেন। তেত্রিশ কোটি দেবতার প্রাণে তখন স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধারার্থ সম্মিলিত সজ্জবদ্ধ হওয়ার তীব্র সঙ্কল্প জাগ্রত হলো। সেই সঙ্কল্পের তেজঃ একত্র মিলিত হলে, তার মধ্যে আবির্ভূত হইলেন—অপরূপা মহামায়া শ্রীশ্রীভূগা। ফলে দেবদৈত্যের সংগ্রামে—দেবগণ বিজয়ী হলেন।

### দেবী-প্রতিমার জাতিগঠনের ইঙ্গিত

পূর্ত-বিজ্ঞাবিশারদ ( Engineer ) যেমন বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণের জন্য প্রথমে ক্ষুদ্রাকারে একটি পরিকল্পনা-চিত্র ( Plan ) প্রস্তুত করে ; তেমনি যে মহাশক্তি সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারিণী রূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্তা, মানুষ ক্ষুদ্র মনোবুদ্ধি দিয়ে সে বিশ্বরূপের ধারণায় অসমর্থ। তাই ক্ষুদ্রাকারে প্রতিমা নির্মাণ করে মহাশক্তির বিশ্বব্যাপিনী লীলাকে ধারণা করিবার সুযোগ শাস্ত্রে নির্দেশ করিয়াছে। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় হিন্দুজাতি আজ দেবী-প্রতিমায় এই বিশ্বব্যাপিনী শক্তির লীলার ইঙ্গিত লক্ষ্য করে না। ফলে তার পূজা আজ পুতুল-পূজায় পরিণত হয়েছে। তাই মাটির প্রতিমার বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে—তার সঙ্কল ও সাধনার বিসর্জন।

প্রতিমার মধ্যে মহামায়ার লীলার ইঙ্গিত ; মহামায়ার রূপ ও লীলার মধ্যে হিন্দুর জাতিগঠনের ইঙ্গিত,—হিন্দুকে আজ তা' নতন করে ধ্যান করতে হবে। প্রত্যেক জীবের মধ্যে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিসমূহ একত্র সম্মিলিত হলে, সেই সমষ্টিশক্তিরূপিণী মহামায়ার ষথার্থ স্বরূপ প্রত্যক্ষ হয়। তেত্রিশ কোটি দেবতার সঙ্কল-শক্তি যখন একত্র সম্মিলিত হয়েছিল, তখনই মহামায়া শ্রীশ্রীদুর্গা স্বরূপে আবির্ভূতা হন। ত্রিশ কোটি হিন্দুর সঙ্কল-শক্তি—জাতির উপর অহুষ্ঠিত অবিচার-অগ্রায়-অত্যাচারের অবসান-কামনায় যদি সম্মিলিত হয়, তখনই হিন্দুজাতির মধ্যে আবির্ভূতা হবেন—অস্বরনাশিনী শ্রীশ্রীদুর্গা।

### দেবীপূজায় চাই কি ?

শুধু পুণ্য-বিষপত্রের অর্ঘ্য ও বিবিধ ব্যঞ্জনের নৈবেদ্য সাজিয়ে—অহুতাপ-অশ্রদ্ধল-কাকূতি-মিনতিতে মহাশক্তির প্রসন্নতা হয় না। দেবী—অস্বরনাশিনী ; তাই তাঁর পূজায় চাই—হিন্দু নরনারীর জন্মে

অস্থর-নাশের অটুট সঙ্কল্প—অগ্নায়-অবিচার-অত্যাচারের প্রতিবাদ ও প্রতিকারের প্রবল প্রচেষ্টা। **দেবী—মহাবীৰ্য্যরূপিনী** ; তাই তাঁর পূজায় চাই—আত্মশক্তির উদ্বোধন, বিকাশ, প্রকাশ—আত্মরক্ষার্থ হিন্দু নরনারীকে শক্তি ও কৌশল অৰ্জনপূৰ্বক অত্যাচারের প্রতীকারে উদ্যত থাকা। **দেবী—সমষ্টিশক্তিরূপিনী** ; তাই চাই—হিন্দু-সমাজের অন্তর্গত সর্বশ্রেণীর নরনারীকে সম্মিলিত ও সম্বন্ধ করা ; সমগ্র হিন্দু-জন-সমষ্টির মিলন ও সংহতির ফলে যে বিরাট **জাতি-প্রতিমা** গঠিত হবে—তাতে আবির্ভূত হবেন—মহাবীৰ্য্যময়ী, দানবদলনী—**শ্রীশ্রীহর্গা**। **দেবী—অস্ত্রশস্ত্র সূক্ষ্মজ্ঞিতা—সংগ্রামরতা** ; তাই দেবী পূজায় চাই—অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা—শেল-শূল-পরশু-পট্টিশ-গদা-চক্র-ধড়গ-কুঠার ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্রের যুদ্ধ ক্রীড়ার দ্বারা দেবীর আরতি এবং আত্মরক্ষার্থ প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর ক্ষাত্রবীৰ্য্যের অনুশীলন।

### শুধু ফুলে পূজা নেবো না এবার

দেবী পূজার উক্ত রহস্য আলোচনা প্রসঙ্গে আচার্য্যদেব একদা সমবেত সজ্জ-সম্মানগণকে বলিতেছেন—“এবার শুধু ফুলের পূজায় হবে না ; বীৰ্য্যের পূজা চাই। যে দেবতার যে ভাব, যে লীলা, যে অস্ত্রশস্ত্র, তাই দিয়ে পূজা করলে, তবে সেই দেবতার শক্তি ও আশীর্ব্বাদ লাভ ঘটে। শিবের প্রীতি—ত্রিশূলে, শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতি—ধনুর্বাণে ; শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা—সুদর্শনে ; দশভূজা দুর্গার প্রীতি—দশপ্রহরণে।” আচার্য্যদেবের এই অগ্নিগর্ভ বাণী ও বীৰ্য্যের প্রেরণা সজ্জ-কবির হৃদয়ে বাণী-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে তাহা “সজ্জবিষাণ” কবিতা গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। এখানে তাহার শেষ কলিটা দেওয়া হইল :—

যত পূজা তুমি করেছ হিন্দু পড়ে নাই মোর পায়,

হীনবীৰ্য্যের ক্লীবতার পূজা স্বীকার করিনা তায় ।

অত্যাচারের প্রতিরোধে যবে

ভীম প্রতিজ্ঞা লও যদি সবে

সেই দিনে তব প্রার্থনা-ধ্বনি পশিবে আমার কাণে ।

শুধু ফুলে পূজা নেবোনা এবার কাতর কাকুতি গানে ॥

### বিজ্ঞান সন্মেলন

কাশীধামে বিজ্ঞান দশমীতে দেবীপ্রতিমার বিসর্জনের দৃশ্য অপূর্ব, অতুলনীয় । অর্ধচন্দ্রাকৃতি পতিতপাবনী জাহ্নবীর ক্রোশব্যাপী তীরে লক্ষ লক্ষ ভক্ত নরনারীর সমাবেশ । গঙ্গা-গর্ভেও অসংখ্য নৌকায় অসংখ্য নরনারী । বহু দেবী-প্রতিমা বিসর্জনোদ্দেশ্যে ঘাটে ঘাটে স্তব্ধজিত । বাদ্য-সমারোহের সহিত দেবীর আরতি চলিতেছে ; তীরস্থ লক্ষ লক্ষ নরনারী নিঃশেষ নয়নে দেখিতেছে । ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত সন্ত্দের ৬৬২গোঁসবে বিসর্জনের সমারোহ ছিল না । ১৯৩৬ সাল হইতে আচার্য্যদেবের অভিপ্রায়ানুসারে মহা ধুমধামে বিসর্জন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে ।

দেবী-প্রতিমা সহ বিজ্ঞানর শোভাযাত্রা । স্তব্ধজিত মোটর গাড়ীতে আচার্য্যদেব সমাসীন ; প্রসন্ন গম্ভীর মূর্তি ; পুষ্পমাল্যে সমগ্র কলেবর আবৃতপ্রায় ; দক্ষিণকরে সম্মুখ স্বর্ণবর্ণ ত্রিশূল অন্তায়মান সৌরকরে ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলিতেছে । উত্তরপার্শ্বে ও পশ্চাতে শতশত সন্ন্যাসী ও গৃহীসন্তান ও সমবেত ভক্তবৃন্দ । শিরোপরি রাজহুত্র ; চামর হুলিতেছে, ব্যজনী বহিতেছে, ধূপদানী ঘুরিতেছে, শতশত হস্তে ত্রিশূল, দণ্ড, তরবারী, ঢাল, সড়কী, খড়্গ, রামদা ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র ভীমবেগে আফালিত হইয়া দর্শকগণের প্রাণে যুগপৎ ভয় ও বীৰ্য্য সঞ্চার করিতেছে । ঢাক-টোল-

ব্যাণ্ডের তুমুল নিনাদের সহিত—“ওঁ হর দুর্গাশঙ্কর শিব শঙ্কো”—কীৰ্ত্তন-রোলে দিগ্দিগন্ত কম্পিত হইতেছে। সম্মুখে বাহকগণ স্বক্কে দেবী-প্রতিমা; বালক ও যুবকগণ ধূপদানি ও অস্ত্রশস্ত্র করে নৃত্য আরতি করিতে করিতে চলিতেছে। শোভাযাত্রা স্থানে স্থানে অপেক্ষা করিতেছে; তখন রক্ষীবাহিনী নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র-ক্রীড়া প্রদর্শন করিতেছে। অবিরাম বাঁদ্যোদ্যম ও জয়ধ্বনির মধ্যে দেবীপ্রতিমা ও আচার্য্যদেব সহ শোভাযাত্রা দশাশ্বমেধ ঘাটে পৌছিল।

একখানি নৌকায় শতাধিক সন্ন্যাসি-পরিবৃত আচার্য্যদেব সিংহাসনে বিরাজিত, শিরোপরি রাজছত্র। মধ্যখানিতে দেবী-প্রতিমা; তৃতীয়খানিতে ভক্ত নরনারী। তীরস্থ লক্ষ লক্ষ দর্শকের সাগ্রহ একাগ্র দৃষ্টি সন্ন্যাসি-মণ্ডলী-পরিবৃত আচার্য্যদেবের প্রতি। শত শত নরনারী প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ গ্রহণ করিল। যাহারা অগ্রসর হইতে পারিল না, তাহারা দূর হইতে প্রণাম করিল। দেবীপ্রতিমার সম্মুখে সন্ন্যাসী ও সেবকগণ ধূপদানী ও বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আরতি-নৃত্য ও বিবিধ যুদ্ধক্রীড়া প্রদর্শন করিতে লাগিল। দর্শকবৃন্দ ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া রহিল। সৰ্ব্বশেষে বিসর্জনান্তে আচার্য্যদেবের আরতি হইল। আচার্য্যদেব সকলকে অজস্র আশীর্বাদে আপ্ত করিয়া দিলেন। কাশীধামে জাহ্নবীবক্ষে এ অপাখিবদৃশ্য যে দেখিয়াছে, সেইই সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছে—স্বয়ং বিশ্বনাথ সপরিকরে আবির্ভূত হইয়াছেন।\*

---

\* জনৈক সন্ন্যাসীর দর্শনানুভূতির বিবরণ—“১৯২৬ খৃষ্টাব্দ মাঘী পূর্ণিমায় দীক্ষা গ্রহণান্তে মাদারিপুর আশ্রমে আসিয়াছি। একটা আশ্রমবৃক্ষতলে বেদী বাঁধাইয়া সমস্ত রাত্রি তথায় বসিয়া জপ ধ্যান করি।

নৌকার উপর “মাইক্রোকোন ও লাউড্‌স্পীকার” খাটাইয়া অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ টা পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম ও সমাজ এবং দেবীপূজার রহস্য বিষয়ক বক্তৃতা এবং ধর্ম ও জাতীয়তার প্রেরণামূলক সঙ্গীত চলিতেছিল। লক্ষলক্ষ হিন্দু নরনারীর প্রাণে নূতন নূতন ভাব, নূতন আদর্শ, অভিনব আশা ও আশ্বাস জাগিল। সন্ন্যাসী ও স্বেচ্ছকর্ম্মের অঙ্গশস্ত্র ক্রীড়া ও বীরত্ব দেখিয়া দর্শক নরনারীর প্রাণে বীরত্ব ও তেজস্বিতার সঞ্চার হইতেছিল।

### শ্রীশ্রীপ্রণবমঠে ৮দুর্গোৎসব ও মহাপ্রকাশ

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে আচার্যদেবের দেহ মারাণ্ডক পৃষ্ঠভ্রণ রোগে শয্যাগত থাকায় কাশীধামের পরিবর্তে কলিকাতায় দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয় ; রোগশয্যায় অবস্থানকালীন আচার্যদেব সঙ্কল্প করেন—পর বৎসর

ক্রমে শিবরাত্রি আসিল। রাত্রিতে বেদীর উপর বসিয়া জপ ধ্যান করিতেছি ; হঠাৎ যেন বাহুবোধ হারাইয়া ফেলিলাম ; এক অদ্ভুত দর্শনে ডুবিয়া গেলাম। দেখিতেছি—একটি আলোর রাস্তা কাশীধামের ৮বিশ্বনাথের মন্দির হইতে বরাবর মাদারিপুর নূতন আশ্রমের আচার্য-নিবাস পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। আমি যেখানে ধ্যান করিতেছি রাস্তাটা তার পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। একটু পরেই দেখি অন্নপূর্ণা-মন্দিরের উপরতলে ( যেখানে সোনার অন্নপূর্ণা বিরাজ করেন ) দাঁড়াইয়া “রক্ত-গিরিসমিভ” শুভ্রোজ্জ্বল জ্যোতির্বিভূতি বিপুল-কলেবর মহাদেব। মস্তকে পাটলবর্ণ জটাজাল চূড়ার আকারে নিবদ্ধ ; তন্মধ্যে গঙ্গা বিরাজিতা ; পরিধানে আজাহুলস্বিত ব্যাস চর্ম্ম ; আকর্গ-বিশ্রান্ত নয়নযুগল অর্দ্ধনিম্নলিত ; প্রসন্ন হাস্যে দর্শনকচি-কৌমুদী দ্বিধা প্রকাশিত। তিনি ধীরে ধীরে অর্দ্ধবাহুভাবে আলোর রাস্তায় তুলিতে তুলিতে অগ্রসর হইতেছেন ; আসিতে আসিতে আমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া আমার

বাজিতপুরে শ্রীশ্রীপ্রণবমঠে ৬জুগোৎসব সম্মেলন সম্পন্ন করিবেন। তদনুযায়ী ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বিভিন্ন আশ্রমে কর্মরত সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারি-সেবকগণ এবং বিভিন্ন প্রদেশে প্রচার-নিরত আটটি “চারণ-দল দল”—বাজিতপুরে প্রণবমঠে আসিয়া মিলিত হইলেন। সজ্জ্বর বহু ভক্ত-শিষ্যও যোগদান করিলেন। একটা বৎসরে আচার্য্যদেবের শরীর অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। পূজার কিছুদিন পূর্বেই তিনি সন্তানগণকে বাজিতপুরে পৌছিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

বাজিতপুর আচার্য্যের জন্মভূমি, তপোভূমি, সিদ্ধপীঠ। স্বতরাং আচার্য্যদেব বাজিতপুর মঠে আসিলেই স্বীয় স্বাভাবিক ভাবে অবস্থান করিতে পারেন। অগ্রাগ্র স্থানে নানা ভূমিকায় গুরুরূপে, নেতাক্রপে, তাঁহাকে বহু সামাজিক ভাব ও ভাব্যতা নিয়া সমাজের বহুবিধ লোকের সহিত মিলামিশা করিতে হয়। কিন্তু মঠে আসিলে—সে বালাই নাই। বালকের মত সরলভাবে গ্রামের সর্বশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানগণের সহিত ঘরোয়া ভাবে কথাবার্তা, কাজকর্ম করিয়া যেন তাহাদের একান্ত নিজস্ব ‘সাধু’ বা ‘মহারাজ’ হইয়া যান। তাই মঠে আসিয়া সন্তানগণকে নিয়া আচার্য্যদেব স্নেহ-প্রীতি-বাৎসল্যের মন্ডাকিনী বহাইলেন।

প্রায় প্রতিদিন অধিকাংশ সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারি-সেবকগণকে লইয়া “কাণ্ডারী” নামক সুবৃহৎ নৌকাযোগে নদীতে কিছুকাল পরিভ্রমণ

প্রতি চাহিয়া মধুর হাস্য করিলেন; পরে অগ্রসর হইয়া আচার্য্য-নিবাসের গৃহকুটিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পর বৎসর ৮শিখরাদ্বিতেও দর্শন করিলাম—অনন্ত আকাশে বিরোট পূর্ণিমার চন্দ্র তন্ন্যখে ঔকার-মণ্ডিত সজ্জনেতা আচার্য্যরূপে—আপ্ততোষ মহাদেব। এই দুই দর্শনের স্মৃতি আজ পর্য্যন্ত তেমনি জাজ্জল্যমান ভাবে হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে।”



করিতেন। নৌকার উপরিতলে মন্দিরঘরে পূজারতি হইত। উন্মুক্ত কুমারনদ-বক্ষে সে উৎসব সত্যই হৃদয়ানন্দ-কর। পূজাস্তে ভোগাবশিষ্ট প্রসাদের ভাণ্ডার লইয়া সমবেত সন্তানগণকে স্নেহ তত্ত্বাবধানে সম্মুখে বসাইয়া ভোজন করাইতেন। সজ্ব-সন্তানগণও শিশুর গ্রায় আচার্য্য-দেবেন্ন সহিত নদীর জলে ঝাঁপাইয়া, ডুবাইয়া, সাঁতরাইয়া হাস্যলাপে আনন্দের হাট বসাইত; তৎপরে শিশুর মত আনন্দে মাতিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিত।

কদাচ আচার্য্যদেব সকল সন্তানগণকে নিয়া আসন্ন পূজা-উৎসবের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্য্য করাইতেন। বহু হিন্দু মুসলমান কৃষাণ, মুটে, মজুর, মিস্ত্রি লইয়া কাজ করাইতেছেন। লাটিমের গ্রায় অবিশ্রান্ত ক্রতপদে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাটাকাটানো, জমিছাঁটানো, ঘর তৈয়ারী করানো, কাঠ ফাড়ানো, বেড়া লাগানো প্রভৃতি বহুবিধ কার্য্য নিজস্ব-তত্ত্বাবধানে করাইতেন। এই সব কাজের মধ্য দিয়া তাঁর এক এক টুকরা হাসি বা উৎসাহবাক্য বা সন্মোদনবাক্য সকলের প্রাণে আনন্দের উচ্ছ্বাস বহাইয়া দিত। আচার্য্যের সম্মুখে কাজ করিতে কোনদিন কেহ শ্রান্তি বা ক্লান্তি বোধ করিত না। তাঁহার স্নিগ্ধ, করুণ, প্রসন্ন দৃষ্টি, স্মিত হাসি, মধুর বাক্য স্বমিষ্ট সন্মোদন—শারীরিক, মানসিক সমুদয় গ্লানি গ্লানি মুছিয়া দিত।

সিদ্ধপীঠমন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে দেবীপ্রতিমা স্থাপন পূর্ব্বক পূজার আয়োজন করা হইল। পার্শ্ববর্তী নাটমন্দিরের রাজমঞ্চের উপর শ্রীশ্রীগুরুপূজার আসন স্থাপন পূর্ব্বক পূজা আরতির আয়োজন করা হইল। এতদ্ভিন্ন আচার্য্যদেবের অগ্রাগ্র পীঠটী সিদ্ধাসনে—(গুহা, ধুনী, অভিষেক মঞ্চ, তপোবন ও প্রণবকানন)—আচার্য্যের পূজার আসন সুসজ্জিত হইল। পূর্ব্ব হইতেই সজ্ব-সন্তানগণ ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের যাবতীয় নদনদী ও তীর্থস্থান হইতে অভিষেকবারি সংগ্রহ করিয়াছেন। সিদ্ধ-

পীঠে আসিয়া সকলেই যেন এক মহাভাবের, এক অপরূপ আনন্দের রাজ্যে নিয়ত বাস করিতেছে।

পূজা আরম্ভ হইল। সর্বশ্রেণীর হিন্দু আসিয়া সমবেত ভাবে অঞ্জলি প্রদান, আশীর্বাদ ও প্রসাদ গ্রহণ করিল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তিলি, মালী, নমশূদ্র, ঋষি—সকলের সমান দাবী, সমান অধিকার, সমান মর্যাদা মঠের সর্ববিধ অমুষ্ঠানে; সমান স্নেহ-প্রীতি-আদর আচার্য্যের নিকট। শত শত সন্ন্যাসী ও গৃহীর সমবেত চণ্ডীপাঠে, অঞ্জলিমন্ত্রের আবৃত্তিতে ও প্রার্থনায়; দিবারাত্র ভজনে, কীর্ত্তনে, পূজা আরতিতে, প্রসাদ-বিতরণে আনন্দের প্লাবন বহিল। দেবীর আরতিতে সন্তানগণ ভাবোন্মত্ত হইলেন। মহাবীর্ঘ্যের ভাবে মাতোয়ারা হইয়া বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া নৃত্য আরতিতে এক রুদ্র-মধুর ভাবের আবহাওয়া সৃষ্ট হইল।

সিদ্ধপীঠে আচার্য্যদেব পরিপূর্ণ তপঃশক্তি ও মহাভাবের প্রকাশ ঘটিল। একদিকে দেবীর মহাভিষেক—নদনদী-হ্রদ-নিবাস-মাগরাদির এবং সর্বতীর্থের পবিত্র বারিতে; অপরদিকে আচার্য্যদেবের মহাভিষেক অষ্টোত্তর শত তীর্থের বারিতে। আচার্য্যদেব মহাভাবে সমাহিত হইয়া অভিষেক-মঞ্চে সমাসীন। ভক্ত সন্ন্যাসি-গৃহী কণ্ঠে “মঙ্গল আশীষে মঙ্গল ধারা বহিয়া পড়িছে আজি” ইত্যাদি অভিষেক গীত; নারীকণ্ঠে ঝাঁকে ঝাঁকে হলুধরনি। পুরুষ ভক্তগণ মাথায়, নারী ভক্তগণ কাঁধে তীর্থবারিপূর্ণ কলসী লইয়া “ওঁ সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষাঃ সহস্রাক্ষাঃ সহস্রপাং” ইত্যাদি মন্ত্র আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে ঢালিয়া দিলেন। পঞ্চাশটি ঢাক এক সঙ্গে গর্জ্জন করিয়া উঠিল; খোল, করতাল, কাংস, ঘণ্টা একসঙ্গে তুমুল নিনাদ করিতে লাগিল; নারীকণ্ঠের অবিরাম হলুধরনি পড়িতে লাগিল। অভিষেকান্তে আচার্য্যদেব রাজ্যমঞ্চে সিংহাসনে সমাসীন হইলে মহাসমারোহে গুরুপূজা ও

আরতি আরম্ভ হইল। শত ধূপদানী শত সন্ন্যাসীর করে ঘুরিতেছে ; শতদীপমালা শ্রীপাদপদ্ম আলোকিত করিতেছে ; রক্ত-কোকনদ পরে রক্ততল শ্রীপাদপদ্ম ; শিরে রাজহুত্র, চতুর্দিকে বাজনরত চামর পাখা প্রভৃতি ; শতহস্তে শত ত্রিশূলের খেলা। পুষ্পমালায় বিভূষিত হইয়া আচার্য্যদেব পূজা আরতি গ্রহণ পূর্বক অজস্র আশীর্বাদ করিলেন। সজ্জ-সন্তানগণ পূজা আরতিতে আত্মহারা হইয়া গেলেন।\*

আচার্য্যদেব মন্দিরে প্রবেশ পূর্বক ভোগের আসনে বসিলেন। অল্পকূট ভোগ! ভক্ত সন্ন্যাসী ও গৃহীর প্রাণের আবেগ ও ভক্তিতে প্রস্তুত নানাবিধ ভোগ-দ্রব্য-সস্তার স্তরে স্তরে মন্দিরের মধ্যে স্তম্ভিত। আচার্য্যদেব সমস্ত দ্রব্যই একটু একটু করিয়া গ্রহণ করিলেন। উৎস মহাষ্টমীর দিবস প্রত্যুষে যাবতীয় সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরনারী ও সেবকগণের আরতি গ্রহণ ; একাদিক্রমে চারি পাঁচ ঘণ্টা আরতির আসনে বসিয়া ; আচার্য্যদেবের এবার কৃপার বাধ যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যতবার প্রণাম, ততবার আশীর্বাদ। সিদ্ধপীঠে আচার্য্যদেব কল্পতরু হইয়া বসিয়াছেন।

বিভিন্ন সিদ্ধাসনে বসিয়া আচার্য্যদেব আরতি গ্রহণ পূর্বক আশীর্বাদ দান ও শক্তি সঞ্চার করিতে লাগিলেন। ধূনির সিদ্ধাসনে, গুহার মধ্যস্থ সিদ্ধাসনে, মন্দিরের সিদ্ধপীঠে আরতি হইল। কীর্তনে, ভজনে, গানে, জয়ধ্বনিতে তিনদিন তিনরাত্রি মঠ জমজমাট হইয়া রহিল। প্রত্যেক সিদ্ধাসনে বসিয়া আচার্য্যদেব সমবেত নরনারীকে অজস্র আশীর্বাদ দান করিলেন।

---

\* জর্নৈক সন্ন্যাসী এই সময়কার অমুভূতি সঙ্ক্ষে বলেন—“পূজার কয়েকদিন—আচার্য্যদেব আমাকে অদ্ভুত ভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি যেন সন্তানবৎসলা মাতা, আমি যেন দুগ্ধ-পোষ্য

বিজয়া দশমীতে আচার্যদেব সমস্ত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, সেবক, ভক্তগণ সহ “কাণ্ডারী” ও আরও কয়েকখানি নৌকার চাপিয়া জলিরপারে মেলায় উপস্থিত হন। তথায় অৰ্দ্ধলক্ষাধিক নমশূত্রের সম্মেলন। “নৌকা বাইচ্,” “ঢাল সড়কীর” খেলা হইতেছিল। আচার্যদেবের বাহিনী পৌছিলে তথায় বিরাট উৎসাহের বজ্রা বহিল। দলে দলে নরনারী আসিয়া দর্শন, প্রণাম ও আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। আচার্যদেবের আনন্দের সীমা নাই। জলিরপারে যজ্ঞ, বক্তৃতা, প্রসাদ বিতরণ হইল।

কোজাগর পূর্ণিমায় আচার্যদেব পুনরায় “কাণ্ডারী”তে অভিযান করিলেন—“বাঘিয়ার বিলে”—লক্ষ নমশূত্রের বিরাট সম্মেলনে। সেখানেও “নৌকা বাইচ্” ও “ঢাল সড়কীর” খেলা চলিল। বক্তৃতা ও পূজা আরতি হইল। সহস্র সহস্র লোক যারা আচার্যদেবের নাম মাত্র শুনিয়াছে, কখনো দেখে নাই, দেখিবার আশাও করে নাই; তাহারা আচার্যদেবকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। দলে দলে আসিয়া দর্শন প্রণাম পূর্বক আশ্বাস ও আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইল।

এইরূপে আচার্যদেব সিদ্ধপীঠে শক্তিপূজাকে উপলক্ষ্য করিয়া মহাশক্তির সঙ্কল্প ও প্রেরণার উদ্বোধন ও সঞ্চাল করিলেন। দুইটী বৎসর পরেই (১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে) সেই সঙ্কল্পের বীজ অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল—সে পরিচয় আলোচনা প্রসঙ্গে পাইব।

শিও; যেন অকল ধরিয়া সাধে সাধে ঘুরিতেছি। আরতির সময় মনে হইতে লাগিল—আচার্যদেবের মধ্য হইতে একটা প্রবল শক্তি-স্রোত আমার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। আমি যেন আত্মহারা হইয়া গেলাম।” এই ঘটনার দিন হইতে সন্ন্যাসী কয়েক দিবস বাহ্যতঃ অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিলেন।

## আচার্যের কায়কল্প

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের শেষ ভাগে আচার্যদেবের শরীর গুরুতর পৃষ্ঠভ্রণ \* ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে। জীবনে আচার্যদেব বহু গুরুতর ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছেন এবং আরোগ্য লাভ পূৰ্ব্বক স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু এই বার ব্যাধির বিশেষত্ব এই যে এবার আচার্যের দেহ ধারণের সক্ষম চলিয়া গিয়াছিল। তিনি এই সময়ে একদিন সমবেত সন্ন্যাসীগণকে বলিয়াছিলেন।

“যত গুরুতর ব্যাধি হোক না কেন দেহ ধারণের সক্ষম-বলে সব ফুৎকারে উড়ে গেছে ; এবার যে সেই সক্ষম নেই। আমার যদি দেহ ধারণের ইচ্ছা না থাকে, ডাক্তার বেটে খাওয়ালেও কিছু হবে না।”

সন্দের কোনো বিশেষ কার্যের জন্য ১৯৩২ সালের জুন মাসে আচার্যদেব কয়েকদিনের জন্য কাশী ও বিষ্ণুচল যাইতে বাধ্য হন। সেবার অত্যধিক গরম পড়িয়াছিল। আচার্যের শরীর পূৰ্ব্ব হইতেই

---

\* এই ব্যাধির অপ্রত্যক্ষ কারণ বাহ্যাই থাকুক—প্রত্যক্ষ কারণ ছিল—একটা ব্যাধিগ্রস্ত বালকের মাতার করুণ ক্রন্দনে বিচলিত হইয়া বালকের কুষ্ঠ জাতীয় ব্যাধি স্বীয় শরীরে গ্রহণ ; আমরা সে জীলোকটাকে সপুত্র কয়েকবার আচার্যের নিকট আসিতে দেখিয়াছি। কয়েকবার নিবেদন করা সত্ত্বেও আচার্য স্বয়ং উহাদিগকে ডাকিয়া কাছে নিয়াছেন

পীড়িত ছিল; গ্রীষ্মে কলিকাতাতেই অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল। সেই অবস্থায় কাশী ও বিদ্যাচলের অসহ্য গরম এবং পথ-ভ্রমণ-অনিষ্ট-ভ্রম ও ক্লান্তিতে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলে দেখা গেল মাথায় ইতস্ততঃ এবং ঘাড়ে পিঠে কতকগুলি যন্ত্রণাদায়ক বিস্ফোটক উঠিয়াছে এবং তজ্জনিত অল্প অল্প জ্বর ও মাথায় অত্যন্ত যন্ত্রণা। ডাক্তার ডাকিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার কথা উঠিল। কিন্তু কার্যতঃ হইয়া উঠিল না। রথযাত্রা অদূরবর্তী; এই সময়ে প্রতি বৎসর জগন্নাথধামে সমবেত অগণিত নরনারী নানা প্রদেশ হইতে প্রাণে ভক্তি-ভাব ও প্রার্থনা-আকাজ্জা নিয়া ছুটিয়া আসে; তাহাদিগকে আচার্যদেব যথাযোগ্য দর্শন, উপদেশ, সাধন ও আশীর্বাদ দান করেন। জীবকল্যাণ-ব্রত আচার্যের করণ অন্তরে সেই প্রেরণা দুর্জয় হইয়া উঠিল। চিকিৎসার ব্যবস্থা পড়িয়া রহিল, তিনি সদল বলে চলিলেন—পুরীধামে; বলিলেন—এসে যা হয় করা যাবে।

পুরীধামে গিয়া তাঁহার শরীরের অবস্থা ক্রমশঃ ধারাপ হইতে লাগিল; বিস্ফোটক গুলি বড় ও অধিকতর যন্ত্রণা-দায়ক হইয়া উঠিল; জ্বরও ক্রমে বেশী হইতেছিল; সন্ন্যাসী সন্তানগণের উদ্বেগও বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্তু আচার্যদেব পুরীধামে পদার্পণ করিয়াই ব্যাধির বিষয় সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। আহার ও বিশ্রামে উদাসীন হইয়া নানাবিধ কার্যে এবং সমাগত অগণিত নরনারীকে দর্শন, উপদেশ, সাধন ও আশীর্বাদ দানে ব্যাপৃত রহিলেন। অধিক রাজিতে যখন অবসর দেহ-ভার শব্দ্যার ঢালিয়া দিতেন, তখনই সেবক সন্ন্যাসিগণ বুঝিতেন—শরীরের অবস্থা কিরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে। দেহ-জ্ঞান-হীন আচার্য কোনো সঙ্কল্প হইতে কদাচ বিচলিত হন নাই।

এরনি তাঁকে সন্তোহ কাল কাটিয়া গেল। স্বল্প সমাপনান্তে আচার্যদেব সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। অতি কষ্টে তাঁহাকে কলিকাতায় কিরাইয়া আনা হইল। ডাক্তার ডাকা হইল। তাহার। আসিয়া দেখিলেন—মাথার বাবড়ীয় স্ফোটকগুলির বিষ কেন্দ্রীভূত হইয়া পৃষ্ঠদেশের উপরি ভাগে মেরুদণ্ডের গায়ে বামপার্শ্বে একটা স্নুবুৎ পৃষ্ঠত্রণ (Carbuncle) দেখা দিয়াছে। চিকিৎসকগণ আতঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। উপযুক্তরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার জন্য কলিকাতার কেন্দ্র স্থলে বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় আচার্যদেবকে নিবাস পরামর্শ দিলেন। কারণ চিকিৎসকগণের বাস কলিকাতায়; বালিগঞ্জের আশ্রমে প্রত্যহ হু'তিনবার অথবা আবশ্যক মত যখন তখন যাওয়া আসা অসম্ভব। আচার্যদেবের নিকট অল্পমতি প্রার্থনা করিলে তিনি নিজস্ব কোনো মত না দিয়া “তোমরা যা” ভালো বোঝো কর।” বলিয়া নীরব রহিলেন। বাড়ীভাড়া করিয়া (ভবানী দত্ত লেনে) তাঁহাকে তথায় নেওয়া হইল। সন্ন্যাসী সন্তানগণ অনেকেই সঙ্গে রহিলেন, সেবা-শুক্রবার জন্ত। ডাঃ নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ডাঃ সত্য-রঞ্জন সেন প্রথমে চিকিৎসা আরম্ভ করেন; পরে ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেন ও ডাঃ ললিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যোগদান করেন। দিবা রাত্রি চিকিৎসার বহুবিধ কসূর চলিল। চিকিৎসকগণও আন্তরিকতা ও ভক্তিভাবের \* সহিত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। এই ভাবে এক

---

\* ডাঃ সত্যরঞ্জন সেন প্রত্যহ রোগ-পরীক্ষাদি সমাপনান্তে বিদায় গ্রহণ কালে আচার্যদেবের চরণে প্রণত হইলে তিনি স্নেহে আশীর্বাদ করিতেন; সত্যাব্যু শিশু-স্থলভ সরলতার সহিত বলিতেন—“মহারাজ! আপনার ব্যাধি আপনিই কৃপা করে ভাল করে নিয়া!”

মাস কাটিল; দিবারাত্রি রোগের বহুশয্য তিনি ছুটুকই করিতেছিলেন। বিরাট শরীর জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িল। ব্যাধির কিছুমাত্রও উপশম হইতেছে না দেখিয়া চিকিৎসকগণও বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

একদিন সন্ধ্যায় যখন বয়স্ক সরাসী সন্তানগণ সকলে আচার্যের শয্যাপার্শ্বে বিষন্ন মনে গুপ্তস্বায় রত, তখন অকস্মাৎ তিনি সকলকে আহ্বান পূর্বক বলিলেন—

“দেখ, একটা কথা তোমাদেরকে না বলা আমার অশ্রায় হুবে; সুতরাং বলে রাখছি—এবার আমার শরীর ধারণের কোনো সঙ্কল্প আসছে না। পূর্বের যত বড় বড় ব্যাধি হয়েছে, শরীর ধারণের সঙ্কল্প থাকায়, সে সব ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছি। আমার যদি শরীর ধারণের সঙ্কল্প না থাকে, তবে ডাক্তার কি করবে! আমাকে তোরা কোথায় এনে রেখেছিস? আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি—এটা ষ্টেন, প্লাটফর্ম, না কি? আমার আসনে যদি আমাকে রাখতিস, তবে যা হয় একটা হতো।”

আচার্যের মুখের এই মর্মান্তিক বাণী বিবাক্ত শেলের ত্রায় সন্তানগণের হৃদয়ে বিদ্ধ হইতেছিল। সকলে নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সকলেরই প্রাণ করুণ আর্ন্তনাদে মথিত হইতে লাগিল হায়! হায়! উপায় কি? আমাদেরকে এমনি অসহায় অবস্থায় কেলে যাবে? তুমি চলে গেলে আমরা জীবন ধারণ করবো কিরূপে? কেন?” এইভাবে কিছুক্ষণ অতীত হইলে পর আচার্যদেব বলিলেন—

“দেখ, আমার শরীর ধারণের কোনো সঙ্কল্প নেই বটে, তবু তোদের সকলের যদি তীব্র সঙ্কল্প জাগে, তবে শরীর হয় তো থাকতে পারে। তোদের সঙ্কল্পই আমার সঙ্কল্প।”



জনৈক সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

“তুই বা বলবি—তাই বেদ ; তুই বা বলবি তাই সত্য হবে।”

সন্ন্যাসীটি অশ্রুধ্বং কণ্ঠে বলিলেন—“এতকাল আপনি আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন—‘তোদের সকলের ইচ্ছা, চিন্তা, চেষ্টা আমার মধ্যে ডুবিয়ে দে ! তোদের আর কোনো পৃথক্ সত্তা থাকবেনা।’ আর আজ আপনার মুখে এ কি আদেশ—তোদের সঙ্কল্পই আমার সঙ্কল্প !’ আচার্য্যদেব সন্ন্যাসীটির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—“তোর জগুই তো আমার এই দুর্দশা !” \* সন্ন্যাসীটি তখন অশ্রু-গদগদ কণ্ঠে নিবেদন করিলেন—“অপরাধতো আজই নূতন করিনি ; পদে পদে অসংখ্য অপরাধে অপরাধী। বর্তমান অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত বা প্রতিকার যদি কিছু থাকে—সেই আদেশ দিলে তা’ করবার চেষ্টা করি।” আচার্য্যদেব বলিলেন—

“এই একমাস ব্যাধিতে শয্যাশায়ী ; তার মধ্যে একদিনও তুই পূজা করলিনে ! ওরে ! একবার ফুল বেলপাতা পায়ে পড়লে সহস্র গুণ সঙ্কল্প জাগ্রত হয়।”

\* চিকিৎসার জন্ত যখন আচার্য্যদেবকে বালিগঞ্জ হইতে কলিকাতায় নিবার কথা উঠে এবং আচার্য্যদেবের অমুমতি প্রার্থনা করা হয়, তখন তিনি উক্ত সন্ন্যাসীর বিচারের উপর নির্ভরের ইঙ্গিত করেন। এবং উক্ত সন্ন্যাসীটাই আচার্য্যের অভিপ্রায় সন্মুখে তুল ধারণা বশতঃ অগ্রণী হইয়া বাড়ী ভাড়া করিয়া আসেন। স্বীয় সিদ্ধ-সঙ্কল্পের আসন হইতে বিচ্যুত হওয়াতেই আচার্য্যের শরীর ধারণের সঙ্কল্প নষ্টপ্রায় হইয়াছিল।

সত্যই থাকে প্রত্যাহ ত্রিসঙ্খ্যা পূজা আরতি করা হইত, এই ব্যাধির একমাস তাঁকে একদিনও একবারও পূজা আরতি করা হয় নি ; অবশ্য একরূপ করা সম্ভবও ছিল না। কিছুক্ষণ সবাই নীরব। সন্ন্যাসী সন্তানগণ দিশাহারা অচেতন-প্রায়।

আচার্য্যদেব উক্ত সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন “পূজা আরতির যোগাড় করেছি?” সন্ন্যাসীটি বলিলেন—“হাঁ! করেছি!” আচার্য্যদেব বলিলেন—

“নে! আমাকে ধরে উঠিয়ে বসিয়ে দে! পূজা আরতির জিনিষপত্র নিয়ে আয়!”

সকলে ধরিয়া অতিকষ্টে আচার্য্যদেবকে শয্যার উপর তিনদিকে তাকিয়া দিয়া বসাইয়া দেওয়া হইল। উক্ত সন্ন্যাসীটিকে আদেশ করিলে আরতি আরম্ভ হইল। “জয় গুরু গুঁকার জয়শিব গুঁকার” কীৰ্ত্তনের সহিত আরতি চলিল। পরে গুরু-প্রণাম মন্ত্রাদি পাঠান্তে আচার্য্যদেবের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন পূর্বক প্রণাম করিলে তিনি সকলকে শিরঃ-স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে তাঁকে শয্যায় শয়ন করান হইল। সন্তানগণ কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন।

ব্যাধি কিছু উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। মাঝে মাঝে উপশমের কিছু আভাস আসিলেও পুনঃ দ্বিগুণ বেগে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একদিন আচার্য্যদেব উপস্থিত সন্তানগণকে একত্র ডাকিয়া তাঁর অবর্ত্তমানে সজ্জের ব্যবস্থা সম্পাদিত একখানি ‘উইল’ লেখাইয়া রাখিলেন। সন্তানগণ আশা-নিরাশার মধ্যে দোলায়মান অবস্থায় অবক্তব্য উদ্বেগ ও দুঃখে দিন কাটাইতে লাগিলেন। সকলেই অন্তরে অবিরত আচার্য্যের শরীরের নিরাময়তা প্রার্থনা করিতে ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসী—বাহাকে লক্ষ্য করিয়া আচার্য্যদেব বলিয়া-

ছিলেন—তুই বা বলবি, তাই সত্য হবে—নিজ দায়িত্ব চিন্তা করিয়া কিংকৰ্ত্তব্যবিমূঢ় ও ক্লেশে শোকে আহাৰ-নিদ্রায় উদাসীন হইয়া নীরব ক্রমশে দিন কাটাইতে লাগিল। আর একদিন আচার্য্যদেব সন্তানগণকে বলিলেন—

“আমাকে তোরা আশ্রমে নিয়ে চল। ওরে বাজিতপুরে সিদ্ধপীঠে আমাকে নিয়ে চল। সেখানে নিয়ে যেতে পারলে যা হয় একটা কিছু হবে। এমনি করে শেষে শুকনো ড্যাঙায় তোদের ভরাডুবি হবে রে?”

সন্তানগণের প্রাণের ইচ্ছা—আচার্য্যদেবের আদেশ পালন করা। কিন্তু উপায় ছিল না। আচার্য্যদেব সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী, পাশ কিরিবার সামর্থ্য নাই। উঠিয়া বসাইবার চেষ্টা করিলে ‘হার্ট ফেল’ হইতে পারে—চিকিৎসকগণ সাবধান করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যহ বহুপ্রকার ‘injection’ এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় ‘fomentation’ দেওয়া হইতেছে। অতি সতর্পণে একটু পথ্য দেওয়া হইতেছে। আরও বহু প্রকার সেবাসুশ্রবা চলিতেছে। এমতাবস্থায় কলিকাতা হইতে কোথায়ও তাকে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তা উঠাই অসম্ভব কল্পনা।

ব্যায়ির উপশমের কোনো লক্ষণই দেখা গেল না; আচার্য্যের অন্তরে দেহ ধারণের সঙ্কল্পও জাগিতেছে না দেখিয়া পূর্বোক্ত সন্ন্যাসী মানসিক ব্যস্তপায় অচেতন-প্রায় হইয়া যেন মনে স্থির করিলেন “আচার্য্যের আদেশ পালন পূর্বক তাঁহার অন্তরে শরীর ধারণের সঙ্কল্পই যখন জাগাইতে পারিলাম না, তখন জীবন ধারণ বৃথা! চাইনা—এমন অকৰ্ম্মণ্য, অপদাৰ্ঘ্য, অভিশপ্ত জীবন।” এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি আহাৰ নিদ্রা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিলেন। নিয়মিতভাবে বাবতীয়

কার্য্য তিনি করিয়া চলিতেন বটে কিন্তু জলবিন্দুও গ্রহণ করিতেন না ।  
এরূপে তিনদিন অতীত হইলে চতুর্থ দিবস অপরাহ্নে আচার্য্যের  
শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সন্তানগণ সেবার নিযুক্ত ; উক্ত সন্ন্যাসীটী মাথায়  
হাওয়া করিতে করিতে প্রাণে প্রাণে সঙ্কল্প করিতেছে—“তোমার দেহ  
ধারণের সঙ্কল্পই যখন জাগাইতে পারিলাম না । তখন আর এই জঘন্য  
মাংসপিণ্ডের ভার কেন বহন করিব ? আমার এ দেহ এখনই ধ্বংস  
হউক ! তোমার তিরোধান আমি সহিতে পারবো না ; তৎপূর্ব্বেই  
আমার দেহের অবসান হোক ।”

কিছুক্ষণ পরেই আচার্য্যদেব উত্তেজিত কণ্ঠে সন্ন্যাসীটীকে লক্ষ্য করিয়া  
বলিলেন—

“বর্ব্বর ! তুই শরীরকে নষ্ট করছিস্ কেন ? তোর শরীর  
বিকল হলে আমার শরীর বিকল হয় !”

সন্ন্যাসীটী তখন ফোপাইয়া কাদিতে লাগিলেন । পরে আচার্য্যদেব  
বলিলেন আর তোকে আশীর্বাদ করবো । সন্ন্যাসীটী কাদিতে কাদিতে  
পদপ্রান্তে পড়িলে আচার্য্যদেব মস্তক স্পর্শ পূর্ব্বক আশীর্বাদ করিয়া  
আহারে আদেশ দিলে সে কান্দিতে কান্দিতে গিয়া আহার করিল ।  
ব্যাধির প্রকোপ কথঞ্চিৎ উপশম হইলেও তেমন আশাশ্রম কিছু হয়  
নাই । মাঝে মাঝে বেশ কয়েকটা দিন খুব কমিয়া পুনরায় দ্বিগুণবেগে  
বর্দ্ধিত হয় । ৬জ্যৈষ্ঠমী ও মহালয়ার সময়ে ব্যাধির উপসর্গ কমিয়া  
গিয়াছিল এবং আচার্য্যদেব এতটা সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন যে  
স্বাক্ষর পূজার আসনে বসাইয়া পূজা আরাতি করা হইলে তিনি উপস্থিত  
সন্ন্যাসী ও গৃহী সন্তানগণকে আশীর্বাদ দান করেন ।

অপর একদিন আচার্য্যদেব উপস্থিত সন্তানগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে  
লাগিলেন—

“এ শরীর রেখে কী হবে ? এই পটা গলা শরীর দিয়ে কি আর আমার কাজ হবে ? তোরা কি এই শরীরের সেবা করতে পারবি।”

পূর্বোক্ত সন্ন্যাসীটি বলিলেন—“আচার্য্য শব্দের মৃতদেহটাকে মাসের পর মাস তাঁর শিষ্যেরা সেবায়ত্ত্ব করেছিল ; আর আমরা আপনার এই জীবন্ত শরীরকে কেন করতে পারবো না ? খুব পারবো।”

তিনি ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতেছেন এবং শীঘ্রই সম্পূর্ণ নিরাময় হইবেন ভাবিয়া সকলে আশ্বস্ত হইলেন বটে কিন্তু মহালয়ার পরেও পুনঃ ব্যারাম বৃদ্ধি পাইল। চিকিৎসক বলিলেন—“মোটের উপর অবস্থা ভালর দিকে চলিলেও এখনো চিকিৎসা আরও দীর্ঘকাল চালাইতে হইবে। সুতরাং আর একটি ভালো বাড়ীর সন্ধান করা আবশ্যক। সন্ন্যাসী সন্ধানগণের মধ্যে দুইজন অমুসন্ধান পূর্বক একটি ভালো বাড়ী দেখিয়া আসিয়া আচার্য্যদেবের নিকট বাড়ীর বিষয় নিবেদন করিতেছিলেন—এমন সময় পূর্বোক্ত সন্ন্যাসীটি তথায় উপস্থিত। অকস্মাৎ সে ভীষণ উত্তেজিত হইয়া—যেন আচার্য্যদেবের ইচ্ছায় অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—“বেশ ! আবার একটা হাসপাতাল সৃষ্টি করবেন ? গুরুদেব শুয়ে শুয়ে ভুগবেন ; আর আমরা তাঁর সেবা করে গুণ্য অর্জন করতে থাকবো—কেমন ?” এরূপ বলিয়া সে আচার্য্যদেবকে লক্ষ্য করিয়া সমান উত্তেজনার সহিত আবদার ও দাবী জানাইল—“আপনি আমাকে বর দিয়েছেন যে আমি যা বলবো তাই সত্য হবে। আপনি সিদ্ধসকল, অশ্রান্ত ; সুতরাং আপনার বাক্যও অশ্রান্ত ! আগামী বৃহস্পতিবার সকালেই আপনাকে স্নান হয়ে আশ্রমে যেতে হবেই।” এই কথা বলেই উত্তেজনা-ভরে সন্ন্যাসীটি বালিগঞ্জে

আশ্রমে চলিয়া গেল। অবশিষ্ট কয়েকটা দিন আর সে আচার্য্যদেবের নিকট আসিলও না, জলবিন্দু স্পর্শও করিল না; আচার্য্যদেবের পথ চাহিয়া বসিয়া রহিল। যথার্থই আচার্য্যদেব নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত লোকজন জিনিষপত্রাদি সহ বালিগঞ্জ আশ্রমে গিয়া পৌছিলােন।

বালিগঞ্জ আশ্রমে পৌছিবাব পরও দুইদিন আচার্য্যদেবের জ্বর পুনরায় উঠিল। সকলেই চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু দেবী পক্ষের যষ্টীর দিবস হইতে জ্বর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া গেল; আর উঠে নাই। বালিগঞ্জ আশ্রমেই ৬দুর্গাপূজার আয়োজন হইয়াছিল। মহাষ্টমীর দিবস আচার্য্যদেবকে পূজা আরতির আসনে বসাইয়া দেওয়া হইল। আচার্য্যদেব পূজা আরতি গ্রহণ পূর্বক সমবেত সন্ন্যাসী ও গৃহী সন্তানগণকে অভ্যর্থনা আশীর্বাদ করিলেন। আচার্য্যদেব তখনো উঠিয়া বসিতে পারেন না। ৬বিজয়াদশমীর পরেই আচার্য্যদেব বাজিতপুর সিদ্ধপীঠে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বহু সন্ন্যাসী সন্তান তাঁহাকে একথানা ইজিচেয়ারে বসাইয়া অতি সন্তর্পণে ট্রেন ও ষ্টীমার যোগে সিদ্ধপীঠে পৌছাইলেন। তথায় কিছুদিন অবস্থান পূর্বক তিনি শরীরে একটু বল পাইলেন। একটু একটু হাঁটা চলা করিতে লাগিলেন।

চিকিৎসকের পরামর্শ মতে তিনি একমাস কাল মধুপুরে গিয়া অবস্থান করেন; তাহাতে শরীর অনেকটা সুস্থ হয়। শীত বেশী আরম্ভ হইলে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। নানা প্রকার বিবাক্ত ঔষধ প্রয়োগের পরিণামে তার শরীরে পিত্তজনিত কত দেখা দেয়। শরীর কথঞ্চিত কৰ্ম্মক্ষম হইলে তিনি বাজিতপুরে সিদ্ধপীঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

সুদীর্ঘ চার মাস রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী থাকা কালীন বহু

স্বাধার ঘটিয়াছিল বাহ্যার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে আচার্য্যদেব তদীয় জগৎ-কল্যাণ দেহ ধারণের সঙ্কল্প পুনঃ প্রাপ্ত হন। সেই সব ঘটনার কিঞ্চিৎ বিবরণ উপরে প্রেরিত হইয়াছে। ভগবৎ-প্রেরিত আচার্য্যের জীবন সঙ্কল্পময়। জীবের জায় কৰ্ম্মকল ভোগের জন্ত তাঁহাদের দেহ-ধারণ নয়। তাঁহারা প্রকৃতির প্রভু—ঈশ্বর। ঐশী প্রেরণায় জগৎ-কল্যাণের সঙ্কল্প লইয়া তাঁহাদের দেহ-বিগ্রহ রচিত হয়। কতকগুলি ভাগবত কৰ্ম্মের সঙ্কল্প লইয়া তাঁহারা চলেন। সঙ্কল্পিত কার্য্য সমাপ্ত হইলে তখন তাঁহাদের দেহ ধারণের ইচ্ছা শিথিল হইয়া পড়ে; এক্ষণ অবস্থায় নূতন কোনো ভাগবত কৰ্ম্মের সঙ্কল্প যদি তাঁহাদের অন্তরে উদ্ভিত না হয়, তবে তাঁহাদের শরীর কিছুতেই থাকিতে পারে না।

ভগবৎ-প্রেরিত আচার্য্যগণের জীবন ও কৰ্ম্মলীলার মধ্যে লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই তিনটি উদ্দেশ্য—(১) ভক্ত, অমৃতভক্ত, শরণাগত, মুমুক্শু নরনারীকে আশ্রয় দান; (২) তাহাদের এবং মানব-সাধারণের পাপভার গ্রহণ; (৩) ব্যক্তিগত ও সমষ্টি জীবনে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আদর্শের প্রচার প্রতিষ্ঠা এবং ধার্মিক ও সামাজিক জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্যের শিক্ষাদান পূর্ব্বক ধর্ম্ম-সংস্থাপন।

লিঙ্গ মহাপুরুষ বা আচার্য্যগণের রোগভোগ কেন হয়? এই সার্বজনীন প্রশ্নের উত্তর—পতিত মানবের পাপভার গ্রহণের জন্য। সন্ত-নেতা আচার্য্যদেব জীবনে অসংখ্য ব্যাধিতে ভুগিয়াছেন—লক্ষ লক্ষ নরনারীর পাপভার গ্রহণই তার হেতু। অনেক শিষ্যের “আপনাদের রোগ হয় কেন?”—প্রশ্নের উত্তর আচার্য্যদেব সহজ সরল ভাবে দিয়াছিলেন—“তোমাদের জন্য!” অনেক সময়ে দেখা বাইত আচার্য্যদেব অনিষ্টকর কুপাখ্য গ্রহণ করিতেছেন; নিষেধ করিলে জ্ঞান করিতেন না; অধিকতর বলিতেন—

“আমার শরীর আমিই গড়েছি, আমার আমিই ভাঙবে,  
তোদের তাতে কি?”

মাঝে মাঝে উত্তেজিত হইয়া বলিতেন—

“আর পারিনে। তোদের জন্য আমার হাড়ের ভিতর ছিদ্র  
ছিদ্র হয়ে গেছে।”

তিনি লক্ষ লক্ষ নরনারীকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাহাদিগকে  
সাধন দীক্ষা দানের সময় বলিতেন—

“তোমাদের অনন্ত জন্মের পাপতাপ আমি গ্রহণ  
করলাম।”

“তোরা আজ হতে নিষ্পাপ।”

কখনো বলিতেন—

“তোদের যাবতীয় পাপতাপ আমাকে দিয়ে তোরা আজ  
থেকে নিষ্পাপ হ।”

এইভাবে তিনি অসংখ্য আশ্রিত সন্তান-সন্ততির অনন্ত জন্মের পাপ-  
ভার গ্রহণ পূর্বক স্বীয় ভগবৎ-দেহ-বিগ্রহে তাহা ভোগ করিয়া গিয়াছেন।  
কোনো আশ্রিত সন্ন্যাসী বা গৃহী সন্তানের গুরুতর পীড়ার সংবাদ  
আচার্যদেবের নিকট পৌছিলেই দেখা যাইত তৎক্ষণাৎ তাঁর শরীর  
অস্থস্থ হইয়া পড়িয়াছে। তৎপরিবর্তে সেই সন্তান আরোগ্য লাভ  
করিয়াছে। কোন সন্তান ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া কাতর ভাবে তাঁহাকে শ্রবণ  
পূর্বক করুণা প্রার্থনা করিলে তৎক্ষণাৎ অস্ত্রব্যামী আচার্যদেব সেই  
ব্যাধি গ্রহণ করিয়া সন্তানকে রক্ষা করিতেন। উৎসবাদিতে ও মেলা-  
ক্ষেত্রে অসংখ্য জনসমাগমে আচার্যদেব প্রতিদিন ঘটীর পর ঘটী,  
গ্রহরের পর গ্রহর বসিয়া পূজা আরতি গ্রহণ পূর্বক অগণিত নরনারীকে



অবিরত আশীর্বাদ করিতেন। তার অব্যবহিত পরেই দেখা যাইত—  
 আচার্যের দেহ মসীময় ও ব্যাধিগ্রস্তের ত্রায় শীর্ণ হইয়া গিয়াছে; তিনি  
 ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছেন। আচার্যের দৈনন্দিন জীবনে এই  
 জীবোদ্ধার-লীলা লক্ষ্য করিয়া যেন সাক্ষাৎ দেখিতে পাইতাম—  
 আশুতোষ মহাদেব লক্ষ লক্ষ নরনারীর পাপতাপের হলাহল গ্রহণপূর্বক  
 নীলকণ্ঠ সাজিয়াছেন। ক্রমাগত রোগভোগ এবং আহার-নিদ্রায়  
 উদাসীন হইয়া অবিশ্রান্ত অমাহুষিক পরিশ্রমের ফলে তদীয় বিরাট  
 শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল; তাহা দেখিয়া চোখের উপর একটা  
 দৃশ্য ভাসিত—যেন অনন্ত ভাগবতী করুণা ও শক্তি জমাট বাধিয়া বিরাট  
 আচার্যরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে; জীব-দুঃখের সম্মুখে যেন সেই বিগ্রহ  
 গলিয়া যাইতেছে! আর ভগবৎ-শক্তি ও করুণার স্রোত চতুর্দিকে  
 অবিরত প্রবাহিত হইতেছে।

আচার্যদেব যে সঙ্কল্প বলে গলিতপ্রায় শরীরকে পুনরায় কর্মক্ষম  
 করিয়া ধারণ করিলেন, সেই সঙ্কল্প কি? ব্যাধিতে শয্যাগত থাকি-  
 কালীন শেষের দিকে আচার্যদেব স্বগত ভাবে বহু কথা বলিতেন, তার  
 মধ্যে কতকগুলি কর্ম-পরিকল্পনার প্রকাশ পাইত।

“বাজিতপুর সিদ্ধপীঠের জমি বিস্তৃত করিয়া বাঁধাইতে  
 হইবে। সাতস্থানে সিদ্ধাসন স্থাপিত হবে। বিরাট মেলা  
 বসাইব। অসংখ্য লোক একত্র করিয়া বিরাট সম্মেলন করিব।  
 আনন্দের হাট বসিয়া যাইবে। হাজার হাজার লোকে পূজারতি  
 করিবে। আশীর্বাদ ও শক্তি সঞ্চার করিব;—”

এই ভাবে নানা কথা বলিতে বলিতে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া  
 উঠিতেন।

“নাথজী হাতিতে চড়ে রাজার মত মণ্ডলী নিয়ে বাহির

হতেন ; দু'হাতে করে টাকা পয়সা হরির লুটের লত ছড়িয়ে দিতেন । তেমনি করতে হবে । হাজার হাজার লোক নিয়ে চলবো ; হাজার হাজার লোককে আশ্রয় দেবো, প্রতিপালন করবো ; বিরাট নৌকা ও পালকী তৈরী করে মণ্ডলী নিয়ে চলবো ; দেশবাসী যেন আশ্বাস অভয় পায়, আশ্রয় পায় ।”

ব্যাধির মধ্যে অর্ধবাহ অবস্থায় তিনি যাহা সব বলিয়াছিলেন, পরবর্তী দশটি বৎসরের কার্যাবলীর মধ্য সেই সঙ্কল্পগুলিই পরিপূর্ণ হইয়াছে । ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের জাহুয়ারী মাসে তিনি আরোগ্যলাভ পূর্বক সঙ্কল্পিত কার্য সাধনে ব্যাপৃত হন এবং ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের জাহুয়ারী মাসে সঙ্কল্পিত কার্য সমাপ্ত হইলে তিনি পরিনির্বাণ লাভ করিলেন । এই নয়টি বৎসরের জন্ত তিনি নব সঙ্কল্প গ্রহণ পূর্বক ( কায়কল ) শরীর ধারণ করিয়াছিলেন । এই দশটি বৎসরে তিনি যে অসংখ্য কর্মের অনুষ্ঠান করেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিতে হইলে একখানি বিরাট গ্রন্থ রচনা করিতে হয় । বর্তমান গ্রন্থে শুধু সংক্ষিপ্ত সারাংশ উল্লেখ করিয়া যাইব । এই দশ বৎসরে অনুষ্ঠিত অসংখ্য কার্যের মধ্যে কতকগুলি বিশেষভাবে আশ্রিত ভক্ত শিষ্যগণের জন্ত তাহাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহে ।

সম্মুখভাষ্য আচার্যের ভাগবত জীবনের এই শেষ দশটি বৎসরের অবদান—“**হিন্দুজাতি গঠনের**”—প্রেরণা সঞ্চার এবং তদুদ্দেশ্য সাধনের অব্যর্থ পন্থা “**হিন্দু মিলন মন্দির স্থাপন ও রক্ষাওল গঠন**” কর্ম-পদ্ধতি প্রবর্তন ও প্রচার । পরবর্তী অধ্যায়ে সংক্ষেপে উহা বিবৃত করিব ।

# হিন্দুজাতি-গঠন

## আয়োজন

আচার্য কোন্ সঙ্কল্পে, কোন্ ভাগবত উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত “কামকল্প” করিলেন? এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর—হিন্দু-জাতি-গঠনের প্রেরণা সঞ্চার ও পছা প্রদর্শন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের জাছুয়ারী মাসে শরীর কথঞ্চিৎ সুস্থ হইতেই তিনি বাজিতপুর সিদ্ধপীঠে অবস্থানপূর্বক ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনার রূপদানের আয়োজন করিতে লাগিলেন। খালের অপর পারে জমি সংগ্রহপূর্বক উচু করিয়া বাধাইলেন। আশ্রম-প্রাঙ্গণে, দুটা নাটমন্দির (টিনের আটচালা) ও একটি পাকা ধর্মশালা নির্মাণ করিলেন। অগ্ন্যগ্ন্য আত্মসম্মতিক আবশ্যক নির্মাণ কার্য চলিতে লাগিল। আচার্য্যদেব এই বাস্তবিক কার্যই স্বীয় তদাবস্থানে করিতে লাগিলেন। ঐকল শরীরে এত অধিক পরিশ্রম করিলে পুনঃ স্বাস্থ্য-ভঙ্গের সম্ভাবনা বলিয়া তাঁহাকে বিজ্ঞানের জন্ত অল্পরোধ করিলে তিনি বলিতেন ‘পরিশ্রমের শরীর পরিশ্রমেই ভাল থাকে। বিনা কাজে থাকলে শরীর ভাল হবে কে বলে? কাজগুলো তো উপলক্ষ্য মাত্র; শরীরটা যে এর মধ্য দিয়ে ভালো হয়ে উঠছে—এটাই বড় কথা।’ ব্যারামের সময়ে স্বপ্নত ভাবে যে সমস্ত কার্যের কথা উল্লেখ করিতে শুনিয়াছিলাম তিনি ক্রমে ক্রমে সেই সবই করিলেন। তিনি সাতটা সিদ্ধাসন স্থাপন করিলেন; নাটমন্দির নির্মাণপূর্বক পরিকল্পিত সম্মেলনে সমাগত নরনারীর অবস্থানের ব্যবস্থা করিলেন। হিন্দু-সম্মেলনের অধিবেশনের স্থান এবং এতদুপলক্ষ্যে পরিকল্পিত মেলাও রচনা করিলেন;

বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অবস্থানের জন্য ধর্মশালা নির্মাণ করিলেন। পূর্ব বঙ্গের সর্বত্র সদলবলে প্রচার কার্য চালাইবার জন্য “কাণ্ডারী” নামে এক বিরাট পান্‌সী নৌকা ও একখানি বৃহৎ পাল্‌কী গড়িলেন; জলকষ্ট নিবারণের জন্য টিউব ওয়েল বসাইলেন। পুরাতন বৃহৎ পুকুর কাটাইয়া ঘাট বাধাইয়া দিলেন। এই সময়ে বাজিতপুর অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হওয়ায় সদাত্রত স্থাপন পূর্বক কিছুদিন অকাতরে অন্নদান এবং কৃষকদিগকে অর্থ সাহায্য দান করিতে থাকেন। উপরোক্ত নির্মাণ কার্যেও প্রত্যহ শত শত লোক নিযুক্ত ছিল। এই সব কার্যোপলক্ষ্যে সেই দুর্ভিক্ষের দিনে সহস্র সহস্র নরনারী প্রতিপালিত হইতেছিল। ১৯৩৩ ও ৩৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই সব কার্য সম্পূর্ণ হয়। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে বাজিতপুর আশ্রমে ৬৬র্গোৎসব সম্পন্ন হয়। এই বৎসর হইতেই বাজিতপুর আশ্রমে আচার্য্যদেবের অভিপ্ৰায়ানুসারে বাসন্তীপূজা ও নীলপূজার অনুষ্ঠান মহাসমারোহে হইতে থাকে। মাঝে মাঝে সন্ন্যাসী, কন্নী ও সেবকবকগণকে লইয়া আচার্য্যদেব এই সময় হইতে পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র-অধ্যুষিত অঞ্চলের পল্লীসমূহে উপস্থিত হইয়া উৎসব-সম্মেলন অনুষ্ঠান সুরু করেন। “কাণ্ডারী” ও তৎসহ অন্যান্য নৌকায় চাপিয়া প্রচারক দলবলসহ তিনি বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ ও প্রচারকার্য করিতে করিতে জলপথে কলিকাতা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতেন। কয়েক বৎসর এই ভাবে নৌপথে পরিভ্রমণের ফলে— “কাণ্ডারী”কে দূর হইতে দেখিলেই স্থানীয় অধিবাসিগণ বৃত্তিত “বাজিতপুরের মহারাজ” আসিতেছেন; আর অমনি গ্রামে গ্রামে সাড়া পড়িয়া বাইত; দলে দলে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—হিন্দু-মুসলমান নদীর উভয়পাশে সমবেত হইয়া নৌকা বাধিবার জন্য অহরোধ জানাইত। কিছুতেই সে অহরোধ এড়াইবার উপায় ছিল না।

নৌকা লাগাইবার সঙ্গে সঙ্গে দর্শন, প্রণাম ও আশীর্বাদ গ্রহণের ধুম পড়িয়া বাইত ; সঙ্গে সঙ্গে কীৰ্ত্তন, পূজা, আরতি ইত্যাদি চলিত । নৌকার মাঝিরা কখনো কখনো স্থানীয় জনগণের অহুরোধে ভ্রক্ষেপ না করিয়া নৌকা চালাইতে থাকিলে গ্রামবাসিগণ দল বাঁধিয়া আসিয়া মাঝিদের হাত হইতে গুণদড়ি কাড়িয়া নিয়া নৌকা থামাইয়া ফেলিত এবং বলিত—“মহারাজ ! আমাদের দর্শন না দিয়া বাইতে পারিবেন না” আচার্য্যদেব তাহাদের আগ্রহ ও আব্দার শুনিয়া অমনি প্রসন্ন বদনে আশীর্বাদ করিয়া তাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিতেন ।

অব্যবহিত পরেই আচার্য্য যে জন-সংগঠন ও জাতিগঠনের আন্দোলন প্রবর্তন করিবেন, উপরোক্ত প্রচার কার্যের উদ্যোগ আয়োজনের মধ্য দিয়া তিনি তাহারই আভাস ফুটাইয়া তুলিতেছিলেন । জন-সাধারণের সম্বন্ধে জাতি । জাতিগঠনের প্রথম কথা জন-সংগঠন । সহরবাসী মুষ্টিমেয় শিক্ষিত, সভ্য, আয়েসী জনমণ্ডলী জাতির অতি নগণ্য অংশ । কোটা কোটা পল্লীবাসী নরনারী—যারা শিক্ষা-সভ্যতা-জ্ঞান-বঞ্চিত, অনাহারে অর্দ্ধাহারে জীর্ণ শীর্ণ, অবজ্ঞায় অত্যাচারে পশুবৎ জীবন যাপনে বাধ্য, অশিক্ষা ও কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন, হিতাহিত চিন্তার শক্তিও বাদের নাই—তাহাই জাতির অধিকাংশ বা জাতির যেকোনও । তাদেরই গায়েব রক্ত-জল-করা অর্থে সহরবাসীর ভোগ-সম্ভার রচিত । এই পতিত দলিত অবজ্ঞাত নিপীড়িত, ব্রুক নিঃশ্ব জনগণের শিক্ষা, উন্নয়ন, গঠন ও রক্ষণের উপায় ও আয়োজন না করিতে পারিলে জাতিগঠনের ভিত্তি পত্তনই সম্ভব নয় । তাই আচার্য্যদেব হিন্দুজাতিগঠনের উদ্যোগপক্ষে পল্লীবাসী অশিক্ষিত, অবজ্ঞাত, অনাচরণীয়, অস্পৃশ্য হিন্দুজনসাধারণের মধ্যে প্রবেশপূর্বক আশা, আশ্বাস, উৎসাহ, আনন্দ, জাগাইয়া, নব জাগরণের সমাচার

জুনাইয়া স্বীয় অলৌকিক আশীর্বাদ ও অমোঘ সঙ্কল্পশক্তি সঞ্চার স্ব-করিলেন।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে নবেম্বরের মধ্যভাগে এবং ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত আচার্যদেব অসুস্থ ও শয্যাগত হইয়া পড়েন। এই সময়ে সজ্জ বহুপ্রকার বিরোধী ও অপ্রত্যাশিত অবস্থার মধ্যদিয়া অগ্রসর হইতেছিল। এই আপাতঃ বিরুদ্ধভাব ও অবস্থা-চক্র কয়েকটা বৎসর ধরিয়া ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল; আচার্যদেব আপাতঃ বিরুদ্ধ ভাব ও অবস্থা লক্ষ্য করিলেও তেমন গ্রাহ্য করিতেছিলেন না। কিন্তু ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে যখন সজ্জের বিরুদ্ধ জনমত একটু প্রবল হইয়া উঠিল এবং সংবাদপত্রাদিতেও প্রচার চলিতে লাগিল, তখন আচার্যদেব তৎপ্রতীকারে মনোযোগী হইলেন। এই সময়ে আচার্যদেব কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—

“নানাভাব ও অবস্থাচক্র সৃষ্টি করে আমি জাতির মধ্যে আমার অভীষ্ট ভাব ফুটিয়ে তুলবো! যা’ কিছু হবে ও হচ্ছে সবই আমার ইচ্ছায় ও জ্ঞাতসারে। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমি এই বিরুদ্ধ ভাব তৈরী হ’তে সুযোগ দিয়েছি; আবার এখনি একটা ফুৎকারে এসব ঠাণ্ডা করে দেবো। আমার ইচ্ছা ছাড়া অনভিপ্রেত কিছু কি হতে পারে?”

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তিনি সুস্থ হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন তিনি বলিয়াছিলেন।

“আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে দাঁড়াতে পারে? আমিই কতক লোককে বিরুদ্ধভাবে ভাববার সুযোগ দিয়েছি। আমার

ইচ্ছায় তারাই পুনরায় সজ্জের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী হয়ে দাঁড়াবে। যে “আনন্দবাজার” আমার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী প্রচার করেছে, সেই আনন্দবাজারই হবে সবচেয়ে বড় বন্ধু। “আনন্দবাজারই” আমার জাতিগঠন আন্দোলনের সবচেয়ে বড় প্রচারকারী হবে।” আর একদিন বলিলেন—“দেখ! সজ্জের বিরুদ্ধে যারা প্রচার করে তাদের অধিকাংশই আমার আবাল্য সহকর্মী ও বন্ধু। তারা আমাকে একভাবে জানতো। ইদানীং তাদের সহিত বহুদিন দেখা সাক্ষাৎ আলাপ হয় না; তাই লোকের মুখে নানান কথার শুনে দূর থেকে মনে মনে কল্পনা করে:—আমি কিস্তৃত কিমাকার একটা হয়ে গেছি। আবার যখন তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে বুঝিয়ে দেখিয়ে দেবো যে আমি সেই লোকই আছি, তখন আবার তারাই হবে সজ্জের বড় হিতৈষী।”

ইহার পর একদিন সজ্জসম্মানসিগণ পরিবৃত্ত হইয়া বসিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—

“এমন কর্মপদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে যাতে জাতি ও সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক নরনারীর মনের মধ্যে থাকা যায়! সমগ্র হিন্দু-জনসাধারণ যাতে সজ্জ ও সজ্জনেতার চিন্তা করে, রক্ষাকর্তা ও আশ্রয়-দাতা জ্ঞানে সজ্জের নাম করে শয্যা গ্রহণ করবে, আবার সজ্জের নাম স্মরণ করে শয্যা ত্যাগ করবে;—এমনি কাজ করা চাই। জাতি ও সমাজের জীবন-মরণের সহিত সজ্জকে জড়িত করিতে হবে। যে যেখানে

আছে, প্রত্যেকে প্রতি মুহূর্তে চিন্তা করবে সজ্জ তার একমাত্র বন্ধু।”

ক্রমাগত প্রায় এক পঞ্চকাল ধরিয়া সজ্জ-সন্তানগণের সহিত আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি দেশ, জাতি, সমাজের বর্তমান অবস্থা চিন্তা করিতেছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জন-সেবা, সমাজ-সেবা, তীর্থ-সংস্কার, ধার্মিক ও নৈতিক আদর্শ প্রচার, গুরু-পূজার প্রচার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যে বহু-মুখীন কার্য্যধারাসমূহ প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তিনি বর্তমানে সেই সমস্ত কার্য্যধারাকে সমাহার করিয়া তৎসঙ্গে নূতন বাণী, প্রেরণা ও পরিকল্পনা সংযোগ পূর্ব্বক “ধর্ম্ম-ভিত্তিতে জাতিগঠন আন্দোলন” প্রবর্তন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

তিনি বলিতেন—

“আমাদের সজ্জের পন্থা রাজনীতি নয় বটে, কিন্তু আমরা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি না। আমাদের চিন্তা ও বাক্যের দ্বারা আমরা কদাচ কংগ্রেসের বিরুদ্ধতা করবো না। হিন্দু-মহাসভার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট তাহার সহিতও আমাদের যতদূর সম্ভব সহযোগিতা রেখে চলিতে হবে! ধর্ম্মের ভিত্তিতেই আমাদের সজ্জ ও সজ্জের কার্য্যধারা; সুতরাং রাষ্ট্রনীতির সহিত আমরা জড়িত হবো না। আমাদের কার্য্যপন্থার ভিত্তি হওয়া চাই—সকলের সহিত যথায় যোগ্য সহযোগিতার উপর। আমাদের কার্য্যধারা সমগ্র জনসাধারণকে, সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে, সমগ্র নেতাকে মহামিলন



ও মহাসময়ের ক্ষেত্রে এনে দাঁড় করাবে। এমন সার্বজনীন সার্বভৌমিক হওয়া চাই।

আচার্যদেব যখন হইতে জগদগুরু আচার্যরূপে আত্মপ্রকাশ পূর্বক স্বীয় ভাগবত ব্যক্তিত্বকে দেশের সম্মুখে স্থাপন করিলেন; সর্বত্র মহাসমারোহে গুরুপূজার অনুষ্ঠান হইতে লাগিল, তখন হইতে ক্রমে ক্রমে আচার্যের ও তদীয় সজ্জের বিরুদ্ধে নিম্না-সমালোচনা সুরু হয়। কতকগুলি বিশ্বনিন্দুক গুরুপূজা ব্যাপারকে মিথ্যা কাহিনীতে পল্লবিত করিয়া জনগণকে ভ্রান্ত করিতে বদ্ধকটা হয়। অসংখ্য ভক্ত নরনারীর ইচ্ছায় ও উদ্যোগে রাজবেশে অর্ঘ্যগ্রহণ ব্যাপারটিকে বিকৃত ভাবে সংবাদ পত্রাদিতে প্রচার করিয়া তাহার সজ্জের জনপ্রিয়তা নষ্ট করিতে আশ্রয় চেষ্টা করিতেছিল। ব্যাপারটি যখন জটিল হইয়া দাড়াইল, তখন আচার্যদেব উহার প্রতিকারে দৃষ্টি দিলেন।

আমি চিন্তা করছি এমন এক কৰ্ম্ম-পরিকল্পনা যা আসন্ন ভবিষ্যতে দেশের সকলকে—সকল নেতা ও প্রতিষ্ঠানকে গ্রহণ না করে উপায় নেই। আমি যে আন্দোলন প্রবর্তন করবো—তার দ্বারা জাতিগঠন কল্পে অনুষ্ঠিত যাবতীয় কৰ্ম্মপন্থাই সাফল্যের পথে অগ্রসর হবে; অথচ কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোনো কৰ্ম্মপন্থার সহিত বিরোধিতা থাকবে না।”

আচার্যদেব অসুস্থ ও শয্যাগত অবস্থাতেই এই সমস্ত আলাপ-আলোচনা ও গভীর চিন্তায় ডুবিয়া থাকতেন। সুস্থ হইয়া অল্পপথ্য লাভের পর একদিবস বালিগঞ্জস্থিত সজ্জের প্রধান কার্যালয়ের পশ্চাতে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পায়চারী করিতে করিতে কতিপয় সন্ন্যাসীর সহিত আলোচনা করিতেছিলেন :—

আমি যে আন্দোলন প্রবর্তন করতে যাই—সেটা হবে হিন্দুসমাজকে সংস্কার ও সংগঠনের জন্য ; আমি চাই—সমগ্র হিন্দু জাতিকে সজ্জবদ্ধ, শক্তিশালী করে তুলতে !

১ম সন্ন্যাসী—সে রূপ করা কি সজ্জব পক্ষে উচিত হবে ? দেশবাসী জানে যে ভারত সেবাশ্রম সজ্জব জাতিবর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র ভারতীয় জনগণের সেবা করে । এতে সজ্জবর সম্বন্ধে লোকের ভুল ধারণা হবে ।

২য় সন্ন্যাসী—না, সে হবে কেন ? সম্বতো তার জনসেবার অসাপ্তদায়িক কার্য পরিত্যাগ করে, শুধুমাত্র হিন্দুজাতি ও সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে না ! হিন্দু সন্ন্যাসী আমরা—হিন্দু ধর্ম প্রচার, হিন্দু সমাজ-সংস্কার ও সংগঠন আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব—তা' কে না বোঝে ?

আচার্য্য—যে যা, তাকে তা-ই বলে ডাক দিলে সাড়া দেয় । মুসলমানকে মুসলমান বলে ডাক দেওয়া হচ্ছে, তাই সে তাতে সাড়া দিচ্ছে ; খৃষ্টানকে খৃষ্টান বলে ডাক দেবার লোক আছে, তাই সে—সে ডাকে সাড়া দিচ্ছে ; নিজেদের অস্তিত্ব ও সেইভাবে অনুভব করছে । কিন্তু হিন্দুকে হিন্দু বলে ডাক দেবার লোক নেই ! গত একশো বছর ধরে কেউ ডাক দিয়েছে—‘ব্রাহ্ম’ বলে, কেউ ডেকেছে ‘আর্য্য’ বলে, কেউ ডেকেছে—ভারতীয় জাতি বলে, কোনো পক্ষ তাকে আখ্যা দিয়ে রেখেছে ‘অমুসলমান’ ! বিরাট ভারতীয় হিন্দু জাতটো অসাড়, অবশ হয়ে আত্মভুলে ঘুমিয়ে রয়েছে । আজ সময় এসেছে হিন্দুকে হিন্দু বলে ডাক দেবার । আমি তাই হিন্দুকে হিন্দু বলে ডাক দিতে চাই ! আমি সমগ্র হিন্দু জনসাধারণকে ‘আমি হিন্দু’ ‘আমি হিন্দু’ জপ করাবো । এই হিন্দুত্ব-বোধ জাগার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর লুপ্ত গুণ ভেজোবোধ্য, শক্তি-সামর্থ্য জেগে উঠবে ।

১ম সন্ন্যাসী—কংগ্রেস চায়—হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান সমগ্র ভারতীয় জনগণের সম্মিলিত জাতীয়তা। আমরা হিন্দু জাতিগঠন চাইলে, কংগ্রেসের সঙ্গে বিরোধিতা আসবে না ?

আচার্য—আমার হিন্দু-জাতিগঠন আন্দোলন তো কংগ্রেসের ভারতীয় মহাজাতিগঠন আন্দোলনের বিরোধী নয়। কংগ্রেস চায়—রাষ্ট্রভিত্তিতে জাতিগঠন, আমিও চাই—ধর্মভিত্তিতে জাতিগঠন। জাতির জীবনের বহুদিক আছে ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি। জাতি গঠনের প্রচেষ্টা শুধু রাষ্ট্রক্ষেত্রে হলে চলবে না ; যুগপৎ ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ সকল ক্ষেত্রে জাতিগঠন প্রচেষ্টা আবশ্যক। এ গেল প্রথম কথা।

দ্বিতীয় কথা—মুসলমান সজ্জবদ্ধ ও স্বগঠিত ; খৃষ্টাণগণও সজ্জবদ্ধ ও স্বরক্ষিত ;—তাদের সম্মিলিত ও সজ্জবদ্ধ করবার জগ্না কারো মাথা ঘামাবার আবশ্যক হবে না। কিন্তু জাতির তিন চতুর্থাংশ যে হিন্দু-জন-গণ তারাই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, বিবদমান, দুর্বল, অবরক্ষিত ; এই বিরাট ভারতীয় হিন্দু-জন-মণ্ডলীকে সম্মিলিত ও সজ্জবদ্ধ করতে না পারলে জাতীয় জীবন সম্ভব কি ? যার কিছুমাত্র মগজ আছে সে বুঝবে—ভারতে জাতি গঠনের পথে যথার্থ সমস্যা হিন্দু-জাতিগঠন,—হিন্দু মুসলমান মিলন নয়। আমি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিবদমান হিন্দুজনগণকে সম্মিলিত ও সংগঠনের প্রচেষ্টা দ্বারা কংগ্রেসের মহাজাতিগঠন কার্যেরই ভিত্তি স্থাপন করবো ; কার্যের পদ্ধতি দ্বারাই সকলে তা' বুঝবে। “হিন্দুতে হিন্দুতে মিলন যত শীঘ্র গড়ে উঠবে, হিন্দু মুসলমানে মিলন তত দ্রুত সম্ভব হবে।”

২য় সন্ন্যাসী—মুসলমান ও খৃষ্টানের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো একেবারেই নিরর্থক ! ২৮ কোটি হিন্দু যদি সম্মিলিত সজ্জবদ্ধ হয় তবে মুসলমান খৃষ্টানকে বাদ দিয়েও কি নিজস্ব শক্তিতে সে স্বরাজ-

স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে না? কিন্তু ২৮জন হিন্দুও তো একমত নয়। হিন্দুতে হিন্দুতে যেখানে মিলন নেই, সেখানে হিন্দু-মুসলমানে মিলনের প্রশ্ন ওঠে কেমন করে?

আচার্য্য—হিন্দু-সমাজের মধ্যে অসংখ্য ভেদ, বৈষম্য ও বৈচিত্র্য। সব কিছু ভেঙে চূরে একাকার করে অথচ সমাজ গড়ার চেষ্টা—বাতুলতা; অথচ সমাজ যেভাবে বিশৃঙ্খল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, তাতে কিছু ভাড়া চোরা না করলে সংস্কার সম্ভব নয়; আর কতকটা সংস্কার না করলে সংগঠনের কার্য্য অগ্রসর হবে না। অথচ আমরা এমন কোনো কর্ম্ম-পদ্ধতি নেবো না যাতে সমাজে বিপ্লব সৃষ্টি হয়। সমাজকে তার নিজস্ব খাতে, নিজস্ব গতি বেগে চলতে দিতে হবে। তারপথে বাধা বিঘ্ন, আবর্জনাগুলো সরিয়ে তার গতিকে অব্যাহত করে দেওয়াই আমাদের কাজ; সংস্কারের নামে সমাজকে আঘাত দিয়ে ক্ষত বিক্ষত করা চলেছে—সেটাকে বন্ধ করতে হবে।

২য় সন্ন্যাসী—সমাজস্থ জনগণের চেতনা সঞ্চার করে বিবেক-বিচার জাগিয়ে জ্ঞানদান না করে, শুধু গায়ের জোরে মন্দির প্রবেশ, অস্পৃশ্যতার মূলোচ্ছেদ প্রভৃতি করতে গেলে হিন্দুসমাজের ভগ্নাবশিষ্ট কঙ্কালখানা আরও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে যে!

আচার্য্য—গত একশো বছর ধরে হিন্দুজাতি বা সমাজকে কেহ (একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত) আশা, উৎসাহ দান করেনি, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্র দেখায়নি, একটা সাহসনার মধুর বাণীও শোনায় নি। পরন্তু হিন্দুসমাজে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক, এই সমাজের অন্নে প্রতিপালিত ও পরিবর্তিত হয়ে এই সমাজের বুকে বসেই হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজের উপর নির্ধমভাবে নিন্দা গালি, বাক্যবাণ বর্ষণপূর্ব্বক তার

অদ্বৈত করেছে ; ফলে সমাজ ক্রমশঃ দুর্বলতর হয়ে আজ মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত !\*

২য় সন্ন্যাসী—আমাদের এখন সংগঠনের পথে চলতে হবে ।

আচার্য—আমার জাতিগঠন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যই হবে—মিলন, সখ্য, সহযোগিতা । সংস্কার অবশ্য কিছু কিছু চাই—ধর্ম-ক্ষেত্রে ও সমাজ ক্ষেত্রে ; কিন্তু সাক্ষাৎ ভাবে আমরা সে সংস্কারে হাত দেবনা ; আমার কর্মপদ্ধতিই হবে—এমনি যদ্বারা স্বাভাবিকভাবে সংস্কার ও সংগঠন এক সাথে চলবে ।

২য় সন্ন্যাসী—সংজ্ঞের পরিকল্পিত এই নব আন্দোলনের নাম কি দেওয়া হবে ?

আচার্য—সেইটাইতো ভাবছি । লোকে ঠিক ঠিক সংজ্ঞের ভাবটা

---

\* রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ গড়লেন ; স্বামী দয়ানন্দ আর্য্যসমাজ গড়লেন ; কেশব সেন নববিধান সৃষ্টি করলেন ; অধুনা ছোটখাট কয়েকটা মণ্ডলী গড়ে উঠেছে ;—সে সমস্তগুলিই বিরাট হিন্দু সমাজ থেকে পরগাছার গ্রায রস শোষণ করেছে ও করছে ; কিন্তু বিনিময়ে বিরাট সমাজকে ক্রমশঃ অধিকতর দুর্বল ও নিষ্কর্ষ করেছে ও করছে ।

ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসমাজ—যুগের প্রয়োজনে বিজাতীয় ভাব-প্রবাহকে প্রতিরোধে যথেষ্ট সহায়তা করেছে—অবশ্য স্বীকার্য্য । কিন্তু দলে দলে শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত ও শক্তিশালী লোক পৃথক হয়ে যাওয়ায় বৃহত্তর হিন্দু সমাজ যে দুর্বল হয়ে পড়েছিল ;—তা' কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না । তখনকার সংস্কারকগণ যুগের চাহিদার যে ব্যতিরেকী পন্থা গ্রহণ করেছিলেন, বর্তমান কালের নেতৃগণের পক্ষে সে পন্থা গ্রহণ সমীচীন নয় । এখন চাই মিলন ও সমন্বয়ের পন্থা ।

বুঝতে পারে, অথচ ভুল ধারণা না করে ; এমন একটা নাম দেওয়া আবশ্যক। ‘সংস্কার’ কথাটার দ্বারা লোকে বোঝে একটা সমাজ-বিপ্লবের ভাব।

২য় সন্ন্যাসী—‘সংগঠন’ কথাটাও আজকাল ‘আর্য্য-সমাজ’ ও হিন্দু-মহাসভার কার্য্যের দ্বারা শুদ্ধি, বিধবা বিবাহ, অচ্ছুতোদ্ধার, মন্দির-প্রবেশ ইত্যাদি ভাবের জ্যোতক হয়ে দাঁড়িয়েছে ; কাজেই ‘সংগঠন’ কথাটাও দেওয়া ঠিক হবে বলে মনে হয় না। একটা কথা আছে ‘সমন্বয়’।

আচার্য্য—‘সমন্বয়’ কথাটার অর্থ কি ?

২য় সন্ন্যাসী—যথাযোগ্য স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক মিলন ও সহযোগিতা। সূত্রে যুক্ত থাকা।

আচার্য্য—লোকে আবার ভুল বুঝবে না তো—সব সমান করে একাকার করে দেওয়া ?

২য় সন্ন্যাসী—কর্ম্ম-পদ্ধতিই হচ্ছে আসল কথা ; আন্দোলনের যথার্থ পরিচয় থাকবে তার মধ্যে। ভুল বুঝলেও তা’ আপনাই ভেঙে যাবে।

আচার্য্য—তা’ হলে “হিন্দু সমাজ সমন্বয়”—সভ্যের সংগঠন আন্দোলনের এই নাম দেওয়া যাবে।

১ম সন্ন্যাসী—আমাদের সমাজ মূলতঃ ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান ; স্বতন্ত্রাং ‘ধর্ম্ম’ কথাটা থাকলে ভালো হতো না ? শুধু সমাজ কথাটা থাকলে লোকে—সভ্য সম্বন্ধে আর্য্য-সমাজের মত একটা ধারণা করে বসতে পারে।

আচার্য্য—ধর্ম্ম যতক্ষণ অহুষ্ঠানের মধ্যে প্রতিফলিত না হয়, ততক্ষণ শুধু কথার কথা। সমাজের মধ্যেই ধর্ম্মের বিকাশ-প্রকাশ,—কার্য্যকরীরূপ।

বিগত হাজার বছর ধরে ধীরে ধীরে সামাজিক জীবন থেকে ধর্ম জীবনকে পৃথক করে ফেলায় আজ জাতির এই দুর্দশা! ধর্মের ভিত্তিতেই সমাজ-জীবনকে গড়ে তুলতে হবে।

২য় সম্মানী—সজ্জের এই নব আন্দোলনের কর্মপদ্ধতি কি হবে?

আচার্য—আমি চাই—গ্রামে গ্রামে, সহরে সহরে সর্বশ্রেণীর হিন্দু-গণকে পরস্পর সম্মিলিত, সজ্জবদ্ধ করতে। আমার সংগঠন বা সংস্কার কার্যের মূল ভিত্তি—মিলন; সর্বাত্রে চাই—মিলন। মিলনের পথে 'যা' 'যা' প্রয়োজন, 'যা' 'যা' সহায়ক—সেই ভাব, সেই অনুষ্ঠান আমরা গ্রহণ করবো। মিলনের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে—এমন কোনো কিছুই আমরা করবো না। প্রথমেই চাই—সর্ব শ্রেণীর মিলন-ক্ষেত্র এবং সার্বজনীন মিলনানুষ্ঠান-সমূহ।

হাটে বাজারে, সভা-সমিতিতে, ক্লাবে, ক্রীড়াক্ষেত্রেও লোক মিলিত হয়; কিন্তু সেই সার্বজনীন মিলনে জাতির জীবন গঠনের সহায়তা পাওয়া যায় না। মিলন চাই—ধার্মিক ও সামাজিক—আদর্শের ভিত্তিতে। এজগৎ হিন্দুর মিলন-ক্ষেত্রের নাম দিতে হবে—**হিন্দু 'মিলন-মন্দির'**। মন্দির যেমন ধর্ম-সাধনার স্থান! তথায় প্রবেশ করলেই যেমন মনে শান্ত, গম্ভীর পবিত্র ভাবে হৃদয়-মন পরিপূর্ণ হয়, তেমনি হিন্দু-মিলন-মন্দিরে সর্বশ্রেণীর হিন্দু উচ্চভাব নিয়ে আসবে।

২য় সম্মানী—মন্দির তো হিন্দুর যথেষ্ট আছে! মন্দিরে আজ কাল কয়জন হিন্দু যায়? মন্দিরে তো সর্বশ্রেণীর হিন্দুর প্রবেশের অধিকারও নেই। হিন্দু-মিলন-মন্দিরের নামে যদি লোক সাধারণ মন্দিরের মত একটা কিছু ধারণা করে বসে?

আচার্য—মিলন-মন্দির জিনিসটাকে ভালো করে Explain

(ব্যাখ্যা) করে বুঝিয়ে দিতে হবে। মুসলমানদের যেমন মসজিদে হিন্দুর তেমন মিলন-মন্দির।

এক কথায় বুঝিয়ে বলতে হবে। মুসলমান যেমন নিয়মিত ভাবে সপ্তাহে ও পর্বাহে মসজিদে সমবেত হয়ে ধর্ম্মানুষ্ঠান; সামাজিক বিষয়ে আলোচনা ও বিধি-ব্যবস্থা করে; সর্ব্ব-শ্রেণীর হিন্দুগণও তেমনি গ্রামে গ্রামে, সহরে সহরে—কেন্দ্রে কেন্দ্রে সম্মিলিত হয়ে ধর্ম্মানুষ্ঠানাদির সহিত সমাজ ও জাতির দুঃখ-হুর্দশার আলোচনা ও আত্মরক্ষার উপায় নির্ধারণ করবে।

২য় সন্ন্যাসী—এই আন্দোলন যথাযথ ভাবে প্রবর্তন করতে হলে প্রথমেই—ইহার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্ম্ম-পদ্ধতি সঘর্ষে বিজ্ঞাপন ও-পুস্তিকাদি প্রণয়ন পূর্ব্বক প্রচার এবং সংবাদ-পত্রেও প্রচার-প্রচেষ্টার আবশ্যক।

আচার্য্য—কালই তুমি সব লিখে দু'তিন দিনের মধ্যেই সব ছাপিয়ে ফেলো; সপ্তাহ কালের মধ্যেই আমি প্রচারে বহির্গত হবো। শরীর তো ঠিক হয়ে গেছে! কাজের মধ্যে পড়লেই ভালো হয়ে যাবে।





# হিন্দু-সমাজ-সমন্বয় আন্দোলন

## আচার্যের প্রচারাভিযান

আচার্যের জীবনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে সকল অন্তরে জাগ্রত হওয়া মাত্রই তৎসাধনে বদ্ধকর্তী হওয়া এবং কার্য শেষ না করে নিবৃত্ত না হওয়া। “হিন্দু-সমাজ-সমন্বয়” আন্দোলনের সকল জাগ্রত হওয়া মাত্র আচার্য্য একটি দিনও স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভগবৎ-করণার যে প্রবল তরঙ্গ তদীয় অন্তরে উদ্বেল হইয়া উঠিল, তাঁর উচ্ছ্বাস তাঁকে অবিলম্বে সদলবলে ছুটাইয়া নিয়া চলিল—দেশের পতিত, দলিত, অবনত, অস্পৃশ্যের দ্বারে দ্বারে। এইখানে সাধারণ নেতার সহিত ভগবৎ-প্রেরিত আচার্যের পার্থক্য।

সাধারণ নেতা ধর্মক্ষেত্রেই হউক বা সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি যে ক্ষেত্রেই, হউক—কোনো, আন্দোলন সৃষ্টি করিতে হইলে প্রথমে সহরে সহরে, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উহার প্রচার প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হন। বিগত একশত বৎসর ধরে জাতিগঠন কল্পে যত আন্দোলনের তরঙ্গ উখিত হয়েছে—সমস্তই এই রীতিপদ্ধতিতে চলিয়াছে দেখিতে পাই। কিন্তু সজ্ঞানেতা আচার্য্যদেবের মধ্যে ভগবৎ-করণা ও আশীর্বাদ-ধারা উদ্বেলিত; তিনি সেই করুণা ও আশীর্বাদ-ধারা ঢালিয়া দিবার জন্ত ব্যাকুল; হাজার বছর ধরিয়া যারা পতিত, দলিত, দ্বণিত, উপেক্ষিত; যাদের দেখিবার কেউ নেই, সামান্য বাণী শোনার কেউ নেই, দুঃখে, বিপদে সহায়ত্বভূতি কেউ করে না, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পশুর মত জীবন বাপন করিতে

বাধ্য হয়েছে বারা ; তাদের কোলে নেবার জন্ত, আশ্বাসের বাণী শুনাইয়া, আশীর্বাদ ধারায় অভিনিষিক্ত করিবার জন্ত আচার্যদেব উন্নত প্রায় হইয়া উঠিলেন। শরীর-বোধ যেন তিরোহিত হইল ; সকলের সনির্বন্ধ ও সকাঁতর প্রার্থনাতেও তিনি জীর্ণ স্বাস্থ্যের দিকে চাহিয়াও একটা দিনও অপেক্ষা করিলেন না। সে ব্যস্ততা, ব্যাকুলতা না প্রত্যক্ষ করিলে ধারণা হয় না।

ডিসেম্বর মাসের মধ্য ভাগ। তিনি চলিলেন তাঁর আশীর্বাদের পশরা লইয়া প্রথমে সুন্দরবন-অঞ্চলে—“ডাঙায় বাঘ জলে কুমীরের” দেশে। কলিকাতা হইতে শ্যামবাজার বসিরহাট হাসনাবাদ লাইনে হাসনাবাদ হইয়া ডিঙ্গি নৌকায় চাপিয়া লোকজন, মালপত্র, প্রচারের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া তিনি সুন্দরবন-অঞ্চলে প্রবেশ করিলেন—পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় (পোত), নমশূদ্র, ঋষি (মুচি), মাহিষা, কপালী প্রভৃতি তথাকথিত অস্পৃশ্য, অনাচরণীয় হিন্দু-অধ্যুষিত গ্রাম-সমূহে। পথে বাইতে বাইতে ট্রেণে, নৌকায় সর্কক্ষণ এই হিন্দু-সংগঠনের কথা ছাড়া অন্য কোনো কথা বা চিন্তা নেই। পথে বাকে পাইতেছেন তাকেই বলিতেছেন ; তাতেও তৃপ্তি হইতেছে না, লোক ডাকিয়া ডাকিয়া স্বহস্তে কাগজপত্র বিলাইতেছেন এবং হিন্দু-সংগঠনের মোটামুটি দু'চারটা কথা বলিয়া দিয়া সকলকে এই সংবাদ জানাইবার নির্দেশ দিতেছেন।

নৌকায় চলিয়াছেন ; অবিরাম হিন্দু-সংগঠনের জল্পনা-কল্পনা-আলোচনার দ্বারা সজ্ব-সন্তান-গণের হৃদয়ে স্বীয় সঙ্কল্প সঞ্চার করিতেছেন ; যত নৌকা বাইতেছে, ডাকিয়া ডাকিয়া আরোহীগণকে কাগজপত্র স্বহস্তে দিতেছেন, সন্তানগণের হাত দিয়া দিয়াও যেন তৃপ্তি হইতেছে না। নিজেই ডাকিয়া পথচারী বা নৌকারোহীকে

বলিতেন—“শোনো! শোনো! আজ অমুক স্থানে সমস্ত শ্রেণীর হিন্দুগণের এক বড় সভা হবে; একজন বড় মহাপুরুষ সেখানে আসবেন, তিনি হিন্দুজাতির মধ্যে শক্তির-সঞ্চার ও আশীর্বাদ দান করবেন। সভায় হিন্দু ধর্ম ও সমাজের উন্নতি সম্বন্ধে বক্তৃতা হবে। সকলকে ডেকে ডুকে নিয়ে সভায় আসবে।” আচার্যদেবের এই বালকের ছায়া সারল্য এবং ব্যাকুলতা দেখিয়া সন্ন্যাসিগণ আনন্দে হাসিতে লাগিলেন। তাহারা আচার্যদেবকে বলিলেন—“আমরাই বলছি। আপনার বলার প্রয়োজন নেই, ভালো দেখায় না।” তিনি বলিলেন—“তোরা বলিস্ কৈ? একটা লোকও যেন বাদ না যায়! এখানে কে কাকে চেনে? গ্রামের লোক সরল! তারা তো সহরের শিক্ষিত নয়। তাদের মধ্যে, ভগবানে, মহাপুরুষে, বিশ্বাস-ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে!” আচার্যদেবের দেহে মনে পতিতোদ্ধারের সঙ্কল্প উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে; মুখমণ্ডলে স্নেহকরণার আভাপ্রদীপ্ত; কণ্ঠে ব্যাকুলতা ও করুণায় স্তবধ্বনিত!

সুন্দরবন অঞ্চলের বহুগ্রামে জাগরণের সাড়া তুলিয়া দিয়া তিনি ফরিদপুর ও বরিশাল জেলায় নমশূদ্র-অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া বহু দুর্গম পল্লী পরিভ্রমণ পূর্বক নবজাগরণের বাণী শুনাইয়া আশীর্বাদ দান করিতে লাগিলেন। তথাকথিত অস্পৃশ্য অনাচরণীয়ের গৃহে গমন পূর্বক তাহাদের প্রদত্ত খাদ্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাহারা আকস্মিক অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িত; আদর অভ্যর্থনার কোনো আয়োজন তেমন করিতে পারিত না; অকৃত্রিম সরলতা সহকারে ভক্তি নিবেদন করিত ও তদীয় মুখনিঃসৃত অমৃতময়ী মৃতসজীবনী বাণী পরম আগ্রহভরে শুনিত। তাহাদের সেই সরল বিশ্বাস ও নির্ভরতার ভাবের উল্লেখ করিয়া,

তাহাদের বৎসামাত্র উদ্যোগ-আয়োজনকে প্রশংসা করিয়া কত কথা বলিতেন এবং কত প্রীতি প্রকাশ করিতেন। কোনো কোনো গ্রামে হাতে লিখিয়া অভিনন্দন পত্রের দ্বারা গ্রামবাসীগণ আচার্য্যের স্তুতিবন্দনা প্রকাশ করিয়াছিল। আচার্য্যদেব তাহা উল্লেখ করিয়া সন্ন্যাসীগণকে বলিতেন—“দেখ্ ! অশিক্ষিত গ্রাম্য হলে কি হয়, জ্ঞান-বুদ্ধি শিক্ষিতের চেয়ে কম নয়। বরং ঢের বেশী ! তাহা কেমন সুন্দর লেখে, গান কবিতা রচনা করে, কেমন বক্তৃতা দেয় ! দেখ্—নমশূদ্র, পৌণ্ড্রদের মধ্যেও কেমন লেখক, কেমন বক্তা ; তোদের মধ্যেও কেউ এমন সুন্দর ভাবে লিখতে বা বলতে পারে না।” পল্লীবাসী পতিত অবজ্ঞাত হিন্দুগণের আলোচনা-প্রশংসায় আচার্য্য সর্বক্ষণ মুখর থাকিতেন। চাঁদসীতে এক নমশূদ্র ভাস্কর্যের বাড়ীতে হঠাৎ গিয়া দাওয়াতে বসিয়া পড়িয়াই তিনি বলিলেন—“ঘরে কি আছে নিয়ে আয়, ক্ষিদে পেয়েছে।” বাড়ীর কর্তা ও গৃহিণী বিস্ময়ে অবাক !

১২ই ডিসেম্বর তারিখে প্রচারক দলসহ বহির্গত হইয়া ২০ শে ডিসেম্বরের মধ্যে তিনি খুলনা জেলার অন্তর্গত সুন্দরবন অঞ্চলের নমশূদ্র, পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়, ঋষি, কপালী প্রভৃতি শ্রেণীর হিন্দুগণ-অধ্যুষিত—আশান্তনি, কোদণ্ডা, সবদলপুর, বরেন্দ্রা, বড়দল, পাজ্রাবুনিয়া, হাতিয়ারডাঙা, দাকোপ, চুণকুড়ি, রাজাপুর, ডুমুরিয়া এবং যশোহর জেলার অন্তর্গত সুফলাকাটা প্রভৃতি পল্লীসমূহ পরিভ্রমণ করিলেন। এই পল্লীগুলি কলিকাতা হইতে বহুদূরে অবস্থিত ; পথ অতি দুর্গম ; যানবাহনের অসুবিধা, পানীয় জল হুস্ত্রাপ্য, খাদ্যদ্রব্যাদি তথৈবচ। বারো দিনের মধ্যে বারোটি পল্লীতে উপস্থিত হইয়া প্রত্যেক গ্রামে জনসভা, পূজা, কীর্ত্তন, শোভাযাত্রা ; চারি পাচটি গ্রামে বৈদিক যজ্ঞ ও মহোৎসব, প্রসাদ বিতরণ এবং প্রত্যেক স্থানে “মিলন-মন্দির” স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বারো দিনের মধ্যে বিভিন্ন

গ্রামে নৌকাপথে যাতায়াতে ৬টা দিন ব্যয়িত হইয়াছিল। অবশিষ্ট ছয় দিনে বারোটা গ্রামে উপরোক্ত অঘুষ্ঠানগুলি করা হয়। একদিনেই আচার্যদেব চারিটা গ্রাম পরিদর্শন করেন। তন্মধ্যে রাজি ১১টায় এবং তৎপরে রাজি ২টায় পর পর দুটি গ্রামে সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেক গ্রামে তদীয় শুভাগমন বার্তা ঘোষিত হইলে সহস্র সহস্র নরনারী ছুটিয়া আসিয়াছিল। কয়েকটা স্থানে সমবেত হিন্দু নরনারীর সংখ্যা পাঁচ ছয় সহস্রে পরিণত হইয়াছিল।

আচার্যদেবের আহার নিদ্রার অবসর ছিল না। শীত-বোধ তিরোহিত হইয়াছিল। রোগ-জীর্ণ শরীরের উপর অবিরত অনিয়ম ও অমাসুখিক পরিশ্রমে স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া শরীর অচল হইয়া পড়িবার আশঙ্কা হইতেছিল; তথাপি তাঁহার হুঁস ছিল না, শরীরের প্রতি দৃষ্টি দিবার অবসর ছিল না। সমাগত সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম এবং শত শত লোক ব্যক্তিগত ভাবে উপদেশ গ্রহণ এবং স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিগণ হিন্দু-সংগঠন বিষয়ক আলাপ আলোচনা করিতেছিল। যতক্ষণ সভার কার্য চলিত, তিনি সভাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত বিষয় তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করিতেন। যজ্ঞাঘুষ্ঠানের সময়ে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত থাকিয়া সকলকে আশীর্বাদ দান করিতেন। এমনভাবে দিবারাত্রি তিনি এক মহাভাবে যাতোয়ারা ও অনন্তচিত্ত হইয়া চলিতেছিলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও অনিয়মে সঙ্গী প্রচারক দলের অনেকের শরীর অস্থস্থ হইয়া পড়িতেছিল।

আচার্যদেবের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বেও লক্ষ্য করিয়াছি— যখন তরুণ-সমাজে নৈতিক আদর্শের বিস্তার এবং গাহ'স্থ্য জীবনে শক্তি সাধনা প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়া প্রচারাভিযানে বহির্গত হন, তখন

তিনি দিবারাত্র সেই সঙ্কল্পে মাতোয়ারা হইয়া আহাৰ-নিদ্রাদি শারীরিক প্রয়োজনে উদাসীন হইয়া রহিতেন।

খুলনা ও বশোহর জেলার গ্রামে সাড়া ফেলাইয়া তিনি ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তৎক্ষণাৎ প্রথমে বাজিতপুর আশ্রমে গিয়া—সন্ধ্যার বৃহৎ তরণী “কাণ্ডারী”তে চাপিয়া সদলবলে রওনা হইয়া ৩রা জামুয়ারী (১৯৩৫ খৃঃ) ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত নমশূদ্র-অধ্যুষিত পল্লী গোপীনাথ পুর, ৪ঠা জামুয়ারী বাজুনিয়া, ৬ই জামুয়ারী সাতপার এবং ৮ই জামুয়ারী রাউজর এ শুভ পদার্পণ করেন। প্রত্যেক স্থানে বহু সহস্র নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া বহু শত শশস্ত্র নমশূদ্র সর্দার তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। যজ্ঞোৎসব, সভা অহুষ্ঠিত হয় এবং প্রত্যেক স্থানে মিলন-মন্দির স্থাপিত হয়।

ফরিদপুরে হিন্দু জাগরণের তরঙ্গ উঠাইয়া আচার্য্য নোকা ষোণে বরিশাল জেলার অন্তর্গত টরকী বন্দরে ১৩ই জামুয়ারী, চাঁদসীতে ১৪ই জামুয়ারী, ১৫ই ফুলশ্রী আটগল ঝাড়া, প্রভৃতি স্থানে শুভাগমন করেন। প্রত্যেক গ্রামে উপরোক্ত অহুষ্ঠানাদি এবং মিলন-মন্দির স্থাপিত হয়।

উপরোক্তভাবে চারিটি জেলায় পৌণ্ড্রকজিয়, নমশূদ্র, মল্লকজিয়, রুহিদাস, কপালী প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে নবজাগরণের সাড়া তুলিয়া এবং ভগবৎ-করণা ও আশীর্বাদ বিতরণ করিয়া আচার্য্যদেব কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন পূর্বক আসন্ন মাঘীপূর্ণিমা তিথিতে সমগ্র বাঙ্গালী হিন্দু-জন-সাধারণের মধ্যে এই আন্দোলনের তরঙ্গ বিস্তারোদ্দেশ্যে “বঙ্গীয় হিন্দু-মহাসম্মেলনের” আয়োজন করিতে ব্যাপৃত হইলেন। উক্ত হিন্দু-মহাসম্মেলনের অধিবেশন সন্ধ্যায়

বাজিতপুর আশ্রমে হইয়াছিল এবং তদবধি প্রতিবৎসর নিয়মিতভাবে হইয়া আসিতেছে।

### বিহার ও যুক্ত-প্রদেশে প্রচারাভিযান

বৎসরের প্রথমভাগে আচার্যদেব হিন্দু জাতিগঠন আন্দোলনের যে তরঙ্গ উঠাইলেন কয়েকমাস বিবিধ প্রকারে তাহা বাঙ্গলার সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে প্রচারিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া জুলাই মাস হইতে বিভিন্ন প্রদেশে সেই আন্দোলনের তরঙ্গ লইয়া অভিযান করিলেন। সমগ্র ভারতের হিন্দুজন-গণের মধ্যে এই নবজাগরণের প্রেরণা সমভাবে সঞ্চার করা আবশ্যক বোধে আচার্যদেব প্রচারক দলবল সহ অন্ত্রাত্ম অসংখ্য কর্মের অবসরে জুলাই মাসে গয়া ও পাটনায়, সেপ্টেম্বর মাসে কাশীধাম ও গাজিপুরে, অক্টোবর মাসে দেওঘর, মধুপুর ও ছমকায়, ডিসেম্বর মাসে ছাপড়ায় ও ভাগলপুরে এবং জানুয়ারী মাসে (১৯৩৬ খৃঃ) প্রয়াগধামে কুম্ভমেলায়, ডেরি-অন-শোনে এবং পুর্ণিমাতে শুভপদার্পণ করেন। সর্বত্রই হিন্দুনেতৃবর্গ এবং হিন্দু-জনসাধারণ উৎসাহ সহকারে আচার্যকে অভ্যর্থনা পূর্বক জনসভায় হিন্দু-সমাজ-সমস্বয়ের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি শ্রবণ করিয়া অভিনব আশা ও আশ্বাসে উদ্দীপিত হন।

প্রয়াগধামে কুম্ভমেলা উপলক্ষ্যে অবস্থান কালে প্রত্যহ বিভিন্ন প্রদেশবাসী সহস্র সহস্র হিন্দু দর্শন-প্রণাম পূর্বক আশীর্বাদ নিতে আসিয়া তাঁহার নিকট হিন্দু-জাগরণের আলোচনা শুনিয়া নূতন চিন্তাধারা লইয়া বাইত। প্রত্যহ সভা ও হিন্দু-জাতিগঠন-সংক্রান্ত বক্তৃতার আয়োজন ছিল। কুম্ভমেলায় উপস্থিত লক্ষ লক্ষ সাধুসন্ন্যাসী, প্রচারকের হৃদয়-মনে হিন্দু-সমাজ-সমস্বয়-আন্দোলনের নূতন ভাব ও চিন্তা প্রবেশ করাইয়া

হিন্দুজাতি গঠন কর্ষে উদ্যোগী করিয়া তুলিবার জন্ত বিভিন্ন ভাষায় “হিন্দুধর্ম-সংস্থাপন” “হিন্দু-মিলন-মন্দির” প্রভৃতি প্রচার পত্র ছাপাইয়া সহস্র সহস্র বিতরণ করা হইতেছিল। প্রত্যেক আখড়া ও আশ্রমে গিয়া সঙ্ঘের সন্ন্যাসী প্রচারকগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুসন্ন্যাসীগণের সহিত হিন্দু-সংগঠনের আবশ্যকতা ও সঙ্ঘের মিলন-মন্দির-কর্ষণশক্তির উপযোগিতা বুঝাইয়া দিতেছিল।

এইরূপে আচার্যদেব যখনি যে সহরে বা যে স্থানে যাইতেন বা অবস্থান করিতেন, চারিদিকে হিন্দু-জাতিগঠনের ভাব ও চিন্তাধারা নানাভাবে ছড়াইয়া হিন্দু-জাগরণের আবহাওয়া সৃষ্টি করিতেন; তথাকার সকলেই তখন সেই ভাবে ভাবিতে, সেই ধারায় চিন্তা করিতে বাধ্য হইত, হিন্দু-সংগঠন-সংক্রান্ত কার্যধারা রীতিমত ভাবে কার্যে পরিণত করিবার জন্ত এই ভাবে দেশময় হিন্দু-জাতিগঠনমূলক ভাব ও চিন্তাধারা ছড়াইয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছিলেন।

### বাজিতপুর হইতে খুলনা নৌপথে

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে বাজিতপুর সেবাশ্রমে প্রথম বার্ষিক বঙ্গীয় হিন্দু সম্মেলনের অধিবেশন সমাপনান্তে সঙ্ঘনেতা আচার্য শতাব্দিক সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও সেবকবৃন্দ সমভিব্যাহারে “কাণ্ডারী” এবং অগ্রাগ্র কয়েকখানা ক্ষুদ্রাকার নৌকাযোগে বাজিতপুর হইতে খুলনা পর্য্যন্ত নৌপথে প্রচারাভিযান করেন। প্রচারবাহিনী কুমার নদ, মধুমতী ও আঠার বাকী নদী বহিয়া ভৈরব-তীরে সঙ্ঘের খুলনা সেবাশ্রমে আসিয়া পৌছে; এই অভিযানে পাঁচ দিবস সময় লাগিয়াছিল। প্রতিদিন প্রাতে সমস্ত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও সেবকগণকে কিঞ্চিৎ জলযোগান্তে পাঁচ ছয়টি দলে বিভক্ত করিয়া নদীর উভয় পারে নামাইয়া



দিতেন। সে এক অপূৰ্ণ দৃশ্য। অকস্মাৎ গৈরিক-দীপ্তিতে জলস্থল যেন রক্তিমাব হইয়া বাইত। গ্রামবাসীগণ অবাক আনন্দে চাহিয়া রহিত

প্রচারক-বাহিনী হিন্দু-সংগঠন ও হিন্দু-জাগরণ বিষয়ক সঙ্গীত গাহিয়া গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে পরিভ্রমণ পূৰ্বক মিলন-মন্দির কৰ্মপদ্ধতি বুঝাইয়া দিত; তৎ-সংক্রান্ত কাগজ ও পুস্তিকা বিতরণ করিত। সুবিধামত স্থানে হিন্দু-জনসভা আহ্বান পূৰ্বক বক্তৃতা করিত। সমস্তদিন এইভাবে প্রচার কার্য চালাইয়া পূৰ্ব হইতে নির্দিষ্ট স্থানে পৌছিয়া নৌকায় চাপিত। গ্রামে গ্রামে মহা উৎসাহ ও আনন্দের প্রাবন বহিয়া বাইত। গ্রামবাসীগণ সাধুদের সেবার জন্ত চাউল, টাকা, পয়সা, তরীতরকারী সাধ্যানুযায়ী কিছু কিছু দিত।

প্রাতে, দ্বিপ্রহরে ও সন্ধ্যায় যেখানে যেখানে “কাণ্ডারী” ভিড়িত তথায় মহোৎসব লাগিয়া বাইত; আনন্দের হাট বসিয়া বাইত। যখন সংবাদ পৌছিত যে পতিত দলিতের দরদী মরমী ব্যথার ব্যথী—বাজিতপুরের মহারাজের বজরা আসিয়াছে, অমনি চারিদিকে গ্রামের লোক নয়নারী ফল, ফুল, বিষ্ণপত্র ইত্যাদি যে যাহা পাইত লইয়া উৰ্দ্ধ্বাঙ্গে ছুটিয়া আসিত; নারীগণ হলুধ্বনি দিতে দিতে ছুটিত। তার পর পূজা, আরতি, কীর্তন, দর্শন ও আশীর্বাদ দান চলিত; জনসভায় বক্তৃতাও স্থানে স্থানে হইত। বহুশত, স্থানে স্থানে সহস্র সহস্র লোক জমিয়া বাইত। আচার্য্য সকলকে সম্মুখে আশীর্বাদ দান করিতেন; মধুর কণ্ঠে কত আশা, কত আশ্বাসের বাণী কহিয়া তাহাদের হৃদয়-মনে আনন্দ ও উৎসাহের প্রাবন বহাইয়া দিতেন। তাহারা অবাক হইয়া বাইত—এতকাল কেহ তো এমন দরদ করিয়া কথা বলেনি, এমনভাবে দুঃখে সহানুভূতি দেখায় নাই। এমন আদর

করিয়া তো কেহ বুকে টানিয়া নেয় নাই, এত আশীর্বাদ—এ যে কল্পনার অতীত ! তারা দেখিত যেন সাক্ষাৎ আশুতোষ, মহাদেব আশ্বভোলা ভোলানাথ ককণার ভাণ্ডার লইয়া আসিয়াছেন ; পতিতের পাপতাপের হলাহল রাশি গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে স্বয়ং নীলকণ্ঠ আবির্ভূত । এই ভাবেই তাহারা আচার্য্যের জ্ঞতিবন্দনা করিত ।

এই প্রচার-বাহিনীতে প্রায় দুই শতের অধিক লোক ছিল । নৌকাতেই পাক ও আহার, নৌকাতেই পূজা-আরতি-ভজন-কীর্ত্তন চলিত । নৌকাতেই লোকজন আসিয়া আচার্য্যের দর্শন ও আশীর্বাদ লাভ করিত । এ যেন একটি চলমান আনন্দ-মেলা আনন্দময় আনন্দ-রস-ঘন আচার্য্যকে কেন্দ্র করিয়া চলিতেছে—সৌরজগতে যেমন সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া গ্রহ উপগ্রহাদি কোন্ অনন্তের পানে ছুটে চলে ।

অপরাত্নে আচার্য্যদেব নৌকা হইতে নামিয়া নদীতীরস্থ উন্মুক্ত প্রান্তর বাহিয়া পদব্রজে চলিতেন ; অন্তায়মান রক্তিম সৌরকরে তদীয় জটাজ্বাল পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করিত ; সন্ন্যাসিগণ দল বাঁধিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতেন । কেহ কেহ নৌকার গুণ-দড়ি ধরিয়া টানিয়া নৌকা চালাইতেন । আচার্য্যদেব কত প্রসঙ্গে কত ভাব কত উপদেশ দিয়া সন্তানগণের হৃদয়ে আদর্শের বীজ বপন করিতেন । সন্ধ্যায় নির্জন নদীবক্ষে আরতির সিংহাসনস্থ আচার্য্যদেবকে কেন্দ্র করিয়া শত সন্ন্যাসী ধীরোদাস্তকণ্ঠে কীর্ত্তন, স্তবপাঠ, ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন পূর্ব্বক আচার্য্যের আশীর্বাদ গ্রহণ করিত । সন্তানগণ অহুভব করিত যেন তাহারা মরজগতের নয় ; দূরে—বহুদূরে, উর্দ্ধে—বহুউর্দ্ধে, শোকছুঃখ-জরা-মৃত্যুর জগতের পরপারে আনন্দ-ধামে আনন্দময় রাজ্যে তাহারা অবস্থিত ; তাহারা ছঃখ-জরা-মৃত্যু-শোক-প্রপীড়িত মানবকুলকে

অমৃতের রাজ্যের আহ্বান শুনাইয়া গাহিত “প্রেমের তরী নিয়ে কাণ্ডারী ডেকে যায়! তোরা কে কে যাবি আয়! এমন সাথের সাথী ব্যথার ব্যথী কত দেখি নাই, তোরা কে কে যাবি আয়!” “অকুল ভবসাগর বারি পার হবি কে আয়রে আয়!” “এসেছে প্রেমের পাগল ঝরিছে কুপার বাদল, ভেঙেছে দয়ার আগল ভাইরে!” রাত্রিতে শুভ্রচন্দ্রালোক-প্রাবিত মধুমতীর বিস্তীর্ণ সৈকতে আচার্য্যের শ্রীচরণ-তলে বসিয়া সম্মানগণ আনন্দোন্মাস-কলরবে প্রসাদ গ্রহণ করিত;—সে স্মৃতি মধুর, পবিত্র, প্রাণারাম, পাপ-সন্তাপহারী, সংসার-বন্ধনচ্ছেদনকারী, অপাখিব সম্পদ।

### আশাশুনি হইতে নৌপথে কলিকাতা

মার্চ মাসে আশাশুনি আশ্রমে স্তম্ভরবন অঞ্চলের অল্পমত হিন্দুগণের বিরাট সম্মেলন অস্থগিত হয়। আচার্য্যের নির্দেশে পঞ্চাশ জন সন্ন্যাসী হিন্দু সংগঠনের বাণী ও কর্ম-পদ্ধতির নির্দেশ লইয়া গ্রামে গ্রামে নিমন্ত্রণে বাহির হইলেন। দুই সপ্তাহের মধ্যে তাহারা সহস্রাধিক গ্রামে সম্মেলনের বিষয় প্রচার ও নিমন্ত্রণ করিলেন। সহস্র সহস্র হিন্দু নরনারীর সমাগমে সম্মেলন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। তৎপরে আচার্য্যদেব সন্ন্যাসিগণকে লইয়া নৌপথে প্রচার করিতে করিতে চলিলেন। দেবহাটা, টাকী, বসিরহাট প্রভৃতি অঞ্চলে আচার্য্যদেব অবতরণ করিলেন; সভা ও বক্তৃতা হইল; শত শত নরনারী আচার্য্যদেবের দর্শনাশীর্ষাদ লাভ করিল। হিন্দু-সমাজের নব জাগরণের বাণীতে উদ্দীপিত হইয়া নব জীবন-স্পন্দন অনুভব করিতে লাগিল।

### খুলনা-বশোহরের গ্রামে নৌপথে

জুন মাসে আহত ও অসুস্থ হইয়া আচার্য্যদেব সদলবলে কাণ্ডারী

যোগে বাজিতপুর হইতে খুলনা জেলার মধ্য দিয়া মধুমতী বাহিয়া যশোহর জেলায় কোলাদিঘলিয়া পর্যন্ত অভিযান করেন। যাতায়াতের পথে বহু গ্রামে “হিন্দুসংগঠনের” বাণী প্রচার করা হয়। কোলাদিঘলিয়া কালীবাড়ীর প্রাঙ্গণে যজ্ঞ, সভা ও মহোৎসব-সম্মেলন সমাপনান্তে প্রত্যাবর্তনকালে ভীষণ ঘূর্ণিবাতায় “কাণ্ডারী” ডুবিলার উপক্রম হয়। সমস্ত দিন ও রাত্রিবাণী ঝটিকার বেগ ও উদ্বেলিত নদীর উত্তাল তরঙ্গাঘাতের সহিত যুদ্ধ করিয়া অতিকষ্টে রক্ষা পাওয়া যায়। এমনিতত্ত্ব দুর্ঘ্যোগের দিনেও আচার্য্যদেব অবিচলিত; পথে স্থানীয় গ্রামবাসীদের আহ্বানে জলকাদার মধ্যেও ভিজিয়া তিতিয়া নামিয়াছিলেন, আমাদের শত বাধা নিষেধ তিনি গ্রাহ করেন নাই।

### খুলনা হইতে নৌপথে শ্রীরামকাঠী

বরিশাল জেলায় গ্রামাঞ্চলবাসী নমশূদ্রগণের পুনঃ পুনঃ আহ্বানে আচার্য্যদেব কলিকাতা হইতে প্রচার-বাহিনী সহ খুলনা পৌছিয়া “কাণ্ডারী” যোগে ভৈরব, আঠারো বাকী, মধুমতী, মাঠীভাঙ্গা বাহিয়া শ্রীরামকাঠী উপস্থিত হন। আষাঢ় মাস—দারুণ বর্ষা, শত প্রকার অহবিধা ও দারুণ কষ্ট। আচার্য্যের ক্রক্ষেপ নাই। ১০০ জর লইয়া তিনি সম্মেলনে যোগদান করিলেন। সহস্র সহস্র নমশূদ্র তাঁহার দর্শনাগ্রহে একযোগে নৌকায় উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; নৌকা ডুবিলার উপক্রম। আচার্য্যদেবের তাহাতেই আনন্দ। সহস্র সহস্র নরনারী বর্ষাবাদলের দিনে দূর গ্রাম হইতে যে প্রাণের আকাজক্ষা লইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে—ভাবগ্রাহী জনার্দন, সেই ভাবটুকু দেখিয়া আনন্দিত। তিনি মধুর বাক্যে, স্নেহে আশীর্বাদ দানে তাহাদিগকে

আমন্ত্রণ করিলেন। শ্রীরামকাঠী ও নিকটবর্তী বাবতীয় গ্রামের অধিবাসী অধিকাংশই নমশ্রুত। এই সম্মেলনে পাঁচ সহস্রাধিক নমশ্রুত নরনারী উপস্থিত হইয়াছিল। যজ্ঞ, সভা, বক্তৃতা, উৎসব চলিল। শতশত নরনারী দলে দলে সারা দিনরাত্রি ধরিয়া আচার্য্যদেবের দর্শনোপদেশ লাভ করিতে লাগিল। পথে বহু স্থানে প্রচারকার্য্য করা হইল।

### নানাস্থানে প্রচারাভিযান

এই বৎসরে (১২৩৫ খৃষ্টাব্দে) জুলাই মাসে উড়িষ্যায়, আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে বিহারে এবং অক্টোবরে যুক্ত-প্রদেশে আচার্য্যদেবের প্রচারাভিযান ও বিভিন্ন স্থানে হিন্দুসম্মেলনের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ১২৩৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আচার্য্যদেব পুনরায় “কাণ্ডারী” যোগে পূর্বোক্ত প্রকারে ফরিদপুর ও খুলনার গ্রামাঞ্চলে সন্ন্যাসী প্রচারকবাহিনী সহ যজ্ঞ, সভা, কীর্ত্তন, উৎসব প্রভৃতি নানাভাবে হিন্দুজাতির মিলন ও সংগঠনের ভাবতরঙ্গ বিস্তার করেন। খুলনা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলের গ্রামেও তিনি “কাণ্ডারী” যোগে স্বয়ং পরিভ্রমণ করিয়া প্রচারকগণ দ্বারা নানাভাবে তাঁর বাণী গ্রামবাসী হিন্দুগণকে শুনাইতে শুনাইতে মার্চ মাসে পুনরায় দোলপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে অল্পমত হিন্দুগণের বিরাট সম্মেলন সুসম্পন্ন করেন। তৎপরে হরিদ্বার কুম্ভমেলায় অভিযান করেন।

জুলাই মাসে সদলবলে রাজসাহীতে উপস্থিত হইয়া আচার্য্যদেব বিরাট সম্মেলনে হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে বাণী প্রচার পূর্বক রাজসাহী হিন্দু-মিলন-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ববঙ্গের গায় উত্তর-বঙ্গেও হিন্দু-জাগরণের তরঙ্গ বহাইয়া দিলেন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমার অন্তর্গত নহাটার নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলে হিন্দু মুসলমানে ভীষণ দাঙ্গা উপস্থিত হয়। সজ্জের পক্ষ হইতে অবিলম্বে অত্যাচারিত গ্রামবাসিগণের সেবাকার্য্যের ব্যবস্থা করা হয়। এই সেবাকার্য্যের সূত্রে সজ্জের সম্মানসী প্রচারকগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া হিন্দুগণকে সম্মিলিত ও সজ্জবদ্ধ হইয়া আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইতে আহ্বান করেন। বারোখানি গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর অধিবাসিগণকে লইয়া এক বিরাট সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। আচার্য্যদেব কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া সদলবলে খুলনা হইতে ষ্টীমার যোগে ১২ই জুন নহাটায় উপস্থিত হন। পঞ্চসহস্রাধিক হিন্দুর সম্মেলনে যজ্ঞ, সভা ও মহোৎসবদির অনুষ্ঠান হয়। বারোখানি গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দু প্রতিনিধিগণকে লইয়া হিন্দু-মিলন-মন্দির ও তিনশত গণ্ডিশালী উৎসাহী হিন্দু যুবককে লইয়া হিন্দু রক্ষীদল গঠিত হয়। আচার্য্যের বীর্ঘ্যময়ী বাণী এবং আশ্বাস ও আশীর্ব্বাদে স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীগণ নির্ভয় হয়।

জুলাই মাসে আচার্য্যদেব নৌকাযোগে বাজিতপুর হইতে রওনা হইয়া ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার গ্রামাঞ্চলে প্রচার করিতে করিতে বিখ্যাত পীঠস্থান নীকারপুর পর্য্যন্ত অভিযান করেন; যে সমস্ত গ্রাম তিনি পরিভ্রমণ করেন তন্মধ্যে গৈলা, বাটাঝোড় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

### হিন্দু-সম্মেলনের প্রবর্তন

কুস্তকর্ণের ত্রায় সহস্রবর্ষের সুসুপ্ত হিন্দু জাতির মধ্যে জাগরণ ও নবজীবন-স্পন্দন আনয়নের জন্ত আচার্য্যদেব একদিকে যেমন প্রচারক-

বাহিনী সহকারে কখনো ক্ষুদ্রভাবে, কদাচ বৃহদাকারে বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে ও সহরে সহরে, তথা অন্ধ্রাণ্ড প্রদেশের সহরে সহরে প্রচার্যভিযান পূর্বক হিন্দু-জনসভা ও বক্তৃতাাদি এবং বজ্র-মহোৎসবাদির অহুষ্ঠানের মধ্য দিয়া নানাশ্রেণীর সহস্র সহস্র হিন্দুকে সম্মিলিত করিয়া হিন্দুজাতিগঠনের বাণী, প্রেরণা ও আশীর্বাদ দিতেছিলেন; অপরদিকে তেমনি দেশের নেতৃবর্গ, প্রবীণ ব্যক্তিগণ, শিক্ষিত ও চিন্তাশীল জনগণের মস্তিষ্কে হিন্দুজাতি গঠনের চিন্তা এবং হৃদয়ে হিন্দুত্বের চেতনার উদ্বোধন করিয়া দিবার জন্য দেশের সর্বত্র বিরাট হিন্দু-সম্মেলনসমূহের প্রবর্তন করিতেছিলেন।

### বঙ্গীয় হিন্দু-মহাসম্মেলন

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সম্ভার বাজিতপুর সেবাশ্রমে “বঙ্গীয় হিন্দু মহাসম্মেলনের” অধিবেশন আহ্বান করেন। বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলা হইতে অন্যান্য অর্ধ লক্ষ হিন্দু নরনারী উহাতে যোগদান করে। হিন্দু জাতির অন্তর্গত বহু শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ উহাতে উপস্থিত ছিলেন। দুই দিনব্যাপী বক্তৃতা ও আলোচনায় হিন্দুসমাজের বহু সমস্যার বিশ্লেষণ ও সমাধান নির্ধারণ পূর্বক প্রস্তাবাদি গৃহীত হয়। আত্মসম্বন্ধ রূপে বৈদিক বজ্র, লাঠি, সড়কী, ঢাল, যুগ্মস্ত্র, ব্রতচারী নৃত্য প্রভৃতি বীরত্ব-মূলক খেলার অহুষ্ঠান হইয়াছিল। আচার্যদেব স্বয়ং সম্মেলনের অধিবেশনে এবং যাকৃতীয় অহুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া কার্য পরিচালনা করেন। তদবধি প্রতিবৎসর উক্তরূপে বাজিতপুর সেবাশ্রমেই মাঘীপূর্ণিমা তিথিতে উক্ত প্রকারের “বঙ্গীয় হিন্দু মহাসম্মেলনের” অহুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে।

### সুন্দরবনে অনুষ্ঠিত হিন্দু-সম্মেলন

এই বৎসরে দোল পূর্ণিমা তিথিতে আচার্য্যদেব সুন্দরবনে অঞ্চলের অনুষ্ঠিত শ্রেণীর হিন্দু অধিবাসিগণকে লইয়া এক থিরাট হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন করেন। দলে দলে প্রচারক সন্ন্যাসী প্রেরণ করিয়া সমগ্র সুন্দর-বন-অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে প্রচার করা হয়। সজ্জের আশাশুনি আশ্রমে এই অধিবেশন হয়। দশ সত্তরাধিক নরনারী এই সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিল। সম্মেলনে হিন্দু সমাজান্তর্গত অনুষ্ঠিত শ্রেণীগণের সমস্তা বিশেষ ভাবে আলোচিত ও প্রস্তাবাদি গৃহীত হয়। এতদুপলক্ষ্যে পোণ্ড্রকজিয়গণের টালি খেলা, যুবকবৃন্দের বীরত্ব-মূলক ব্যায়াম ক্রীড়া, যজ্ঞ-মহোৎসব প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তৎপরে প্রতি বৎসর দোল-পূর্ণিমাতে আশাশুনি আশ্রমেই এই সম্মেলনের অধিবেশন নিয়মিত ভাবে হইয়া আসিতেছে।

### পর্কোৎসবগুলিকে হিন্দু-সম্মেলনের রূপদান

অতঃপর আচার্য্যদেব সজ্জের বিভিন্ন আশ্রম ও কর্মক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত পর্কোৎসব ও বার্ষিক মহোৎসবগুলিকে হিন্দু-সম্মেলনের আকার প্রদান পূর্বক হিন্দু জাতি-গঠন-মূলক ভাব ও আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্র করিয়া তুলিলেন।

হিন্দু-সমাজ-সংগঠক সর্বত্রষ্টা ঋষিগণ যেমন ব্যক্তিগত ও আধ্যাত্মিক চরমোৎকর্ষ সাধনের জন্ত দেশ-কাল-পাত্র ভেদে নানাবিধ সাধন-পন্থা প্রচার করিয়াছেন; সঙ্গ্রে সঙ্গ্রে আৰ্য্য হিন্দুর সামাজিক ও জাতীয় জীবনকে অথগু, অটুট, একতান করিয়া তুলিবার জন্ত বিবিধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; হিন্দুর “বাবো মাসে তেরো পার্কণ” গুলি এবং



গ্রহ-নক্ষত্রের যোগাযোগে উদ্ভূত পুণ্য মুহূর্তে পুণ্য ক্ষেত্রে অহুষ্ঠিত ধর্ম-মেলা-মহোৎসবগুলির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সজ্জনতা আচার্য্যদেব হিন্দু-জাতীয়তার পুনরুদ্বোধন কল্পে কালপ্রভাবে হৃত-গৌরব, অর্থ-ভাব-আদর্শহীন, গতানুগতিক সেই পর্ক, উৎসব ও সম্মেলনগুলিকে পুনরায় সামাজিক ও জাতীয় ভাব ও আদর্শ প্রচার এবং সমাজ-সংস্কার ও জাতি-গঠন রূপ উদ্দেশ্যে রূপান্তরিত করিবার সক্ষম করিলেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে সজ্জের খুলনা সেবাশ্রমে অহুষ্ঠিত রাসপূর্ণিমার বিরাট মহোৎসবকে হিন্দু-জাতি-গঠন মূলক আকার প্রদান করিলেন। সার্বজনীন বৈদিক যজ্ঞ, সমবেত পূজা, সশস্ত্র আরতি, নাম-সংকীর্তন, শ্রীকৃষ্ণ-পূজা, শিবপূজা, গুরুপূজা ইত্যাদির সহিত বিরাট হিন্দুজনসভায় হিন্দু-সমাজ ও ধর্ম, এবং হিন্দু-সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা, হিন্দু মিলন-মন্দির ও রক্ষীদল গঠন প্রভৃতি বিষয়ক বক্তৃতা, আলোচনা ও প্রস্তাবাদি গ্রহণ চলিতে লাগিল; ক্রমে লাঠি, ছোরা, ঢাল, সড়কী প্রভৃতির আত্মরক্ষা-মূলক ক্রীড়া-কৌশলও প্রবর্তিত হইল। এইরূপে কলিকাতায় অহুষ্ঠিত শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী ও কালীপূজার উৎসবকে, বাজিতপুরে অহুষ্ঠিত বাসন্তী পূজা ও নীলপূজার উৎসবকে, রথযাত্রা উপলক্ষ্যে অহুষ্ঠিত পুরী সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব ও কাশীতীর্থ সেবাশ্রমে অহুষ্ঠিত দুর্গোৎসবকে রূপান্তরিত করিয়া জাতিগঠনমূলক সার্বজনীন হিন্দুসম্মেলনে পরিণত করিলেন। হরিদ্বার ও প্রয়াগে কুম্ভমেলার অধিবেশনেও দিনের পর দিন হিন্দুজনসভায় হিন্দুধর্ম, সমাজ ও জাতিগঠন বিষয়ে বক্তৃতা ও নানাভাবে মেলায় সমাগত লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারীর মধ্যে হিন্দু-ধর্মের প্রচারের ব্যবস্থা করিলেন।

এইরূপে ধীরে ধীরে আচার্যদেব সজ্জের সমগ্র বহুমুখীন কার্যাবলীকে হিন্দুজাতিগঠনের ভাব ও উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত ও রূপান্তরিত করিয়া ধর্ম-ভিত্তিতে ভারতের মহাজাতির ভিত্তি পত্তনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। বঙ্গলার তথা অন্যান্য প্রদেশে হিন্দুসমাজ-সংস্কার ও হিন্দুজাতিগঠনের একটা অল্পকাল ভাব ও আবহাওয়া এইভাবে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে পর ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে আচার্যদেব জাতিগঠনের স্থনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

### সজ্জ-সন্তানগণের হৃদয়ে প্রেরণা সঞ্চার

ধর্মভিত্তিতে হিন্দুজাতিগঠন আন্দোলনের স্থনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতির প্রবর্তন কল্পে সজ্জনেতা আচার্যদেব একদিকে যেমন অল্পকাল ভাবের আবহাওয়া ও ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছিলেন; অপর দিকে তেমনি তার জাতিগঠন-পতাকার ধারক ও বাহক যারা, সজ্জের সেই প্রচারক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণের হৃদয়ে স্বীয় ভাব, আদর্শ ও কর্মপ্রেরণা শক্তিপূত জলন্তবাণী দ্বারা মুদ্রিত করিয়া দিতেছিলেন :—

“দেশের লোক জানে—সজ্জ যখন যে কাজে হাত দিয়েছে, তা’ সুসম্পন্ন, সফল না করে ছাড়েনি। সজ্জ যখন হিন্দু-জাতিগঠন কাজে নেমেছে, তখন নিশ্চয়ই তা’ সফল হবে। নিজেদের এমন spirit (ভেজঃ) নিয়ে সর্বদা চলতে হবে—আমরাই সকলের অগ্রণী ; আমরাই হিন্দুর ধর্ম-মান-ইজ্জৎ-স্বার্থ-অধিকার রক্ষার জন্ত অগ্রসর ; যদি কোনো আঘাত আক্রমণ আসে, আমাদের বুকেই তা আগে আসবে ; তা’ বুক পেতে নিতে আমরা সর্বদা প্রস্তুত। পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবার লোক আমরা

নই ; লক্ষ বাধাবিপদ এলেও আমরা সঙ্কল্প থেকে বিচলিত হব না। হাঁ! প্রশ্ন—এত বড় বৃহৎ ব্যাপারের জন্য টাকা কোথায় ? আজ না হয় কাল, না হয় পরশু, লোকে আমাদেরকে টাকা দেবেই। আমরা যদি জাতির জন্য প্রাণ দিতে দাঁড়াই, টাকা না দেবে কে ? জীব গায়ের অলঙ্কার বিক্রী করে টাকা দিতে বাধ্য হবে। সেদিন—জীর্গ্গিরই আসছে।”

দেশের নানা ঘটনায় প্রদর্শিত দুঃস্থ-দুর্ভিক্ষ প্রতিপক্ষের প্রতি হিন্দুর অমূলক অস্বাভাবিক আতঙ্কে লক্ষ্য করিয়া আচার্য্য বলিলেন—

“হিন্দুর প্রাণে যে একটা আতঙ্ক দেখা যায়, এটা সম্পূর্ণ অমূলক ; হিন্দুর কে কি করতে পারে ? হিন্দুর শক্তি কোনো প্রতিপক্ষের চেয়ে কম নয়! সম্মুখ-সমরে বীরের মত যদি প্রাণ দিতে পারে, তবে সে এই হিন্দু ; চিরকাল তাই দিচ্ছে এসেছে ! তবে যে অত্যাচার উৎপীড়ন সত্ত্বেও হিন্দু তা করছে না বা পারছে না ;—তার কারণ—হিন্দু আজ কোথায় ? হিন্দু তো আজ আর হিন্দু নাই ? চারিদিকে যা সব—হিন্দু-নামধারী—অবিশ্বাসী, নাস্তিক, শ্লেচ্ছ !

মুসলমানের আর কিছু না থাক—তার আল্লার উপর একটু বিশ্বাস আছে ; কোরাণ তার প্রাণ, মসজিদ তার জান, পয়গম্বর তার সর্ব্ব্ব, নমাজ তার অপরিহার্য্য। কিন্তু তথাকথিত হিন্দুর আছে কি ? দেবদেবীতে ভক্তি-বিশ্বাস নেই। সঙ্ঘাতিক পূজার্ত্তনা নেই। শাস্ত্র-সদাচার নেই, সাধু মহাপুরুষে আস্থা নেই, ধর্ম্ম-কর্ম্মে আস্থা নেই ; নেই বলতে কিছুই নেই ;—অথচ পরিচয় দিবার বেলায়

‘আমি হিন্দু ! হিন্দু আজ দুর্বল, কাপুরুষ কেন ? ধর্মকে হারিয়ে, হিন্দুকে বিসর্জন দিয়ে আজ হিন্দুর এই দুর্দশা, অধঃপতন । যারা বলে—ধর্মই হিন্দুকে দুর্বল করেছে—আমি বলবো—তারা ভণ্ড, আত্ম-প্রতারক, আত্মদ্রোহী, আত্মঘাতী !’

বলিতে বলিতে উত্তেজিত হইয়া আচার্যদেব বক্তৃনির্বোধে বলিতেন—

“সঙ্কল্পে যে দৃঢ়, প্রতিজ্ঞায় যে অবিচলিত, বাবতীয় সিদ্ধি তার করতলগত ;—এই মহাশক্তির বাণী আমি হিন্দুজাতির কাণে কাণে শুনাবো, সকলের মধ্যে মহাশক্তির সঞ্চার করবো । আমি যে হিন্দু-ধর্ম প্রচার করবো, সে ধর্ম কথা বলবে ! ছুঁই দুর্বৃত্তের দল হিন্দুর কি করতে পারে ? আমি দেখিয়ে দেবো, বুঝিয়ে দেবো—হিন্দুর ধর্ম—শক্তির সাধনা, হিন্দুর সাধনা—বীৰ্য্যের সাধনা । আমি হিন্দুর মধ্যে যে শক্তির সঞ্চার করবো, তার কাছে জগতের কোনো শক্তিই দাঁড়াতে পারবে না । এটা ভারতবর্ষ—হিন্দুস্থান, এখানে কারো জারিজুরি খাটবে না ; ফুৎকারে উড়িয়ে দেবো, কোন ভয় নেই । তবে অপরাধীর কাল পূর্ণ হবার প্রতীক্ষায় থাকতে হবে । শিশুপাল ধ্বংস হলো কখন ? কুরুবংশ ধ্বংস হলো কখন ? অপরাধের কাল পূর্ণ হলে । আর পাঁচ সাতটা বছর শরীরটা যদি থাকে তবে ভারতের হিন্দুর চেহারা কিরিয়ে দেবো !”

“আমি যে কি করবো । এখনো তা’ কেউ জানে না । সকলে হয়তো এইটুকু ভাবে—ভারত সেবাস্রম সত্ত্ব গ্রামগুলি

organise (সংগঠন) করছে; কিন্তু এটা তো মাত্র Back ground (পটভূমিকা) তৈরী হচ্ছে। দেশে যদি কোনো brain (চিন্তাশীল) থাকে তবে সে বুঝবে—আমি কোন্ পথে চলছি। আমি যা করবো তা' সজ্জের জন্মদিনে বলেছিলাম—এযুগ মহাজাগরণের যুগ, এযুগ—মহামিলনের যুগ, এযুগ—মহাসমঝয়ের যুগ। ভারতবর্ষ তথা হিন্দু জাতি আবার জাগ্বে, আবার শক্তিশালী হবে—সে একমাত্র আমার ইচ্ছাশক্তির দ্বারা, আমার ইচ্ছাশক্তির দ্বারা হিন্দুসমাজের যাবতীয় দুর্বলতা দূর হয়ে যাবে!’

দেশের নানা ঘটনায় হিন্দুর উপর সাম্প্রদায়িক দুর্জ্ঞেয়তার অমানুষিক অত্যাচার; অথচ তার প্রতীকারে হিন্দুজনসাধারণের নিশ্চেষ্টতা লক্ষ্য করিয়া সঙ্ঘ-সম্মানগণ মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া আচার্যকে বলিতেন—

“আমরা হিন্দু জাতিকে আশ্বাস দিয়া আসিতেছি—উপদেশ দিতেছি যে বিপদে আপদে আমরা তোমাদের সহায়, তোমরা বীরের ছায় অত্যাচার লাঞ্ছনার প্রতিবাদ প্রতিকারে অগ্রসর হও। এখনো যদি আমরা অগ্রণী না হই এবং অত্যাচারের যথোচিত প্রত্যুত্তর দিবার জন্য উদ্বৃত্ত না হই তবে আমাদের উপর হিন্দুজনগণের আস্থা থাক্বে কি করে?”

তখন আচার্যদেব সঙ্ঘসম্মানগণের অবিবেচনা ও হঠকারিতাকে সংযত করিবার জন্য বলিতেন—

“বীরের শক্তি অজ্ঞায়ের প্রতিবাদ ও প্রতীকারের জন্য। ভীম

কুরুক্ষেত্র সমরে দুঃশাসনের রক্তপান করে, দুর্হ্যোধনের উরুভঙ্গ করে জ্যোপদীর অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছিল। কিন্তু তৎপূর্বের প্রকাশ্য সভায় যখন জ্যোপদীর অপমান করা হইল, তখন পাণ্ডবগণ স্থিরভাবে স্বচক্ষে তা' দেখলো; ভীম এক একবার গর্জন করে উঠেছিল; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কেউ কিছু বলেনি। কারণ অশ্রায় অত্যাচারের প্রতীকারের যথোপযুক্ত সমর আসেনি; আয়োজন ও শক্তি-সংগ্রহ হয়নি, ভগবান্দ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতও তারা পায়নি। কিন্তু কাল পূর্ণ হলে, শক্তি-সংগৃহীত ও আয়োজন যথেষ্ট হলে কুরুক্ষেত্র রণে কুরুকুল নিমূল করে তারা প্রতিশোধ নিয়েছিল।”

সম্ভব-সন্তানগণ তখন বুঝিল যে বার্থত: প্রতীকার করিতে হইলে হঠকারীর ছায় কাছ পণ্ড না করিয়া, ধীরভাবে, যাবতীয় উপায়ে হিন্দুজনসাধারণকে সম্মিলিত ও সম্ববদ্ধ করিয়া মহাশক্তির সৃষ্টি করিতে হইবে। সংগঠনের জন্য সমগ্র শক্তি নিয়োগ করা আবশ্যক।

সম্ভব হিন্দু-সংগঠন কর্মপদ্ধতি বাহাতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পথে না যায় সেজন্য আচার্য্যদেব সন্তানগণকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দিতেন—

“আমি সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করতে চাইনে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-সৃষ্টিকারী ছুষ্টের দমন চাই। মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের বলবার বা করবার কিছু নেই। তাদের উপর আমাদের বিন্দুমাত্র আক্রোশ থাকবে না। আমরা চাই—  
তারাও শান্তিতে, সুখে, আনন্দে থাকুক। মুসলমান ধর্ম বহু

শাস্ত্র বা পয়গম্বরের কোনো নিন্দা আমরা করি না ; মুসলমানের নামটীও আমরা উচ্চারণ করবো না। বরং মুসলমানের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্বাব, স্বজাতি-স্বধর্ম্মানুরাগ, সজ্জশক্তি, তাই হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে ; হিন্দুদের চোখে আঁতুল দিয়ে মুসলমানের এই সদগুণ দেখিয়ে শিখিয়ে দিতে হবে। হিন্দুগণকে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে—নিন্দা, গালিবর্ষণ বা আক্রোশ পোষণের দ্বারা শক্তি কদাচ বৃদ্ধি হয় না, হয়—শক্তির অপচয়। সূর্য্য উঠলে অন্ধকার আপনিই দূর হয়ে যায় ! তেমনি হিন্দুর মধ্যে যখন সজ্জশক্তি গড়ে উঠবে, এক হিন্দুর বিপদে সহস্র হিন্দু জান্ দিতে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াবে, তখন সাম্প্রদায়িক দুর্ব্বলগণ আপনা আপনিই সংযত, ত্রস্ত হয়ে যাবে। অত্যাচারীর নিন্দা-গ্লানি—সমালোচনার দ্বারা কি হিন্দুর এই সজ্জশক্তি বা সৌভ্রাত্য বাড়বে ?”

“মিলন ও সংগঠনের চেষ্টা না করে নিন্দা-গালির স্বভাব হিন্দুকে কেমন ভাবে আরও দুর্ব্বল, আরও হিন্নভিন্ন করছে দেখ্—যে কৃষ্ণ, সেই কালী, সেই শিব—একই ভগবৎ-শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ, বিভিন্নরূপ ও ক্রিয়া ; একথা একটা পঞ্চমবর্ষীয় বাচ্চকেও বোঝে ! কিন্তু দেখ্...মঠের সন্ন্যাসীরা কালীর নিন্দা করে, শিবের কুৎসা করে ; কৃষ্ণই সত্য আর সব মিথ্যা ; এই প্রচার করে। তারা বিদ্বান্ পণ্ডিত হয়েও জেনে শুনে কুৎসাও এমনি ছাড়া-লমো করছে। হিন্দু-ধর্ম্মের প্রচারক যদি হিন্দু দেবদেবীর এমনি কুৎসা করে, তবে সাম্প্রদায়িক দুর্ব্বলগণ কেন

সেই দেবদেবীর অঙ্গ কলুষিত করবে না ? বিগ্রহ ভাঙবে না ? আমরা হিন্দু-মিলন-মন্দিরের মধ্য দিয়ে এই মিথ্যা গোড়ামীর প্রচার রোধ করে মিলন ও সমস্বয়ের ভিত্তিতে হিন্দুজ্ঞান-সাধারণকে ঐক্যবদ্ধ ও সহযোগিতা-পরায়ণ করে তুলবো।

গ্রামে গ্রামে হিন্দু-সংগঠন কার্যে বহির্গত হইয়া সজ্জ-সন্তানগণ বহু প্রকার অসুবিধা ও বাধা-বিশ্বের মধ্যে পড়িত। জড়ভাবাপন্ন হিন্দুগণের সহায়ত্বের অভাব, সংশয়াপন্ন মনোবৃত্তি, উদ্যম-উৎসাহ-শূন্যতা লক্ষ্য করিয়া প্রচারক ও কর্মীগণ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িত ; ভাবিত মুষ্টিমেয় সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী বিশাল ভারতে কোটা কোটা হিন্দুর নির্জীব প্রাণে কিরূপে সাড়া জাগাবে ? এত অসম্ভবের সঙ্গে লড়াই করিয়া কতদিন কংসোৎসাহ থাকিবে ?

আচার্য্যদেব সজ্জ-সন্তানগণের এই নৈরাশ্র-অবসাদেব মানি-মানি দূর করিবার জন্য উৎসাহবানীতে তাহাদের হৃদয়ে প্রেরণা সঞ্চার করিতেন—

“আমরা কি না করতে পারি ? আমাদের কি মান অপমানের ভয় আছে ? আমরা কোন্ কাজ করতে পিছপা হই ? আমরা ত্যাগী, আমাদের আসক্তি সেই, আশঙ্কা নেই, বন্ধন নেই ? আমরা হৃৎথকে ডরাইনে, মৃত্যুকে ভয় করিনে, কিসের পরোয়া করি আমরা ? মৃত্যুভাত খেয়ে, এক মুষ্টি-মুড়ি খেয়ে, উপবাস করেও আমরা দিন কাটাতে পারি, গাছতলায় পড়ে থাকতে পারি ! তবে আমাদের চিন্তা কিসের ? এই যে দ্বিবারাত্রি গায়ের রক্ত জল করে দেশে দেশে ঘুরে ভিক্ষা করে



টাকা পয়সা সংগ্রহ করিস,—লক্ষ লক্ষ টাকা, এর একপয়সাও কি তোদের ভোগ-সুখ-আরামের জন্ত ব্যয় করিস ? একহাতে টাকা আনিস, আর এক হাতে দেশের কল্যাণে, জাতির সেবায় বিলিয়ে দিস। বীর কর্মী কর্মক্ষেত্রে সর্ববিধ দুঃখ-দৈন্ত-হুর্ষিপাককে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করবে। তাই জাতির মহামুক্তির জন্ত আমাদেরকে নক্ষত্র বেগে অগ্রসর হতে হবে। সমগ্র বিশ্ব সম্মিলিত হয়েও আমাদের গতি রোধ করতে পারবে না। আমাদের শক্তি—ব্রহ্মশক্তি,—ভগবৎ-শক্তি ; এ শক্তির সামনে হিমালয়ও ফুৎকারে উড়ে যাবে। হিন্দুর ধর্ম-মান-ইজ্জৎ-স্বার্থ-অধিকার রক্ষার জন্ত আমরা সম্মুখ সংগ্রামে দাঁড়িয়েছি ; আমরাই তা করতে পারি ; আমাদের মত লোক যদি না পারে তবে কে পারবে ?”

বর্তমান যুগে আত্মরক্ষাই যে হিন্দুর সবচেয়ে বড় কর্তব্য ; স্বীয় ধর্ম-সমাজ-মান-সন্ত্রম রক্ষার্থ পরস্পর সম্মিলিত সজ্জবদ্ধ হইয়া মহা-শক্তিশালী জাতীয়তার গঠনই যে হিন্দুর সবচেয়ে প্রথমও প্রধান সাধনা—এই কথাটি বুঝাইয়া বলিতেন—

“যখন সজ্জ গড়ে ওঠেনি, তখন বিপ্লববাদীরা আমার কাছে আসতো, তখন থেকেই আমি এই কথা বলে আসছি যে এ ভাবে কিছুই হবে না। বিপ্লব সৃষ্টি না করে জাতি-সমাজ বাতে স্নগঠিত হয়, তার জন্ত তোমরা আত্মবলি দিতে প্রস্তুত হও। লোকে তুলসীর মালা, কাঠের মালা জপ করে—আমি চিরকাল এই মালা জপ করে এসেছি। আমার এইসব কথা

শুনে—ছেলেরা নিত্য নূতন শক্তি, সাহস, প্রেরণা পেতো। আমি জাতিগঠনের স্বপ্ন, পরিকল্পনা তাদেরকে দেখাতাম; তাই তারা আমাকে এত ভালোবাসতো। আমি সন্তোষকে সেদিন বললাম “দেখ্ সন্তোষ, আমি আজ নূতন মানুষ সাজিনি। তিরিশ বছর আগে যা বলতাম, এখনো আমি সেই কথাই বলছি।”

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ—সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ, ধর্ম প্রতিষ্ঠান। কিন্তু “হিন্দু-সমাজ-সমস্বয়” আন্দোলন সৃষ্টি করিতে গিয়া সঙ্ঘ কি স্বীয় ভাব ও আদর্শ থেকে সরিয়া পড়িতেছে না? ধর্মআন্দোলন সৃষ্টি করাই কি সঙ্ঘের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়?—এই ভাবের প্রশ্ন সঙ্ঘ-সম্মান-গণকে সংশয়াপন্ন করিয়া তুলিলে আচার্যদেব তাহাদিগকে বুঝাইয়া-ছিলেন—

“আমি কি কোনো সামাজিক আন্দোলন চাই? আমি কারো কাছে তা কোনো দিন বলেছি? আমি চাই—ধর্মআন্দোলন, ধর্মের ভিত্তিতে জাতি ও সমাজ গঠন। কিন্তু মুখে শুধু ‘ধর্মকর’, ‘ধর্মকর’ বলে চোঁচালে কি ফল হবে? আজ জাতি ও সমাজের সাম্মুখে যে সব সমস্যা তার সমাধান যদি ধর্মের মধ্যে না দেখিয়ে দেওয়া যায়, ধর্মের ভিত্তিতেই যে সমাজ ও জাতির যাবতীয় অভাব-অভিযোগ-ক্রটি-হুর্বলতার অবসান—তা’ বুঝিয়ে না দিলে, কে ধর্ম মানতে যাবে? এই জন্য হিন্দু-জাতিগঠন, হিন্দু-সমাজ-সমস্বয়, হিন্দু-মিলন-মন্দির, হিন্দু-সঙ্ঘ-শক্তি গঠন করতে হবে বলে ডাক দিয়েছি, অমনি দেশবাসীর

কাণ খাড়া হয়েছে ? আর সেই সুযোগে খাটা ধর্মের বৃত্ত-সঞ্জীবনী মহাশক্তি-মন্ত্র দানের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে। জাতির ভূত-ভবিষ্যৎ যে জানে, নাড়ী-নক্ষত্রের সংবাদ যে রাখে, সেইই জানে কোন্‌ খানে আঘাত করলে সমগ্র জাতির প্রাণ সাড়া দেবে। সেই ভাবেই আমি “হিন্দু-সমাজ সমন্বয়” আন্দোলন প্রবর্তন করেছি।”

ভারতীয় জাতির—হিন্দু-জাতির আদর্শ—ত্যাগ। হিন্দুর ধর্ম, সমাজ, জাতি, পরিবার—সমস্তই এই ত্যাগের আদর্শ ও সাধনার উপর গঠিত। এই আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হবার ফলেই হিন্দু আজ আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থ-কেন্দ্রিক হইয়া পড়িয়াছে। সত্ত্বের হিন্দু-সংগঠনের মূলে এই ত্যাগের আদর্শ; তাই হিন্দুজনসাধারণকে ত্যাগের আদর্শে উৎসাহ করিতে হইবে। দেশজাতি সমাজের চিন্তা ও স্বার্থরক্ষা আগে, ব্যক্তিগত সুখস্বার্থ পরে দেখিতে শিখাইতে হইবে। এই কথা সত্যসন্তানগণকে বুঝাইয়া আচার্য্য বলিলেন—

‘ত্যাগ মানুষকে অমিত তেজোবীর্য্যের অধিকারী করে। ভোগ মানুষের শক্তি-সাহস, বিক্রমপরাক্রম হরণ করে। এক সময়ে বিপ্লববাদীগণ যথেষ্ট ত্যাগ ও সংযমের আদর্শ দেখিয়েছিল; তাদের পথ অভ্রান্ত ছিল না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা, তাদের সংযম, তাদের বিলাস-হীনতা, তাদের কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও “বিপদ-বরণ, জাতির জন্য আত্মোৎসর্গ;—অস্বীকার করবে কে? গভর্নমেন্ট শত শত পীড়নের কৌশলেও তাদেরকে দমাতে পারেনি; বরং

পাঁড়নের ফলে তাদের তেজোবীৰ্য্য বেড়ে গিয়েছে। তখন গভৰ্ণমেণ্ট দেখলো—এ পথে হবে না। তাদের ক্ষুদ্র বিলাস-ভোগের ব্যবস্থা করে দিলো। ছেলেরা ভাললো গভৰ্ণমেণ্টের পয়সা, যত খসিয়ে নেওয়া যায়, মন্দ কি? ফলে তাদের সৰ্ব্ব-নাশ হলো! সেই সব সোণার ছেলে আজ বিবাহ করে, সংসার-বন্ধনে পড়ে দেশজাতির চিন্তা পরিত্যাগ করে, পেটের চিন্তায় বিভ্রত।”

“গুরু রামদাস—শিবাজীকে জাতি-গঠনের কি আদর্শ দেখিয়েছিলেন—‘এ রাজ্য ভোগীর নয় ত্যাগী সন্ন্যাসীর’—এই বলে নিজের গৈরিক কাপড়কে পতাকা করে শিবাজীর হাতে দিলেন। গুরু গোবিন্দ কোন আদর্শে খালসা শিখ গড়েছিল? গুরুর আদেশে সৰ্ব্ব ত্যাগে, জীবন ত্যাগে আগ্রহান্বিত থাকবে—এই ছিল—তার প্রেরণা ও শিক্ষা। তাইতো মারহাটা ও শিখ জাতি দুর্জয় হয়ে উঠেছিল। সেই আদর্শ পরিত্যাগ করে যখন তারা অর্থ-লিপ্সু ও প্রভুত্ব-প্রিয় হয়ে উঠলো, তখনই হলো—তাদের পতন;—এই ভাব ও আদর্শ হিন্দু-জনসাধারণের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে।”

সংঘের জাতি-গঠন আন্দোলন ও তাহার কর্মপদ্ধতি “হিন্দু-মিলন-মন্দির” এর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বুঝাইয়া আচার্য্যদেব বলিতেন—

“আমরা চাই সংস্কার, মিলন, সংগঠন। কিন্তু আমরা এমন কিছু করবো না যাতে সমাজে বিপ্লব আসতে পারে, অথবা আদর্শের বিপর্য্যয় ঘটতে পারে। এই ছিন্ন বিছিন্ন হিন্দু

জাতি সম্মিলিত, সবল, সুস্থ, সতেজ, সজ্জবদ্ধ শক্তিমান্ হয়ে যাতে নিজের আদর্শের পথে লক্ষ্যের পথে চলতে পারে ;—  
আমরা তেমন সেবাই করবো ।

ভারতবর্ষের—হিন্দুজাতির প্রকৃতিই এমনি যে ধর্মকে ভিত্তি করে ছাড়া যথার্থ সমষ্টি-জীবন গঠন অসম্ভব । কংগ্রেস রাজ-নৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে ভারতীয় সমষ্টি-জীবন গড়ে তুলতে চায় ; আমরা ধর্মকে ভিত্তি করে জাতি গঠন করতে চাই ।

ধর্মের উচ্চতর ভাব, আদর্শ জন-সাধারণের জ্ঞাত নয় । সমাজে, পরিবারে নানাবিধ সংস্ক, দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে ধর্মের যে আদর্শের বিকাশ ও প্রকাশ, তাইতো জনসাধারণের ধর্ম ; তাকে অবলম্বন করেই সমষ্টি-জীবন গড়ে ওঠে । সমাজের মধ্যেই ধর্মের লৌকিক রূপ প্রকটিত হয় !

“আমরা রচনা করবো—একটা মিলন-ক্ষেত্র, যেখানে সর্ব-শ্রেণীর হিন্দু একত্র সম্মিলিত হবে । এই মিলন-ক্ষেত্রের নাম হবে “হিন্দু-মিলন-মন্দির” । সেটা হিন্দুর সার্বজনীন-মিলন-ক্ষেত্র—সম্মিলিত শক্তি-কেন্দ্র । যে কোনো সময়ে যে কোনো পর্ব বা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সহস্র সহস্র হিন্দু তথায় সম্মিলিত হবে । এই মিলন-মন্দির হবে—ধর্ম-প্রচার, শিক্ষাবিস্তার, সমাজ-সংস্কার, সজ্জবদ্ধ-সংগঠনের—কেন্দ্র । এই মিলন-মন্দিরের মধ্য দিয়েই—হিন্দুর পরিবার, সমাজ,—জাতীয় জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হবে ।”

# হিন্দু-মিলন-মন্দির কর্ম-পদ্ধতি

## প্রবর্তন

এইরূপে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর হইতে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই পর্য্যন্ত আচার্যদেব একদিকে বিভিন্ন উপায়ে জনসাধারণের মধ্যে হিন্দু-সমাজ-সমন্বয় আন্দোলনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতির প্রচারপূর্ব্বক অল্পকূল ভাবের আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক প্রস্তুত করিতেছিলেন ; সমাজের উচ্চতম স্তর ও শ্রেণী হইতে নিম্নতম শ্রেণীর গ্রামবাসী কৃষক শ্রেণীর জনগণকে পর্য্যন্ত হিন্দু জাতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভাবাইতেছিলেন। আবার এই আন্দোলনের আদর্শ ও ভাবধারার বাহক এবং হিন্দু-সমাজহিতে আত্মোৎসর্গকারী কর্মী—সজ্জ্বর সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে জলন্ত ভাষায়, উদ্দীপনাময়ী বাণী ও প্রেরণা দান পূর্ব্বক কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্ত ইঙ্গিত দিতেছিলেন।

সমসাময়িক ঘটনাবলী এবং রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি তদীয় আন্দোলনের অল্পকূল হইয়া দাঁড়াইল। মে মাসে যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমার অন্তর্গত গ্রামবাসী হিন্দু-মুসলমানগণের মধ্যে দাঙ্গার ফলে হিন্দুগণের যে ছরবস্থা ঘটিল, তাহাতে হিন্দু-জন-সাধারণের মধ্যে কিয়ৎ-পরিমাণে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। এই ঘটনা হিন্দু-জনসাধারণের মনে কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পাবনার ও কিশোরগঞ্জের হিন্দু অধিবাসীগণের উপর অল্পাধিক অবর্ণনীয় সাম্প্রদায়িক অত্যাচারের স্মৃতি জাগাইয়া তাহাদের অসহায় অবস্থার বিষয়ে চিন্তা জাগাইয়া দিল। তৎপরে নব গঠিত লীগ-মন্ত্রীদলের গঠনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে গ্রামে গ্রামে যে সাম্প্রদায়িকতার তাণ্ডব স্কন্ধ হইল তদ্বারা প্রত্যেক হিন্দুর হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার হইল। কংগ্রেসের

হিন্দু-মুসলমান মিলনের ঘুম-পাড়ানিয়া মন্ত্রের মোহজাল ছিন্ন করিয়া বাঙ্গলার হিন্দু স্বীয় সঙ্কটজনক পরিস্থিতির প্রতি দৃকপাত করিয়া দেখিতে ও বুঝিতে পারিল—তাহারা হিন্দু-মুসলমান-মিলনের স্বপ্ন ও সাধন-প্রেরণায় স্বীয় স্বার্থ-অধিকার-দাবী-মর্যাদা ক্রমে ক্রমে বলি দিতে দিতে আজ এমন অবস্থায় আসিয়া বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে আর পিছনে হঠিবার জায়গা নাই; হয় তাহাকে বিপদের সঙ্গে যুঝিয়া অগ্রসর হইতে হইবে; নতুবা সাম্প্রদায়িক দম্বার কবলে আত্মদান করিয়া মৃত্যুকে বরণ করিতে হইবে। হিন্দুর চমক ভাঙিল। মহাত্মা গান্ধীর মত অহিংসা-মন্ত্রের একনিষ্ঠ উপাসককেও স্বচক্ষে নোয়াখালীর হিন্দুর অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে আত্মরক্ষার জন্ত আবশ্যক হইলে হিন্দুকে হিংসা-মূলক উপায়ও গ্রহণ করিতে হইবে।

### পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে প্রথম প্রচারাভিযান

সম্মেন্তা আচার্য্যদেব অভীষ্ট আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত উপলব্ধি করিয়া পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে “হিন্দু-মিলন-মন্দির” কৰ্ম-পদ্ধতি রীতিমত ভাবে প্রবর্তনপূর্বক অথও হিন্দু-সংহতি গঠনের সূত্রপাত করিতে উদ্যোগী হইলেন। বিশজন সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী সম্বলিত একটি প্রচারক-বাহিনী গঠন করিলেন। পূর্বেই কয়েক জনকে চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন সহরে সহরে নির্দ্ধারিত তারিখ অনুযায়ী সম্মেলনের আয়োজন ও প্রচার কার্যের জন্ত প্রেরণ করিলেন। প্রত্যেক স্থানে পূর্ব হইতেই সম্মেন্তা আচার্য্যদেবের শুভাগমনবার্তা ও উদ্দেশ্য জ্ঞাপন পূর্বক স্থানীয় হিন্দু-নেতৃবর্গ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে উদ্যোগী করিলেন ও শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করা হইল। বিভিন্ন ভাবে বিজ্ঞাপনাদি

ছাপাইয়া সহরে ও গ্রামে সর্বত্রি ঢোল সহরং ও এবং অস্ত্রাস্ত্র বিবিধ উপায়ে প্রচার করা হইতে লাগিল।

বাক্সলার হিন্দু-জনসাধারণ কয়েক বৎসর যাবৎ সংবাদ-পত্রাদিতে সজ্জের ‘হিন্দু-সমাজ-সম্বন্ধ’ আন্দোলনের কথা শুনিয়া আসিতেছিল এবং সজ্জনেতা আচার্যদেবের প্রচারাভিযান এবং হিন্দু-সম্মেলনাদির কার্য-বিবরণী দেখিতেছিল; এখন সাক্ষাৎ সেই আচার্যকে দেখিবার জন্ত, তাঁর নিকট হিন্দু-সংগঠন বিষয়ক সমস্তার সমাধান শুনিবার জন্ত সর্বত্রি হিন্দু-জন-সাধারণ আগ্রহান্বিত হইয়া রহিল।

আচার্যদেব সদলবলে প্রাতে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া ২২শে জুলাই রাত্রিতে চাঁদপুর পৌঁছিলেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে ২৪শে বাবুহাটে, ২৫শে নোয়াখালীতে, ২৬শে চৌমোহনীতে ও ২৯শে কল্যাণদিতে, দেবপাড়ায়, ২৮শে কুমিল্লায়, ২৯শে চট্টগ্রামে, ১লা আগষ্ট ফেনীতে, ৪ঠা আগষ্ট পাবনা এবং ৫ই আগষ্ট রাজসাহীতে শুভ পদার্পণ করেন। আচার্যের শুভাগমনোপলক্ষ্যে প্রত্যেক সহরে অভূতপূর্ব সাড়া পড়িয়াছিল। তাঁহাকে শোভাযাত্রা সহযোগে অভ্যর্থনা করিয়া নিবার জন্ত স্থানীয় নেতৃবর্গের সহিত স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ও হিন্দু-জনসাধারণের সমাগম সর্বত্রিই অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম টেসনে লোক-সমাগম হইয়াছিল—বহুসংখ্য। প্রত্যেক স্থানে অজস্র পুষ্প-মাল্যাদিতে ভূষিত করিয়া কীর্তন ও গগনভেদী জয়ধ্বনি সহকারে আচার্যদেবকে শোভাযাত্রা করিয়া নির্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। দিবারাত্র আচার্যদেবকে দর্শন ও হিন্দু-সংগঠনের বাণী শুনিবার জন্ত শত শত নরনারীর জনতা লাগিয়াছিল।

সম্মেলনের অধিবেশনেও নরনারীর সমাগম প্রচুর হইয়াছিল এবং তাহারা প্রহরকাল ব্যাপী বক্তৃতা ও আলোচনা স্থির ভাবে প্রবণ



করিয়াছিল। নেতৃবর্গ আচার্যের সহিত সাক্ষাৎপূর্বক হিন্দু-মিলন-মন্দিরের কর্ম-পদ্ধতির রীতিপ্রকৃতি বিশদভাবে আলোচনা করিয়া “হিন্দু-মিলন-মন্দির” স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

আচার্যদেব আলোচনা প্রসঙ্গে নেতৃবর্গকে বুঝাইয়া দেন—

“হিন্দু-মিলন-মন্দির—কোনো সাধারণ দেব-মন্দির নয়। মন্দির তো বাঙ্গলায় সর্বত্র সহস্র সহস্র আছে ; সেগুলির সঙ্গে হিন্দুর দৈনন্দিন জীবনের কোনো সংযোগ নেই। ছেলের জন্ত মানত করলো ; মানত পূর্ণ হলে পূজা দিয়ে আসলো। তার পর সারা বছর আর মন্দিরের সঙ্গে সম্বন্ধ রইলো না। রাজ্যের চামচিকা আর কবুতরের রাজত্ব সেই মন্দিরে। তেমন মন্দির আমি করতে চাইনে। কুমার প্রমথ রায় ( ভাগ্যকুল ) আমাকে জিজ্ঞাসা করলো—মহারাজ, দেশে তো হাজার হাজার মন্দির আছে, আবার আপনি মন্দির তৈরী করতে চান কেন ? আমি তাকে বুঝিয়ে দিলাম—আমার মন্দির কোনো ইট পাথরের মন্দির নয়। ইট পাথর গোঁথে গোঁথে লোকে মন্দির করে ; আমি হিন্দু-সমাজের ঋণ বিধি অঙ্গগুলো, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অংশগুলোকে গোঁথে গোঁথে বিরাট হিন্দু-মিলন-মন্দির তৈরী করবো। আমার মিলন-মন্দির হচ্ছে—হিন্দুর সার্বজনীন মিলন-ক্ষেত্র, সর্বশ্রেণীর হিন্দুর সমবেত ভজন-উপাসনা এবং যাবতীয় সামাজিক ও জাতীয় সমস্তার সমাধানের ক্ষেত্র ; এই মিলন-মন্দিরকে অবলম্বন করেই হিন্দু সম্ভবতঃ, শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

হিন্দুর বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, অর্থ-সামর্থ্যও আছে ; নাই—তার সজ্জশক্তি ; এক সজ্জশক্তির অভাবেই হিন্দু আজ সাম্প্রদায়িক অত্যাচার-লাঞ্ছনায় বিপন্ন ! আমি মিলন-মন্দিরের জাল ফেলে সমগ্র হিন্দু-জন-সাধারণকে গোঁথে গোঁথে হিন্দু-সজ্জশক্তি সৃষ্টি করবো। তখন যে যেখানে আছে--প্রত্যেক হিন্দু অনুভব করবে আমার পিছনে কোটা কোটা হিন্দু ভ্রাতৃগণের শক্তি বর্তমান। ছুঁই-ছুঁর্বৃত্তের দলও তখন আপনা থেকে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।”

শুদ্ধি বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে আচার্য্যদেব হিন্দু-নেতৃবর্গকে বুঝাইয়া দেন—

“ঘরের দরজা বন্ধ রেখে যদি কাউকে ঘরের মধ্যে আসতে আহ্বান করা হয়, তবে সেটা কি নিতান্ত বাজে কথা হয় না ? ধর্ম্মাস্তুরিত হিন্দুগণকে শুদ্ধি করে সমাজে নেওয়া ভালো কথা এবং অত্যাবশ্যকও বটে ; হিন্দু ঋষিগণ কোটা কোটা অনার্য্যকে শুদ্ধি পূর্ব্বক সমাজে গ্রহণ করেছিলেন বলেই আজ হিন্দু-সমাজ এত বড় হতে পেরেছে। কিন্তু শুদ্ধি-কৃত নর-নারীকে সমাজে স্থান দান করবে কে ? কার হুকুম সমাজ মাথা পেতে নেবে ? সমাজ যদি স্বেচ্ছায় গ্রহণ না করে, জোর করে কি কেউ তাকে গ্রহণ করাতে পারে ? হিন্দু সম্রাটের হাতে রাজদণ্ড থাকলে হয়তো তেমন একটা চেষ্টাও হতে পারতো ! কিন্তু বর্তমান অবস্থায়—ব্যাপক ভাবে শুদ্ধি ক্রিয়া কেউ করতে পারে না।

অবশ্য ছুটোছাটা ভাবে দু'চারটি শুদ্ধি করে সমাজের মধ্যে স্থান করে দেওয়া কষ্ট হবে না ; তেমন হচ্ছেও ।”

“শুধু মুখের কথায় শুদ্ধি হবে না । সমাজের মধ্যে ভায়ে ভায়ে দরদ-সহানুভূতির ভাব না জাগাতে পারলে, ঘৃণা-অবজ্ঞা-অস্পৃশ্যতার কালিমা মুছে ফেলতে না পারলে, কাউকে ডেকে সমাজে আনা যাবে না । যে কারণে লক্ষ লক্ষ হিন্দু হিন্দু-ধর্ম ও সমাজকে পরিত্যাগ করে পরধর্ম ও পর-সমাজের আশ্রয় নিয়েছে, সেই কারণগুলি বর্তমান থাকতে হিন্দু-সমাজে কি তারা আসতে চাইবে ? মুসলমান-খৃষ্টানগণ তাদের ধর্ম প্রচারের জন্ত সহস্র সহস্র প্রচারক নিযুক্ত করে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে । হিন্দুগণ তাদের ধর্ম প্রচারের জন্ত কি চেষ্টা করছে ? একজন হিন্দু যদি মুসলমান হয়, অমনি তার জন্ত মুসলমানগণ শত শত টাকা চাঁদা তুলে দেয় ; অথচ একজন ধর্মাস্তরিত হিন্দুকে যদি শুদ্ধি করে সমাজে নেওয়া হয়, একটি পয়সাও কেউ তাকে দিতে চায় না ; মুখের সহানুভূতিও দেখা যায় না ।

আমি চাই—তেমন ব্যাপক আন্দোলন যাতে হাজারে হাজারে ধর্মাস্তরিত নরনারী হিন্দু-সমাজে প্রবেশ করে আৰ্য্য ধর্ম ও আৰ্য্য আচার গ্রহণ করবে ।” আর আমার সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত আমি মিলন-মন্দির কর্ম-পদ্ধতির পরিকল্পনা করেছি । গ্রামে গ্রামে মিলন-মন্দিরের সাপ্তাহিক অধিবেশনে হিন্দু-সমাজের আদর্শ, হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত ঋষিগণের বিধি-বিধান, হিন্দু-সমাজের

বিবর্তনের ইতিহাস, হিন্দু-সমাজের ক্ষয় ও তাহা নিবারণের উপায় প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনার দ্বারা হিন্দু-জনসাধারণের হৃদয়কে উদার, সমষ্টিচেতনা-সম্পন্ন, সহানুভূতিশীল করে তুলবো। তখন সমাজ দুয়ের খুলে দেবে ; আর হাজার হাজার লোককে শুদ্ধি করে সমাজে নিতে পারবো।”

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিলে আচাৰ্যদেব নেতৃস্থানীয় হিন্দুগণকে বলেন—

“হিন্দু কখনো হিন্দুর নিকট অস্পৃশ্য হতে পারে না, অনাচরণীয় হতে পারে না। শাস্ত্রপ্রণেতা আৰ্য্য ঋষিগণ কদাচ একথা স্বীকার করেন নি—তা’ তাদের স্বীয় স্বীয় জীবন ও আচরণে প্রকাশ। মধ্য যুগের ধৰ্মবিপ্লব, সমাজবিপ্লব ও রাষ্ট্র-বিপ্লবের ফলে লোকাচার, দেশাচার, জাতী-আচারের গোলক-ধাঁধায় পড়ে শাস্ত্র-সদাচার ভুলে আত্মবিস্মৃত হিন্দু-জনসাধারণ এই কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে আছে। হিন্দু-সমাজের এই অনাচরণীয়তা ও অস্পৃশ্যতার গ্রানিকে মুছে ফেলতে হবে।

কিন্তু এখানেও সেই কথা। সমাজ যদি বিবেকবুদ্ধিবশতঃ স্বেচ্ছায় এই কুসংস্কার পরিত্যাগ না করে ; তবে গায়ের জোরে কেউ তা করাতে পারবে না। স্মৃতরাং যারা রাতারাতি অস্পৃশ্যতা দূর করে সব একাকার করার পক্ষপাতী, বলবো, তারা ভ্রান্ত, অনিষ্টকারী বটে। সমাজস্থ জনসাধারণকে খাঁটি শাস্ত্র ও

সদাচার বুঝিয়ে দিতে হবে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে যে হিন্দু ঋষি ও শাস্ত্র-কর্তৃগণ এই কুসংস্কার প্রবর্তন করেন নি ; অথচ এই কুসংস্কার কিরূপে হিন্দু-সমাজের সর্বনাশ সাধন করছে। জনসাধারণ যখন বুঝবে তখন এই কুসংস্কার বর্জন-প্রচেষ্টা সহজ ও সফল হবে।

আমি মিলন-মন্দিরের সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে শাস্ত্র-সদাচার প্রচার এবং অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তার অনিষ্ট-কারিতা প্রচার করছি ; এই ভাবে উক্ত পাপের সমূলোচ্ছেদের আয়োজন হচ্ছে। হিন্দু-সমাজের যাবতীয় শ্রেণীর জনগণকে মিলন-মন্দিরে একত্র করে আমি এ বিষয় ভাবাবো। তখন অস্পৃশ্যতা-অনাচরণীয়তা সমাজ ছেড়ে পালাবার দিশে পাবে না।”

(১) সমাজের গোপন অন্তরালে প্রবাহিত ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যার শ্রোত নিরোধ (২) বিধর্মীর কবল হইতে রক্ষা এবং (৩) হিন্দুর সংখ্যাবৃদ্ধি ; এই তিনটি কারণ প্রদর্শন-পূর্বক বিধবা বিবাহের সমর্থন করিয়া নেতৃস্থানীয় হিন্দুগণ আচার্য্যদেবের সিদ্ধান্ত জানিতে চাহিলে তিনি প্রশান্ত গম্ভীর অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলেন—“ত্যাগ, সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, সতীত্ব ও পাতিব্রতা”—হিন্দু ধর্ম ও সমাজের ভিত্তি। জগতের অশান্তি যাবতীয় ধর্মমত, ও সমাজের সহিত হিন্দুর পার্থক্য এখানে। এই বৈশিষ্ট্য পরিত্যক্ত হলে হিন্দুজাতির বাঁচবার কোনো সার্থকতা না

আবশ্যকতা থাকে না। বিধবার পুনর্বিবাহ দ্বারা হিন্দু-ধর্ম, হিন্দু-সমাজের মূলে কুঠারাঘাত করা হয় ;—এইটা হচ্ছে প্রথম ও প্রধান কথা। তা' ছাড়া—পুনর্বিবাহের দ্বারা বিধবার জীবনের সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আরো যে বহু সমস্যার সৃষ্টি করা হচ্ছে—সে কথা কে ভাবছে ? সমাজে লক্ষ লক্ষ কুমারীর যে বিবাহ হচ্ছে না, তার সমাধান কোথায় ? বিবাহ না হলে তারা যে বাভিচারিণী হবে, ধর্মাস্তর গ্রহণ করবে—তার প্রতীকার কে করে ?

বিধবা বিবাহ স্বীকৃত হলে—শান্তিময় দাম্পত্য জীবন সম্ভব হয় কি ? স্বামী যদি জানে যে তার মৃত্যু হলে তার স্ত্রী অশ্রু ব্যক্তিকে স্বামীত্বে বরণ করবে, তবে সে কি স্ত্রীকে বিশ্বাস করতে, ভালোবাসতে পারে ? স্ত্রী যদি ভাবে যে তার স্বামী গত হলে সে অশ্রু পুরুষকে আশ্রয় করবে, তাহলে স্বামীর প্রতি তার ভক্তি-ভালোবাসা-সেবার ভাব থাকতে পারে কি ? পুত্র কন্যা যদি জানে যে পিতার মৃত্যু হলে তাহাদেব মাতা অশ্রু পুরুষের অঙ্কশায়িনী হবে, তবে কি তারা মাতাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি-সম্মানের দৃষ্টিতে দেখবে ? স্বামী যদি রোগগ্রস্ত, অক্ষম, দুর্বল, বিকলাঙ্গ হয়, তবে স্ত্রী পুরুষান্তরের কামনায় তাকে বিষপ্রদানেও হত্যা করতে কুণ্ঠিত হবে না ! ফলে—গার্হস্থ্য জীবন, দাম্পত্য জীবনের হবে—সমাধি ; আর পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় বিবাহ-বিচ্ছেদের কোলাহল ও মামলায় আদালত ভারাক্রান্ত হয়ে

উঠবে। বিধবা-বিবাহ যে সমর্থন করবে—সে হবে হিন্দু সমাজের পরম শত্রু।”\*

হিন্দু-সমাজের ভেদবিবাদ, মনোমালিন্য, দলাদলি ইত্যাদি সমস্তার উল্লেখ করিয়া তিনি হিন্দুনেতৃবর্গকে বিশেষ করিয়া বলেন “একত্র বসবাস, একত্র মেলামেশা, এক সঙ্গে চলাফেরা করতে করতে অত্যন্ত অচেনা, অজানা ব্যক্তিও সহোদরাধিক আত্মীয় হয়ে যায় ; অথচ পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ, মেলামেশা, চলাফেরা না থাকলে নিতান্ত আপনার লোকও পর হয়ে যায়। যে যথার্থ সূক্ষ্মদর্শী, সে স্পষ্ট দেখতে পাবে হিন্দু-সমাজের এই যে ভেদবিবাদ, দলাদলি, সহযোগিতা, সমবেদনার অভাব—এসবের মূলকারণ—মিলনের অভাব ; একই উদ্দেশ্য নিয়ে একত্র মিলিত হওয়ার অভ্যাস না থাকার দরুণ—এই সব গ্লানির উৎপত্তি। যদি গ্রামে গ্রামে রীতিমত সপ্তাহে সপ্তাহে আত্ম-রক্ষার,—ধর্ম-সমাজ রক্ষার, মান-ইজ্জৎ-অধিকার রক্ষার সম-উদ্দেশ্য নিয়ে সর্বশ্রেণীর হিন্দুগণের নিয়মিত মিলনের ব্যবস্থা করা যায়, তবে দেখা যাবে, বারো আনা সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। সামান্য যা কিছু থাকবে, সেটা হিন্দু-ধর্মের ও সমাজের আদর্শ ও অনুষ্ঠান যথাযথ ভাবে প্রচারের মধ্য দিয়েই দূর হবে।”

---

\* স্বামী বিবেকানন্দও বিধবা বিবাহ সমর্থন করেন নাই। আলোচনা প্রসঙ্গে মস্তব্য শুনাইয়াছিলেন যে বিধবার বিবাহ হওয়া উচিত কি অসুচিত, কয়টা বিধবার বিবাহ হইল কি হইল না—এসবের উপর জাতির উন্নতি অবনতি নির্ভর করেনা।

আচার্য্যদেবের জলন্ত প্রেরণা, আশ্বাস ও অভয়বাণীতে উৎসাহিত হইয়া নোয়াখালী, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, পাবনা, রাজসাহী এই কয়েকটা জেলায় হিন্দুনেতৃত্বদ্বন্দ্ব এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সজ্জের হিন্দু-মিলন-মন্দির কর্মপদ্ধতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিলেন। হিন্দু মিলন-মন্দির কমিটি গঠন করিয়া সজ্জনেতা আচার্য্যের প্রতিকৃতি সহ আবেদন পত্র প্রচার পূর্ব্বক প্রতি জেলায় সমগ্র হিন্দু অধিবাসিগণকে গ্রামে গ্রামে হিন্দু-মিলন-মন্দির স্থাপনের জন্ত নির্দেশ জ্ঞাপন করিলেন। চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফেনী, চৌমুহনী, চাঁদপুর, কুমিল্লা, পাবনা ও রাজসাহী—এই কয়েকটা স্থানে প্রধান প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হইল। সজ্জের সন্ন্যাসী ও সজ্জ হইতে নিবৃত্ত প্রচারকগণ উক্ত জেলাগুলির গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া হিন্দুজনসভায় সাধারণ বিপদে আত্মরক্ষার জন্ত মিলন-মন্দির স্থাপনের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। প্রতি জেলাতে বহু সংখ্যক মিলন-মন্দির কয়েক মাসের মধ্যে স্থাপিত হইল। সাম্প্রদায়িক উপদ্রব ক্রমেই নগ্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে করিতে চরমে উঠিয়াছিল। সজ্জ-সন্ন্যাসী ও প্রচারক-গণের অবিরাম অক্লান্ত প্রচার ও সংগঠনের ফলে সাম্প্রদায়িক দুর্জ্বলগণ সংঘত হইতে বাধ্য হইল। নোয়াখালী, ত্রিপুরা, পাবনা, রাজসাহী, মালদহে পরপর কতকগুলি ঘটনায় সজ্জের সন্ন্যাসী, প্রচারক ও কর্মীগণের সজ্জবদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধা প্রাপ্ত হইয়া তাহারা বুঝিয়াছিল যে অবাধভাবে আর সাম্প্রদায়িক অত্যাচার চালান সম্ভব হইবে না।



# হিন্দু-সমাজ-সমন্বয় আন্দোলনের প্রভাব বিস্তার

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই আচার্যদেবের অভীষ্ট হিন্দু-মিলন-মন্দির কর্মপদ্ধতি বাঙ্গলার চতুর্দশটি জেলায় প্রসারিত হইয়া পড়িল; তন্মধ্যে চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগে ব্যাপকভাবে কার্য চলিতেছিল। বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় এই হিন্দু-সংগঠন কার্য ব্যাপকভাবে বিস্তারিত করিবার জন্ত আচার্যদেব সন্ন্যাসী ও প্রচারকবৃন্দকে সর্বত্র গ্রামে গ্রামে ঘোরণ করিতেছিলেন। বাঙ্গলার অশীতি সহস্র গ্রামের হিন্দু অধিবাসিগণের যাবতীয় সংবাদ যাহাতে সজ্জের কার্যালয়ে পৌছিতে পারে, তজ্জন্ত নানাভাবে উপদেশপত্রাদি ছাপাইয়া গৃহে গৃহে, জনে জনে প্রচার করিবার ব্যবস্থা করেন। মধ্যে মধ্যে স্বয়ং সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারি-কর্মিগণসহ বিভিন্ন সহরে ও গ্রামে শুভপদার্পণ পূর্বক উৎসাহ-উদ্বোধনা সৃষ্টি করিতেছিলেন।

এই বৎসরেও বাঙ্গিতপুর আশ্রমে “বঙ্গীয় হিন্দু-মহা-সম্মেলনের” অধিবেশনান্তে তিনি সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারি-কর্মিগণসহ নোপথে বাঙ্গলার নানাস্থানে প্রচারাভিযান করেন। বরিশাল জেলার হিন্দু অধিবাসিগণের (নমঃশূদ্র) পুনঃ পুনঃ আগ্রহে তিনি দ্বিতীয়বার **শ্রীরামকাঠী মিলন-মন্দিরে** শুভপদার্পণ করেন—মার্চ মাসে। দশসহস্র হিন্দু নর-নারীর বিরাট সম্মেলনে বজ্র, পূজা, আরতি, মহোৎসব, ম্যাজিক লঠনে হিন্দুর প্রাচীনকীর্তি প্রদর্শন, জনসভার অধিবেশনে বক্তৃতা, আলোচনা ও প্রস্তাবাদি গৃহীত হয়। দুইটি দিবসব্যাপী বিরাট আনন্দ ও উৎসাহের

শ্রোত বহিষ্কা ছিল। খুলনা, ফরিদপুর, বরিশালের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। আচার্যদেবের প্রতিকৃতিসহ তদীয় হিন্দু জাতিগঠন মূলক সিদ্ধান্তপূর্ণ অভিভাষণ সমস্ত সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইলে উহা হিন্দু-নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

## গয়ালী পাণ্ডার দমন

ইতিমধ্যে বিহার হইতে বাঙ্গালী বহিষ্কারের আন্দোলনের সুযোগে গয়ালী পাণ্ডাগণ সজ্জের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়া সজ্জের গয়া সেবাশ্রমের আশ্রিত কোনো যাত্রীকেই পিণ্ড দিতে দিবে না বলিয়া ঘড়ঘড় করিল। তখন প্রতিদিন ৫৭ শত যাত্রী গয়া আশ্রমে আসিতেছে। সপ্তাহখানেক পুলিশ অফিসার ও কন্টেবলদের সহায়তায় কোনোপ্রকারে কাজ চালান হইতেছিল। আচার্যদেব প্রতিকারার্থ সমগ্র দেশব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। বাঙ্গলা ও বাঙ্গালার বাহিরে সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে জনসভা আহ্বান পূর্বক গয়ালী পাণ্ডার অত্যাচারের বিষয়ে আলোচনা হইতে লাগিল। ইংরাজী, বাঙ্গলা, হিন্দী যাবতীয় সংবাদপত্রে প্রতিদিন উক্ত জন-সভার বিবরণ ও প্রস্তাবাদি এবং সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইতে লাগিল। একমাস এরূপ চলার পর গয়াধামে যাত্রী-সমাগম বন্ধ হইয়া গেল। বাঙ্গালী যাত্রী একটীও গয়ালী পাণ্ডার নিকট যাইত না। তখন গয়ালীরা জব্দ ও আচার্যদেবের চরণে শরণাগত হইয়া সজ্জ-নির্দিষ্ট ব্যবস্থা মানিয়া লইবার অঙ্গীকার করিলে, আচার্যদেব প্রসন্ন হইয়া আন্দোলন বন্ধ করিলেন। তদবধি গয়ালী পাণ্ডাগণ শাস্ত ও সংযত হইয়া চলিতেছে।

## অন্নপূর্ণা মন্দিরের অত্যাচার দমন

কাশীর অন্নকূট মহোৎসব সুপরিচিত। অগণিত দর্শনার্থী—অধিকাংশই নারী—এই সময়ে ৬বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা ও অন্নকূট দর্শনার্থ কাশীতে গমন করেন। সজ্জের পক্ষ হইতে বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীসহ যাত্রীগণের সেবার ও রক্ষণের বন্দোবস্ত করা হয়। সজ্জের সম্মাসী ও সেবকগণ মোহন্তের চাকরগণকে দর্শনাধিনী নারীদের উপর অশ্লীল ব্যবহার করিতে দেখিয়া প্রতিবাদ করিলে তাহারা স্বেচ্ছাসেবক-গণকে প্রহার করিয়া মস্তক হইতে রক্তপাত করে। সংবাদ-পত্রাদিতে উহা লইয়া বাদ প্রতিবাদ হয় বটে কিন্তু প্রতীকার কিছু হয় নাই।

পর বৎসর কাশীধামে দুর্গোৎসবোপলক্ষ্যে সজ্জের পক্ষ হইতে যে হিন্দু সম্মেলনের অধিবেশন হয় উহাতে যুক্তপ্রদেশের নেতৃবৃন্দ ও কাশীর কমিশনার মিঃ জে, এল, সাথের উপস্থিতিতে অন্নপূর্ণা মন্দিরের অনাচার দমনের জ্ঞাত প্রস্তাব উত্থাপন করিতে আচার্য্যদেব আদেশ করিলেন; প্রস্তাব গৃহীত হইল। মন্দিরের মোহন্ত ভীত হইয়া সজ্জের নামে মোকদ্দমা দায়ের করিল। কিন্তু উহার নিষ্পত্তি মোহন্তের বিরুদ্ধে হইল। বেগতিক দেখিয়া মোহন্ত অন্নকূট বন্ধ করিয়া দিলেন। এইরূপে অন্নপূর্ণা মন্দিরের অনাচার বন্ধ হইল। সজ্জ হইতে অত্যাচার প্রতি বৎসর সেবাকার্য্য করা হইয়া থাকে।

## মোহন্ত ও মঠধারীদের প্রতি সতর্কতার বাণী

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের জাছুয়ারী মাসে কাশীধামে “Religious Endowment Bill” এর প্রতিবাদ কল্পে অহুষ্ঠিত “অখিল ভারত সাধু সম্মেলনের” অধিবেশন আহুত হইলে, বিশেষ কারণে

উপস্থিত হইতে না পারিয়া আচার্য্যদেব সভাপতি শঙ্করাচার্য্যের নিকট একটা স্মারক লিপিতে হিন্দুজাতি, ধর্ম ও সমাজের সেবায় সাধু-সমাজের নির্মম ঔদাসীন্দ্ৰের প্রতি কটাক্ষ করিয়া দেশের বর্তমান সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে ধর্মপ্রচার ও সমাজ-সেবায় সাধু-সন্ন্যাসি মণ্ডলীর দায়িত্ব ও কর্তব্য স্বরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। উহাতে সমবেত সন্ন্যাসি-সাধুমণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ভারতের দাবতীয় বিভিন্ন ভাষার পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হয় এবং বহু পত্রিকায় দীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়; আত্মবিস্মৃত, আদর্শভ্রষ্ট সাধু-সমাজ সরল ও অবিকৃত মনে সে সমালোচনা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। আচার্য্যদেবের ইংরাজী হইতে অনূদিত মন্তব্যটি অবিকল নিম্নে তুলিয়া দিতেছি :—

কাশীধামে অনুষ্ঠেয় আগামী “অখিল ভারতীয় সাধু-সম্মেলনের নিমন্ত্রণ-পত্র গৌরব ও সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলাম। আপনাদের পবিত্র সঙ্গলাভের এই সুবর্ণ-সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে না পারিয়া আমি হুঃখিত। কারণ—আমি আমার সঙ্ঘের কতকগুলি গুরুতর কার্য্য—বিশেষভাবে বঙ্গালা দেশে হিন্দু-সংহতি-শক্তি-সংগঠন ব্যাপারে বিশেষ ব্যস্ত আছি। তবে আশাকরি আপনার সুনিপুণ পরিচালনায় সাধু-সমাজের সম্মুখে যে গুরুতর সমস্যা সমুপস্থিত, অখিল ভারতীয় সাধু সম্মেলনে তাহার সমাধান-প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হইবে।

ভারতীয় জাতীয় জীবন বর্তমানে এক ক্লেশময় বিপ্লবযুগের মধ্য দিয়া চলিতেছে; এবং জাতির অন্তরাত্মা আজ চায় যে ভারতের লক্ষ লক্ষ সাধু জাতির উন্নতি-অভ্যুদয় কল্পে তাহাদের

যথাসাধ্য সেবাদান করুন—জাতিকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনী শক্তি দিয়া সঞ্জীবিত করুন। বলা বাহুল্য যে আমি বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া সমগ্র সাধু-সমাজের মনোযোগ এ বিষয়ে আকর্ষণ করিবার জন্ত নানা প্রকার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি এবং আমি বিশেষ আনন্দিত হইতেছি যে আজ সমগ্র সাধু-মণ্ডলী তাহাদের চিন্তা ও চেষ্টা এদিকে প্রয়োগ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

অতীতের অত্যাচছ ধর্ম-মহিমার গৌরব ও গর্বই যে ভারতের একমাত্র সম্বল—তাহা নহে; ভারতে এখনো লক্ষ লক্ষ সর্বত্যাগী নিঃস্বার্থ সেবাত্রী সাধু আছেন, যে বিরাট আধ্যাত্মিক সৈন্যবাহিনীর এক মুষ্টি ভাত বা কয়েক টুকরা রুটী এবং একখণ্ড কটীয়াস ছাড়া আর কিছুই প্রয়োজন হয় না। কিন্তু প্রশ্ন জাগে—এই লক্ষ লক্ষ ত্যাগী সাধুর মধ্যে কয়জন আজ পাশ্চাত্য নাস্তিক্য-মূলক কুষ্টি ও সভ্যতার প্লাবন-প্রবাহ প্রতিরোধের জন্ত ভারতীয় নরনারীর দ্বারে দ্বারে সনাতন ধর্মের আদর্শ ও বাণীপ্রচারে নিযুক্ত? আত্মজ্ঞানলাভের জন্ত তপস্যা এবং সেই সাধন-বাণী ও প্রেরণা সমাজের প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেওয়াই কি সাধুর আদর্শ ও দায়িত্ব নয়? তাই যদি হয় তবে কয়জন সাধু আজ সেই আদর্শ ও দায়িত্ব যথার্থতঃ পালন করিতেছেন? আমাদের সময় সুযোগ আসিয়াছে; ভারতীয় সাধু-সমাজের সমগ্র দৃষ্টি ও

মনোযোগ এদিকে একাগ্র করিয়া তাহাদের সনাতন দায়িত্বভার স্বন্ধে নিতে হইবে।

সনাতন ধর্মের প্রচার ও সংরক্ষণের জন্ত যে বিপুল সম্পত্তি উৎসর্গিত এবং সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ধর্মগুরু মোহন্তদের উপর যাহার তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত রহিয়াছে, সেই ধর্মার্থ সম্পত্তি যে আজ সরকারী আইনের দ্বারা হস্তান্তরিত হইবে ;—আমি এই নীতির আন্তরিক বিরোধী। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাকে লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করি—উক্ত সম্পত্তির কত তুচ্ছ অংশ আজ উহার যথার্থ উদ্দেশ্যসাধনে ব্যয়িত হইতেছে এবং অধিকাংশ কিরূপ আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং আত্মসুখসন্তোকে নিয়োজিত হইতেছে। অবশ্য মোহন্ত ও মঠাধীশগণের মধ্যে বহু খাঁটি ব্যক্তি আছেন—তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।

আপনি Religious Endowment Bill এর প্রতিবাদ কল্পে যে আন্দোলন করিতেছেন, আমি তাহা আন্তরিক ভাবে সমর্থন করি ; কিন্তু আশঙ্কা হয় যে পর্য্যন্ত উক্ত সম্পত্তি-সমূহের আয়ের বৃহত্তর অংশ ধর্ম-প্রচার এবং সমাজ-সেবায় নিয়োজিত করিবার ব্যবস্থা না হয় সে পর্য্যন্ত আপনার এই আন্দোলন জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিবে না।

আমি আমার ব্যক্তিগত ধারণা ও চিন্তা আপনার নিকট বিবৃত করিলাম। আশা করি আপনি আপনার এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে

সাহায্যে জাতির দাবীও যথাযোগ্য স্থবিচার পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবেন।”

### হিন্দুসংগঠন কার্যে হিন্দুনেতৃবর্গকে আহ্বান

বাঙ্গালার বিভিন্ন জিলায় হিন্দু-মিলন-মন্দির স্থাপন কার্য যখন রীতি মত চলিতেছিল এবং সাম্প্রদায়িক মন্ত্রীমণ্ডলীর অধীনে হিন্দু-নির্যাতন নানাভাবে চরমে উঠিয়াছিল, তখন আচার্য্যদেব বাঙ্গালার যাবতীয় নেতৃবর্গ ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে হিন্দু-সংগঠন কার্যে মনোযোগী ও উত্তোগী হইবার জন্য আহ্বান করিলেন।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে আচার্য্যদেবের আদেশে জুলাই মাসে কুমার সিং হলে এক সম্মেলনে কলিকাতার হিন্দুনেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট হিন্দু-নাগরিকগণকে লইয়া যে সভা হয় উহাতে সজ্জকস্মীগণ বিভিন্ন জেলায় হিন্দু-নির্যাতনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা পূর্বক হিন্দু-নেতৃবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই সম্মেলনে আচার্য্যদেব বাঙ্গালার “বিপন্ন হিন্দুর আত্মরক্ষার উপায় সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন তাহাতে হিন্দুনেতৃবর্গের হৃদয়ে চৈতন্য ও উৎসাহ সঞ্চারিত হয় :—

“বাঙ্গালার হিন্দু আজ নানাভাবে বিপন্ন ও লাঞ্ছিত।..... বিভিন্ন জেলায় সহরে ও গ্রামে প্রতিষ্ঠিত শতাধিক মিলন-মন্দিরের কার্য্য-তৎপরতার মধ্যদিয়া প্রতি সপ্তাহে যে সংবাদ পাইতেছি, তাহাতে বুঝিতেছি—বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে কোনো হিন্দুর ধন-মান-প্রাণ ও স্ত্রী-কন্টার ইজ্জৎ লইয়া বসবাস এক প্রকার অসম্ভব।... ..

দীর্ঘকাল হিন্দু মুখ বুজিয়া সহিয়া আসিতেছে; প্রতিবাদটা পর্য্যন্ত করে নাই; বরং কংগ্রেসের মধ্য দিয়া মিলন ও শান্তি স্থাপনের

জগৎ বহু প্রকার চেষ্টা চলিয়াছে ; দাবীর পর দাবী মিটানো হইতেছে ; কিন্তু উৎপীড়নের স্রোত, উপশম হওয়া দূরের কথা, বহুতার জলের ন্যায় দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছে । ফলে নীরব সহিষ্ণুতার শেষ প্রান্তে আসিয়া হিন্দু আজ জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান । এই সঙ্গীন অবস্থায় হিন্দুকে বাঁচিতে হইলে দৃঢ়-কণ্ঠে প্রতিবাদ ও সবল হস্তে প্রতীকারের ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে এবং তজ্জগৎ উপযুক্ত শক্তি-সংগ্রহ আবশ্যক । শক্তি-সংগ্রহের অর্থ—সম্ভব বাধাইবার জগৎ দলবদ্ধ হওয়া নয় । বিরোধের মধ্য দিয়া শাস্তির প্রতিষ্ঠা, বিদ্বেষের মধ্য দিয়া মিলন অসম্ভব ।...আমি আবারও বলি—মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুর সংগঠন নয় । আত্মরক্ষার জগৎ হিন্দুকে প্রস্তুত হইতে হইবে । আত্মরক্ষার্থ শক্তি সংগ্রহের উপায়—হিন্দু সম্ভবশক্তি-সংগঠন । হিন্দু-সম্ভবশক্তি গঠনের জগৎ চাই উন্নত ও অনুন্নত যাবতীয় শ্রেণীর হিন্দু-জনসাধারণের মিলন । এই মিলনকে অব্যাহত করিয়া তুলিতে হইলে—একদিকে উন্নত শ্রেণীর হিন্দুকে হৃদয়বান্ দরদী হইয়া অস্পৃশ্যতার গ্লানি মুছিয়া ফেলিয়া অনুন্নত হিন্দু ভ্রাতৃগণকে ধার্মিক ও সামাজিক অধিকার দান করিতে হইবে । অপর দিকে অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুকেও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর স্তোকবাক্য ও প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া উন্নত শ্রেণীর হিন্দু ভ্রাতৃগণের প্রতি বিদ্বেষ ও ক্ষোভ বিসর্জন দিয়া অকুণ্ঠিত চিন্তে হিন্দু-মিলন-যজ্ঞে যোগদান করিতে হইবে । আত্মরক্ষার প্রসঙ্গেই সর্বপ্রধান বলিয়া জাতির সম্মুখে ধরিবে ।



হইবে। তাহা হইলে খুটীনাটী ভেদ-বিবাদের কথা আপনা হইতেই তলাইয়া যাইবে। হিন্দু-সম্মতশক্তি গঠনের উপরোক্ত পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী রূপ দানের জন্ত আমার “হিন্দু-মিলন-মন্দির” কল্প-পদ্ধতি। বাঙ্গলার—প্রতি জিলা, মহকুমা, ইউনিয়ন ও গ্রামে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে অসংখ্য হিন্দু-মিলন-মন্দির স্থাপন পূর্ব্বক সমগ্র হিন্দু-জন-সাধারণকে এমন ভাবে গাঁথিয়া তুলিতে চাই যে কেন্দ্রস্থলে যে কোনো আন্দোলন উপস্থিত করিলে যাবতীয় হিন্দু-জন-মণ্ডলী হইতে যুগপৎ সাড়া ও সহায়তা পাওয়া যাইবে।....”

ইহার অব্যবহিত পরে আচার্য্যদেবের আদেশে সম্মত-সম্মতসঙ্গ, মালদহের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া নারী-হরণের যে মর্ম্মভঙ্গ বিবরণ ও বৃহৎ তালিকা প্রকাশ করেন, তদ্বারা দেশে ও হিন্দু-জনসাধারণের মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়। গভর্ণমেণ্টও বিচলিত হইয়া পড়েন। ফলে হিন্দুগণের মধ্যে এক নবজাগরণের সূচনা ও আত্মরক্ষার উদ্যোগ জাগিয়া উঠে।

আগষ্টমাসে আচার্য্যদেব এক বিরাট হিন্দু-সম্মেলনে—ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ৮সার এম, এন, মুখার্জি, সার নীলরতন সরকার, সার ইউ, এন, ব্রহ্মচারী, মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জি, ৮হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৮দীনেশ চন্দ্র সেন, ৮রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মিঃ এস, এন, ব্যানার্জি, শ্রীযুত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, ৮মৃণালকান্তি ঘোষ, কুমার প্রমথনাথ রায়; ৮যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুত সনৎকুমার রায় চৌধুরী, ৮নিশীথ চন্দ্র সেন প্রমুখ হিন্দু-নেতৃবর্গকে আহ্বান পূর্ব্বক “বাঙ্গলার দুর্গত হিন্দুর আত্মরক্ষার উপায়” আলোচনা

ও নির্দ্বারণের অনুরোধ করেন এবং এতদ্ব্যতীত সজ্জের পক্ষ হইতে বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে যে রক্ষীদল গঠন কার্য চলিতেছে তাহাই যে একমাত্র পন্থা তাহা নির্দেশ করেন। আচার্য্যদেবের সিদ্ধান্ত সকলে সমর্থন পূর্বক হিন্দুজনসাধারণকে এই কার্যে সহায়ভূতি ও সহায়তা প্রদর্শন করিতে অনুরোধ পূর্বক সভাপতি ও বক্তাগণ ভাষণ প্রদান করেন। সমস্ত বাঙ্গালায় অপূর্ব হিন্দু-জাগরণের তরঙ্গ বহিতে লাগিল। এই সভায় আচার্য্যদেব স্বীয় অভিভাষণ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন :—

“হিন্দু সম্মানগণের প্রতি আমার এই নির্দেশ—আত্ম-রক্ষার জন্য তাহারা ঐক্যবদ্ধ ও সহযোগিতা-পরায়ণ হউন। কিন্তু হিন্দুর মধ্যে আজ মিলন ও সহযোগিতার আগ্রহ আকাজক্ষা কোথায়? যদিও আজ সর্বশ্রেণীর হিন্দু সমান ভাবে বিপদের সম্মুখীন তথাপি সমবেত ভাবে আত্মরক্ষার চেষ্টা কৈ? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেদ-বিবাদ এবং অস্পৃশ্যতা-অনাচরণীয়তাদি বাধা আজ হ্রস্বতীক্রম্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেরা নিশ্চেষ্ট হয়ে শুধু সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তগণের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া কি লাভ? হিন্দুগণ যদি জাতি হিসাবে বাঁচিতে চায় তবে অবিলম্বে সখ্য ও সহযোগিতা-মূত্রে আবদ্ধ হয়ে, তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণীর ভ্রাতৃগণকে যথাযোগ্য মর্যাদা ও আদর দিয়ে সম্মিলিত ভাবে সাম্প্রদায়িক সজ্জের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে। উদীয়মান হিন্দু জাতির পতাকাই স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া দাও—ভেদ নয়, চাই মিলন; অবজ্ঞা নয়, চাই—সহযোগিতা; কাপুরুষতা নয়, চাই—বীরত্ব।”

এই বৎসরে মার্চমাসে সঙ্ঘনেতা আচার্যদেব বরিশাল জেলায় নমশূদ্র-নেতৃবর্গের সাগ্রহে আহ্বানে শ্রীরামকাঠী মিলন-মন্দিরে শুভপদার্পণ করেন। অষ্ট সহস্রাধিক নমশূদ্র এবং অগ্নাত শ্রেণীর হিন্দু এতদুপলক্ষে সম্মিলিত হয়। দুই দিবসব্যাপী সম্মেলনের অধিবেশনে হিন্দু-সমাজের বহু সমস্যার আলোচনা প্রস্তাবাদি গৃহীত হয়। নমশূদ্র-নেতাগণ আচার্যদেবের নিকট হইতে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করেন। আত্মসম্মতিক বৈদিক যজ্ঞাদি, বহু ধর্ম্মানুষ্ঠান ও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

জুনমাসে পুরীধামে উড়িষ্যা হিন্দু-সম্মেলন, সেপ্টেম্বর-অক্টোবরমাসে যথাক্রমে গয়াধামে বিহার হিন্দু-সম্মেলন এবং কাশী ও প্রয়াগধামে যুক্ত-প্রদেশ হিন্দু-সম্মেলনে “মিলন-মন্দির ও রক্ষীদল গঠন” কল্পপদ্ধতি আলোচিত ও গৃহীত হয়।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আচার্যদেব পাবনা জেলা মিলন-মন্দির-সম্মেলনে শুভপদার্পণ পূর্বক সহস্র সহস্র নরনারীর প্রাণে প্রেরণা সঞ্চার করেন। তৎপরে কামালপুরে দশ সহস্র হিন্দুর এক বিরাট সম্মেলনে যোগদান করেন। দুই দিবসব্যাপী বৈদিক যজ্ঞ, শোভাযাত্রা, কীর্ত্তন, মহোৎসব, জনসভার অধিবেশনে হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ-বিষয়ক বক্তৃতা ও প্রস্তাবাদি গ্রহণ প্রভৃতি হয়। সহস্র সহস্র নরনারী আচার্যদেবের দর্শন, উপদেশ, আশীর্ব্বাদ ও সাধনলাভ করে। সমগ্র পাবনা জেলার যাবতীয় মিলন-মন্দির হইতে সভ্য ও রক্ষীগণ যোগদান করে। তৎপরে আচার্যদেব রাজসাহীতে শুভপদার্পণ করেন। রাজসাহীতেও মহাসমারোহে উক্ত প্রকার যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

আচার্যদেব সহস্র সহস্র হিন্দুকে আত্মরক্ষার জন্ত শক্তির অনুশীলন



বিক্রমপুর অগীতি সহস্র হিন্দু নরনারীর সম্মেলনের আংশিক দৃশ্য : আচার্যদেব বঙ্কীদত্তবাহিত চতুর্দশে সম্মেলন ।



বিক্রমপুর হিন্দু-সম্মেলনে ২০ মহাস্থ নবমারীর শোভাযাত্রা সহকারে আচার্যদেবের অভ্যর্থনা ( আংশিক দৃষ্ট ) ।

ও শক্তি অর্জনের প্রেরণা দান পূর্বক গ্রামে গ্রামে “হিন্দুরক্ষীদল” গঠনের আদেশ ও নির্দেশদান করেন এবং আশ্বাস ও অভয় দান করেন যে— হিন্দুগণ যদি সজ্জের নির্দেশমতে মিলন-মন্দির ও রক্ষীদল কর্মপদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক সংগঠিত হয়, তবে সংখ্যায় অল্প হইলেও বাকালী হিন্দুর কেশ স্পর্শ কেহ করিতে পারিবে না।

মার্চ মাসে আচার্যদেব হাওড়া জেলার উদ্যোগী হিন্দু অধিবাসীগণের সভক্তি আহ্বানে চিৎনান মিলন-মন্দিরে বিরাট হিন্দু-সম্মেলনে ভূতপদার্পণ করেন। সমাগত সহস্র সহস্র হিন্দুকে আশ্বাস ও আশীর্বাদ দান পূর্বক তিনি বলেন যে হিন্দু-সংগঠন-আন্দোলন অহিন্দু সম্প্রদায়ের অত্যাচারের পাল্টা জবাব দেবার জ্ঞান নয়; হিন্দুত্বের চেতনা ও আদর্শের ভিত্তিতে হিন্দুকে সংগঠিত ও শক্তিমান করে তোলাই হিন্দু-সংগঠনের যথার্থ উদ্দেশ্য। হিন্দু-ধর্মের সার্বজনীন আদর্শ ও অনুষ্ঠান সমূহের ভিত্তিতে হিন্দুগণকে মিলিত হইয়া সামাজিক জীবনের ভেদবৈষম্য, হিংসাঘেয পরিত্যাগপূর্বক সজ্জবদ্ধ ও পরস্পর সহযোগিতা-পরায়ণ হইতে হইবে।

হিন্দুধর্মের নামে আজ দেশে নানা কুসংস্কার সমাজ-দেহে বাসা বাঁধিয়াছে। হিন্দু-সমাজের অনিষ্টকর লৌকিক আচার, ভ্রান্ত সংস্কার ও অস্পৃশ্যতাদি অশাস্ত্রীয় প্রথাগুলি দূর করিয়া সমস্বয়মূলক রীতিনীতি প্রবর্তন করিতে হইবে। হিন্দুকে আজ উপলব্ধি করিতে হইবে—ব্যক্তিগত সুখ-সন্তোষের আকাঙ্ক্ষার উপরে সামাজিক কর্তব্য ও দায়িত্ব রহিয়াছে।

হিন্দু ধর্মের সাধনা—বীর্ষের সাধনা; বীরত্ব, পুরুষত্ব, মনুষ্যত্বই—মহাপুণ্য; আজ কোটি কোটি অনুন্নত হিন্দুকে এই

সত্য বাণী শুনাইতে হইবে। তারাই সমাজের মেরুদণ্ড ; তাহাদিগকে ধার্মিক অধিকার ও উপযুক্ত সামাজিক মর্যাদা দিতে হইবে। সকল শ্রেণীর হিন্দুকে এক মহামিসনের ক্ষেত্রে সম্মিলিত করিয়া বুঝাইতে হইবে—আমরা সকলেই এক হিন্দু ; আমাদের এক বেদ, এক ধর্ম, এক সংস্কৃতি। স্বধর্ম রক্ষা ও স্ব-সমাজের সেবায় হিন্দু জীবন বিসর্জনে ভয় করে না ;—এই আত্মরক্ষার—স্বধর্ম, স্ব-সমাজ রক্ষার মহাসঙ্কল্প সকল হিন্দুর হৃদয়ে সঞ্চারিত হোক !”

### বিক্রমপুর হিন্দু-সম্মেলনে আচার্যদেব

ফেব্রুয়ারী মাসে বাজিতপুরে অস্থিষ্ঠিত বঙ্গীয় হিন্দু-সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনান্তে একশত সন্ন্যাসী এবং বহু কর্মী ও রক্ষাবাহিনীসহ আচার্যদেব বিক্রমপুরে শুভদর্পণ করেন। বিক্রমপুরের ভোগদিয়া গ্রামবাসী প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুত তারকনাথ দাস প্রমুখ হিন্দু-গণের সাগ্রহ আমন্ত্রণে আচার্যদেব এই অভিযানের আয়োজন করেন। উক্ত তারকনাথ দাস প্রচুর অর্থব্যয় পূর্বক প্রায় লক্ষ হিন্দুর এই বিরাট সম্মেলনের যাবতীয় ব্যয় বহন করেন। বিক্রমপুরে বিরাট সাড়া পড়িয়া যায়। সদলবলে আচার্যদেব তারপাশায় পৌছিলে দশ হাজার লোকের এক বিরাট শোভাযাত্রা মহাসমারোহে বিপুল বান্যোদ্যম ও জয়ধ্বনি সহকারে চতুর্দোলে করিয়া তাঁহাকে তারকনাথ দাসের ঠাকুর বাড়ীতে লইয়া যান। প্রায় দুই মাইল ব্যাপী দীর্ঘ শোভাযাত্রা ত্রিশূলধারী শত সন্ন্যাসীর গৈরিক দীপ্তিতে অধিকতর শোভাষিত হইল। ঠাকুর বাড়ীর সম্মুখস্থ দিগন্ত-বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বিরাট জনসমুদ্র ! চতুর্দিকে নরমুণ্ড ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। দুইটা দিনব্যাপী বিরাট সার্বজনীন

যজ্ঞ, বিরাট মহোৎসব গেলা, হিন্দু-সম্মেলনের বিরাট অধিবেশন সম্পন্ন হয়।

আচার্যদেব স্বয়ং এই মহাসম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অভিভাষণে তিনি বলেন—

“ভারতের বিশাল জনসমষ্টির মধ্যে সংখ্যায় যারা মাত্র ৮ কোটি সেই মুসলমান ও খৃষ্টান সম্প্রদায় সুগঠিত ও সুরক্ষিত ; পক্ষান্তরে সংখ্যায় যারা ২৬ কোটি সেই বিরাট হিন্দু-জন-সাধারণ পরস্পর হিন্নবিচ্ছিন্ন, দুর্বল, আত্মরক্ষায় অক্ষম। ভারতের মূল সমস্যা—হিন্দু-জাতিগঠন বা হিন্দু-সঙ্কলন-গঠন। হিন্দুর বর্তমান জাতীয় জীবনে ধর্মরক্ষা ও ধর্মপ্রচার, আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসার, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণার্থ, সমাজ-সংস্কার ও সংগঠন, নারীরক্ষা, অন্তঃসত্ত্বা-উন্নয়ন, সংখ্যাভ্রাসরোধ, সংখ্যাবৃদ্ধি প্রভৃতি বহু প্রশ্ন উপস্থিত। সমস্যার সমাধানের জন্য চাই—শক্তি, চাই—প্রতিবিধানের সুদৃঢ় সঙ্কল্প। দুর্বলতাই—সবচেয়ে বড় অপরাধ, ভীরুতাই মহাপাপ ; এই মহাপাপের অবশ্যসম্ভাবী ফল—ধ্বংস, বিলোপ।

দার্শনিক উপদেশ, নীতিশাস্ত্রের বাণী, কদাচ হিংসার গতি-রোধ করিতে পারে না ; ত্রাণের বিধান, যুক্তিতর্কের শানিত অস্ত্র কদাচ দুর্বলকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। শক্তির অনুশীলনে উদাসীন থাকিয়া শুধু অত্যাচারীর নিন্দা, সমালোচনা, গালিবর্ষণ,—প্রতিকার এবং প্রতিবিধানের পন্থা নয়।

হিন্দুজাতির দুর্বলতার প্রধান কারণ—তার স্বদেশে নির্ভা



ও বিশ্বাসের শৈথিল্য ; দ্বিতীয়তঃ সামাজিক ভেদ-বিবাদ ও ঘৃণাবিদ্বেষ। স্বধর্মে নিষ্ঠা ও বিশ্বাস না থাকায় ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রাণহীন ও লুপ্তপ্রায় ; সামাজিক জীবনে শাস্ত্র-সদাচারের নামে অস্পৃশ্যতা-অনাচারের দোহাই দিয়া হিন্দু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য গণ্ডী সৃষ্টি করিয়া হীনবল হইয়া পড়িয়াছে। স্বধর্মে অটুট বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও গৌরব-বোধই হিন্দুজাতির প্রাণে পুনরুত্থানের প্রেরণা জাগাইতে পারে। স্বধর্ম্ম-রক্ষার ব্রত ও দায়িত্বই হিন্দুর প্রাণে মহাবীর্যের সঞ্চার করিতে পারে। হিন্দুর ধর্ম্ম—শক্তির সাধনা ; হিন্দু-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বীর-ভাবোদ্দীপক ; হিন্দুর দেবতা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, শত্রুনাশে সংগ্রামোত্তম। অদৃষ্টের বিড়ম্বনা—হিন্দু আজ আত্মরক্ষার্থ ক্ষুদ্র যষ্টিখণ্ডও ধারণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে।

বাঙ্গলায় হিন্দুর আত্মরক্ষার প্রশ্নই বড় কথা। শক্তিশালী হিন্দু-সম্মিলিত-সংগঠনই উহার একমাত্র অব্যর্থ পন্থা। এই সম্মিলিত-সংগঠনের প্রথম পর্ব্ব চাই—মিলন ও সহযোগিতা। মিলন ও সহযোগিতা সম্ভব—হিন্দুর সার্বজনীন ধর্ম্মাদর্শ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের ভিত্তিতে। বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে মিলন-কেন্দ্র স্থাপন পূর্ব্বক এক মূলকেন্দ্রের সহিত সেগুলিকে যুক্ত করিতে হইবে। তখন দেশের যে কোনো প্রান্তে কোনো হিন্দুর উপর আঘাত আক্রমণ হইলে সমগ্র হিন্দুজনগণের প্রাণে সাড়া পড়িবে এবং তাহারা সমবেত শক্তিতে প্রতিকার-প্রতিবিধান সমুদ্যত হইবে।

প্রত্যেক কেন্দ্রে রক্ষীতল গঠন করিতে হইবে। প্রত্যেক হিন্দুকে এই সিদ্ধান্ত হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া নিতে হইবে যে স্বধর্ম রক্ষায় আত্মনিয়োগ এবং সমাজ-সেবায় আত্মোৎসর্গ—ধর্মের যথার্থ সাধনা।”

---

# আত্মরক্ষার সঙ্কল্প সংগার

৩

## রক্ষীদল আন্দোলন

নেতৃসম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে আচার্যদেবের আস্থানে ৮সার মনুখনাথ মুখার্জির সভাপতিত্বে বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ হিন্দু-নেতৃবর্গ ও জনসাধারণের এক বিরাট সম্মেলনে বিপন্ন বাঙ্গালী হিন্দুর আত্মরক্ষার সঙ্কল্প ও রক্ষীদল গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। লীগ-মন্ত্রীদলের ছত্রচ্ছায়া-তলে সাম্প্রদায়িকতা প্রশ্রয় পাইয়া চরমে উঠিয়াছিল; হিন্দুগণও সহিষ্ণুতার শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়াছিল। সমগ্র বাঙ্গলা দেশে হিন্দু-জনগণের মধ্যে জাগরণের তরঙ্গ উখিত হইয়াছিল। সম্মেলনে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের অসামান্য উৎসাহ ও গাভীর্ষ্য দর্শনে নেতৃবর্গ বিশেষ আশাশ্রিত হইয়াছিলেন। এই সম্মেলনে আচার্যদেব যে বাণী প্রদান করেন উহাতে তিনি বলেন।—

“বাঙ্গলার হিন্দু আজ ভিতরে বাহিরে নানাভাবে বিপন্ন; আত্মরক্ষার প্রশ্নই আজ সকল সমস্তকে ছাপিয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উভয় পক্ষীয় নেতৃবৃন্দের একটা আপোষ বৈঠকের প্রস্তাব চলছে; কিন্তু পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের গ্রামে গ্রামে ক্রমাগত যে সমস্ত মন্দির ও দেববিগ্রহের লাজুনা, নারী-হরণ ও নারী-নির্যাতন, দুর্বল, অসহায় সংখ্যালঘু গ্রামবাসীর উপর অত্যাচার চলছে, তাহাতে আমি কোনো মতে স্থির থাকতে

পারছি না! কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আপোষ নিষ্পত্তির দ্বারা দুঃস্থত্বের কবলে বিপন্ন গ্রামবাসীর দৈনন্দিন জীবন কদাচ নিরাপদ হইবে না, যে পর্য্যন্ত না গ্রামবাসী হিন্দুগণ আত্ম-রক্ষার্থে উদ্যোগী ও সজ্জবদ্ধ হয়। আত্মরক্ষার্থ উদ্যোগ ও সামর্থ্য যার নেই, তেমনতর দুর্বলকে স্থায়ের বিধান, আইনের রক্ষা-কবচ কদাচ রক্ষা করতে পারে না।

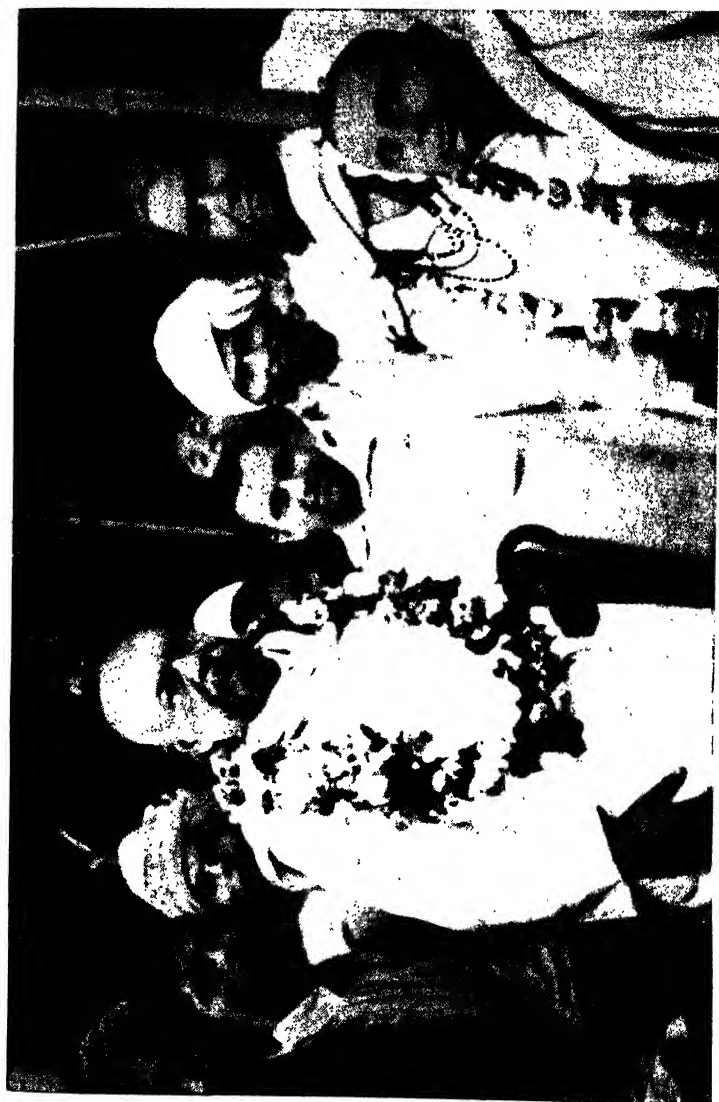
আমি বাঙ্গলার চিন্তাশীল উদ্যোগী নেতৃবৃন্দকে আহ্বান করছি—বাঙ্গলার হিন্দুর সামাজিক ও জাতীয় জীবনের পরিস্থিতি বিশেষভাবে অনুধাবন পূর্বক কৰ্মপন্থা নির্ণয়ের জ্ঞাত। আমি তাহাদিগকে বিশেষভাবে বলতে চাই যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিত্রতা ও সহযোগিতা স্থাপিত হলেও হিন্দু-সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা কিছুমাত্র হ্রাস পাবে না। হিন্দু-সংগঠনের উদ্দেশ্য হিন্দু-সমাজের সংশোধন ও সংগঠন; বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন হিন্দু-জন-সাধারণকে এক ধর্ম, এক সংস্কৃতি, এক ভ্রাতৃত্বের চেতনায় উদ্ধুদ্ধ সজ্জবদ্ধ করা;—এর মধ্যে মুসলমানের সহিত বিরোধিতা বা বিদ্বেষের কোনো প্রশ্নই আসতে পারে না। বরং আমার বিশ্বাস—বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে মিলন ও সহযোগিতা যত দ্রুত বৃদ্ধি পাইবে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মিত্রতা ও সহযোগিতা তত দ্রুত গড়ে উঠবে।.....কিন্তু বহু শতাব্দে যাবৎ বিচ্ছিন্ন হিন্দু-জন-সাধারণের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা ও সজ্জবশক্তি গড়ে তুলতে হলে, একটা নির্দিষ্ট সুনিয়ন্ত্রিত অনুশীলন পদ্ধতির

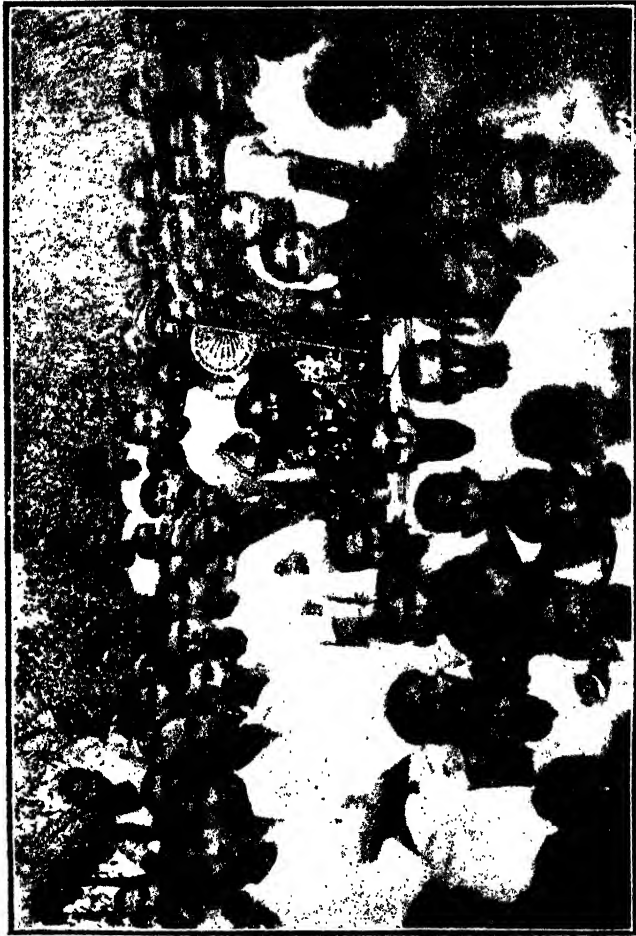
আবশ্যক। এই বিষয় বিবেচনা পূর্বক আমি হিন্দু-রক্ষীদল গঠনের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছি। এই রক্ষীদল গঠনের মধ্য দিয়ে হিন্দু-জন-গণের মধ্যে আত্মরক্ষার সঙ্কল্প দ্রুত সঞ্চারিত হবে এবং শক্তি চর্চার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হবে; সজ্জ-শক্তির বিকাশের সঙ্গে আত্মরক্ষার সামর্থ্য আসবে।”

কলিকাতায় নেতৃ-সম্মেলনে “হিন্দু রক্ষীদল গঠনের” প্রস্তাব গৃহীত হইলে পর আচার্যদেব সম্মাসী ও কর্মীগণকে সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে রক্ষীদল গঠনে নিয়োগ করিলেন। রক্ষীদলের নিয়মাবলী প্রস্তুত হইল। অন্ততম হিন্দু নেতা মিঃ বি, সি, চাটার্জি, বার-এট-ল মহাশয়কে প্রধান তত্ত্বাবধায়ক করিয়া বঙ্গীয় হিন্দু-রক্ষীদল গঠন কার্য চলিল। রক্ষীদলের দায়িত্ব, কর্তব্য ও প্রতিজ্ঞাপত্র ছাপাইয়া সর্বত্র বিতরিত হইতে লাগিল। আচার্যদেব আদেশ করিলেন—বিশিষ্ট ব্যক্তি ও জনসাধারণ—সকলকেই রক্ষীদলভুক্ত হইবার জ্ঞপ্তি বলিবে। প্রবীণ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিলে তাহারা বলেন—যারা যুবক কর্মী তাদেরকে রক্ষীশ্রেণীভুক্ত করে নাও; তারাই তো কাজ করবে।

কর্মীগণ এই প্রসঙ্গ আচার্যদেবের নিকট উত্থাপন করিলে আচার্যদেব বলিয়াছিলেন—

“মাদারীপুরের উকীল অবনী রায় একদিন আমাকে বলেছিল—মহারাজ! আমরা রক্ষী হব কি? রক্ষী হবে ছেলেপিলেরা। আমি বললাম—সে কি? দেশের যারা জ্ঞানী, গুণী, প্রতিভাশালী, অর্থবান—শ্রেষ্ঠ উকীল, শ্রেষ্ঠ ডাক্তার, শ্রেষ্ঠ কর্মচারী, শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী,—তারা যদি দেশ-সমাজ-ধর্মকে রক্ষা না করবে, তবে করবে কারা? কতকগুলি হিতাহিত-





সুন্দরবন উন্নত অল্পত হিন্দু-মহাসম্মেলনে শক্তি-সাধন-প্রাপ্ত জনম ওলী মধ্যে আত্মার্থদেব ।

বাধহীন অপোগণ্ড বালক-যুবক ? শুধু লাঠী ঘুরালে আর রাইট লেফট্ করলে কি দেশরক্ষা হয় ? গায়ের জোরেই কি দেশ রক্ষা সমাজ রক্ষা হয় ? মহাত্মা গান্ধী কি খুব বলবান ? অথচ তাঁর তেজে সমগ্র ভারতবাসী চলে ! গান্ধী—হচ্ছেন—একজন শ্রেষ্ঠ রক্ষী ।

Spirit চাই, তেজ চাই, সঙ্কল্প চাই ! হাতিয়ার ধরা পরে । ঘুমন্ত লোকের কাছে বন্দুক রাখলে কি হবে ? আগে লোককে জাগাতে হবে । তাদের মধ্যে আত্মরক্ষার তেজঃ সঞ্চার কুরতে হবে । তখন হাতিয়ার আর কুচ্কাওয়াজে ফল হবে । জাতির জন-সাধারণের মধ্যে এই সঙ্কল্প এই তেজঃ জাগবে কেমন করে ? জাগাবে কারা ? এই শ্রামাশ্রমাদ প্রভৃতি যে নেতারা হিন্দু-সমাজের রক্ষার জন্ত অগ্রণী হয়েছে—এরাই হচ্ছে—শ্রেষ্ঠ রক্ষী । এদের ভিতর স্বার্থত্যাগ, তীব্রসঙ্কল্প, দুর্জয় তেজঃ যদি জাগে তবেই তা' সমগ্র হিন্দু-জনসাধারণের হৃদয়ে সঞ্চারিত হবে । এই জগ্নেই তো এই সব শ্রেষ্ঠ নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে সম্মেলনে আহ্বান করে এই ভাবে ভাবিয়ে মাতিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছি । জন-সাধারণকে সজাগ, সচেতন করা, তাদের ভিতর Spirit জাগিয়ে দেওয়াই আসল কাজ ; সমাজ জাগ্রত হলে মুক্তির পন্থা যে খুঁজে নেবেই ।”

### পূর্ববঙ্গে দ্বিতীয় অভিযান

রক্ষীদল গঠন আন্দোলনকে ব্যাপক ভাবে সমগ্র বাংলাদেশে—



বিশেষভাবে সাম্প্রদায়িক অত্যাচারের কেন্দ্র—পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে প্রচার ও প্রসার করিবার জন্ত আচার্য্যদেব দ্বিতীয় বার অভিযানের সঙ্কল্প করিলেন। দিন স্থির করা হইল, যথাযোগ্য আয়োজন হইতে লাগিল। এই সময়ে এক দিবস—আচার্য্যদেব বসিয়া আছেন—নিকটে বসিয়া সন্ন্যাসীগণ আসন্ন প্রচারাভিযানের বিষয় আলোচনা করিতেছেন। ইহার অল্প কয়েকদিন পূর্বে শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ এবং অগ্ন্যন্ত কয়েকজন নেতা নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে গমন করিলে—সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তগণ কুমিল্লাতে আক্রমণ করে, বরিশালে গতিরোধ করে ;—এই প্রসঙ্গ উত্থাপন পূর্বক জনৈক সন্ন্যাসী বলিলেন—“যদি এমন কোনো বাধা-বিঘ্ন আসে তবে আমরা কী করবো ?” অপর একজন বলিলেন—“আমরাও যথাযোগ্য পাল্টা ঝাব দেবো।” অপর একজন বলিলেন—“ছোটো খাটো ব্যাপার,—ছেলে ছোকরা যদি ফচ্কিমি করে কিছু করে—তেমন ক্ষেত্রে আমরা উপেক্ষা করে যাবো। দলবদ্ধভাবে যদি তারা কোনো উপদ্রব সৃষ্টি করতে আসে, তবে আমরাও তার উপযুক্ত প্রতিবিধান করবো।” আর একজন বলিলেন—“না, সে সব কোনো কথা নয়, ক্ষুদ্র বৃহৎ কোনো অপমানই আমরা সহ্য করবো না, যায়সাকৈ ত্যাগসা লাগাবো।” আচার্য্যদেব এতক্ষণ সন্ন্যাসীদের এই বিবিধ প্রকার আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক শুনিতেছিলেন ; হঠাৎ গভীর অথচ দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন—“আমি কোনো কাপুরুষকে আমার সঙ্গে নেবো না ; মাথা দিতে পারে, মাথা নিতে পারে—এমন লোক আমার সঙ্গে চলুক।” আলোচনা থামিয়া গেল।

আচার্য্যের ইঙ্গিতক্রমে লাঠী, ত্রিশূল, ঢাল, সড়কী, কুঠার, রামদা, তরবারী—প্রভৃতি নেওয়া হইল। স্তূর্ণদর্শনধারী শ্রীকৃষ্ণের সংগ্রামোন্মুখ

মূর্তি এবং দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংসকারী শিবের রক্তমূর্তি দুইখানি সঙ্গে নেওয়া হইল। পঁচিশজন সন্ন্যাসী এবং অন্যান্য সেবককর্মী লইয়া প্রচারবাহিনী গঠিত হইল। পূর্ব হইতে সন্ন্যাসী ও কর্মী প্রেরণ পূর্বক নির্দিষ্ট সহর ও গ্রাম গুলিতে যান্ত্রীয় ব্যবস্থা করা হইল। শতশত মিলন মন্দিরে সংবাদ প্রেরিত হইল। তাহারা গ্রামে গ্রামে সংবাদ রাষ্ট্র করিয়া দিল। ভ্রমণ ও অনুষ্ঠানের তালিকা গ্রামে গ্রামে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইল :—

চাঁদপুর ৪ঠা মে; ৫ই মে প্রাতে ৭-৩০ মিঃ শোভাযাত্রা, অপরাহ্নে সম্মেলন।

ঝাবুরহাট—৬ই মে প্রাতে শোভাযাত্রা ও অপরাহ্নে সম্মেলন।

নোয়াখালী—৭ই মে প্রাতে ৭-৫২ মিঃ শোভাযাত্রা; অপরাহ্নে সম্মেলন।

চৌমুহী—৮ই মে অপরাহ্নে শোভাযাত্রা ও সম্মেলন।

দেবপাড়া—৯ই মে প্রাতে শোভাযাত্রা ও অপরাহ্নে সম্মেলন।

ফণী—১০ই মে অপরাহ্ন ৪-৫ মিঃ শোভাযাত্রা ও সন্ধ্যায় সম্মেলন।

চট্টগ্রাম—১১ই মে সন্ধ্যা ৬টা শোভাযাত্রা। ১২ই মে অপরাহ্নে সম্মেলন।

কুমিল্লা—১৩ই মে সন্ধ্যা ৬টা শোভাযাত্রা; ১৪ই মে অপরাহ্নে সম্মেলন।

—আনন্দবাজার

৪ঠা মে আচার্যদেব সদলবলে যাত্রা করেন। অভিযানের প্রাঙ্গণবর্ত্তে আচার্যদেব সঙ্গী সন্ন্যাসীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

“আমি যাচ্ছি—বাস্তালার বিপন্ন-হিন্দুকে রক্ষার ব্যবস্থা করবো—এই আশ্বাস বাণী নিয়ে। আমার সামনে কেউ কোনো অত্যাচার করলে যদি তখনি তার প্রতীকার না হয় তবে

আমার মান কোথায় থাকে ? দেশের জন-সাধারণ আমাকে গ্রাহ্য করবে কেন ? বলবে—নিজেকে যে রক্ষা করতে পারে না, সে আবার হিন্দুকে রক্ষা করবে ! ছুষ্ঠ-ছুর্ব্বস্ত অবসর পেলেই, তাদের দুষ্কার্য সাধন করবেই । জাগ্রত যারা, শত্রুর সম্মুখীন হতে প্রস্তুত যারা, প্রতিকার-প্রতিবিধানের অজ্ঞেয় সঙ্কল্প নিয়ে বিপদ বরণে উদ্যত যারা, তাদের সাম্মুনে কে আসতে সাহসী হয় ? যদি বোঝে যে কিছু করতে গেলে মাথা নিয়ে ফিরে আসা যাবে না ;—তাহলে কোন্ ব্যাটা সেখানে এগোবে ?”

আচার্য্যদেবের এই অভিযানে সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগে বিরাট সাড়া পড়িয়াছিল । সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দু এবং কংগ্রেসী, অকংগ্রেসী, হিন্দু-মহাসভার কর্ম্মী, সরকারী, বে-সরকারী, ব্যবসায়ী, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, জনসাধারণ সকলেই সমভাবে শোভাযাত্রা ও সম্মেলনে অংশগ্রহণ করিয়াছিল । নানা প্রতিষ্ঠান ও পৌর জনগণের পক্ষ হইতে অভিনন্দন ও মানপত্র দান করে । প্রত্যেক স্থানে আশাতীত লোক সমাগম হইয়াছিল । আচার্য্যদেব প্রহরের পর প্রহর ব্যক্তিগত ভাবে উপদেশ ও আশীর্বাদ দান, হিন্দু নেতৃবর্গের সহিত রক্ষাদল গঠন বিষয়ক আলোচনা করিতেন । সম্মেলনে উপস্থিত থাকিয়া যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা করেন ।

সর্ব্বত্র সম্মেলন ক্ষেত্রে উচ্চ আসন ( platform ) করিয়া সুদৃশ্য চন্দ্রাতপ ও যবনিকা খাটাইয়া—এক পার্শ্বে সুদর্শন-ধারী শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি, অপর দিকে ত্রিশূলধারী শিবের রুদ্র মূর্ত্তি লব্ধিত হইত । অন্যস্থলে সুদীর্ঘ ত্রিশূল হস্তে আচার্য্যদেব সমাসীন হইলে এক অপূর্ণ

দৃষ্টের অবতারণা হইত। মনে হইত সংগ্রামোন্মুখ শ্রীকৃষ্ণ এবং ক্রমমুষ্টি শিব—এই দুয়ের মূর্তি ও ভাবের সমন্বয়—সজ্বনেতা আচার্য্যের মধ্যে। পরিধানে পীতোজ্জ্বল কোষেয় বসন, গলে ক্রান্তাক্ষ মালা, হস্তকে লঙ্ঘিত কুঙ্কিত কেশদাম, স্থির গম্ভীর অথচ বীরত্ব ও দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক স্ফুটোল মুখকমল, করে সুদীর্ঘ স্বর্ণবর্ণ ত্রিশূল, বিপুল শক্তিশালী কলেবর;— আচার্য্য অপূৰ্ণ হরিহর মূর্তিতে দীপ্যমান। তাঁর হিন্দুজাতি গঠন ও ধর্ম ও সমাজ-রক্ষা-মূলক বাণী যখন প্রকাশিত হইতে থাকিত, তখন শ্রোতৃবর্গ—সম্মুখের এই দৃশ্য এবং সেই বাণী—উভয়ের সমবায়ে অমুভব করিত—ভগবান্ ধর্ম-সংস্থাপন-কারী, দুষ্ট-দমনকারী আচার্য্যরূপে আবির্ভূত হইয়া বিপন্ন, ভীত, শরণাগত হিন্দু-জন-সাধারণকে আশ্রয় ও অভয় দান করিতেছেন।

নোয়াখালীর সম্মেলনে আচার্য্যদেব বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন—

“বাক্সালী হিন্দুর সামনে আজ একমাত্র পন্থা—বীর-বিক্রমে যাবতীয় অশ্রায় অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিবিধান এবং আত্মরক্ষার জন্ত সজ্জবদ্ধ হওয়া। এই আত্মরক্ষার সংগ্রামে অগ্রসর হবার জন্ত প্রত্যেক হিন্দুর আগে দুর্জয় সঙ্কল্প জাগিয়ে দিতে হবে। হিন্দু কদাচ কারো অনিষ্ট করতে চায় না। কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুরা নীরবে নিরীক্সবাদে কোনো অশ্রায় বা অত্যাচার সহ্য করবে না। হিন্দুকে আত্মরক্ষায় উদ্যোগী এবং শক্তিমান করে তোলার জন্ত আমার রক্ষীদল-গঠন-কর্ম-পদ্ধতি। ছত্রপতি শিবাজী, শিখগুরু গোবিন্দসিংহের জাতি গঠনের পদ্ধতি যেমন ছিল, আমার হিন্দু-জাতি-গঠন-আন্দোলনও সেই ধারায় পরিচালিত।”

সোণাইমুড়ীতে শুভপদার্পণান্তে দুই হাজার হিন্দু-সম্বলিত কীৰ্ত্তন দল, শশস্ত্র রক্ষীদল, ব্যাণ্ডপাৰ্টি, সুসজ্জিত তিনটা হস্তী সহ বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে আচার্য্যদেব চৌমুহনী আশুড়া বাড়ীতে পৌছিলে অসংখ্য জন-সমারোহে অপূৰ্ণ উদ্গাদনা লক্ষিত হয়। নোয়াখালী সহরের বিশিষ্ট লোকগণ উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের পক্ষ হইতে চারিখানি অভিনন্দন দানের পর—আচার্য্যদেব তদীয় ভাষণে বলেন :—

“হিন্দু-ধর্মের গ্রানিতে হিন্দু-সমাজের গ্রানি; হিন্দু-সমাজের গ্রানিতে হিন্দু-জাতির অধঃপতন ও নির্যাতন। ধর্ম ও সমাজে শক্তি-সঞ্চারের অভাবে এই সর্বনাশকর গ্রানির উৎপত্তি। উপনিষদের মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী হিন্দুকে বীর্য্যের অমুশীলনে উদ্বুদ্ধ করেছে। গীতা স্বধর্ম পালন এবং সমাজ রক্ষার জন্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করতে আদেশ দিচ্ছে। হিন্দুর অতীত সহস্রাব্দের ইতিহাস—শুধু অত্যাচারী দিগ্বিজয়ীর আক্রমণ হতে স্বধর্ম, স্ব-সমাজকে রক্ষার জন্য প্রাণপণ সংগ্রামের কাহিনী। “হিন্দু শির দিয়াছে, কিন্তু সার দেয় নাই।” যুদ্ধক্ষেত্রে জাতীয় গৌরব রক্ষার জন্য সাগ্রহে মৃত্যুকে বরণ করেছে, কিন্তু কাপুরুষতা প্রদর্শন করে নাই। হিন্দু আজ সে ধর্ম-যুদ্ধের গৌরব গাঁথা ভুলিয়া ক্লীবতা, কাপুরুষতাকে আশ্রয় করেছে। ধর্মের নামে, অহিংসার নামে অমুখ্য বিসর্জন দিয়া তিলে তিলে মৃত্যুর সম্মুখীন হচ্ছে।

আমি হিন্দু জাতিকে পুনরায় দুর্দ্বন্দ্ব দিগ্বিজয়ী করে তুলবার

জগৎ হিন্দুধর্মে এবং সমাজ-জীবনে বীর্ষের সাধনার পুনঃ প্রবর্তন চেষ্টায় বদ্ধ-পরিকর। “রক্ষীদল-গঠন” কর্ম-পদ্ধতির দ্বারা সমগ্র বাঙ্গলায় এমন এক অখণ্ড শক্তিশালী হিন্দু-সম্মত-শক্তি গড়ে তুলবো—যাহার আশ্রয়ে বাঙ্গলার যে কোনো নিভৃত পল্লীতে প্রত্যেকটি হিন্দু নরনারী নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে অবস্থান করতে পারবে।”

বাবুরহাটে সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়া আচার্য্যদেব বলেন—  
“আত্মরক্ষা বর্তমানে হিন্দু জাতির স্বধর্ম ; আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করেই সর্বশ্রেণীর হিন্দুকে একত্র সম্মিলিত, সম্মত হতে হবে। আত্মরক্ষার চিন্তা ও প্রচেষ্টার মধ্য দিয়াই হিন্দু-সমাজের বর্ণগত, শ্রেণীগত, আভিজাত্য-প্রসূত ভেদ-বিবাদ মিলিয়ে যাবে ; উন্নত-অনুন্নত, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য যাবতীয় হিন্দু সমভাবে এক সাধারণ মিলন-ক্ষেত্রে সমবেত হতে বাধ্য হবে। হিন্দু-জাতি-গঠনের এই অপূর্ব সুযোগ উপেক্ষা করা উচিত নয়। আজ প্রত্যেক হিন্দুকে রাণাপ্রতাপের মত, ছত্রপতি শিবাজীর মত, শিখগুরু গোবিন্দসিংহের ন্যায় স্বধর্ম ও স্বসমাজ রক্ষার ব্রত ও দায়িত্ব গ্রহণ পূর্বক জাতি-গঠন মস্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে।”

দেওশাড়া সম্মেলনে স্থানীয় হিন্দুগণের পক্ষ হতে অভিনন্দন দানের পর আচার্য্যদেব হিন্দুগণের প্রতি আদেশ নির্দেশ প্রদান প্রসঙ্গে বলেন—

“হিন্দু-সংগঠনই বর্তমান ভারতের সবচেয়ে বড় সমস্যা—যার সমাধানের উপর হিন্দু-মুসলমান মিলন, রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক যথাযোগ্য বিধি-ব্যবস্থা নির্ভর করছে। হিন্দু-সংগঠনের পথে প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন উন্নত অল্পমত সর্বশ্রেণীর হিন্দুর এক সাধারণ ক্ষেত্রে মিলন ও সহযোগিতা। হিন্দু-সংগঠনের পথে বাধা-বিঘ্ন এবং সমস্যা যথেষ্ট। এই সমস্যাগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে মিয়ে সমাধান করতে গেলে কোন দিনই তা সমাপ্ত হবে না। কিন্তু বর্তমানে আসন্ন সঙ্কটের মধ্য দিয়ে এক মহা-সুযোগ উপস্থিত। এই সাধারণ বিপদের দ্বারা আক্টাস্ত হিন্দু-জনসাধারণকে আত্মরক্ষার সঙ্কল্পে ও উদ্দেশ্যে সম্মিলিত সজ্জবদ্ধ করতে হবে। এই সার্বজনীন বিপদের সম্মুখে হিন্দুর সামাজিক সঙ্কীর্ণতা ও ভেদ-বৈষম্য সহজে মুছে যাবে। চাই—ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে শক্তির সাধনা এবং আত্মরক্ষা ও আত্ম-বিস্তারের দুর্জয় সঙ্কল্প। এই জন্য আমি হিন্দু-মিলন-মন্দির স্থাপন ও রক্ষিদল-গঠন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হিন্দুজাতির মধ্যে শৌর্য্য-বীৰ্য্য জাগিয়ে তুলবার ব্যবস্থা করেছে।”

চট্টগ্রামে সম্মিলিত হিন্দুগণকে লক্ষ্য করিয়া সজ্জনেতা আচার্যদেব বলেন—

“আমার সজ্জের হিন্দু-সংগঠন-পদ্ধতি ভারতে বৃহত্তর জাতি-গঠন-পরিকল্পনার পরিপন্থী তো নয়ই ; বরং উহার ভিত্তি নির্মাণ করছে। সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমান ও খৃষ্টান—সজ্জবদ্ধ,



হিন্দুরক্ষীদল-সংগঠক আচার্যদেব





সুগঠিত, আত্মরক্ষায় সমর্থ; কিন্তু হিন্দু ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল। সুতরাং যদি বিরাট হিন্দু সম্প্রদায়কে সম্ভবতঃ ও শক্তিশালী করে তোলা যায় তবে বৃহত্তর জাতি গঠনের কার্য যথার্থই দ্রুত অগ্রসর হবে। আমি সমগ্র দেশে সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে মিলন-মন্দিরের জাল ফেলে সমগ্র হিন্দুজনগণকে গাঁথে তুলে একমূল কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করে দেবো। জাতির আজ শক্তির অভাব; চাই—জাতির অসাড় ধমনীতে বৈদ্যুতিক শক্তি-প্রবাহ ও উষ্ণ শোণিত-স্রোতের সঞ্চার; তবেই সমাজ ও জাতির জীবনের গলদ কাটবে এবং বাধাবিঘ্ন দূর হবে; নাশ্চঃ পন্থা।”

কুমিল্লার সম্মেলনে সমবেত হিন্দুগণকে আশ্বাস ও উৎসাহ প্রদান পূর্বক আচার্যদেব নিম্নোক্ত তেজোগর্ভ বাণী প্রকাশ করেন—

“জীবন-সংগ্রামে দুর্বলের বিনাশ অবশ্যস্বাভাবী। কাপুরুষ, নিশ্চেষ্ট যে, বিধাতাও তার প্রতি বিমুখ। হিন্দুকে আজ ক্লৈব্য পরিহার পূর্বক জীবন-সংগ্রামে বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। বাঙ্গালী হিন্দুর শিরায় শিরায় আজ চাই হৃদয় বীর্ঘ্যের, হৃদয়ে হৃদয়ে হৃদম সঙ্কল্পের সঞ্চার। শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ যে সংগঠন-পন্থায় যথাক্রমে মহারাষ্ট্র ও শিখ জাতিকে নবজীবন দান করেছিলেন, আমি বাঙ্গালায় সেই সংগঠন-পদ্ধতি-ক্রমে পরাক্রমশালী হিন্দু-সংহতি গঠনে বদ্ধ-পরিকর। এই আত্মরক্ষা ও আত্মগঠন প্রচেষ্টাকে যথেষ্ট প্রবল

করে তুলতে পারলে হিন্দু-সমাজের যাবতীয় তুচ্ছ ভেদ-বিবাদ, ঘৃণাবিদ্বেষ বিদূরিত হয়ে যাবে।”

### বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-সম্মেলনে আচার্যদেবের বাণী

এই ছুন মাদারীপুর সেবাশ্রম প্রাক্ষণে স্থানীয় যাবতীয় বিশিষ্ট লোক এবং সর্বশ্রেণীর হিন্দু-জনসাধারণকে লইয়া এক বিরাট হিন্দু-সম্মেলনে উদ্বোধন বক্তৃতা প্রসঙ্গে আচার্যদেব বলেন—

“বাংলার হিন্দু আজ বিপন্ন। ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ—সকল ক্ষেত্রে হিন্দু আজ লাক্ষিত নিপীড়িত। দুই-দুর্বৃত্তের কবল হতে পল্লীবাসী হিন্দুকে রক্ষা করতে হলে তাদেরকে আত্মরক্ষার্থ উত্তোগী ও সজ্জবদ্ধ হতে হবে। দুর্বল, আত্মরক্ষায় অক্ষম ব্যক্তিকে কেউ রক্ষা করতে পারে না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মিলন ও সহযোগিতা হলেও হিন্দু-সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা কিছুমাত্র হ্রাস পাবে না। হিন্দু-সংগঠনের উদ্দেশ্য হিন্দু-সমাজ-সংস্কার ও সজ্জশক্তি সংগঠন। এর মধ্যে মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ বা বিরোধিতার কোন প্রশ্ন নাই। হিন্দু আজ জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। এই সঙ্কট-কালে হিন্দুকে জাতি স্বার্থ ও অধিকার নিয়ে সম্মানে বাঁচতে হলে অনাচার ও অত্যাচারের প্রতিকারের পথ গ্রহণ করতে হবে। তৎক্ষণ উপযুক্ত শক্তি-সংগ্রহ চাই। বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই বাংলাদেশে বসবাস করবে। এক সম্প্রদায়

অপরকে উচ্ছেদ করতে পারবে না ;—উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃ-  
বৃন্দের হৃদয়ে এই ধারণা সুস্পষ্টরূপে থাকা বাঞ্ছনীয় ।

হিন্দুকে আজ নতন করে তার ধর্ম ও জাতীয়তার মর্ম  
উপলব্ধি করতে হবে । হিন্দুধর্ম বীৰ্য্যের সাধনা, হিন্দুর দেবতা  
অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ; অত্যাচারী ছুষ্ঠের দমন হিন্দুর দেবতার  
লীলা । আত্মরক্ষার সঙ্কল্প ও সম্বলশক্তি গঠনের প্রচেষ্টা ও  
দায়িত্ববোধ প্রত্যেক হিন্দু-নরনারীর প্রাণে জাগ্রত করে দিতে  
হবে ।”

২১শে জুন খুলনা সহরে এক বিরাট জন-সভায় ষাবতীয় বিশিষ্ট  
হিন্দুর উপস্থিতিতে আচার্য্যাদেব বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন—

“বাংলার হিন্দুগণের উপর চতুর্দিক হতে অবিরত যে আঘাত  
আক্রমণ আসছে তাতে হিন্দু-সমাজ আজ ভীত, আতঙ্কগ্রস্ত ।  
এই সার্বজনীন বিপদের সম্মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেদ-বিবাদ, অনৈক্য-  
পার্থক্য ভুলিয়া আত্মরক্ষার্থ হিন্দু-জন-সাধারণের মিলন ও  
সম্বলবদ্ধতা সহজ ও স্বাভাবিক । আত্মরক্ষার্থ প্রত্যেক হিন্দুর  
প্রাণে শক্তির অনুশীলনের দুর্ব্বার আকাজক্ষা জাগানো চাই ।  
হিন্দুর মান, সম্মান, ধর্ম, স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার তীব্র সঙ্কল্প ও  
দায়িত্ববোধ সকলের প্রাণে জাগিয়ে তুলতে হবে । এই উদ্দেশ্যেই  
সম্ভব রক্ষীদল-গঠন-আন্দোলন । এর মধ্য দিয়েই হিন্দু-  
জাতির লুপ্ত শৌর্য্য-বীৰ্য্য পুনর্জাগ্রত হবে ।”

২৫শে জুন মধ্য-প্রদেশের অন্তর্গত রায়পুর সহরে স্থানীয় হিন্দু-  
নেতৃবর্গের উদ্যোগে জনপ্রিয় নেতা মিঃ লাথের সভাপতিত্বে

আহত বিরাট হিন্দু-সম্মেলনে আচার্যদেব উদ্বোধন ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন—

“শক্তিশালী জাতি-গঠনের আগ্রহে আজ সমগ্র ভারতবাসীর চিত্ত উদ্বেলিত ; কিন্তু হিন্দু-সংগঠন ব্যতীত ভারতে জাতি-গঠন অসম্ভব। সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমান একতাবদ্ধ ও সুগঠিত ; নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ, অধিকার, সুযোগ-সুবিধা, হিতাহিতৈর্য প্রতি তাহাদের সুতীক্ষ্ণ সচেতন দৃষ্টি। কিন্তু ভারতের ৯ অংশ যারা সেই বিশাল হিন্দু সম্প্রদায়ের জনগণ আজ আত্ম-দৃষ্টিহীন, ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও দুর্বল, স্বীয় ধর্ম ও সমাজের স্বার্থ অধিকার ও শুভাশুভ সম্বন্ধে উদাসীন। ফলে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্য হতে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র নরনারী ধর্মাস্তরিত হচ্ছে। হিন্দু-সমাজের এই ক্ষয়ের পথ রোধ করতে হলে ভারতের সর্বত্র হিন্দু-জন-সাধারণের মিলন-কেন্দ্র ও হিন্দু-ধর্মের প্রচার কেন্দ্র স্থাপন আবশ্যিক। হিন্দুদের আদর্শ-প্রচার, হিন্দু-সমাজের কুসংস্কার দূরীকরণ, বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে মিলন ও সহস্র সহস্র প্রচারক নিযুক্ত করতে হবে। ভারতের মোহন্ত ও মঠধারীগণ এবং সম্পত্তি ও প্রতিপত্তিশালী গৃহস্থগণকে অর্থ সামর্থ্য নিয়ে হিন্দু-সংগঠন কার্যে পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে।”

অগ্নীধামে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে পুরী-সেবাশ্রমে মন্ত্রী বিশ্বনাথ দাসের সভাপতিত্বে যে উড়িষ্যা হিন্দু-সম্মেলনের অধিবেশন হয় উহাতে আচার্যদেব ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন—

“হিন্দু-জাতি তার ধর্মের উচ্চতর আদর্শ ও ভাবধারা ভুলিয়াছে ; কারণ বহু শতাব্দে যাবৎ প্রণালীবদ্ধ ধর্মপ্রচার ব্যবস্থা হিন্দু-সমাজে নাই। আজ যে অসংখ্য হিন্দু নরনারী বিশ্বাসের কবলিত হচ্ছে—তার একটি কারণ—রীতিমত ধর্ম-প্রচার-ব্যবস্থার অভাবে হিন্দু জন-সাধারণের স্বীয় ধর্মের আদর্শ ও মহত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা। এই অজ্ঞতা হতেই সামাজিক সংকীর্ণতা ও ঘৃণা-বিদ্বেষের উৎপত্তি। বর্তমানে ব্যাপক ভাবে ধর্মপ্রচার ব্যবস্থার অত্যন্ত প্রয়োজন। উড়িষ্যায় প্রচুর সম্পত্তিশালী বহু মোহন্ত ও মঠধারী আছেন ; তাহাদের অর্থ-সামর্থ্য আজ শুধু ব্যক্তিগত সুখ-সম্ভোগে ব্যয় না করে জাতির সেবায় নিয়োগ করা আবশ্যিক ; হিন্দু-জাতি ও সমাজের আজ এই দাবী।”

### কলিকাতায় হিন্দু সম্মেলন

আচার্যদেবের নির্দেশ ক্রমে ২৬শে আগষ্ট খ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মষ্টমী উপলক্ষ্যে কলিকাতা বালিগঞ্জে ডাঃ শ্রীমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট হিন্দু-সম্মেলন আভূত হয়। এই সম্মেলনে কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকগণ এবং নেতৃবৃন্দ উদ্যোগী ছিলেন। অনানু-  
শঙ্গ সহস্র নরনারী সম্মেলনে যোগদান করে।

“বাক্সলার বিপন্ন হিন্দুর আত্মরক্ষার উপায় ও আয়োজন” সম্বন্ধে নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা ও প্রস্তাবাদি গ্রহণ করেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে যে উৎসাহ—উদ্দীপনা লক্ষিত হইয়াছিল তাহা যথার্থই অদ্ভুতপূর্ব্ব। এই সম্মেলনে আচার্যদেব উদ্বোধন অভিভাষণ প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন :—

“অবিরত অত্যাচার উৎপীড়নে হিন্দুর জাতীয় জীবন ক্ষত-  
বিক্ষত। কিন্তু হিন্দু জাতির জীবনে সে আঘাতের প্রতিক্রিয়ার  
লক্ষণ কৈ ? আত্মরক্ষা—গ্রায্য স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা—মানুষের  
স্বাভাবিক প্রকৃতি ও দাবী। কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনে  
এত আঘাত আক্রমণের ফলেও চেতনা জাগে কৈ ? এখনো ভেদ-  
বিশেষে ছিন্ন ভিন্ন, ক্লেব্য-দৌর্বল্যে অবসন্ন হিন্দুর আত্মরক্ষার  
উত্তম কোথায় ? অত্যাচারী যে, সে অপরাধী—সত্য ! কিন্তু  
অগ্রায় অত্যাচার যে বিনা প্রতিবাদে মাথা পেতে সহ্য করে  
—সে মহাপাপী—ইহাই না হিন্দুধর্মের ও শাস্ত্রের মর্ম্মবাণী ?

জন্মাষ্টমীর পুণ্য তিথিতে হিন্দুধর্মের মূর্ত্ত বিগ্রহ, হিন্দু  
জাতি-সংগঠক শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব দিনে তাঁর দুঃষ্ট-দমন-লীলা  
ও বীৰ্য্যপ্রদ বাণীর মধ্যেই আজ হিন্দুকে কর্তব্যের সন্ধান করিতে  
হইবে।—“হতো বা প্রাপ্যাসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্যাসে-  
মহীম্।”

আত্মরক্ষাই প্রত্যেক জীবের, প্রত্যেক মানুষের স্বধর্ম ;  
আত্মরক্ষার জন্য চাই—অটল সঙ্কল্প, কঠোর ব্রত-বরণ এবং  
শক্তি-সংগ্রহ। আত্মরক্ষার উত্তম ও সামর্থ্য যার নেই, কোনো  
গ্রায্য ধর্মের অনুশাসন, যুক্তি তর্কের ধর্ম, মনুষ্যত্বের আবেদন  
তাকে কদাচ রক্ষা করতে পারে না। শক্তি-সংগ্রহের উপায়—  
সজ্জবদ্ধতা।

হিন্দু জাতি শাস্তি-প্রিয়, উদার। নিরর্থক কারো ধর্ম,  
সম্মান, স্বার্থে আঘাত দেওয়া তার স্বভাব নয়। অপরকে

বঞ্চিত করে অন্তায় অধিকার সে চায় না। কিন্তু অন্তায়-অত্যাচারও সে সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। আত্মরক্ষার সঙ্কল্প—আজ আমি ব্যাপক ভাবে গ্রামে গ্রামে হিন্দু রক্ষীদল-গঠন কর্ম-পদ্ধতির প্রবর্তন—চাই। কার্য্য কিয়ৎ পরিমাণে অগ্রসর হয়েছে। এখন চাই—হিন্দু নেতৃবৃন্দ তথা হিন্দু জনসাধারণেব পৃষ্ঠ-পোষকতা। সিদ্ধি সুনিশ্চিত।”

### বিহার হিন্দু সম্মেলন

২৯ শে ও ৩০ শে সেপ্টেম্বর আচার্য্যদেবের নির্দেশ ক্রমে সম্মেলন গয়া সেবাশ্রমে মন্ত্রী অমুগ্রহ নারায়ণ সিংহের সভাপতিত্বে বিহার হিন্দু সম্মেলনের অধিবেশন হয়। বহু বিহারী হিন্দুনেতা এবং খ্যাতনামা বক্তাগণ যোগদান করেন। হিন্দু জাতির দুর্দশার মূল কারণ বিশ্লেষণ পূর্ব্বক হিন্দু-সংগঠনের উপায় সম্বন্ধে প্রস্তাবাদি গৃহীত হয়। আচার্য্যদেব স্বয়ং সম্মেলনে উপস্থিত থাকিয়া যাবতীয় কর্ম্ম-ব্যবস্থা করেন। সম্মেলনের প্রারম্ভে উদ্বোধন ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বাণী প্রকাশ করেন :—

“হিন্দুসমাজ ও হিন্দুজাতির যাবতীয় দুর্দশা ও অধঃপতনের মূলকারণ—হিন্দু ধর্ম্মের গ্রানি। হিন্দু ধর্ম্মের গ্রানির মূলে—হিন্দু-ধর্ম্মের আদর্শ ও সাধনা সম্বন্ধে অজ্ঞতা, বিস্মৃতি ও উপেক্ষা। স্বীয় ধর্ম্ম-সংস্কৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা, বিস্মৃতি ও উপেক্ষার মূলে—হিন্দু ধর্ম্মের যথোচিত প্রণালীবদ্ধ প্রচারের অভাব। ভারতে মহাজাতি গঠনের সমস্যার সমাধান কল্পে প্রয়োজন—হিন্দু-জাতি-গঠন। আর হিন্দু-জাতি-গঠনের প্রথম পর্ব্বই চাই—হিন্দু ধর্ম্মের প্রণালীবদ্ধ প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা। সম্মেলন



পক্ষ হতে দশটি ধর্ম-প্রচারক সন্ন্যাসিদল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচার কার্যে নিযুক্ত আছে। দেশের অর্থ ও প্রতিপত্তিশালী—বিশেষ ভাবে মঠধারী মণ্ডলেশ্বর ও মোহন্তগণের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করি।”

### যুক্ত-প্রদেশে হিন্দু-সম্মেলন

সম্মেলনের আদেশে স্থানীয় হিন্দু-নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে সম্মেলন কাশীতীর্থ সেবাশ্রমে ৭ই, ৮ই ও ৯ই অক্টোবর এবং প্রয়াগ সেবাশ্রমে ১৫ই অক্টোবর যুক্তপ্রদেশবাসী হিন্দুগণের সম্মেলনের পরপর চারিটি অধিবেশন হইয়াছিল। যুক্ত-প্রদেশের প্রায় যাবতীয় হিন্দু নেতৃবৃন্দ এবং প্রধান ব্যক্তিগণ এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। আচার্যদেব হিন্দুগণের প্রতি যে বাণী প্রদান করেন তাহাতে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন,—

“হিন্দু ধর্মের উদার ও শক্তিপ্রদ আদর্শ ও অনুষ্ঠানাদির প্রচারাভাবেই হিন্দুজাতি আজ দুর্গত, লাঞ্ছিত, ভেদ, বিবাদে দুর্বল ও আত্মরক্ষায় অক্ষম। ধর্মের যথার্থ আদর্শের ভিত্তিতেই হিন্দুজাতির পুনর্গঠন আবশ্যিক। হিন্দু ধর্মের আদর্শ ও আচরণের মধ্যে আদ্যন্ত তেজস্বিতা বীৰ্য্যবত্তা—আত্মরক্ষা, আত্মবিস্তার ও জাতীয়তার চেতনায় পরিপূর্ণ। ক্লেব্য-দৌর্বল্যে মুহমান হিন্দু জাতিকে আজ সেই ধর্ম ও জাতীয়তার অমর সিদ্ধান্ত প্রচার পূর্বক হুজুর্য় প্রেরণা সঞ্চার আবশ্যিক।”

## কলিকাতা হিন্দু সম্মেলন

আচার্যদেবের অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীশ্রীকালীপূজা উপলক্ষ্যে কলিকাতা বালিগঞ্জে সম্মেলন উদ্যোগে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের আহ্বানে ৩০শে অক্টোবর তারিখে এক হিন্দু সম্মেলনের অধিবেশন হয়। উহাতে কলিকাতার বিশিষ্ট হিন্দু নাগরিকগণ যোগদান করেন। হিন্দুর শক্তি-সাধনা বিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনা হয়। সম্মেলন আচার্যদেব এই সংক্ষিপ্ত ভাষণে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন :—

“হিন্দু মহাশক্তির পূজারী, মহাবীর্যের সাধক। হিন্দুর ধর্ম-সাধনার উদ্দেশ্য—মানবাত্মায় নিহিত অনন্ত শক্তির উন্মেষ, বিকাশ, প্রকাশ। যে ধর্ম—মানুষকে শক্তিমান করে না হিন্দুর মতে তা’ অধর্ম ; যে সাধনা—সাধককে বীর্যবান করে তোলে না—হিন্দুর মতে—তা’ ভণ্ডামি,—আত্মপ্রতারণা। ভ্রান্ত তারা, যাদের ধারণা—হিন্দুর ধর্ম—হিন্দুকে ক্লীব, কাপুরুষ, দুর্বল করেছে। হিন্দু ধর্মের বাণী, ‘ক্লেব্যাং মাস্ম গমঃ।’ হিন্দুর দেবতা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, বীর্য-ঘন-মূর্তি। হিন্দু ধর্মের স্থাপক—রাক্ষস-বংশ-ধ্বংসকারী শ্রীরামচন্দ্র, অসুর-দৈত্যদানব-ধ্বংসী শ্রীকৃষ্ণ।

হিন্দু ভগবানকে শুধু করুণাময় রূপে কল্পনা করেনি। তাঁকে “ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং” মহাকাল ও সংহার-কারিণী মহাকালী রূপেও পূজা করিয়াছে। হিন্দুধর্ম জীবন ও জগৎকে অনিত্য ও মরীচিকা জ্ঞানে পরিত্যাগ পূর্বক কাপুরুষের মত পলায়নের পরামর্শ দান করেনি। বরং আদেশ ও নির্দেশ

দিয়েছে—বিপদাপদ এমন কি মৃত্যুর ভয়েও ধর্ম পরিত্যাগ করতে নেই। বর্তমানে ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনে হিন্দু শক্তির সাধনা ও প্রয়োগে উদাসীন; তাই হিন্দু নির্জীব, নিপীড়িত। আজ পুনরায় শক্তির সাধনা, অমুশীলন ও আত্মরক্ষায়—ধর্ম-স্বসমাজ-স্বজাতি রক্ষায় উহার প্রয়োগের সঙ্কল্প হিন্দুর হৃদয়ে হৃদয়ে সঞ্চারিত করতে হবে।

### পার্বত্য হিন্দু-সম্মেলনে বাণী প্রচার

১লা ও ২রা নবেম্বর বিহার প্রদেশের অন্তর্গত মানভূম জেলায় পার্বত্য অঞ্চলের হিন্দু-অধিবাসিগণের ভক্তি-যুক্ত সাগ্রহ আহ্বানে আচার্যদেব সেনেড়া হিন্দু সম্মেলনে শুভ পদার্পণ করেন। এই সম্মেলনে বহু সহস্র সাঁওতাল, মুণ্ডা, বাউরী প্রভৃতি জাতির সমাগম হইয়াছিল। আত্মা, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে বহু বান্ধালী ও মাড়োয়ারী যোগদান করেন। বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া আচার্যদেবকে অভ্যর্থনা পূর্বক সম্মেলন ক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হয়। দুইদিবস ব্যাপী পার্বত্যজনীন বৈদিক যজ্ঞ, ভজন. কীর্তন, সভায় হিন্দু-ধর্ম, সমাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা, তীরধনু লাঠি খেলা ও প্রস্তাব গ্রহণ হয়। আচার্যদেব অজস্র আশীর্বাদে সমাগত সহস্র সহস্র পার্বত্য নরনারীকে অভিষিক্ত করেন। তাহারা অনুভব করিল যেন প্রভু শ্রীরামচন্দ্র পুনঃ অবতীর্ণ হইয়া করুণাপূর্ণ হৃদয়ে গুহক চণ্ডাল ও বনের বানর-ভল্লুক-হুমুমানাদির ত্রায় সেই সকল পার্বত্য অমার্জিত নরনারীকে আদর ও আশীর্বাদ করিতেছেন। সম্মেলনে আচার্যদেব ভাষণ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন—

“সহস্র বৎসর যাবৎ হিন্দু-ধর্মের প্রণালীবদ্ধ প্রচারের এবং হিন্দুজাতির আত্মপ্রসার-প্রবৃত্তির অভাবে, হিন্দু-সমাজ আজ অচল, পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। ফলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া হিন্দু সমাজের প্রতিবেশী রূপে থাকিয়াও, কতক পরিমাণে হিন্দু ভাবাপন্ন হইয়াও লক্ষ লক্ষ সাঁওতাল, মুণ্ডা, বাউরী প্রভৃতি জাতি আজ অহিন্দু বলিয়া পরিগণিত এবং ধর্মাস্ত্রিত হইতেছে। হিন্দু-সংগঠনের অত্যন্ত প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—হিন্দুধর্মের উদার ভাব ও আদর্শের দ্বারা উক্ত পার্বত্য জাতির জনগণকে হিন্দুসমাজের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লওয়া। ধর্ম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য—ত্রিবিধ সেবা ইহাদের প্রয়োজন। প্রদেশে প্রদেশে সজ্জের মিলন-মন্দিরগুলির মধ্য দিয়া আমি প্রধানতঃ এই কার্যই করিতে চেষ্টিত আছি।”

অতঃপর আচার্যদেব ১৪ই ও ১৫ই নবেম্বর রাসপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত খুলনা সেবাস্রমের বার্ষিক হিন্দু-সম্মেলনে পদার্পণ পূর্বক আচার্য্য সহস্র সহস্র হিন্দু নরনারীকে আশ্বাস ও আশীর্বাদ দানপূর্বক হিন্দু সমাজ রক্ষার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেন। গার্বজনীন বৈদিক যজ্ঞে উপস্থিত সহস্র সহস্র নরনারীর হৃদয়ে শক্তি ও উৎসাহ সঞ্চার করেন। তৎপরে ২৭শে নবেম্বর সজ্জের বার্ষিক সভায় উপস্থিত থাকিয়া কার্যাদি পরিচালনা করেন।

# শ্রীশ্রীপ্রণব-মঠ-প্রতিষ্ঠা

ও

## জগদ্‌গুরু রূপে অর্ঘ্য গ্রহণ

পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি—কিরূপে সজ্জের কর্মপ্রসার বহুমুখী  
ও বহু বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্যদেব সজ্জকে আইনামুসারে  
বিধিবিজ্ঞ এবং পরিচালক-সমিতি গঠন পূর্বক সজ্জকে স্বদৃঢ় ভিত্তির উপর  
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। “কর্মচক্রের” সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্যদেব যুগপৎ  
“ধর্মচক্রের” প্রবর্তন করিয়াছেন। সেই “ধর্মচক্রের” প্রচার ও প্রসারের  
সঙ্গে সঙ্গে কিরূপে উহাকে স্বদৃঢ় ভিত্তিতে স্থপ্রতিষ্ঠিত করা যায় সে  
বিষয়ে আচার্য্যদেব বিশেষ চিন্তা করিতেছিলেন।

যে ভাব, যে আদর্শ, যে সাধনার ভিত্তিতে আচার্য্যের অভীষ্ট ভবিষ্য  
ধর্ম-রাজ্য গঠিত হইয়া কোটি কোটি নরনারীকে আশ্রয় দান পূর্বক শক্তি,  
শান্তি ও মুক্তির অমৃত দান করিবে; তার মূল উৎসটিকে স্বদৃঢ়, যথা  
সম্ভব কালজয়ী ও স্বরক্ষিত করিবার জন্ত তিনি আগ্রহান্বিত হইয়া সমগ্র  
স্বযোগের অপেক্ষা করিতে থাকেন।

১৯২২ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে আচার্য্যদেবের অন্ততম গৃহী শিষ্য  
শ্রীযুত গোপীকৃষ্ণ সিংহ কলিকাতায় আচার্য্যদেবের দর্শনাশীর্ষাদ  
লাভের জন্ত উপস্থিত হন। তিনি আচার্য্যদেবের সেবার জন্ত কিছু অর্থ  
দানের প্রস্তাব করেন। আচার্য্যদেব তাহাকে চিন্তা করিয়া স্থির করিতে  
বলেন—কিরূপে সেই অর্থ ব্যয়িত হইবে? গোপীবাবু বলিলেন যে

তিনি সে সব কিছু বুঝেন না। আচার্য্যদেব স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী বাহা বাহা ভাল বিবেচনা করিবেন সেই ভাবেই ব্যয় করিলে তিনি কৃতার্থ হইবেন। গোপীবাবুর এই নিকিঞ্চন ভক্তি-ভাবে আচার্য্যদেব বিশেষ প্রীত হন। তিনি অবিলম্বে বাজিতপুরে তদীয় তপোভূমিতে “শ্রীশ্রীপ্রণবমঠ” স্থাপন এবং সিদ্ধপীঠের মন্দির নির্মাণের সঙ্কল্প ও পরিকল্পনা স্থির করিয়া স্বয়ং কয়েকজন সন্ন্যাসীকে লইয়া কার্য্যারম্ভ করেন। ক্রমে ক্রমে কিছু কিছু করিয়া জমি সংগ্রহ পুস্কক মাটি কাটিয়া উচু করিয়া বাধাইয়া মন্দির নির্মিত হইতে থাকে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের মধ্যেই উক্ত সিদ্ধপীঠ মন্দির নির্মিত হইয়া গেল।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস হইতে আচার্য্যদেব অন্তঃস্থ হইয়া শয্যাশায়ী হন। ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। ফেব্রুয়ারীর মধ্য ভাগে আচার্য্যদেবের শরীর নিরাময় হইয়া উঠে। ব্যাধিতে শয্যাগত ছিলেন বলিয়া আচার্য্যদেব ১৯৩০ সালের প্রয়াগ কুম্ভমেলায়—সজ্জ হইতে বিরাট সেবাকার্য্য ও ধর্ম্ম-প্রচারানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইলেও—আচার্য্যদেব তথায় শুভপদার্পণ করিতে পারেন নাই; এবং পরবর্ত্তী মাঘীপূর্ণিমায় সিদ্ধপীঠে সজ্জমহোৎসব-সম্মেলনে সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত থাকিয়া আশীর্বাদ দান করেন নাই। কিন্তু সজ্জের যে সকল সন্ন্যাসী মাঘীপূর্ণিমায় সিদ্ধপীঠে মহোৎসব-সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তাহারা সকলেই এক বাক্যে বলিয়াছিলেন যে উক্ত মাঘী পূর্ণিমায় আচার্য্যদেবের অলৌকিক শক্তি ও প্রভাব উপস্থিত সহস্র সহস্র নরনারীকে এমনি আবিষ্ট রাখিয়াছিল যে আচার্য্যদেব যে সিদ্ধপীঠে অহুপস্থিত এ কথা কেহ মনেও আনিতে পারে নাই। ঠিক ঐ সময়ে যে সব সন্ন্যাসী কলিকাতায় আচার্য্যদেবের শয্যাপার্শ্বে নিয়ত সেবাক্রিয়ায় নিয়োজিত ছিলেন তাহাদের নিকট জানা

গিয়াছিল যে মাঘীপূর্ণিমার দুইটা দিন আচার্য্যদেব অল্পক্ষণ অহরহঃ সিদ্ধপীঠের চিন্তায় তন্ময় এবং বাহ্যহীন ও অর্কবাহ্য অবস্থায় ছিলেন। তখন সত্যই বৃত্তিতেছিলাম—আচার্য্যদেব মহাভাবে যোগস্থ। তাঁর দেহটা রোগশয্যায় আছে বটে কিন্তু স্বয়ং তিনি যোগবলে সিদ্ধপীঠে উপস্থিত ছিলেন।

### মঠ-প্রতিষ্ঠা উৎসব

মাৰ্চ্চ মাসে আচার্য্যদেব সজ্জের সুন্দরবন অঞ্চলের আশান্তনি আশ্রমের বার্ষিক মহোৎসব-সম্মেলনে শুভপদার্পণ করেন। উৎসবাস্তে তিনি বাবতীয় সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণকে লইয়া ঈমার যোগে খুলনা হইয়া বাজিতপুরে উপস্থিত হইয়া “শ্রীশ্রীপ্রণবমঠ ও সিদ্ধপীঠ মন্দির” প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন। নিমন্ত্রণপত্র মুদ্রিত করিয়া দলে দলে সন্ন্যাসিগণকে চতুর্দিকে গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে প্রেরণ করা হইল। মাঘী পূর্ণিমায় আচার্য্যদেব সিদ্ধপীঠে উপস্থিত হইতে পারেন নাই; তিনি ব্যাধিতে শয্যাশায়ী জানিয়া তাঁর অমরকৃত, ভক্ত, শিষ্যগণ উদ্বেগে কালষাপন করিতেছিলেন। তাহারা যখন সন্ন্যাসী প্রচারকদের নিকট সংবাদ পাইল যে তাহাদের প্রাণের দেবতা সুস্থ হইয়া সিদ্ধপীঠে আগমন করিয়াছেন এবং দর্শন ও আশীর্বাদ নিবার জ্ঞাত আহ্বান লিপি প্রেরণ করিয়াছেন। তখন সকলের প্রাণে উৎসাহের বজ্রা বহিল। বহু দূর দেশ হইতেও বহু ভক্ত নরনারী আগমন করিয়াছিল। শ্রীযুত গোপীবাবু সজ্জীক যোগদান করিলেন।

মঠের জ্ঞাত যে জমি সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ উচু করিয়া বাধাইয়া মধ্যস্থলে মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। অবশিষ্টাংশ

পর বৎসর উঁচু করিয়া বাধাইয়া সমগ্র মঠ-প্রাঙ্গণটি চোরস করা হয়। মন্দিরের সম্মুখস্থ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আচ্ছাদন দিয়া অহোরাত্র নামসংকীৰ্ত্তনের আসর ও বৈদিক যজ্ঞের বেদী নির্মিত হইয়াছিল।

সন ১৩৩৬ সালের ৭ই ও ৮ই চৈত্র তারিখে এই মঠ প্রতিষ্ঠার উৎসব-সম্মেলন সম্পন্ন হয়। ৭ই চৈত্র ব্রাহ্ম মুহূৰ্ত্ত হইতেই আচার্য্যদেবের মহাপ্রকাশ লক্ষিত হইল। মহাভাবে সমাহিত অবস্থায় তিনি প্রহর কাল ধরিয়া সমবেত সন্ন্যাসী ও গৃহী সন্তানগণের পূজা আরতি গ্রহণ পূৰ্ব্বক আশীর্বাদ দান করিলেন এবং অহোরাত্র নাম-সংকীৰ্ত্তন আরম্ভ করিবার আদেশ দিলেন। সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও সেবকগণ কয়েকটি দলে বিভক্ত হইয়া পর্যায়ক্রমে আচার্য্যদেব কর্তৃক সিদ্ধপীঠে প্রাপ্ত যুগের তারক ব্রহ্মনাম “ওঁ হর গুরু শঙ্কর শিবশম্ভো”—কীৰ্ত্তন সারা দিনরাত্রি ব্যাপিয়া করিতে লাগিলেন। সমাগত ভক্তগণ সঙ্গে যোগদান করিলেন।

আচার্য্যদেব মহাভাবে আবিষ্ট হইয়া সিদ্ধপীঠ-বেদীতে অধিষ্ঠিত হইলে সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তগণ সমবেত ভাবে “ওঁ সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাঙ্কঃ সহস্রপাং প্রভৃতি” মন্ত্রে তীর্থবারি ও দধি-দুগ্ধ-ঘৃত-মধু দ্বারা আচার্য্যদেবকে অভিষেক পূৰ্ব্বক পূজা আরতি করিলেন। সহস্র সহস্র নরনারী ভাবোন্মত্ত হইয়া “জয় গুরু ওঁকার জয় শিব ওঁকার” গীতির সহিত আরতি ও নৃত্য করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ ধূপদানী, ত্রিশূল প্রভৃতি লইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিলেন।

এক অপূৰ্ব্ব মহাভাবের শ্রোত বহিল। উপস্থিত নরনারী সকলে যেন স্থান কাল ভুলিয়া এক দিব্যভাব-রাজ্যে বিহার করিতে লাগিল। আচার্য্যদেব সিদ্ধপীঠে সমাসীন থাকিয়া প্রণত ভক্তগণকে অবিভ্রান্ত আশীর্বাদ দান ও শক্তি সঞ্চার করিতে লাগিলেন। মন্দিরের তিন দিকের তিনটি দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। আর তিন দিক হইতে



দলে দলে নরনারী হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জলশ্রোতের ত্রায় মন্দিরে প্রবেশ পূর্বক দর্শন, প্রণাম ও আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। মহাভাবে সমাহিত আচার্য্যদেব ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রহরের পর প্রহর ধরিয়৷ আশীর্বাদ ও মহাশক্তি বিতরণ করিতে লাগিলেন।

অভিষেক-কালীন এমন ভাবের আবহাওয়া রচিত হইল যে ত্যাগী গৃহী সকল ভক্ত নরনারীর প্রাণে একই অমৃতভূতি জাগ্রত হইল যেন ধর্ম-রাজ্য-সংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ আচার্য্যকে জগতের নরনারী সকলে জগদগুরু মহাসিংহাসনে অভিষেক করিতেছে। যজ্ঞবেদীর সন্মুখে পূজা-আরতির আসনে সমাসীন ত্রিশূল-হস্ত, জটজালশোভিত, ক্রদ্রাক্ষমণ্ডিত, বিপুলকলেবর, স্থির, গভীর, সমাহিত আচার্য্যদেবকে দেখিয়া সন্তলের প্রাণে বোধ হইল যেন সাক্ষাৎ যজ্ঞেশ্বর শিব আবির্ভূত।

### ভারতে মঠ-মন্দিরের সার্থকতা

ভারতের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য—ধর্মপ্রাণতা; আবহমান কাল হইতে ভারতীয় হিন্দুজাতি জগতে ধর্মগুরুর আসন অলঙ্কৃত করিয়া আসিয়াছে। সমাজে যেমন কর্ম-বিভাগ (Division of labour) থাকে; কেহ ব্রাহ্মণের কার্য্য করে, কেহ ক্ষত্রিয়ের কার্য্য করে, কেহ বৈশ্যের কার্য্য এবং কেহ শূত্রের কার্য্য করে; এরূপ পরস্পর কর্ম-সমবায় ও বৃত্তি-সমন্বয়ের ফলে সমাজে শৃঙ্খলা ও শান্তি বিরাজিত থাকে। জগতের অসংখ্য জাতির বিচিত্র জীবন-বাণন-পদ্ধতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই—বিধাতা যেন ভারতীয় আৰ্য্য-হিন্দু-জাতিকে সৃষ্টির প্রভাত হইতে মানবজাতিকে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার পথে পরিচালনা করিবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন।

তাই যুগে যুগে দেখি—ভারতের বৃকে ধর্মের সাধন ও প্রচারে উৎসর্গিত-জীবন শত সহস্র মুনি, ঋষি, ত্যাগী, সন্ন্যাসী; ভারতের জন



শ্রীশ্রীপ্রণবমঠ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্যদেব ।



পদে, তীর্থে, অরণ্য-গর্ভে, পর্বত-শিখরে অসংখ্য আশ্রম, মঠ, তপোবন, বিহার। রামায়ণের যুগে, মহাভারতের যুগে, পৌরাণিক যুগে, তৎপূর্বে বেদ-উপনিষদের যুগে সমগ্র ভারতে অসংখ্য ধর্ম-সাধনার কেন্দ্র এবং অগণিত সাধক-সম্প্রদায়। ঐতিহাসিক যুগে বৌদ্ধ সজ্জের অভ্যুদয়ে সমগ্র ভারতে লক্ষ লক্ষ বিহার গড়িয়া উঠিল। বস্তুতঃ যুগে যুগে অলৌকিক আচার্য্যগণের মধ্য দিয়া যখন ভাগবতী শক্তি ধর্ম-সংস্থাপনের জন্ত অবতীর্ণ হইয়াছে, তখনি ক্রমে ক্রমে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক শক্তির কেন্দ্র স্বরূপ অসংখ্য মঠ-মন্দির-আশ্রমাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যুগে যুগে ইহাও দেখা গিয়াছে যে ভগবদ্ভিমুখ পাষণ্ড অসুন্দর এই ধর্ম-কেন্দ্রগুলিকে ধ্বংস করিবার জন্ত প্রবল প্রচেষ্টা করিয়াছে। মামুদ, জাঙ্গিস, তাইমুর, নাদির, আমেদ, কালাপাহার, আওরঙ্গজেব প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ মঠ, মন্দির, আশ্রম, বিহার ধ্বংস করিয়াছে। কিন্তু নব নব আচার্য্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আবার রক্তবীজের গ্রায় সহস্র সহস্র নূতন কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে।

নব যুগে ধর্ম-সংস্থাপনার্থ—অবতীর্ণ আচার্য্যের ভবিষ্য ধর্ম-রাজ্যের মূল কেন্দ্র আচার্য্যের তপঃ-সিদ্ধির ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীপ্রণব মঠের প্রতিষ্ঠা হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজাতির ভবিষ্য বিরাট অভ্যুদয়ের সূচনা করিল। ভবিষ্য বংশধরগণ আচার্য্যের অভীষ্ট ধর্ম-রাজ্যের বিরাট রূপ প্রত্যক্ষ ও সুফল ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইবে।

ভারতের সহস্র শতাব্দ-ব্যাপী জাতীয় জীবনের মূল উৎস ও স্রষ্টা দুর্গ—ভারতের এই মঠ, মন্দির, আশ্রম, বিহারাদি; এই কথাটা ভারতীয় হিন্দু জাতি যেন মর্মে মর্মে গাঁথিয়া রাখে। এই ধারণার শিথিলতাই ভারতীয় আধ্য হিন্দুজাতির সহস্রাব্যাপী দুর্দশা এবং

জাতীয় দুঃখ-লাঞ্ছনা ও অধঃপতনের সর্বপ্রধান ও মূল কারণ ;—ভাল করিয়া শুনিয়া বুঝিয়া সাবধান হও ।

### মঠের আর্থিক ভিত্তি

সজ্জ-পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে বহু পূর্বে হইতেই আচার্য্যদেবের অন্তরে এই মঠ-পরিকল্পনা ছিল । অভীষ্ট-মঠ-পরিকল্পনাকে রূপ দিবার জন্য যে অর্থের আবশ্যক তাহার সংস্থান করিবার জন্য তিনি কয়েকটা উপায় অবলম্বন করেন—

(১) সন্ন্যাসী শিষ্য কর্তৃক লিখিত তদীয় উপদেশাদি সম্বলিত প্রণব-মঠ-গ্রন্থাবলীর বিক্রয়-লব্ধ অর্থ ।

(২) আচার্য্যের সহস্র সহস্র ভক্ত, অমুরক্ত, শিষ্যগণ প্রদত্ত প্রণামী ।

(৩) তীর্থস্থানে মেলায় ভক্ত যাত্রিগণ প্রদত্ত প্রণামী ।

(৪) শিষ্য বা ভক্তের বিশেষ দান ।

(৫) মঠের নিজস্ব সম্পত্তি-লব্ধ আয় ।

এইভাবে যখন কিছু অর্থ সঞ্চিত হইল তখন পূর্বোক্ত ভক্ত শিষ্য শ্রীযুত গোপীকৃষ্ণ সিংহের দানকে উপলক্ষ্য করিয়া আচার্য্যদেব মঠের জমি সংগ্রহ ও তথায় মন্দির নির্মাণ পূর্বক “শ্রীশ্রীপ্রণব মঠ” প্রতিষ্ঠা করিলেন ।

### মঠের সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য

জাতি ও জগতের মহাকল্যাণের বিরাট উদ্দেশ্য লইয়া মঠের উদ্ভব হইলেও মঠের সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য :—

(ক) সন্ন্যাসী সজ্জ সংগঠন ।

(খ) জগদগুরু আচার্য্যদেবের অলৌকিক মহাতপঃ-শক্তি-সিদ্ধ-পীঠের উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবা পূজার ব্যবস্থা ।

(গ) আচার্য্যের বিশেষ বিশেষ লীলা ও মহাপ্রকাশের স্থানগুলিতে স্থাপিত আচার্য্যের সিদ্ধাসনকে সুরক্ষিত ও মন্দিরাদি নির্মাণ পূর্বক আচার্য্য-বিগ্রহের সেবা পূজার ব্যবস্থা।

(ঘ) জাতি ও সমাজের সর্ব স্তরে গৃহে গৃহে আচার্য্যদেবের সেবা-পূজার প্রচার ও আদর্শের প্রতিষ্ঠা।

(ঙ) আচার্য্যের আশ্রিত বর্ধমান ও ভবিষ্য ভক্ত-শিষ্যগণের মধ্যে আচার্য্যের অভীষ্ট শিক্ষা-সাধনা-আদর্শের প্রচার প্রতিষ্ঠা।

(চ) আচার্য্যের ত্যাগী সন্ন্যাসী শিষ্যবর্গের জীবন-গঠন ও ভরণ-পোষণ জন্ত আবশ্যক ব্যবস্থা।

### মঠের গৃহাদি নির্মাণ ও সিদ্ধাসন স্থাপন

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে মঠের সমস্ত জমিটুকু মাটি তুলিয়া চোরস করিয়া বাধান হয়। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে বিত্তীর্ণ অঙ্গণটিতে পূর্ব, উত্তর, পশ্চিমদিকে পরস্পর সমকোণ করিয়া তিনখানি স্তম্ভ টিনের ব্যারাক নির্মিত হয়। তথায় দূর দেশ হইতে সমাগত ভক্তগণ সপরিবারে সাময়িক ভাবে বাস করিতে পারিতেন। এই বৎসরেই সিদ্ধপীঠ মন্দিরের পশ্চাৎ দিকের বারান্দা জুড়িয়া উপরে নীচে দুইটি প্রকোষ্ঠ নির্মিত হয়। উপরের খানিতে আচার্য্যদেব রাক্তিতে বিশ্রাম করিতেন এবং নীচের তলাতে দিবা ভাগে বিশ্রাম করিতেন এবং সমাগত দর্শনার্থীর সহিত কথাবার্তা বলিতেন।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে মঠের সমগ্র প্রাঙ্গণটিকে উত্তমরূপে বাধাইয়া কয়েকটি অঙ্গণে বিভক্ত করিয়া কয়েকটি স্থানে স্বীয় সিদ্ধাসন স্থাপন করেন। এই সালের মাঘী পূর্ণিমা উৎসবের সময়ে “মঠ-প্রাঙ্গণের বর্ণনা :—

সাধারণ রাস্তা হইতে কাঠের পুল পার হইয়া মঠ-সীমানায় প্রবেশ করিতেই একটি বিস্তৃত প্রাঙ্গণ; এখানে রাধাকৃষ্ণ-পূজার ঘর, মঠের কাছারী ঘর এবং আরও তিনখানি ছোট টালির ঘর। উৎসবেই এই প্রাঙ্গণে অহোরাত্র নাম সংকীৰ্ত্তন হইয়া থাকে। উক্ত প্রাঙ্গণের সম্মুখে একটি নিম্নতল চত্বর—নিবিড় শ্রাওড়া গাছে ঢাকা; তথায় গ্রাম-দেবতা—বনভূগা দেবীর (বুড়াঠাকুরাণী) পাঠস্থান। উৎসবকালীন জন-সাধারণ এখানে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করে। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া সিদ্ধপীঠ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে দক্ষিণ পার্শ্বে সিদ্ধপীঠ-মন্দিরের পার্শ্বে শ্রাওড়া গাছের ছায়া-স্নিগ্ধ একটি সুরক্ষিত নিম্নতল নিভৃত অঙ্গণ। অঙ্গণটির এক দিকে উচ্চ বেদীর উপর সম্মুখভাগে আচার্যদেবের আসন স্থাপিত। এখানে আচার্যদেব পূজা আরতি গ্রহণ পূর্বক সমাগত ভক্তগণকে আশীর্বাদ ও শক্তি-সঞ্চার করিতেন। এই নিভৃত অঙ্গণে বসিয়া সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ ধ্যান-ভজনও করিতেন। মন্দিরের ঠিক সম্মুখে খালের সন্নিকটে “মহোৎসব-প্রাঙ্গণ”—তথাক্ মহোৎসবের ভোগ ও প্রসাদ বিতরণের গৃহাদি অবস্থিত।

মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিলেই উত্তর পার্শ্বে খালের কিনারা পর্য্যন্ত “রাজমন্ডা প্রাঙ্গণ”। এই প্রাঙ্গণকে তিন দিকে ঘেরিয়া সুদীর্ঘ টিনের ব্যারাক। প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে উচ্চ গোলাকার চূড়াবিশিষ্ট অষ্টকোণ উচ্চ বেদীর উপর “রাজমঞ্চ”। মাঘী পূর্ণিমা উৎসবে রাজবেশে আচার্যদেবের বরণ, অভিষেক এবং যজ্ঞেশ্বর মহাদেব বশে আচার্যদেবের বরণ, অভিষেক ও পূজার্কনাদি হয়। রাজমঞ্চের সম্মুখে “অগ্নিহোত্র যজ্ঞকুণ্ড”। সৰ্ব্বশ্রেণীর হিন্দু একযোগে সমস্ত বৈদিক মন্ত্র উদ্গম পূর্বক হোমকুণ্ডে আহুতি প্রদান করেন।

রাজমন্ডা প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া মন্দিরের পশ্চাৎদিকে বামপার্শ্বে

“ভোগ-প্রাঙ্গণ” এবং সম্মুখে “তপোবন।” “তপোবন” এর মধ্যস্থলে এক দিকে স্থউচ্চ “অভিষেক মঞ্চ”—গোলাকার বেদী ; অপর এক পার্শ্বে প্রস্তুতিত শতদলের মধ্যস্থানে পরিকল্পিত “প্রণবধুনী”। আচার্য্যদেব ধুনীর সম্মুখস্থ বেদীতে সমাসীন হইয়া পূজা আরতি গ্রহণ পূর্বক আশীর্বাদ দান করেন। ধুনীর অদূরেই “প্রণব কুণ্ডা”—মাটির নীচে নিম্নিত একটি প্রকোষ্ঠে আচার্য্যদেবের আসন। উক্ত আসনে বসিয়া পূজা-আরতি গ্রহণ পূর্বক আচার্য্যদেব সকলকে আশীর্বাদ দিতেন। মঠ-সীমানায় উত্তর-পশ্চিম কোণে উভয় দিকে খালের দ্বারা পরিবেষ্টিত “প্রণবোদ্যান” এবং তাহার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র জলাশয়— “প্রণব কুণ্ড”। আচার্য্যদেব এই কুণ্ডে অবগাহন করিতেন। কুণ্ডের উত্তর পশ্চিম কোণে একখানি কুটীরে আচার্য্যদেবের আসন স্থাপিত ; তথায় বসিয়া পূজা আরতি গ্রহণ পূর্বক আচার্য্যদেব সমবেত ভক্ত নবনারীকে আশীর্বাদ দান করিতেন।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে মঠ-প্রাঙ্গণের পরিবর্তন ও উন্নতি সাধন করা হয়। মন্দিরের সম্মুখস্থ অঙ্গণে এবং পার্শ্বস্থ “রাজসভা প্রাঙ্গণের” টিনের ব্যারাক উঠাইয়া দুইখানি নাট্যমন্দির নির্মিত হয়। মন্দিরের সম্মুখস্থ নাট্যমন্দির অপেক্ষা রাজসভা-প্রাঙ্গণস্থ নাট্যমন্দিরটি অনেক বড়। ভোগ-প্রাঙ্গণটিকে চারিদিকে টিনের ব্যারাকের মত ঘর উঠাইয়া সম্মুখে প্রবেশ দ্বার রাখিয়া সুরক্ষিত করা হয়। “প্রণব কুণ্ডার” উপরে একটি প্রকোষ্ঠ নির্মিত হয়। এইরূপে খালের পূর্ব পার্শ্বস্থিত সমগ্র মঠ-প্রাঙ্গণখানি সুসজ্জিত হইল। ১৯৩৩।৩৪ খৃষ্টাব্দে খালের পশ্চিম তীরস্থ কিছু কিছু জমি সংগ্রহ করিয়া খালের মধ্য হইতে মাটি তুলিয়া উচু করিয়া বাধান হয়। এই নব নির্মিত জমির দক্ষিণ প্রান্তে মাষী পূর্ণিমা মহোৎসব কালীন মেলা বসিয়া থাকে ; এবং উত্তর প্রান্তটীতে সভামণ্ডপ



নির্মিত হইয়া হিন্দু-সম্মেলনের অধিবেশন হয়। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে হিন্দু সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হইয়া অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে। এই হিন্দু-সম্মেলন প্রাক্কণের উত্তর দিকে একটি দোতলা বাড়িনিবাস নির্মিত হয়। উহাতে সম্মেলনে সমাগত প্রতিনিধি ও অতিথিবৃন্দ অবস্থান করেন। হিন্দু-সম্মেলন প্রাক্কণের পূর্ব প্রান্তে খালের কিনারায় আচার্যদেবের বাল্য-কৈশোর-যৌবনের তপঃক্ষেত্র—“অশান” এর উপর একটি ক্ষুদ্র “স্মৃতিমন্দির” নির্মিত হয়।

### বিশ্বকর্মা আচার্যদেব

এই মঠ-সংক্রান্ত যাবতীয় নির্মাণকার্য আচার্যদেব স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া করাইয়াছিলেন। শত শত কৃষাগ, মজুর, মিস্ত্রি লইয়া নিজস্ব তত্ত্বাবধানে যাবতীয় কার্য করাইতেন। দিবারাত্রি তাঁর অবসর ছিল না। গৃহাদি নির্মাণের আসবাবপত্র ক্রয় ও সংগ্রহ; কৃষাগ, মিস্ত্রি, মজুর গণকে কাজে লাগান ও খাটান; কোথায় কিরূপ ভাবে মাটি কাটিয়া জমি ভরাট করিতে হইবে, কি কি উদ্দেশ্যে কোথায় কিরূপ গৃহাদি হইবে,—তাহার পরিকল্পনা (Plan) এবং আত্মমানিক ব্যয় (Estimate) তিনি স্বয়ং নির্ধারণ করিতেন। প্রত্যেকটি পয়সা নিজে খরচ করিতেন। স্মরণীয় যে কল্পিত কল্পাবসানে শত শত লোকের দেণাপাওনা ও কাজের হিসাব নিকাশ করিতেন। প্রাতে ৫টার সময়ে লোকজন নিয়া কাজে নামিয়া বিস্তীর্ণ মঠ সীমানার (খালের এপার এবং ওপার) অবিরাম লাটিমের মত ছুটাছুটি করিয়া কার্ধ্যের নির্দেশ দিতেন ও তত্ত্বাবধান করিতেন। এক সঙ্গে মাটি কাটা, জমি ভরাট, দালান গাঁথা, নাট মন্দিরের টিনের ঘর নির্মাণ, কাঠ ফাঁড়ান, নলকূপ বসান প্রভৃতি কার্য চলিতেছে; তিনি এই যাবতীয় কার্য স্বয়ং দেখাশুনা করিয়া খুটী নাটী

নির্দেশ দিতেছেন। সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, সমাগত বালক, যুবক, প্রৌঢ় সকলকে দিয়াই তিনি কিছু না কিছু কাজ করাইয়া নিতেন। সকলেই তাঁর একটু আদেশ, নির্দেশ পালন করিতে পারিলেই কৃতার্থ বোধ করিত। তিনি যে সারা বৎসর বসিয়া এইসব কার্য করিতেন—তাহা নয়। এই যাবতীয় নির্মাণ কার্য তাঁহাকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে করিতে হইয়াছিল। সমগ্র দেশব্যাপী তাঁর কর্মক্ষেত্র; বহুমুখীন কার্য সর্বত্র চলিতেছে। এমতাবস্থায় বাজিতপুরে মঠে দীর্ঘদিন বসিয়া কাজ করাইবার অবসর তাঁর ছিল না। তত্বেপরি যতটুকু সময় তিনি মঠে উপস্থিত থাকিতেন, তার মধ্যেও তাঁকে গ্রামের দলাদলি, দাঙ্গা-হাঙ্গামার মীমাংসা; বালক যুবকগণকে নানাভাবে গঠনের চেষ্টা; মঠের বিভিন্ন পার্কণোৎসবের অনুষ্ঠান; প্রত্যাষে ও সন্ধ্যায় পূজা আরতি গ্রহণ পূর্বক ভক্ত সন্তানগণকে আলীকাদ দান; প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে ও রাত্রিতে চারি পাঁচ ঘণ্টা একাসনে বসিয়া—মঠের যাবতীয় লোক—সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ভক্ত, সেবক, মুটে, মজুর, কৃষাণ, মিস্ত্রি, মাঝিমাল্লাকে নিজের সম্মুখে বসিয়া ধাওয়ান। সমাগত ধর্মার্থী সাধন-দীক্ষা-প্রার্থী নরনারীকে দর্শন, উপদেশ ও সাধনাদি দান। নমঃশূদ্র প্রভৃতি হিন্দু-জনসাধারণের মধ্যে জাগরণ আনয়নের জন্ত নানানুষ্ঠানে তাহাদিগকে সম্মিলিত ও সজ্জ্বল করিয়া সমাজের উন্নত শ্রেণীগণের সহিত মেলামেশা করিবার সুযোগদান। এই প্রকার অসংখ্যকার্যে দিবারাত্র তিনি অনবসর থাকিতেন। যখন তাঁর সহিত তথায় থাকিবার সুযোগ-সৌভাগ্য ঘটিয়াছে—তাঁর দৈনন্দিন কার্যগুলি শুধু চোখে দেখিতে দেখিতে ক্লান্ত হইয়া গিয়াছি। যখন যেখানে তিনি থাকিতেন যেন কর্মের মহোৎসব লাগিয়া থাকিত। প্রবল ঘূর্ণীবাত্যের স্রাব কর্মের আবর্ত সৃষ্টি করিয়া আবালবৃদ্ধ সকলকে কর্মে ডুবাইয়া রাখিতেন। কাহাকেও তিনি বসিয়া থাকিতে দিতেন না।

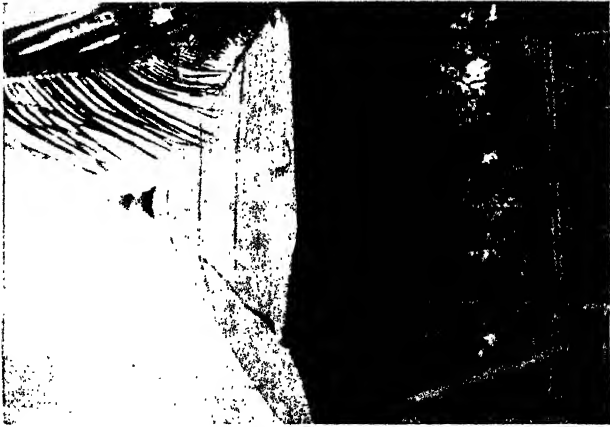
কর্ম-বাহুল্য ও কর্ম-বৈচিত্র্য সৃষ্টি পূর্বক তিনি সকলকে দিয়াই কাজ করাইয়া নিতেন। তাঁর এই কর্মচক্রের দুনিরীক্ষ্য গতিবেগ ও পারিপার্শ্বিক সকলের অংশ গ্রহণ দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের ইতিহাসই সকলের স্মরণে আসিত।

### আচার্য্য-শরীরে সঙ্কট জনক ব্যাধি

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে আচার্য্যদেব সঙ্কটজনক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। কর্ণমূলে বিস্ফোটক উৎপন্ন হইয়া দারুণ যন্ত্রণায় তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিয়া ফেলে। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগ হইতে কর্ণে যন্ত্রণার সূচনা হয়। ক্রমে ক্রমে প্রবল জ্বর সহ বিস্ফোটক দেখা দিল। ডাঃ এন্স রায়, ডাঃ নরেশ ভট্টাচার্য্য, ডাঃ নলিনী সেন, ডাঃ সত্যরঞ্জন সেন, ডাঃ ললিত ব্যানার্জি, ডাঃ মৃগেন্দ্র মিত্র, ডাঃ উপেন্দ্র দাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগপরীক্ষা ও চিকিৎসা করিতে থাকেন। ডাঃ ললিত ব্যানার্জি অস্ত্রোপচার করেন। অস্ত্রোপচার করা সত্ত্বেও ব্যাধির তেমন উপশম হইল না। পুনরায় অস্ত্রোপচারের আয়োজন করা হয়। এক সপ্তাহ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহারের প্রস্তাব হওয়ায় ডাঃ জে, এন, মজুমদার এবং ডাঃ এস, এন, সেনগুপ্ত—ঔষধ ব্যবস্থা করেন। তাহাতেই তিনি ক্রমে নিরাময় হন ; পুনঃ অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় নাই।

### আচার্য্যদেবের দেহধারণের সঙ্কল্প শিথিল

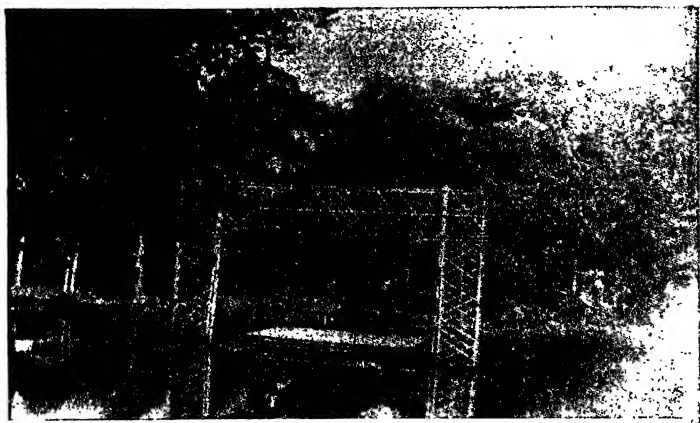
এই গুরুতর ব্যাধিতে শয্যাশায়ী থাকাকালীন আচার্য্যদেবের দেহধারণের সঙ্কল্প শিথিল হইয়া পড়ে। তিনি নানাভাবে ইহার আভাস প্রকাশ করিতে থাকেন। বাবা গম্ভীরনাথের স্মরণ করেন এবং তদীয় প্রতিকৃতি সম্মুখে আনিয়া রাখিতে বলেন। তাঁর এ সাম্ভাবিতিক ব্যারামের



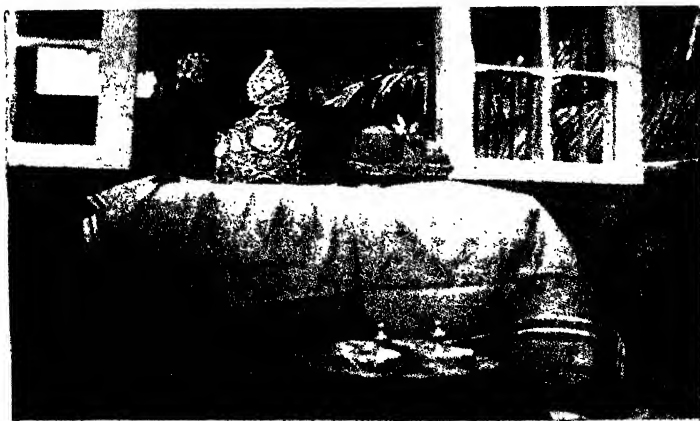
আচার্যদেবের অস্তম সিদ্ধাসন—“প্রণব-ধনী” ।



আচার্যদেবের অস্তম সিদ্ধাসন ও তপোভূমিতে



আচার্য্যদেবের অত্যন্তন সিদ্ধাসন “প্রণব-অর্চনালয়” ।



আচার্য্যদেবের ব্যবহৃত মুকুট, উষ্ণীষ ও পাছকা

সংবাদ প্রাপ্তে বিভিন্ন স্থানে কর্মরত সন্ন্যাসিগণের অনেকেই কলিকাতায় আগমন পূর্বক তাঁহার সেবাক্ষেত্র কার্যে আত্মনিয়োগ করেন।

অস্ত্রোপচার হইয়া গিয়াছে। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা; রক্তজটাজাল আলুলায়িত; ব্যাধিতে ভুগিয়া বিরাট কলেবর ক্ষীণ হইয়া অস্থিচর্মে পর্যাবসিত হইয়াছে; ১০৫ ডিগ্রী তাপ, শরীরের অসহ জালা। উল্লেখ্য অবস্থায় ছটফট করিতেছেন; আবার চারিদিকে ঘেরিয়া উপবিষ্ট বিষণ্ণ অশ্রুসিক্ত সন্ন্যাসী সন্তানগণের সহিত নানা প্রকার কথাবার্তা বলিতেছেন—কাজের কথা, উপদেশের কথা, স্নেহ-বাৎসল্য পূর্ণ-ভাষা। আচার্য্যদেব কয়েকজন গায়ক সন্ন্যাসীকে আদেশ করিলেন—শ্রীশ্রী বাজার গানটী \* গাহিতে— তাহারা পুনঃ পুনঃ গাহিতে লাগিলেন। এই গান পর্যায়ক্রমে গায়কগণ অবিরাম গাহিয়া চলিল। এমনি প্রতিদিন চলিত। সকলেরই প্রাণে ধারণা জন্মিতে লাগিল—যেন আচার্য্যদেব মহাপ্রয়াণের জন্ত প্রস্তুত হইয়াছেন। সজ্জ-সন্তানগণ বিষাদ-অবসাদে অর্দ্ধমৃত হইয়া পড়িলেন।

অনেকে এমনো প্রার্থনা করিত লাগিলেন যেন তিনি মহাপ্রয়াণের সময়ে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যান। আচার্য্যদেবের দেহের প্রতি আকর্ষণ আসিতেছে না বটে; কিন্তু তিনি দেখিতেছেন যে তাঁহার

\* “চরম শয্যায় কাপড় খানা শিরে পায়

কে গো তুমি স্থখে নিজা যাও।

একবার খোলরে বদন মেলরে নয়ন

আনন্দে হাসি মুখে কথা কহে যাও।

মাতাপিতা পরিজন যত দেখ ভবে,

একাকী এসেছ একা যেতে হবে,

আরও কার্যকে তিনি তখনো অদৃঢ় ভিত্তিতে অশৃঙ্খল করিয়া তুলিতে পারেন নাই। সেই বিরাট কার্য চালাইবার মত শক্তি-সামর্থ্য লইয়া তাঁহার ত্যাগী সম্মানগণ তখনো গঠিত হইয়া উঠে নাই; অতরাং তিনি চাহিতেছেন আরও কিছুকাল থাকিয়া আরও কার্য সম্পূর্ণ করিয়া যাইবেন।

### দেহধারণের সঙ্কল্পের পুনর্জাগরণ

এমনিভাবেই কয়েক দিন চলিল। অপরাহ্নের দিকে ব্যারামের প্রকোপ বৃদ্ধি হইতে তাপ বেশী, যজ্ঞণা, ছটফটানি বেশী; ঠিক সেই সময়ে পূর্বোক্ত আশান-যাত্রার গানও অবিরাম চলিত। একদিন তিনি একজন সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—“রে! বল দেখি তুই কি মনে করেছিস? গুরুদেব দেহ :রক্ষা করবেন, এই সময়ে যা’ কিছু পারি মেরে নিয়ে আসি;—এই ভেবে এসেছিস! কেমন? বলনা! সকলের সামনে খুলে বল!” এরূপ পুনঃ পুনঃ সেই সন্ন্যাসীটিকে বলিতে লাগিলেন। একটু বাদে পুনরায় বলিলেন,

আত্মীয় স্বজন যারা দূরেতে দাঁড়ায়ে তারা  
কেহ বলে বাসী মড়া দূর করে দাও।  
শিয়রেতে দেখি তব মেটে একটা ঘড়া।  
তিল তুলসী আলোচাল কড়ি অষ্ট কড়া।  
যে অঙ্গে লাগিলে ধূলা ভেবেছ কতই জ্বালা  
আজ তোমার সেই অঙ্গ ধূলাতে লুটায়।  
তাই বলি মুঢ়মন ভাব নিত্য নিরঞ্জন,  
আনন্দে হাসি মুখে গুরু গুণ গাও  
গুরু-গুণ গাও মন গুরু-গুণ গাও মন।  
আনন্দে হাসিমুখে গুরু-গুণ গাও।”

“আমার এই শরীর গেলে, ট্রেন স্টীমারে করে বাজিতপুরে নিয়ে যাবে !  
তথায় সিদ্ধপীঠের মন্দিরের মধ্যে যে বেদীর উপরে আরতির গিংহাসন  
আছে, সেই বেদীর মধ্যে জায়গা করে বালি ভর্তি করে রেখেছি।  
বালি সরিয়ে সেই বেদীর মধ্যে দেহ রাখি—বুঝলি ! অল্প কোনো  
মন্দির কেন না করা হয় !”

চারিদিকে অন্ততঃ পঞ্চাশ জন সন্ন্যাসী সন্তান ঘিরিয়া বসিয়া এই  
মর্মবিদারক কথাগুলি নির্ঝঙ্ক স্তম্ভিত হইয়া শুনিতেছে। যে কথা  
ভাবনা-চিন্তা-কল্পনার অতীত, সেই কথা বজ্রাঘাতের ছায়া সন্তানগণের  
হৃদয় চূর্ণ নিষ্পেষিত করিতে লাগিল। অপ্রত্যাশিত বিষয়ের কোনো  
ধারণা করিবার মত অবস্থা তাহাদের ছিল না। “ন যযৌ নতস্হৌ”-  
বৎ মর্মাহত হইয়া বসিয়াছিল।

জনৈক সন্ন্যাসী আচার্য্যদেবের শ্রীঅঙ্গ সন্তর্পণে সম্বাহন করিতেছিল।  
আচার্য্যের মুখে এই সব কথা শুনিতে শুনিতে তাহার হৃদয়ে কেন কি  
একটা তেজের সঞ্চার হইল। অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া হঠাৎ পে  
বলিয়া উঠিল—“আপনি নিত্য নিত্য এরূপ প্যান্ প্যান্ করেন কেন ?  
শরীর যখন ধারণ করা হয়েছে, তখন একদিন না একদিন ত্যাগ করিতে  
হবেই। যেদিন শরীর ত্যাগ করবেন, সেই দিন যা’ করবার বলে  
গেলেই হবে। সব মহাপুরুষেরাই তাই করে থাকেন। আপনার  
শরীরের অবস্থা দেখে সমস্ত সন্ন্যাসীদের প্রাণ ভেঙ্গে গেছে ; তার পরে  
নিত্য নিত্য এমনতর কথা বলতে থাকলে তাদের মানসিক অবস্থা  
কি দাঁড়ায় ?”

এই কথা শুনিয়া আচার্য্যদেবও সমান উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—  
“এখন যদি না বলে যাই, পরে তোরা ঝগড়াঝাটি করবি।” সন্ন্যাসীটী  
ততোধিক উত্তেজিত হইয়া বলিল—“কোনো বেটার ঘাড়ে দু’টো মাথা



নেই যে আপনার আদেশ লঙ্ঘন করবে।” খুব তেজের সঙ্গে “বাক্” বলিয়া আচার্য্যদেব জিজ্ঞাসা করিলেন—“আরতির যোগাড় হয়েছে?” সন্ন্যাসীটী বলিলেন—“হ্যাঁ, হয়েছে!”—বলিতেই আচার্য্যদেব লক্ষ্যপ্রদান পূর্ব্বক উঠিয়া আলনা হইতে চাদর খানি গায়ে দিয়া দণ্ডটা হাতে করিয়া গট্ গট্ করিয়া বিদ্যায় বেগে ছাদের উপর আরতির আসনে গিয়া বসিয়া বলিলেন “নে, আরতি কর!” সেই সন্ন্যাসীটী এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রান্ত সকল সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আরতির মণ্ডপে গিয়া “জয় গুরু ওঁকার জয় শিব ওঁকার” গানের সঙ্গে সঙ্গে পূজা আরতি আরম্ভ করিলেন। আরতি ও স্তব পাঠের পরে সকলে অঞ্জলি প্রদান করিতে থাকিলে তিনি এক এক করিয়া সকলের শিরঃস্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ দিলেন। তৎপরে যেমন ভাবে গিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবে দ্রুতবেগে স্বীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্ব্বক—দণ্ড, চাদর ও পরিধেয়, বহির্কাস খুলিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িয়া আর্ন্তনাদ করিতে লাগিলেন।

এই ব্যাপারে আমরা স্তম্ভিত হইলাম। আচার্য্যদেবের শরীরের এই অবস্থায় অতিকষ্টে ধরিয়া পাশ ফিরাইয়া দেওয়া হইত ও বাহ্যপ্রস্রাব করান হইত। ডাক্তার—উঠাইয়া বসাইলে হার্ট (heart) ফেল করার সম্ভাবনা বলিয়া—সাবধান করিয়া দিতেন। সেই অবস্থায় আকস্মিক এই ব্যাপার ঘটাতে আমরা একদিকে ব্যারাম বৃদ্ধির আশঙ্কায় ভীত হইয়া পড়িলাম; অপরদিকে এই আকস্মিক পূজা আরতি গ্রহণ ও আশীর্ব্বাদ দানের বিষয়টির জন্ত আশ্চর্য হইয়া ভাবিলাম—নিশ্চয়ই তিনি এবার প্রসন্ন হইয়া পুনরায় শরীর ধারণের সক্ষম গ্রহণ করিয়াছেন।

সন্তানগণের উদ্বেগ কাটিয়া গেল; আশা পূর্ণ হইল; আচার্য্যের

মনে শরীর ধারণের সক্ষম পুনরায় জাগ্রত হইল। তিনি সেই দিন হইতে দ্রুত নিরাময় হইয়া উঠিলেন। ব্যারাম তখনো সম্পূর্ণ সারে নাই, ১০০ ডিগ্রী জ্বর উঠিতেছে—সেই অবস্থায় নিজে দু'একজন সন্ন্যাসী সহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া সজ্জের প্রধান কার্যালয়ের জন্ত বালিগঞ্জ অঞ্চলে এক খণ্ড জমি ক্রয় করিলেন। সেই জমির উপরেই বর্তমান সজ্জের কলিকাতা আশ্রম ও কার্যালয় ভবন স্থাপিত আছে।

### সর্বসাধারণের মধ্যে মহাপ্রকাশ

পূর্বেই বলিয়াছি—১৯১৬ খৃষ্টাব্দে আচার্যের সিদ্ধিলাভের পর হইতে প্রতি বৎসর মাঘী-পূর্ণিমার দুইটা দিনে আচার্যদেবের মধ্যে সর্বনিয়মী মহাশক্তির পূর্ণতম বিকাশ—(যাহাকে আচার্যদেব বলিয়াছেন—অলৌকিক তপঃশক্তি, তপন্তজঃ ও তপঃপ্রভাব) ঘটিত। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে “শ্রীশ্রীপ্রণব-মঠ প্রতিষ্ঠার” দিবসে—প্রথম সাধারণের মধ্যে তদীয় অলৌকিক তপঃশক্তির মহাপ্রকাশ ঘটিতে আরম্ভ করে এবং সমবেত সহস্র সহস্র নরনারী তদীয় আশীর্বাদ ও তপঃশক্তিদ্বারা অভিষিক্ত হইতে থাকে।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের মাঘীপূর্ণিমায় এই মহাপ্রকাশ বৃহত্তর রূপ ধারণ করে। তদীয় তপঃশক্তির আকর্ষণে এই বৎসর হইতে উৎসবে সমাগত জন-সংখ্যা অগ্ন্যস্ত্র বৎসরাপেক্ষা দ্বিগুণ হইয়াছিল। সমবেত প্রায় বিশ সহস্র নরনারীর উপস্থিতিতে এই বৎসর তিনি সর্বপ্রথম জগদগুরু ধর্ম-সংস্থাপক যুগাচার্যরূপে “অর্ঘ্য-গ্রহণ” করেন।

সজ্জের-সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারি-কর্ষিবৃন্দ-সমন্বিত দিগ্বিজয়-বাহিনীগুলি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ ও ব্রহ্মদেশে প্রচার কার্যা করিয়া সিংহপীঠে সম্মিলিত হয়। সকলেরই প্রাণে কি এক অপূর্ব ভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল। সজ্জ-সন্ন্যাসিগণ স্বীয় ভাবানুসারে বিভিন্ন দেশ

হইতে কেহ অভিষেকের জন্ত নানা তীর্থের পবিত্র বারি সংগ্রহ করিলেন; কেহ—সুদৃশ ছত্র ও চামর সংগ্রহ করিলেন; কেহ—সুন্দর মালা ও বিচিত্র ব্যজনী প্রস্তুত করিলেন; কেহ—মনোরম পাদপদ্মাসন তৈয়ারী করিলেন, কেহ কেহ আরতির আসনের জন্ত সুন্দর চান্দোয়া ও ঘবনিকা এবং কার্পেট ও আসন সংগ্রহ করিলেন; কেহ মন্তকের জন্ত মনোহর উকীষ প্রস্তুত করাইয়া আনিলেন। এইরূপে পরস্পর কোনো প্রকার অহুষ্ঠানের আলাপ-আলোচনা বা মনোভাবের আদান প্রদান না করিয়াও আচার্য্যের অলঙ্কিত সঙ্কল্পের প্রেরণায় স্বীয় স্বীয় হৃদয়োচ্ছিত ভাবের বশে উক্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ পূর্বক সিদ্ধপীঠে উপস্থিত হইলেন। অপর একজন সন্ন্যাসীর হৃদয়ে “অর্ঘ্যপ্রদান” অহুষ্ঠানের সঙ্কল্প জাগ্রত হইল এবং সময়োপযোগী ভাবপূর্ণ সঙ্গীত রচনা করিলেন।

মাঘী পূর্ণিমার উৎসবের নিমন্ত্রণ পত্রে “আচার্য্যবরণ ও অর্ঘ্য-প্রদান” অহুষ্ঠানটা যোজিত হইল। যিনি নিমন্ত্রণ পত্র রচনা করিলেন, তিনি উক্ত অহুষ্ঠানের উপযোগী দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে কিনা—তাঁহাও বিশেষরূপে জানিতেন না। কিন্তু যথাসময়ে দেখা গেল—আচার্য্যের অলৌকিক সঙ্কল্পের প্রেরণায় সমস্তই প্রস্তুত। মাঘী-পূর্ণিমার পূর্ব দিবস সন্ধ্যায় “আচার্য্যবরণ ও অর্ঘ্যপ্রদান” অহুষ্ঠানের দ্বারা মহোৎসব সম্মেলনের অধিবাস করা হইল।

### আচার্য্যবরণ ও অর্ঘ্যপ্রদান

স্ববিস্তীর্ণ সভায়গুপ নানাবিধ ফুল পাতা এবং বিচিত্রবর্ণের কাগজ ও বস্তাদির দ্বারা মনোরম ভাবে সজ্জিত। মণ্ডপের একপ্রান্তে সুউচ্চ বেদীর উপরে সুসজ্জিত সিংহাসন। সুন্দর কারুকার্য-খচিত চন্দ্রাতপ ও ঘবনিকা, সুদৃশ আসনাদির দ্বারা সিংহাসনখানির সৌন্দর্য্য অধিকতর

বদ্ধিত হইয়াছে। সমগ্র সভামণ্ডপটী এবং উহার বাহিরে বিরাট জন-সম্মেলন, শাস্ত্র, স্তব্ধ, ব্যাকুল, উৎসুক,—আচার্য্যের দর্শনের জন্ত স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে।

মন্দির দ্বার হইতে সভা-মণ্ডপের সিংহাসন পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ সুন্দর গৈরিক-রঞ্জিত বস্ত্র বিস্তৃত হইল; তদুপরি পদবিক্ষেপের স্থানগুলিতে সূচি-শিল্পে চিত্রিত মনোহর পাদপদ্মাসন সমূহ বিস্তৃত হইল। সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ভক্ত, সেবকবৃন্দ সারি বাদিয়া মন্দির হইতে সিংহাসন পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান হইলেন। কাহারও হস্তে ধূপদানি, কাহারও হস্তে সুসজ্জিত অর্ঘ্যখালি ও পুষ্পমালা। কাহারও হস্তে রক্ততন্ত্র চামর ছলিতেছে; কাহারও হস্তে রাজহুত্র শোভিতেছে; কাহারও কাহারও হস্তে নানা আকৃতি ও বর্ণের বাজনী বহিতেছে; কাহারো হস্তে রক্ত-ফলক ত্রিশূল ফলক দিতেছে। ধূপধনা-চন্দন-গুগ্গলু সুগন্ধি কুসুমরাশির সৌগন্ধে সমগ্র আশ্রমটী সুবাসিত হইয়া সমাগত জনতার প্রাণে পবিত্র দিব্যভাব রচনা করিয়া দিয়াছে। চারিদিকে মুগ্ধ নরনারীর বিরাট জনতার উৎসুক্য ও ব্যাকুলতা ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতেছে। তুমুল নিনাদে একশত ঢাক এক সঙ্গে বাজিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে খোল, করতাল, শঙ্খ, কাসর, সানাই প্রভৃতি বিচিত্র তাললয়ে বাজিতে লাগিল। সকলে ‘ওঁ হর গুরু শঙ্কর শিব শম্ভো’—সমস্বরে গাহিতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে সিদ্ধপীঠের দ্বার উন্মুক্ত হইল! আচার্য্যদেব ধীর-পদসঞ্চারে মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া সভা-মণ্ডপের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পরিধানে পীতোজ্জ্বল কোষের বসন, গলে বিচিত্র হার ও ফুলমালা, চাঁচর-চিকুর-সুশোভিত শিরে মনোহর উষ্ণীষ, শ্রীকর-কমলে সুবর্ণবর্ণ ত্রিশূল, সুবর্ণ-পাটকা-মণ্ডিত অলঙ্কার-রঞ্জিত, রক্তকোকনদ-তুলা শ্রীচরণ-যুগল, অমূল্যমোজ্জ্বল, নীলোৎপল-রুচি শুভ্র-মাধুরী, শিরো-

পরি ছত্র, চারিপাশে হিল্লোলিত চামর, ব্যজনী, ধূপদানি—অপরূপ রূপে  
আচার্যদেব পাদপদ্মাসনের উপর পদবিছাস করিতে করিতে আসিয়া  
সিংহাসনে উপবেশন করিলেন—“জগদগুরু আচার্য স্বামী  
শ্রীগবানন্দজী কি জন্ম” ধ্বনিতে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

সমগ্র সভামণ্ডপ নিস্তব্ধ, নিঃশব্দ। সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারি-ভক্ত-মণ্ডলী  
সমস্তরে সমতাল-লয়ে গাহিলেন—“বন্দি তোমায় হে জগদাচার্য নিখিল  
বিশ্ব-মানব-প্রাণ” ইত্যাদি। \* উপস্থিত নরনারী দেখিতে ও অল্পভব  
করিতে লাগিল—শ্রীভগবান জীব-করণায় বিগলিত হইয়া জগদগুরু  
যুগাচার্যের দেহ-বিগ্রহের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া পতিত, তাপিত, তৃষিত,  
আর্ন্ত নরনারীর শ্রদ্ধা-ভক্তি-অনুরাগ-আত্মনিবেদনের অর্ঘ্য গ্রহণ  
করিতেছেন।

অতঃপর বরণ ও আরতি। নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র সহ “জয়গুরু ঠাকর,  
জয় শিব ঠাকর” সঙ্গীত গান করিতে করিতে বরণ ও আরতি আরম্ভ

\* বন্দি তোমায় জগদাচার্য নিখিল বিশ্ব-মানব-প্রাণ !

নামিলে ধরায় ওগো বিশ্বরাজ ! মহামুক্তির আনিলে বাণ !

সৌম্য তোমার করুণা-ধারায় তৃপ্ত হইল মানব-বন্ধ

জাগ্রত হলো বিশ্ব-মানব তব জয়ধ্বনি করিয়া লক্ষ্য।

ধন্ত হইল মানব তোমার শক্তি-সাধন-অমৃত-মন্ডে।

বন্দিছে সবে জীবন-অর্থো মধুর ছন্দে মধুর মন্ডে ॥

স্থপ্ত বিশ্ব-মানব-পরাণ মিলন-মন্ডে হইল তৃপ্ত

ভালে ঝলে একি অপরূপ জ্যোতিঃ অমিয় হাস্যে আনন দীপ্ত।

আজি গরিষ্ঠ হে ঋষিশ্রেষ্ঠ শঙ্খ-ঘণ্টা-দামামা-ধ্বননে।

গাইছে আরতি ঠাকর-গীতি হোমানল-শিখা মিশিছে গগনে ॥



শ্রীশ্রীপ্রণবমঠ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্যদেব ।



দেইল। ভাবে মাতোয়ারা হইয়া সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ভক্তগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ নৃত্যারতি এবং প্রণাম-মন্ত্র পঠিত হওয়ার পর একে একে সকলে অর্ঘ্য নিবেদন করিতে লাগিল। আচার্য্যদেব স্মিত প্রসন্ন বদনে মন্তকস্পর্শ পূর্বক আশীর্ব্বাদ ও শক্তি সঞ্চার করিতে লাগিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এরূপ চলিল।

পরদিবস মাঘী পূর্ণিমা; আচার্য্যদেবের মহাপ্রকাশ; প্রত্যুষ হইতে একে একে বাবতীয় ত্যাগী ও গৃহী ভক্তগণের আরতি চলিতে লাগিল। রাজমঞ্চ, সিদ্ধপীঠ-মন্দির এবং অর্চনালয়—এই তিনটি সিদ্ধাসনে পর্য্যায়ক্রমে আরতি হইতে লাগিল। এক সিদ্ধাসনে আচার্য্যদেব বসিলে ষষ্ঠারীতি পূজা আরতি শুভপাঠ হইল। তৎপরে সেই আসন হইতে দ্বিতীয় আসন পর্য্যন্ত গৈরিক বস্ত্র বিস্তৃত হইল, বাদ্য-সমারোহ ও কীর্তন

\* দীর্ঘ ক্ষিপ্র শিরে তপস্কার, হস্তে দণ্ড সে ত্যাগ মূর্ত্ত,  
বক্ষে নাল্য জীব-প্রেমহার, জ্যোতিঃ-বিভূতি অঙ্গে ক্ষুৰ্ত্ত।  
শাসনে তোমার শিহরি পলায় পাপের কালিমা রুদ্র দৃশ্যে।  
কভু সে স্নিগ্ধ মধুর হাস্য ছড়ায় মুকুতা নিখিল বিখে ॥  
এ মহামুক্তি-বাণী নিয়ে তব বিজয়ী সেনানী অবিশ্রান্ত,  
হিমাদ্রি হইতে ছুটে কুমারিকা ব্রহ্ম হইতে দিকু-প্রান্ত।  
বিতরি হৃ'হাতে শক্তির স্নেহ সঙ্কীর্ণনী এ সলিল-বৃষ্টি,  
ভক্ত-প্রেমিক-তাপিতের তরে করিছে প্রেমের রাজ্য সৃষ্টি ॥  
হে গুরো! তোমার বক্ষে শাস্তি কণ্ঠে ধ্বনিছে 'কে নিবি শক্তি' ?  
হস্তে করিছে অভয়-আশীষ চরণে বিরাজে সে মহামুক্তি।  
এস হে! আখ্য, ওগো আচার্য্য, বিশ্ব প্রাণেরি রাজাধিরাজ,  
নাহি প্রেমপ্ৰীতি মোরা মূঢ়মতি বন-ফুল-ফলে পুঞ্জিহু আজ ॥



চলিল ; আচার্যদেব ধীর-পদসঞ্চারে দ্বিতীয় আসনে গমনপূর্বক সমাসীন হইলে পুনরায় পূজা আরতি করা হইল ; তৎপরে পুনরায় এই ভাবে তৃতীয় আসনে গেলেন ; তথায় পূজা-আরতি স্তবপাঠ সমাপ্ত হইলে পুনরায় দ্বিতীয় আসনে আসিলেন ; তৎপরে প্রথম আসনে আসিয়া পূজা-আরতি গ্রহণ করিলেন । এই ভাবে অবিরাম চলিতে লাগিল । কে কখন কোন্ আসনে পূজা আরতি করিবে—সে সবই তিনি পূর্কেই স্থির করিয়া দিয়াছিলেন । আচার্যের শ্রাস্তি নেই, ক্লান্তি নেই ; উপস্থিত অসংখ্য ভক্ত নরনারিগণ এই অলৌকিক আচার্যের মহাভাবোন্মত্ত অদ্ভুত লীলা দেখিতে দেখিতে হয়রান্ হইয়া পড়িল ; সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারিগণও যেন অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন । তখন আচার্যদেব ভাব সম্বরণ করিলেন ; সকলের পূজা-আরতিও শেষ হইল । তৎপরে আশীর্বাদ দান ও শক্তি সঞ্চার করিতে লাগিলেন । তিনি একটি উচ্চ আসনে বসিলেন । স্বেচ্ছা-সেবক-বৃন্দ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রাস্তা করিয়া দিল । ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলশ্রোতের ত্রায় জন-শ্রোত প্রণাম করিতে লাগিল ।

### রাজবেশ ও অষ্টগিহাসন

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের মাঘীপূর্ণিমা তিথিতে আচার্যদেব ভক্তগণের প্রাণের ঐকান্তিক আগ্রহে “আচার্যবরণ ও অর্ঘ্য-গ্রহণ” কালে “রাজবেশ ধারণ” করিয়া সমবেত ভক্ত নরনারীর পূজা-আরতি গ্রহণ পূর্বক আশীর্বাদ দান ও শক্তি সঞ্চার করেন ।\* এই বৎসরের মহাপ্রকাশের দিনে আচার্যদেব

---

\* রাজবেশধারী আচার্যকে বরণ ও অর্ঘ্য-প্রদান-কালীন স্তুতি সঙ্গীত :—

—মন্দির, রাজমঞ্চ, অর্চনালয়, ধুনী, গুহা এবং প্রণবরাম এই ছয়টি সিদ্ধাসনে অগণিত ভক্ত নরনারীর ভক্তি-অর্ঘ্য ও পূজারতি গ্রহণ করেন। পূর্কোক্ত ভাবে আচার্য্যদেবের সপ্ত সিদ্ধাসন—বথা—**সিদ্ধপীঠমন্দির, রাজমঞ্চ, অর্চনালয়, প্রণবধুনী, প্রণবগুহা, শ্মশান-স্মৃতিমন্দির, প্রণবরাম**। এই আটটি সিদ্ধাসনে বসিয়া আচার্য্যদেব পূজারতি গ্রহণ ও শক্তি সঞ্চার করিতেন। আচার্য্যদেব এক একটা আসনে সমাসীন হইয়া পূজা-আরতি গ্রহণান্তে, পূর্কোক্তভাবে বাদ্যোদ্যম, কীর্তন ও জয়ধ্বনির দ্বারা বন্দিত অভ্যর্থিত হইয়া দ্বিতীয় আসনে গমন করেন। এমনি ভাবে পর্যায়ক্রমে ছয়টি সিদ্ধাসনে পুনঃ পুনঃ অধিষ্ঠান পূর্বক প্রত্যুষে পাঁচটা হইতে বার ঘটিকা পর্যন্ত পুনঃ অপরাহ্ন তিনটা হইতে সন্ধ্যা আট ঘটিকা পর্যন্ত একে একে ষাবতীয় সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহী শিষ্যভক্তগণের পূজারতি গ্রহণ করেন। সেই বিরাট দৃশ্য, সেই মহাভাব, সমবেত সহস্র সহস্র নরনারীর সে আকুলতা ব্যাকুলতা স্বচক্ষে না দেখিলে কেহ কল্পনা করিতে পারে না।

নমো রাজ রাজ ভূমা মহারাজ নমি হে প্রণবরাজ হে।

প্রেম-অমুরাগে এ হৃদয় জাগে মহাভাবে মজি আজ হে।

প্রেমের ও-তহু নিন্দে অতহু অমিয়-মাখান সাজ হে।

তায়, সুখা-চলচল আনন-কমল শতদল পায় লাজ হে।

নয়ন-উৎপলে করুণা উথলে, প্রেমিক পরাণে প্রেম উচ্ছূলে।

আর মধুর অধবে প্রেম-সুখা ঝরে তুষিত পরাণ মাঝে হে।

দেবতা আমার প্রিয় প্রাণারাম হে নিখিল-জন-নয়নাভিরাম।

ধরি নরকায়ী আসিলে নামিয়া বিশ্বপতি বিশ্বমাঝে হে।

নমো নমো নমো নমঃ প্রিয়তম তব জয়-গীতি বাজে।

আজ, সফল জনম সফল জীবন শ্রীপদ-সরোজ-রঞ্জে হে।

## ମହାଭିଷେକ

ମାଘୀପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିବସେ ଯେଉଁର ତପୋବନ-ପ୍ରାଙ୍ଗଣ-ମଧ୍ୟସ୍ଥ “ଅଭିଷେକ-ମଞ୍ଚ” ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବେର “ମହାଭିଷେକ” ଉତ୍ସବ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ । ଯଜ୍ଞ-ସନ୍ତାନ-ଗଣ ଭାରତବର୍ଷ ଓ ବ୍ରହ୍ମଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ହୁଏତେ ୧୦୮ ଏକଶତ ଆଟ ତୀର୍ଥେର ପବିତ୍ର ବାରି ସଂଗ୍ରହ କରିয়া ଆଣିଆଇଲେ । ୧୦୮ଟି କଳସେ ଉକ୍ତ ତୀର୍ଥ-ବାରି ପୂର୍ବକ ପୂର୍ବକ ତୀର୍ଥେର ନାମ ଲିଖିଆ ଏବଂ ଦଧି, ଘୃତ, ଯବ, ଯବ, ଯବ ପୂର୍ବ ଅଗ୍ରାଗ୍ର କୁଣ୍ଡ ସିଲ୍ଲୁବାନ୍ଧିତ ଏବଂ ଆୟ-ପଲ୍ଲବ-ପୁଷ୍ପ-ମାଲ୍ୟାଦିର ଦ୍ଵାରା ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଆ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ଭାବେ ଅଭିଷେକ ମଞ୍ଚେର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେ ରକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଚାରିଦିକେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ନରନାରୀର ଭିଡ଼େ ତିଳଧାରଣେର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ମନ୍ଦିର ହୁଏତେ ଅଭିଷେକ-ମଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ରର ଉପର ପଦମଞ୍ଚାର କରିତେ କରିତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆସିଆ ଅଭିଷେକ-ମଞ୍ଚୋପରି ସମାସିନ ହୁଏଲେ । ଶିରୋପରି ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ରାତପ ଓ ରାଜହତ୍ତ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେ ହିଲ୍ଲୋଲିତ ଚାମର, ବାଜନୀ ପ୍ରଭୃତି ; କର୍ଣ୍ଣ-ବନ୍ଧିର-କାରୀ ବାଦ୍ୟୋଦ୍ୟମ ଓ ଅଗଣିତ ଲୋକେର ଗଗନ-ଭେଦୀ ଜୟଧ୍ଵନି । ଡାଲ, ଯଡ଼କୀ, ତ୍ରିଶୂଳ, କୁଠାର, ଖଞ୍ଜ, ଧୂଳିଧାରୀ ନୟନ ସର୍ଦ୍ଦାର ଓ ରକ୍ଷି-ସୈନ୍ୟ-ବାହିନୀର ବୀରତ୍ଵ-ସ୍ପନ୍ଧିତ ଅସ୍ତ୍ରାଞ୍ଚଳନ ଓ ଶିଂହନାଦ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ନରନାରୀର ଧ୍ଵନିତେ ଶୋଣିତସ୍ରୋତକେ ଆନନ୍ଦେ, ଉତ୍ସାହେ, ଉତ୍ତେଜନାୟ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିଆ ତୁଲିଲ । ଦେଶକାଳପାତ୍ର ଭୁଲିଆ ସମବେତ ନରନାରୀ ଦେଖିତେଛେ—ସମ୍ମୁଖେ ଜଗନ୍ନାଥ—ଧର୍ମ-ନାମ୍ରାଜ୍ୟେର ଅଧୀଶ୍ଵର ବିରାଜ କରିତେଛେ ; ସକଳେ ଏହି ଅଭିନବ ଭାବ ଓ ଅଭୂତଭୂତିତେ ମାତୋୟାରା ।

ହିନ୍ଦିତ ମାତ୍ର ବାଦ୍ୟାଦି ବଦ୍ଧ ହୁଏ । ସମଗ୍ର ଜନତା ଶାନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ । ଯନ୍ତ୍ରାସି-ବ୍ରହ୍ମଚାରିଗଣ ସମତାନଲୟେ ଅଭିଷେକ-ଗୀତି ଗାହିଲେ । \* ସେ

\* “ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ଵେ ମଙ୍ଗଳଧାରୀ ବହିଷା ପଢ଼ିଛେ ଆଜି !

ଏସେଇ ଦୁଆରେ ବିଶ୍ଵବିଧାତା ମଙ୍ଗଳ-ଦେବତା ସାଜି !

গীতস্থধা সকলের “কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল।” তৎপরে অভিষেক-মন্তোচ্চারণ পূর্বক কলসীপূর্ণ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও তীর্থবারি পুরুষগণ মন্তকে এবং নারীগণ কক্ষে লইয়া আচাধ্যদেবের শ্রীচরণে ঢালিতে লাগিলেন এবং চরণামৃত গ্রহণ পূর্বক পান করিয়া কৃতার্থ হইলেন। চারিদিক হইতে অবিরত “জগদগুরু আচাধ্যদেবকৌ” “বাবা বিশ্বনাথকৌ” প্রভৃতি জয়ধ্বনিতে গগন পবন মথিত হইতে লাগিল। নারী-কণ্ঠের ভক্তি ও উৎসাহ পূরিত উল্লুধনি ঝাকে ঝাকে নিনাদিত হইতে লাগিল। নমশূদ্র বীরবৃন্দের অঙ্গশস্ত্রের আফালন ও বীরনিনাদ জনগণের হৃদয়ে বীরত্বের স্পন্দন জাগাইয়া তুলিল।

মঙ্গল বারিধারা মঙ্গলকলসে, অঘ্যপাত্র নিয়ে এস হরষে ;  
 সিকু জাহুবী নন্দদা কাবেরী অভিষেক করগো আজি ।  
 হৃন্দর মন্দিরে বন্দনাগীতি, ঝঙ্কারো আরতি নন্দনপ্রীতি,  
 অন্তর-কন্দরে ছন্দিত নিতি প্রেমামৃত উথলে আজি ॥  
 ওঁ সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং ।  
 স ভূমিং সর্বতঃ স্পৃষ্টা অত্যতিষ্ঠদশাঙ্গুলম্ ॥  
 ওঁ সর্বতঃ পানিপাদং তং সর্বতোহক্ষি শিরোমুখম্ ।  
 সর্বতঃ স্ৰুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥  
 ওঁ জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।  
 জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বশ্চ বিষ্ঠিতম্ ॥  
 ওঁ গতিভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ ।  
 প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥  
 ওঁ স্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ  
 ত্রয়স্য বিশ্বস্য পরং নিধানং ।

## অন্নকূট ভোগ

ভোগপ্রাক্‌গণের একপার্শ্বে লম্বা টিনের ঘরের মধ্যে সারি সারি উলুন পাতা। আচার্য্যদেব শিষ্যগণের প্রাণের আকাজক্ষা পরিপূরণের জন্ত অল্পমতি দিলেন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ এবং গৃহী ভক্ত নরনারীর মধ্যে যাহারা বিশেষ আগ্রহশীল তাহারা প্রত্যেকে যাহার যেরূপ ইচ্ছা দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবে—অন্নকূট ভোগের জন্ত। সন্ন্যাসীদের মধ্যে কে কি পাক করিবে তাহাও মোটামুটি নির্দেশ দিয়া দিলেন। সন্তানগণের আনন্দের সীমা নাই। সমস্ত দিন ও রাত্রি জাগিয়া পরিশ্রম করিয়া তাহারা শত শত প্রকার দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিলেন। বিভিন্ন স্থান হইতে তত্ত্বং স্থানীয় বিশেষ দ্রব্যাদি, শাকসজ্জী প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়াছিল। শাক, শুক্লা, ডাল, সজ্জী, ভাজা, চাটনী, মিষ্টান্ন, পিষ্টক প্রভৃতি যত প্রকার হইতে পারে—প্রস্তুত করা হইল। যিনি যাহা পাক করিয়াছেন তাহা স্বতন্ত্র রাখিয়া নাম লিখিয়া রাখা হইল।

যথাসময়ে সিংগীপীঠের মন্দিরের মধ্যে একপ্রান্তে আচার্য্যদেবের উচ্চ আসন স্থাপিত হইল। সম্মুখে একটা বৃহৎ পাত্রে শুভ্র ঘৃতসিক্ত অন্নরাশি উচ্চ চূড়ার আকারে সজ্জিত; চতুর্দিকে স্তরে স্তরে বাবতীয় ভোগ-দ্রব্যাদি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে রক্ষিত। মহাভিষেকান্তে আচার্য্যদেব মন্দির মধ্যে স্বীয় আসনে উপবেশন করিলেন। মন্দিরের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করা হইল। কয়েকজন সন্ন্যাসী ভিতরে বহিলেন। মন্দিরের তিন পার্শ্বের বারান্দায় সমবেত গৃহী

---

ত্বমব্যয়ঃ শাস্ততো ধর্মগোপ্তা

সনাতনস্বঃ পুরুষো যতো মে ॥

সন্ন্যাসী সন্তানগণ বাদ্যতালে “ও হর গুরু শব্দ শিবশঙ্কো”—নামকীৰ্ত্তন করিতেছে।

আচাৰ্য্যের ইচ্ছিতে প্রথমে একে একে সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ মন্দিরে প্রবেশ পূৰ্ব্বক স্বরচিত ভোগ দ্রব্য লইয়া স্বহস্তে আচাৰ্য্যদেবকে কিছু কিছু দিলে তিনি খাইলেন। এমনিভাবে সন্ন্যাসীদের কাজ সমাপ্ত হইলে পুষ্কর ভক্তগণ, পরে নারী ভক্তগণ একে একে মন্দিরে প্রবেশ পূৰ্ব্বক স্বীয় স্বীয় প্রস্তুত ভোগদ্রব্যাদি স্বহস্তে আচাৰ্য্যদেবকে খাইতে দিলেন। আচাৰ্য্যদেবের সম্মুখে একটা পাত্রে জলে ভিজান অন্ন ছিল। প্রত্যেকের প্রদত্ত ভোগদ্রব্য একটু একটু গ্রহণ পূৰ্ব্বক প্রতিবারে উক্ত জলে ভিজান অন্ন এক এক গ্রাস গ্রহণ করিতে লাগিলেন। উক্ত সন্তানগণ স্বহস্তে ভোগ-দ্রব্যাদি ভক্তি-প্রেম-বিগলিত চিত্তে সাশ্রনয়নে আচাৰ্য্যদেবকে খাওয়াইয়া—স্বয়ং বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ স্বহস্তে ভোগ গ্রহণ করিতেছেন—অনুভব করিয়া অনিৰ্কচনীয় ভাবে ডুবিয়া আত্মহারা হইল।

---

\* ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে প্রথম অন্নকূট ভোগের অচ্যুতান আরম্ভ হয়। মাঘী-পূর্ণিমার দিবস ভোর রাত্রিতে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীগণ “আচাৰ্য্য নিবাসের” দোতালার চারিপাশের বারান্দায় দাঁড়াইয়া সমবেত কণ্ঠে “প্রলয় পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং”—প্রভৃতি দশাবতার স্তোত্র গান করিতেছেন। খানিকক্ষণ পরে আচাৰ্য্যদেবের প্রকোষ্ঠের দ্বার উন্মুক্ত হইল। তিনি হস্তমুখ প্রক্ষালনান্তে পণ্ডকের উপর সমাসীন। একটু পরেই আরতি আরম্ভ হইবে। যাবতীয় ত্যাগী ও গৃহী ভক্ত শিষ্যগণ একে একে আরতি করিবেন। তজ্জগৎ আবশ্যক আয়োজন ও ব্যবস্থা হইতেছে।

অন্নকূট ভোগের অহুষ্ঠানের পর মন্দিরের দরজা খুলিয়া দেওয়া হয় ; সমাগত নরনারী মন্দির-দ্বারে আসিয়া উহা দর্শন করেন। পরে উক্ত ভোগের প্রসাদ অন্ন অন্ন করিয়া সমবেত সহস্র সহস্র নরনারীকে বিতরণ করা হয়।

### অগ্নিহোত্র যজ্ঞ

স্বন্দর সুসজ্জিত বিরাট নাট্যমন্দিরে রাজসভা-গৃহের মধ্যস্থলে রাজমঞ্চের সম্মুখে প্রস্তুতিত পদ্যের মধ্যে পরিকল্পিত সুপ্রশস্ত যজ্ঞ-কুণ্ড। ভারে ভারে সমিধরাশি উচ্চ চূড়ার আধারে সজ্জিত। যজ্ঞ-কুণ্ডের চারিপার্শ্বে নানাবিধ ফল, ফুল, তণ্ডুল, যব, তিল, শর্করা, ধূপ গুল্ গুল্ ইত্যাদি স্তপীকৃত। শত ঢাক এক সঙ্গে গর্জন করিতেছে ; খোল, করতাল, কাংস, ঘণ্টা, শঙ্খের রোলে শ্রবণ বধির প্রায় ; মধ্যে মধ্যে নারী-কণ্ঠের হলধ্বনি এবং স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দের তুমুল জয়ধ্বনি। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। কোনস্থানে একটু স্থান নাই ;—যেন তরঙ্গ-গর্জন-মুখরিত বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্র। মাঘ মাসের শীতের মধ্যেও সকলে পিপাসার্ত ও ঘর্ম্মাক্ত। স্বেচ্ছাসেবকগণ পিচ্কারী দিয়া

---

ইতিমধ্যে জনৈক সন্ন্যাসী কিছু ভোগদ্রব্যাদি আনিয়া আচার্য্যদেবের সম্মুখে রাখিলেন। আচার্য্যদেব তৎপ্রতি একটু দৃষ্টিপাত করিয়া “আমি কি এসব খাই ! আমি কি খাই তা’ জানিসনে !” বলিয়া শিশুর গায় অভিমান ভরে পর্য্যঙ্কের উপর বিমুখ হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া শুইয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী অপ্রস্তুত হইলেন। পুনরায় কিছু জলে ভিজান ভাত এবং অল্পাল্প কিছু ভোগদ্রব্য আনিয়া রাখিলেন। অমনি আচার্য্যদেব হাসিতে হাসিতে উঠিয়া বসিয়া আনন্দে ভোগ গ্রহণ করিলেন।

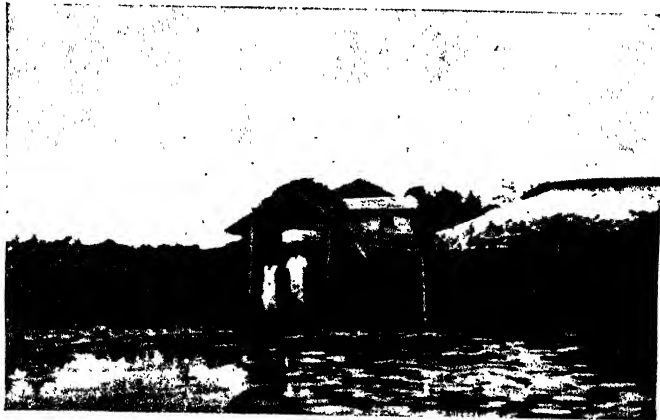


সংসার উত্তোগে নৌবুদ্ধ-প্রতিযোগিতায় সমবেত নমঃ স্তুতঃ ।





বঙ্গীয় হিন্দু মহাসম্মেলন উপলক্ষে সমবেত সহস্র নমশূদ্র সর্দারের  
যুদ্ধ-প্রতিযোগিতার মধ্যে আচার্য্যদেব ।



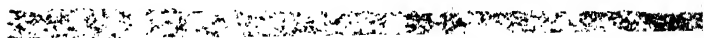
আচার্য্যদেবের দ্বান-জলাশয় প্রণবোস্থান মধ্যবর্তী “প্রণবকুণ্ড”

অবিবর্ত বারিবর্ষণ এবং পানীয় জল বিতরণ পূর্বক জনতাকে শান্ত রাখিতেছে। সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারি ও বক্ষীবন্দ অস্ত্রশস্ত্রাদি আশ্ফালন পূর্বক বাদ্যতালে যজ্ঞ-বেদীকে ঘেরিয়া নৃত্য করিতেছে।

মন্দির-দ্বার হইতে রাজমঞ্চ পর্যন্ত গৈরিক বস্ত্র বিস্তৃত হইল। সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও বক্ষীবন্দ দুই পার্শ্বে ভ্রোণীবদ্ধ ভাবে ছত্র, চামর, পাখা, ধূপদানি, ত্রিশূল, কুঠার, খড়্গ, ঢাল, সড়কী প্রভৃতি হাতে লইয়া “ওঁ হর গুরু শঙ্কর শিবশম্ভো” নীতের তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল। মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত হইল। সাংক্ষাৎ কৈলাসপতি সদৃশ আচার্য্যদেব ধীর-পদ সঞ্চারে রাজমঞ্চে সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইলেন। “জগদগুরু আচার্য্যদেব কী” “বাবা বিশ্বনাথ কী” “শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজীকী”—ইত্যাদি জয়ধ্বনিতে দিগ্বাণুল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

রুক্ষ-জটাজাল-মণ্ডিত শিরে সমুজ্জল সুবর্ণ-কিরীট, হস্তে কনক-কাস্তি দীর্ঘ ত্রিশূল, পাদপদ্মে স্বর্ণ-পাদুকা, ব্যাজ্রচর্ম্মাঘরাচ্ছাদিত-কলেবর বিরাট পুরুষ আলোকোজ্জ্বল সুসজ্জিত সিংহাসনে দিব্য জ্যোতির্ম্মণ্ডিত হইয়া সমাসীন হইলেন। উপস্থিত জনগণ বিস্মিত, বিমোহিত, আত্মবিস্মৃত। সকলের নয়নে মনে শুধু এই দৃশ্য, এই অল্পভূতিই জাগিতেছিল—যেন অপূর্ব “হরিহর মূর্ত্তি”;—জগতের পাপতাপ হরণ, ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জগৎ বিশ্বনিয়ন্তা হরিহরের সমন্বয়মূর্ত্তি ধারণ পূর্বক আচার্য্যের দেহ-বিগ্রহে অবতীর্ণ।

কারুকাঙ্ক্ষা-খচিত সিংহাসন; শিরোপরি বিচিত্র চক্রাতপতলে সুদৃশ্য রাজছত্র সমুড্ডীন; কারু-শিল্প-শোভিত ববনিকা, আসন, আন্তরণে রাজমঞ্চ অপূর্ব শোভায় প্রদীপ্ত। আচার্য্যদেব সমুন্নত দেহে সমাসীন। বথন দেখিতেছি—রুক্ষ-জটাজাল, রুদ্রাক্ষ-মণ্ডিত, বিভূতি-



ভূষিত দেহ, হস্তে দীর্ঘ ত্রিশূল, পরিধানে ব্যাজ্র-চর্মাস্বর ; মনে হইতেছে  
সাক্ষাৎ বরাহমুদ্রাতা শিব। জগতের পাপ তাপ জালামালা হরণের  
জন্ত নীলকণ্ঠ স্বয়ং আবিভূত। আবার যখন দেখিতেছি—রাজসিংহাসনে,  
রাজছত্র তলে, স্বর্ণ-কিরীটশিরে স্বর্ণ-পাদুকামণ্ডিত চরণে আচার্যদেব  
সমাসীন ; চতুর্দিকে চামর তুলিতেছে, বাজনী বহিতেছে, শত ধূপদানী,  
শতদীপমালা ঘূষিতেছে ;—বোধ হইতেছে—সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠপতি  
নারায়ণ—ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্ত বিশ্বপালনী শক্তি বিস্তার  
করিতেছেন।

ইঙ্গিত মাত্র সমগ্র যজ্ঞক্ষেত্র নিস্তক নিঃশব্দ। সকলের মুগ্ধ  
দৃষ্টি আচার্যদেবের অপরূপ হরি-হর মূর্তির প্রতি নিবদ্ধ। ভক্ত-  
সম্মাসীর কণ্ঠে স্তুতি গীতি ঝঙ্কারিয়া উঠিল—“জয় যজ্ঞেশ্বর প্রণবেশ্বর  
নারায়ণ দেব দেব হে।”\*

\* জয়, যজ্ঞেশ্বর প্রণবেশ্বর নারায়ণদেব দেব হে।

জয়, পার্শ্বতী-পতি শিব পশুপতি আশুতোষ মহাদেব হে ॥

ধরি নরকায় আপনি উদয় দানিতে অভয় মানবে।

তব, করুণা অপার প্রেম-পারাবার অপরূপ মহাভাব হে ॥

ত্রিতাপ-তাপিত অভাগা মানব

মায়াবিমোহিত করে হাহা রব ;

রক্ষ বিশ্বনাথ ক্ষম অপরাধ

নাশ এ প্রাণের অভাব হে ॥

দাওহে প্রসাদ না তুলি ওপদ

নিরাপদে সদা রব হে।

ভুলে যদি বাই ওহে দয়াময়

দিও পদ-পল্লব হে ॥

সাক্ষাৎ যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ এবং মহাদেব আজ আচার্য্যদেহে  
আবিভূত হইয়া আছতি গ্রহণার্থ সমাসীন ;—এই ভাবাবেগে সমবেত  
নরনারীর হৃদয়-মন-প্রাণ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। যজ্ঞেশ্বর আচার্য্যদেবের  
নির্দেশে সন্ন্যাসী ঋদ্ধিক বৈদিক মন্ত্রের উদ্গান পূর্বক অগ্নি প্রজালিত  
করিলেন। সমবেত সন্ন্যাসী গৃহী ভক্তগণের কণ্ঠে মন্ত্র প্রতিধ্বনিত হইতে  
লাগিল। সমবেত সহস্র সহস্র কণ্ঠের “স্বাহা” ধ্বনিতে বৈদিক  
যুগের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। “ওঁ নমঃ শ্রীভগবন্তে প্রণবান্ন  
স্বাহা” পূর্ণাহতির মন্ত্র উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক  
হইতে যজ্ঞকুণ্ডের মধ্যে—কদলী, শশা, ক্ষীরাই, বিষ্ণ, নারিকেল,  
কমলা প্রভৃতি ফল বর্ষার বারিধারার তায় বহিত হইতে লাগিল।  
যজ্ঞান্তে হরিহর মূর্তিতে দীপ্তিমান যজ্ঞেশ্বর আচার্য্যদেবের পূজা আরতি  
হইল। শত ধূপদানি লইয়া শত সন্ন্যাসী নৃত্য করিল, শতদীপমালা  
ভক্ত সন্ন্যাসি-করে হিল্লোলিত হইল ; শত ঢাক এক সঙ্গে গর্জন করিল,  
শত ত্রিশূল এক সঙ্গে বলকিত আন্দোলিত হইতে লাগিল। সহস্র  
সহস্র কণ্ঠে “জয় গুরু ওঁকার জয় শিব ওঁকার” গীতি বঙ্কিত হইল।  
সে দৃশ্য, সে ভাব, সে লীলা অমুভবের বস্তু—ভাষায় প্রকাশ করিবার  
নহে। অর্দ্ধলক্ষাধিক নরনারী তিনটি দিন এমনি ভাবে ভাবাবেগে  
দেশকালপাত্র ভুলিয়া, আহার নিদ্রার ক্লেশ সহ্য করিয়া, মাঘের শীত অগ্রাহ্য  
করিয়া মণ্ডপের মধ্যে, বৃক্ষতলে, উন্মুক্ত প্রান্তরে যে যেখানে স্থান পাইল  
দাড়াইয়া, বসিয়া, শুইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া কাটাইয়া দিত।

### —বরাভয়দান—\*

১৯৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে আচার্য্যদেবের মহাপ্রকাশ সার্কজনীন বিরাট

• ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জামুয়ারী মাসে মাঘী পুণিমার উৎসব-সম্মেলনের  
নিমন্ত্রণ পত্র রচনা করিয়া আচার্য্যদেবকে দেখান হইল। উহাতে

ভূষিত দেহ, হস্তে দীর্ঘ ত্রিশূল, পরিধানে ব্যাজ্র-চর্মাস্বর; মনে হইতেছে সাক্ষাৎ বরাহমুদাতা শিব। জগতের পাপ তাপ জালামালা হরণের জগ্না নীলকণ্ঠ স্বয়ং আবিভূত। আবার যখন দেখিতেছি—রাজসিংহাসনে, রাজহুত্রে তলে, স্বর্ণ-কিরীটশিরে স্বর্ণ-পাছুকামণ্ডিত চরণে আচার্যদেব সমাসীন; চতুর্দিকে চামর তুলিতেছে, ব্যাজ্রনৌ বহিতেছে, শত ধূপদানী, শতদৌপমালা ঘুরিতেছে;—বোধ হইতেছে—সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ—ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের জগ্না বিশ্বপালনী শক্তি বিস্তার করিতেছেন।

ইঙ্গিত মাত্র সমগ্র যজ্ঞক্ষেত্র নিস্তব্ধ নিঃশব্দ। সকলের মুখে দৃষ্টি আচার্যদেবের অপরূপ হরি-হর মূর্তির প্রতি নিবদ্ধ। ভক্ত-সন্ন্যাসীর কণ্ঠে স্তুতি গীতি ঝঙ্কারিয়া উঠিল—“জয় যজ্ঞেশ্বর প্রণবেশ্বর নারায়ণ দেব দেব হে।”\*

\* জয়, যজ্ঞেশ্বর প্রণবেশ্বর নারায়ণদেব দেব হে।

জয়, পার্বতী-পতি শিব পশুপতি আশুতোষ মহাদেব হে ॥

ধরি নরকায় আপনি উদয় দানিতে অভয় মানবে।

তব, করুণা অপার প্রেম-পারাবার অপরূপ মহাভাব হে ॥

ত্রিতাপ-তাপিত অভাগা মানব

মায়াবিমোহিত করে হাহা রব ;

রক্ষ বিশ্বনাথ ক্ষম অপরাধ

নাশ এ প্রাণের অভাব হে ॥

দাওহে প্রসাদ না ভুলি ওপদ

নিরাপদে সদা রব হে।

ভুলে যদি ঘাই ওহে দয়াময়

দিও পদ-পল্লব হে ॥

সাক্ষাৎ যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ এবং মহাদেব আজ আচার্য্যদেহে  
আবির্ভূত হইয়া আছতি গ্রহণার্থ সমাসীন ;—এই ভাবাবেগে সমবেত  
নরনারীর হৃদয়-মন-প্রাণ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। যজ্ঞেশ্বর আচার্য্যদেবের  
নির্দেশে সন্ন্যাসী ঋত্বিক বৈদিক মন্ত্রের উদ্গান পূর্বক অগ্নি প্রজ্জালিত  
করিলেন। সমবেত সন্ন্যাসী গৃহী ভক্তগণের কণ্ঠে মন্ত্র প্রতিধ্বনিত হইতে  
লাগিল। সমবেত সহস্র সহস্র কণ্ঠের “স্বাহা” ধ্বনিতে বৈদিক  
যুগের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। “ওঁ নমঃ শ্রীভগবতে প্রণবায়  
স্বাহা” পূর্ণাভতির মন্ত্র উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক  
হইতে যজ্ঞকুণ্ডের মধ্যে—কদলী, শশা, ক্ষীরাই, বিষ্ণু, নারিকেল,  
কমলা প্রভৃতি ফল বর্ষার বারিধারার ত্রায় বধিত হইতে লাগিল।  
যজ্ঞান্তে হরিহর মূর্তিতে দীপ্তিমান যজ্ঞেশ্বর আচার্য্যদেবের পূজা আরতি  
হইল। শত ধূপদানি লইয়া শত সন্ন্যাসী নৃত্য করিল, শতদীপমালা  
ভক্ত সন্ন্যাসি-করে হিল্লোলিত হইল ; শত ঢাক এক সঙ্গে গর্জন করিল,  
শত ত্রিশূল এক সঙ্গে বলকিত আন্দোলিত হইতে লাগিল। সহস্র  
সহস্র কণ্ঠে “জয় গুরু ওঁকার জয় শিব ওঁকার” গীতি বঙ্কিত হইল।  
সে দৃশ্য, সে ভাব, সে লীলা অল্পভবের বস্তু—ভাষায় প্রকাশ করিবার  
নহে। অর্দ্ধলক্ষাধিক নরনারী তিনটা দিন এমনি ভাবে ভাবাবেগে  
দেশকালপাত্র ভুলিয়া, আহার নিদ্রার ক্লেশ সহ্য করিয়া, মাঘের শীত অগ্রাহ্য  
করিয়া মণ্ডপের মধ্যে, বৃক্ষতলে, উন্মুক্ত প্রান্তরে যে যেখানে স্থান পাইল  
দাঁড়াইয়া, বসিয়া, শুইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া কাটাইয়া দিত।

—বরাভয়দান—\*

১৯৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে আচার্য্যদেবের মহাপ্রকাশ সার্কজনীন বিয়ার্ট

---

• ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জাহ্নবারী মাসে মাঘী পূর্ণিমার উৎসব-সম্মেলনের  
নিমন্ত্রণ পত্র রচনা করিয়া আচার্য্যদেবকে দেখান হইল। উহাতে

ভাব ধারণ করিতে থাকে। ১২৩২ খৃষ্টাব্দে উহা বিরাটতর ও পূর্ণতর হইয়া দাঁড়ায়। ১২৩১ খৃষ্টাব্দ হইতেই তিনি মন্দির মধ্যে সিংহাসীনে সমাসীন হইয়া সাক্ষাৎ বরাভয়-দাতা আশুতোষ শিব রূপে সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্য ও ভক্ত নরনারীকে একে একে বরাভয় দান করিতেন।

মাঘী পূর্ণিমার সময়ে যেদিন তিনি অতিমাত্র প্রসন্ন হইয়া বরাভয় দান করিবেন—ইচ্ছা করিতেন (কোনদিন কখন তিনি সে মহাসঙ্কল্প নিয়া আসনে বসিবেন—তাহার কোন নিশ্চয়তা ছিল না) সেদিন যথাসময়ে সংবাদ দিতেন—অবিলম্বে সমস্ত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ভক্ত শিষ্যগণকে স্নান করিয়া আসিয়া “অর্চনালয়ের” নিভৃত প্রাঙ্গণে ধ্যানস্থ হইয়া বসিতে। সকলে আদেশানুসারে ধ্যানে বসিয়া অভীষ্ট প্রার্থনায় মন একাগ্র কারিতে লাগিত।

ওদিকে মন্দিরের মধ্যে সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া অভ্যন্তর ভাগকে সম্পূর্ণ অন্ধকার করা হইত। একটা মাত্র প্রদীপ অতি ক্ষীণ বশি বিস্তার করিত। আচার্য্যদেব রাজবেশ পরিধান পূর্বক,

---

ছিল—অহোরাত্র নাম সংকীৰ্ত্তন, রাধাকৃষ্ণ পূজা, ৮বনদর্গাপূজা, অগ্নিহোত্র বজ্র ও প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি। কিন্তু আচার্য্যদেব বলিলেন—“আরও কিছু লিখিয়া দাওনা কেন?” জিজ্ঞাসা করিলাম—“কী লিখিব?” পুনঃ পুনঃ শুধু বলিতে লাগিলেন—“আরও কিছু লিখিয়া দিলে হয়! জায়গা তো আছেই।” তখন কতকটা উত্তেজিত হইয়া—উক্ত পত্রের মধ্যে—“আচার্য্যবরণ ও অর্ঘ্য প্রদান” “মহাভিষেক” “অন্নকূট ভোগ” “বরাভয়-প্রদান” “রাজরাজেশ্বর বেশ” ইত্যাদি কতকগুলি বিষয় পত্রের ভিতর লিখিয়া নিয়া দেখাইলাম। তিনি বাহ্য চাহিতেছিলেন তাহাই লিখিত হইয়াছে দেখিয়া তিনি বলিলেন—“বিশ হাজার (নিমন্ত্রণ পত্র) ছাপাইলে দোষ কি?”

মুকুটাদিতে তলঙ্কত হইয়া ত্রিশূল হস্তে লইয়া সিদ্ধশীঠের আসনে অধিষ্ঠান করিতেন। পূর্ব হইতে সাবধান করিয়া দিতেন—কেহ কথাটা বলিবে না; নীরবে একে একে ব্যাকুল প্রার্থনায় অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া পুষ্পবিষপত্রাদি অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া নিয়া মন্দিরে প্রবেশ পূর্বক আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি নিবেদন করিবে।

আদেশ আসিল; একে একে সম্মাসীগণ আহুত হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। অঙ্ককার মন্দির-গর্ভে হঠাৎ বাহিরের উজ্জ্বল আলোক হইতে গিয়া কিছুই দেখা যায় না। বিশেষতঃ ক্রীণ দীপরাশি অঙ্ককারকে আরও গাঢ় করিয়া তুলিয়াছে। ব্যাকুল, তন্ময়, ভক্তিগ্নত, একাগ্র চিত্ত লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়া চোখে ভাল করিয়া কিছু লক্ষ্য করা গেল না। অভ্যাস বশে গিয়া শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি নিবেদন করিয়া তত্পরি মন্তক স্থাপন করিলাম। আচার্য্যদেব বরাভয়প্রদ শ্রীকরকমল শিরে স্থাপনপূর্বক বাহ্যাপূর্ণকারী আশীর্বাদ দিলেন। প্রাণের অন্তরতম অন্তস্থল কটকিত হইয়া নয়ন অশ্রু প্রাবিত, হৃদয় বিগলিত হইল। দেশকালপাত্র ভুলিয়া গেলাম; দেহ-মন-আত্মা যেন অমৃত-সাগরে ডুবিয়া গেল। আর উঠিতে সাধ যায় না। কিন্তু আচার্য্যদেবের পদাজুষ্ঠ সঙ্কেতে জাগিলাম। স্বপ্নোথিতের মত আবিষ্ট চিত্তে বাহির হইয়া আসিলাম। সম্মাসীগণের বরাশীষ গ্রহণ সমাপ্ত হইলে গৃহী ভক্তগণের পালা। ১২৩২ সালের মাঘী পূর্ণিমায় শেষ মহাপ্রকাশের সময় ভক্তবাহ্যকল্পতরু আচার্য্যের সর্বশেষ বরাশীষ প্রদান।

### দোল-লীলা

গুজরাট হইতে ভক্তগণ কারুকার্য্য-খচিত একখানি সুন্দর দোলা আনিলেন—প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আচার্য্যদেবকে দোলায় বসাইয়া



দোলোৎসব করিবেন। মাঘী পূর্ণিমা উৎসবের পর দিবস সন্ধ্যায় আয়োজন হইল। সভা-গৃহের একাংশে দোলা খাটাইয়া আসনান্তরণ, চন্দ্রাতপ, যবনিকা, পুষ্পমালাস্তবকাদি দ্বারা মনোরম করিয়া সজ্জিত হইল। কনককাস্তি সুদীর্ঘ শৃঙ্খলদ্বয়ে লম্বিত দোলা নয়নরঞ্জন করিতেছিল। ত্যাগী ও গৃহী ভক্তগণ চতুর্দিকে ভক্তি অল্পরাগে হৃদয়পূর্ণ করিয়া সমবেত। গায়ক সন্ন্যাসীর কণ্ঠে সঙ্গীত বহুত হইল—“এস হৃদি-মন্দিরে প্রণবানন্দ।”\* ভক্তগণের হৃদয় বিগলিত করিয়া সে সঙ্গীতস্বধা যেন এক

- “এস, হৃদি-মন্দিরে প্রণবানন্দ ত্রিশূলদণ্ডধারী !

এস মানব-হৃদয়-রঞ্জন পাপভঞ্জনভয়হারী ॥

এস হে ভারত-সুখ্য তোমার লাঞ্ছিত মৃত দেশে,

এস রুদ্ধ গৈরিক বেশে।

এস সন্তান তরে স্বকরণ করে স্বধামাথা হাসি হেসে।

এস, হাতে নিয়ে তব জীবন-আশীষ প্রেমের অমিঘ-বারি ॥

ওগো ! তোমারে পূজিতে আজি—

মঞ্জুল ফুলমালাটি গাঁথিয়া

আসিয়াছি দীন সাজি,

তব, বিরহ-বেদনা সহে না সহে না

উঠিছে হৃদয়ে বাজি।

মম, চিত্ত-মুকুরে কুটে ধীরে ধীরে

তোমার আনন-খানি ;

মম, শ্রবণের মাঝে ঝঙ্কারি উঠে

তব মুখ-মধু-বাণী।

এসে, লহ গো দীনের জীবন-অর্ঘ্য

প্রাণ-ধন-দান-কারী ॥

আনন্দের স্বপ্নরাজ্য রচনা করিল। ভক্ত-বৎসল আচার্য্যদেবের হৃদয় স্নেহ-প্রেমে দ্রবীভূত হইল। সিদ্ধপীঠ মন্দির-দ্বার উন্মুক্ত হইল। ভক্ত-কণ্ঠে জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে “হর গুরু শঙ্কর শিব শম্ভো” গীতি নিনাদিত হইল। রক্তপীতোজ্জ্বল কোষেয়-বাস-পরিহিত, কিরীট-শীর্ষ, ত্রিশূল-দণ্ড-মাল্যবিভূষিত আচার্য্যদেব বিস্তৃত গৈরিক বস্ত্রোপরি বিস্তৃত পদ্ম-সনগুলির উপর পদসঞ্চার করিতে করিতে দোলায় আসিয়া আসীন হইলেন। ইন্দ্রিতে সভা নিস্তব্ধ হইল। সম্মাসিগণের ভক্তি-বিহ্বলকণ্ঠে পুনরায় সঙ্গীত-সুধা নিখরিত হইল—“স্বমধুর শ্রীগুরুরূপ জ্যোতির সাগরে, ডুবিল নয়ন-মন আনন্দ উথলে।” উপস্থিত জনমণ্ডলীর প্রাণমন তখন ভক্তি-রস-সিদ্ধিতে অবগাহন করিয়া আনন্দ-বিহ্বল। তখন উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সমতাল লয়ে দোলায় দোল দিতে দিতে নৃত্য করিতে করিতে গাহিলেন—

“তালে তালে দোল দে দোল দে দোল

দোছল দোছল দোলে !

হৃদয়েরি দোলে প্রিয়তম দোলে

দোলে ভুবন দোলে ॥

বিশ্ব-দোলনে নাথ দোলেয়ে !

অপরূপ রূপে ভুবন ভোলে রে !

আয়রে প্রেমিক ! আয় দলে দলে

অবগাহি আখিজলে ॥

হুলাল দোলেয়ে গুলাল মাখি,

ভুলালো আজিবে ভরিয়া আখি,

ঢালো ঢালো ঢালো হে সাকী !

প্রেম-পিয়ালা ছলে ॥”

তৎপরে আচার্য্যদেবের ঐশ্রীপাদপদ্ম আবির-রঞ্জিত করিয়া পূজারতি, স্তব পাঠ হইলে তিনি প্রসন্ন চিত্তে উপস্থিত সকলকে শিরঃস্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ দান করিলেন। তৎপরে প্রতি বৎসরেই এরূপ হইয়া থাকে।

### ত্রিশূলোৎসব

১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে আচার্য্যদেব সজ্জশক্তির প্রতীক স্বরূপ ত্রিশূল সিদ্ধপীঠে স্থাপন পূর্বক পূজার ব্যবস্থা করেন। তদবধি প্রতি বৎসর পৌষ পূর্ণিমায় মঠে ত্রিশূলোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পৌষ পূর্ণিমা হইতে ভাগবতী সঙ্কল্প-শক্তি আচার্য্যদেবের অন্তরে সঞ্চিত ও ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে থাকে মাঘী পূর্ণিমায় উহা পরিপূর্ণ ভাবে বিকসিত হয়। তাই ত্রিশূলোৎসব—ভাগবতী সঙ্কল্প-শক্তির উদ্বোধনোৎসব। ভাগবতী শক্তির প্রতীক ত্রিশূল। এই উৎসবেও মঠে কয়েক সহস্র লোক সমাগম হইয়া থাকে। পৌষপূর্ণিমা দিবস অপরাহ্নে গোধূলির প্রাক্কালে সিদ্ধপীঠ হইতে প্রাণ্ডুক্ত ভাবে শোভাযাত্রা করিয়া একজন সন্ন্যাসীর মস্তকে বস্ত্রমণ্ডিত, সিন্দুররঞ্জিত, পুষ্পমালা-শোভিত ত্রিশূল স্থাপন পূর্বক আচার্য্যদেব সহ মঠের পুষ্করিণীতে লইয়া যাওয়া হয়। আচার্য্য দেব অর্দ্ধবাহ অবস্থায় ধীরে ধীরে চলিতে থাকেন; সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসীটি ত্রিশূল মস্তকে লইয়া নৃত্য করিতে করিতে একবার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া পুনঃ পশ্চাতে কিঞ্চিৎ হঠিয়া ক্রমশঃ ঘাটে পৌছিয়া ত্রিশূল সহ জলে ঝাঁপ দিয়া অবগাহন পূর্বক উপরে উঠিয়া পুরোক্ত প্রকার শোভাযাত্রা করিয়া সিদ্ধপীঠ মন্দিরে লইয়া গিয়া নব বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া ত্রিশূলরাজকে সিদ্ধপীঠে স্থাপন করা হয়। পরে রাত্রিতে জটনৈক সন্ন্যাসী আচার্য্যের আদেশক্রমে পূজারতি সম্পাদন করেন। অতঃপর আচার্য্যের সিদ্ধাসনে যথারীতি পূজারতি সম্পন্ন হইয়া থাকে। আচার্য্যদেব সমবেত নরনারীকে আশীর্বাদ ও শক্তি সঞ্চার করেন।

## বিশ্বরূপ পর্য্যবসানের আভাস

আচার্য্যের যে বিরাট ব্যক্তিত্ব মধ্যাহ্ন সূর্য্যের জ্বাল প্রদীপ্ত তেজে চতুর্দিকে জ্বাতি ও সমাজের সর্বস্বত্রে অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, যার কর্মক্ষেত্রের প্রচণ্ড আবর্ত ও দুর্বার গতিবেগে সমাজের সর্বস্বত্রে জনগণকে আকর্ষণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম-ভিত্তিতে জাতি-গঠনের ক্ষেত্রে আনিয়া সম্মিলিত ও সমন্বিত করিতেছিল, তাহা যে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে মহাপর্য্যবসানের সম্মুখীন হইয়া পড়িতেছে, একান্ত ঘনিষ্ট অন্তর্বাসী সন্ন্যাসিগণও তাহা কল্পনা করিতে পারে নাই। তাহার শুধু দিবারাত্র আহার-নিদ্রা-বিশ্রামে সম্পূর্ণ উদাসীন, দেহ-বোধ-বিরহিত আচার্য্যের অবিরাম, অবিশ্রাম প্রচণ্ড কর্মলীলা দেখিয়া স্তম্ভিত হইতেছিলেন। শেষ তিনটা বৎসর তিনি নিদ্রা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; অথবা নিদ্রা ও বিশ্রামের বিন্দুমাত্র অবসর ছিল না। রাত্রিতে হয়ত দু'তিন ঘণ্টা তাঁর প্রকোষ্ঠের দ্বার বন্ধ থাকিত বটে; কিন্তু তখনও তিনি সঙ্কলিত কর্মের চিন্তায় বিনিম্ন রহিতেন—দেখিয়াছি।

রাত্রি ৩ ঘটিকায় দু' একজন সন্ন্যাসী ও সেবককে সঙ্গে নিয়া তিনি কাজে বাহির হইতেন, সমস্ত দিন নানা কার্য্য নানাস্থানে ঘুরিয়া রাত্রি ১২টার আশ্রমে ফিরিয়া আসিতেন। সঙ্গে একটি জলের কুঁজা ও একটা গ্লাস থাকিত। সামান্য কিছু চানাচুর মুড়ি অথবা কমলালেবু দু'একটা খাইয়া দিন কাটিত। শেষ দু'টা বৎসর প্রায়ই এরূপ ঘটিত। সমস্ত দিনব্যাপী হরেক প্রকার কর্মের মধ্যে যাবতীয় সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, সেবকগণকে ডুবাইয়া রাখিতেন; প্রত্যেক কার্য্যের নির্দেশ নিজে

দিতেন, প্রত্যেকটা কার্যের তত্ত্বাবধান নিজে করিতেন; তাঁহার আহারের কথা ভিজ্ঞাসা করিলে তিনি ধমক দিয়া বলিতেন—“আমি কি খাইরে! এক মুষ্টি চানচুর বা মুড়ি হলে আমার চলে! চিরকাল শুধু ভাত খেয়ে এসেছি! আমার জন্তে কোনো বেটার কিছু করতে হবে না!” কেউ যদি তাঁর জন্ত কিছু পাক করিতে যাইতেছে দেখিতেন; অমনি তাহাকে অথচ কোনো কাণ্ডে প্রেরণ পূর্বক বলিতেন—“আমি যে কাজে দিন রাত খেটে মরছি; একটা মুহূর্ত্ত বিশ্রাম পাইনে, সেদিকে না ভেবে যাচ্ছে আমার জন্তে পাক করতে! খাইয়ে আমাকে খুসী করবে! ভারী আমার দরদী!”

সমস্ত দিন অবিপ্রাস্ত কর্ম্মিগণকে নানা কাজে খাটাইতেছেন; কাহারও একটুও বিশ্রাম বিরাম নিবার অবসর নেই; এমনি ভাবে কোনোদিন রাত্রি ১২টা, কোনোদিন ১টা, কোনো দিন বা ২টা হয়ে যায়; তৎপরে একটুখানি অবসর দিলেন। ক্রান্ত কর্ম্মিদল ঘুমাইয়া পড়িল। পুনরায় রাত্রি ৩ ঘটিকায় সকলকে ডাকিয়া তুলিলেন—“আমি একটা মুহূর্ত্ত, একটা পলক বিশ্রাম করি না, তোরা ঘুমোবি? ওঠ! বুদ্ধ ক্ষেত্রের সৈনিক আমরা; বিরাম বিশ্রামের চিন্তা আমাদের জীবনে কোথায়?”

শেষ তিনটা বৎসর তাঁহাকে চট্টগ্রামের শেষ প্রান্ত থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত নানাস্থানে—গ্রামে ও সহরে নানা কার্যোপলক্ষে পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছে। একই সময় পুরী সেবাপ্রমে, কান্দীতীর্থ সেবাপ্রমে, গয়া সেবাপ্রমে, প্রয়াগ সেবাপ্রমে স্বাক্ষরনিবাসগুলি নির্ধাণ করাইতেছেন। বাকলা, বিহার, উড়িষ্যা ও যুক্ত-প্রদেশের নানাস্থানে হিন্দু-সম্মেলনের আহুতান করিতেছেন; লজ্জের বহুবিধ ধর্ম্ম-প্রচার ও সেবামূলক কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তারই অবসরে বিভিন্ন

স্থানের হিন্দুনেতৃবর্গের সহিত জাতি ও সমাজ-গঠন বিষয়ক আলোচনা ও পরামর্শ করিতেছেন। অর্থাভাবে স্বীয় সঙ্কল্পিত কার্য্য আশাহীনরূপে অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া বলিতেছেন—  
“এখন বুঝিতে পারছি—কেন revolution partyর ছেলেরা ডাকাতি করতো! দেশের জন্ত বারো জীবনের রক্তপাত করছে, তাদের সহায়তা করবার জন্ত কেউ অর্থ দিতে চায় না। অথচ নিজেদের খেলা খুসীতে বিলাস-ভোগে অজস্র অর্থ অপব্যয় করছে! আমি হিন্দু-সংগঠন কার্য্যের জন্ত সহস্র সহস্র কর্ম্মী চাই; কিন্তু সেই সহস্র সহস্র কর্ম্মীর ভরণ-পোষণের অর্থ কোথায়? দেশের বহু ধনীকে বোঝাতে চেয়েছি; কিন্তু কিছুতেই তারা বুঝবে না! দেশের অসংখ্য মঠধারী মোহন্ত পুরুষ-প্রমাণ অর্থ নিয়ে বসে আছে; অথচ আমরা গায়ের রক্ত জল করে অর্থ পাচ্ছি না—ধর্ম্ম-প্রচার ও সমাজ সেবার জন্ত। এক একবার মনে করি কলকাতার জমি বাড়ী বিক্রী ক’রে দিয়ে সে টাকা হিন্দুসংগঠনের জন্ত ব্যয় করে যাই।”\*

কোনো কোনো সন্ন্যাসী এই অর্থাভাব প্রসঙ্গে কোনো সময়ে তাঁহাকে আভাসে বলেন—কিছু যোগশক্তি প্রকাশ করলেই তো লোকে টাকা দেয়। তাহাতে তিনি উত্তর দিতেন—“যোগশক্তি বা আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব দেখিয়ে অর্থার্জন করা আর বেস্তাবুস্তি করে অর্থোপার্জন—একই কথা। যে শক্তি সমগ্র জাতির মধ্যে ধর্ম্মভাব ও আধ্যাত্মিক আদর্শ বিস্তারের জন্য, তা কি তুচ্ছ অর্থার্জনে ব্যয় করবো? কোনো আচার্য্য তা’ কোনো যুগে করেনি, করে না।”

---

\* স্বামী বিবেকানন্দও অর্থাভাবে, দেশের জনসাধারণের সহায়ত্বভূতির অভাব দেখিয়া একরূপ উক্তি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

আচার্যের অলৌকিক জীবনের শেষ যে কয়েকটা বৎসরের কথা বর্ণিত হয়েছে, সে সময়ে আচার্যের শরীর নানা প্রকারে অস্থস্থ। ডায়েবিটিস্ এ আক্রান্ত হইয়া তাঁর শরীর জীর্ণ হইতেছিল। প্রতিদিন দু'বেলা ইন্সুলিন ও গ্লুকোজ ইন্জেক্শন চলিত। পথ্য বিষয়ে সংযম অবলম্বন করিতে গিয়া আহার নাম মাত্রে পর্য্যবসিত ; তাহাও অনিয়মে কখনও ঠিক মত হইত, কখনো হইত না। চিকিৎসকগণ সাবধান করিতে করিতে হয়রাণ হইয়া চূপ করিয়া গেলেন। সন্ন্যাসী সন্তানগণের অমুরোধ-উপরোধ-প্রার্থনা, কাকূতি-মিনতি ভাসিয়া গেল। নিরন্তর কণ্ঠের আবর্তের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া তিনি সন্ন্যাসিগণকে স্বীয় মহাপ্রয়াণের আভাস ভুলাইয়া রাখিতেন।

সেই জীর্ণ শরীরের উপর অবিরত অনিয়মের ফলে বেরীবেরী রোগ হইল ; দুই বৎসর ধরিয়া চলিতে লাগিল। পায়ের পাতা ফুলিয়া গেল। সন্ন্যাসী সন্তানগণ নিষেধসম্বন্ধেও চিকিৎসক ডাকাইলেন। তিনি আতঙ্কিত হইয়া বলিলেন—“সর্বনাশ! আপনি যে আত্মহত্যা করছেন! আপনি অন্ততঃ একটি মাস কলিকাতায় থাকুন, আমরা চিকিৎসা করি।” চিকিৎসক চলিয়া গেলে আচার্যদেব—সন্ন্যাসিগণকে বলিলেন—“আমার কি এখন ব্যারাম চিকিৎসা করবার অবসর আছে?” প্রতিদিন জ্বর হইতেছে ; তাই নিয়াই তিনি সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কৰ্মক্ষেত্র রচনা ও কৰ্ম প্রেরণা দান করিতে লাগিলেন। এমনি করিয়া পুরো দুইটা বৎসর ধরিয়া বেরী বেরী চলিল। চিকিৎসা বা বিশ্রামের অবসর একদিনও হয় নাই।

“বেরীবেরী—” আপনা হইতে সারিয়া গেল ; কিন্তু গ্লুকোমা হইয়া চোখ দুইটির দৃষ্টিশক্তি ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল। দু'খানি পায়ের পাতা হইতে হাটু পর্য্যন্ত অবশ-ভাবাপন্ন (Paralysis

of sensory nerves) হইয়াই ছিল। পায়ের তলার কোঁকায় মত উঠিয়া ক্ষতে পরিণত হইল। ক্ষত মাঝে মাঝে আরোগ্য হইয়া গেলে, কিছুদিন পরে পুনরায় নূতন ভাবে কোঁকা উঠিয়া ক্ষতের সৃষ্টি হইত। তথাপি চিকিৎসা বা বিশ্রামের নাম করিতে দিতেন না। সে কথা উঠিলেই বলিতেন—“আমার ঠ্যাণ্ড্ থাক্ আর থাক্, চোখ নষ্ট হোক্ আর বাই হোক্—সে সব ভাববার সময় আমার নেই। একেবারে শয্যাশায়ী হবো যেদিন সেদিন দেখা যাবে।”

অথচ বাইরে লোকে যখন দেখিত—তিনি অবিরাম নানা প্রদেশে নানা কার্যে ছুটিতেছেন—সঙ্গে আসবাবপত্রসহ বিরাট প্রচারবাহিনী; সৰ্ব্বত্র সমস্ত কাজে, সমস্ত মহোৎসব-সম্মেলনে, বাবতীয় হিন্দু-সম্মেলনে, উপস্থিত থাকিয়া অবিশ্রান্ত কার্য করিতেছেন। তাহার কেহই বুঝিতে পারিত না যে তিনি একরূপ অস্থস্থ। সম্পূর্ণ দেহ-বোধ-রহিত না হলে কেউ কদাচ এভাবে জীর্ণ বহুব্যাধিগ্রস্ত শরীর নিয়া একরূপ চলিতে পারে না।

এই সময়কার অবস্থা আলোচনা করিয়া সন্ন্যাসিগণ পরস্পর বলাবলি করিতেন—“শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন, চলিতে অক্ষম, অনিচ্ছুক থোড়াকে অবিরত চাবুক মেয়ে মেয়ে ঢালানোর মত আচার্য্যদেব ব্যাধিগ্রস্ত, জীর্ণ, পক্ষু দেহকে সঙ্কল্পের চাবুক মেয়ে চালিয়ে নিচ্ছেন।” তাঁর অবিরাম কৰ্মের উদ্ভাদনা দেখিয়া আমাদের মনে হইত গন্তব্য স্থল বহুদূর বুঝিয়া এবং সন্ধ্যা সমাগত জানিয়া পথিক যেমন উৰ্দ্ধ্বাসে ছুটিতে থাকে, তেমনিতর উদ্বেগ ও ব্যাকুলতার সহিত আচার্য্যদেব সঙ্কলিত কৰ্ম-পরিকল্পনার পথে ছুটিতেছিলেন। মাঝে মাঝে আশঙ্কা হইলেও আমরা ধারণা করিতে পারি নাই যে তিনি তদীয় সঙ্কলিত কার্য অতি দ্রুত সমাপ্ত করিয়া মহাপ্রয়াণের আরোহণ করিতেছেন। আমরা আলোচনা



করিতাম—“শরীর ব্যাধিগ্রস্ত, জীর্ণ, অচল, পঙ্গু হলে মাহুঘ বিরাম বিশ্রাম নেয়, কর্ণে শিথিলতা আসে। আচার্য্যদেবের বেলায় সবই উল্টো! শরীর যতই জীর্ণ অচল হয়ে আসছে ততই তিনি কর্ণের বেগ বাড়িয়ে দিচ্ছেন। যখন শরীর স্থূহ ছিল, তখন তো বিশ্রাম নিতেন; আর এখন বিশ্রামের প্রয়োজন, অথচ এক মুহূর্ত্তও বিশ্রামের নামটী পর্য্যন্ত নেই।” এই সময়ে তিনি সর্বদাই গম্ভীর ভাবে থাকিতেন; কোনো ব্যক্তিগত দোষ, ত্রুটি, অসুবিধার অভিযোগ করিলেই তিনি ধমক দিয়া বলিতেন...

“আমার এখন কোনো দিকে তাকাবার সময় নেই; আমি চলছি বিচ্ছাংগভিতে, যে পারবি আমার সঙ্গে চলবি; না পারবি পড়ে থাকবি। আমি দেখতে যাবো না! তোদের মন অনেক যুগিয়েছি। আর নয়! আমার সময় সঙ্কীর্ণ। এর মধ্যে সঙ্কল্পিত কাজ শেষ কর্ত্তে হবে।”

## বিশ্বরূপে পর্য্যবসান

✓ | ১২৪০ খৃষ্টাব্দে স্থলমেহ আচার্য্যদেবকে ধারণ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া পড়িল। হিন্দু-ধর্ম, হিন্দু-সমাজ, হিন্দু-জাতির কল্যাণ-চিন্তা ও চেষ্টা, অধঃপতিত, ক্লৈব্য-দৌর্ব্বল্যে বিপর্য্যস্ত, হতাশ-নৈরাশ্যে স্তিমিত হিন্দুজাতির হৃদয়ে শৌর্য্যবীৰ্য্যের প্রেরণা সঞ্চারের তীব্র ব্যাকুলতা আচার্য্যের হৃদয়ে ক্রমশঃ বিপুলতর আকার ধারণ করিতেছিল। রক্ত-মাংস-দেহের অস্তিত্বও তিনি বিস্মৃত হইলেন।

ভিসেম্বর মাসের প্রথমে তিনি স্বীয় সিদ্ধপীঠে মহাসঙ্কল্পের প্রেরণা লইয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্কল্পময় স্থল-শরীরের সহিত তখন আচার্য্যের কোন সংশ্লেষ নাই। ভাগবতী সঙ্কল্প-শক্তির বিরাট বিশ্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক তিনি হিন্দু-জাতির বিরাট শরীরে সমাহিত হইয়া অবস্থিত হইলেন। যেন কবির বাণীই প্রতিধ্বনিত হইল।...

“আমার জীবনে লভিয়া জীবন

জাগো যে সকল দেশ।”

### কমা-প্রার্থনা

‘হে আচার্য্য! তোমার অনন্ত অহৈতুক জন্ম ও জীবন-লীলা আলোচনা করিতে গিয়া অসংখ্য অপরাধে অপরাধী! এ ধৃষ্টতা ক্ষমি বার্জনা কর।...

“তন্মহ্যং প্রণম্য প্রণিধায় কায়ম্

প্রসাদয়ে স্বামহমীশমীড়্যম্।

পিতেব পুত্রস্ত সখেব সখ্যঃ

প্রিয়ঃ প্রিয়ায় হর্ষসি দেব সৌচুম্।

ও শ্রীপ্রণবাপর্ণমন্ত

## শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	সহ
১২৪	১১	ডল	বাড়িল
১৭৭	১৩	আত্মসঙ্কোচই	আত্মসঙ্কোচই
১৭৮	১৫	সুদীর্ঘকাল	সুদীর্ঘকাল
২২৭	১০	এক যেন	যেন এক
২৫৬	৩	বিদ্বান	বিদ্বান
২৫৬	১১	পুণিয়ায়	পুণিয়ায়
২৭৪	৮	চিহ্ন	চিহ্ন
২৮৩	১	ত্রিশূল	ত্রিশূল
২৯৩	১	জগতকে	জগতে
৩০১	১০	গৈরিব	গৈরিক
৩১২	১	দেবী-প্রতিমার	দেবী-প্রতিমায়
৩১৬	২	পর্যন্ত	পর্যন্ত
৩১৬	৬	সেবক-কৃন্দের	সেবকবৃন্দের
৩১৬	৬	দেখিয়া।	দেখিয়া
৩২০	৬	হইয়া।	হইয়া
৩২১	৪	আচার্য্যদেবের	আচার্য্যদেবের
৩৩৬	১৮	আধবেশনের	অধিবেশনের

